ইতিহাস গ্রন্থমালা-৭

মধ্যযুগের ভারতীয় শহর

অনিরুদ্ধ রায়

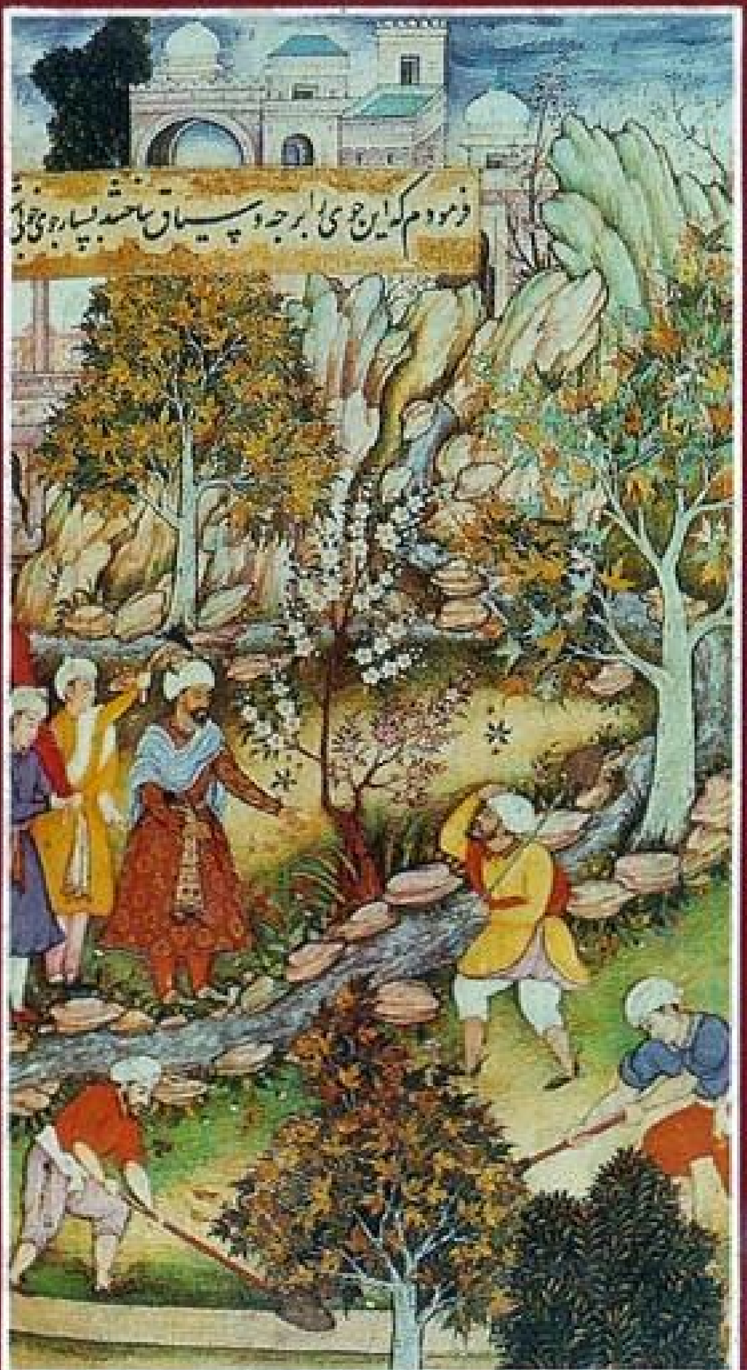

ইতিহাস গ্রন্থমালা ৭

প্রধান সম্পাদক: অশীন দাশগুপ্ত
সহযোগী সম্পাদক: সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

মধ্যযুগের ভারতীয় শহর

অনিরুদ্ধ রায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩

© অনিরুদ্ধ রায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-976-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

MADHYAYUGER BHARATIYA SHAHAR
[History]
by
Aniruddha Roy

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২৫০.০০

বাণী রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৯
ভূমিকা ১১

প্রথম পর্ব

১ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর দিল্লি ৩১

২ রাজস্থান ও গুজরাট ৫০
    ২.১ রাজস্থান ৫০
    ২.২ গুজরাট: খাম্বাজ ৫২
    ২.৩ চম্পানীর ৬২
    ২.৪ আহমদাবাদ ৬৮

৩ মালব ও দাক্ষিণাত্য ৭৭
    ৩.১ মাণ্ডু ৭৭
    ৩.২ বাহমনি, গুলবর্গা ৮৪
    ৩.৩ বিদর ৮৬

৪ বিজয়নগর ৮৯

৫ গোয়া ১০৮

৬ বাংলা ১২৯
    ৬.১ নদীয়া ১৩০
    ৬.২ লক্ষণাবতী ১৩৩
    ৬.৩ পাণ্ডুয়া ১৩৬
    ৬.৪ গৌড় ১৪২
    ৬.৫ সপ্তগ্রাম ১৫৩
    ৬.৬ ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ (নদীয়া) ১৫৮
    ৬.৭ যশোহর ১৬১
    ৬.৮ সোনার গাঁ ১৬৫

দ্বিতীয় পর্ব

৭ আগ্রা ১৮১

৮ ফতেপুর সিক্রি ১৯৩

৯ শাহজাহানাবাদ (দিল্লি) ২১৯

১০ পঞ্জাব ২৩৮
    ১০.১ লাহোর ২৩৮
    ১০.২ সিরহিন্দ ২৫১

১১ সুরাট ২৫৪

১২ কালিকট ২৭২

১৩ কোচিন ২৭৯

১৪ গোলকুণ্ডা ২৮৭

১৫ বিজাপুর ৩০৭

১৬ বুরহানপুর ৩১৩

১৭ বাংলা ৩২১
    ১৭.১ রাজমহল ৩২১
    ১৭.২ হুগলি ৩২৬
    ১৭.৩ ঢাকা ৩৩৬
    ১৭.৪ মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার ৩৫০
    ১৭.৫ চট্টগ্রাম ৩৬১

পরিশিষ্ট ৩৬৯

গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৩
নির্দেশিকা ৩৮৫

মুখবন্ধ

চার বছর আগে প্রধান অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত আমাকে এই ধরনের একটা বই বাংলায় লেখার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে মনে হয়েছিল যে এই ধরনের জরিপ করা সহজ এবং সময়ও বেশি লাগবে না। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হল যে এই ধরনের কোনও বই বাংলাতে নেই। ইংরেজিতেও যা আছে, সেগুলি কিছুদিন আগেকার। এর পরে নানাধরনের কাজ হয়েছে শহর নিয়ে, যদিও মধ্যযুগের উপরে লেখা খুবই কম। সুতরাং ঝুঁকি নিয়ে কাজটি করেছি। এর মধ্যে নিজের গবেষণা খুবই অল্প। প্রধানত অন্যান্যদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণার সুযোগ নিয়েছি। সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা বলে টীকা দেওয়া হয়নি। তবে শেষে একটি গ্রন্থতালিকা রয়েছে। উৎসাহী পাঠক তার সুযোগ নিতে পারেন।

লেখাটি হয়েছে প্রধানত শহরের গড়ন ও চেহারা নিয়ে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায় নেই। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান ধারা প্রায় সকলেরই জানা। না জানলেও জেনে নেওয়া কিছু কঠিন নয়। ওই একই কারণে অর্থনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস খুব অল্পই আছে।

এর মধ্যে ভারতের ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শহরগুলি প্রায় নেই। কলকাতা, মাদ্রাজ, মুম্বাই বা চন্দননগর কি পণ্ডিচেরি সবই নতুন শহর। এগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু হলেও, শহরের রূপ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যা আমাদের আলোচনার সীমানার বাইরে। এ ছাড়া ওইসব শহরের উপর নানারকম লেখা হচ্ছে বা হয়েছে, অর্থাৎ ওইসব শহরের ইতিহাস খুব অজানা নয়। কিন্তু পর্তুগিজদের শহরগুলি মধ্যযুগের ভিতরে পড়ে, ফলে সবগুলি না হলেও, কয়েকটি এখানে আলোচিত হয়েছে। বহু জায়গাতেই শহরের উত্থান বা পতন সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত রয়েছে। যার ফলে অনেক শহরের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চলে গিয়েছি। আমাদের সীমানার বাইরে গেলেও, আগেকার ধারাটির অবক্ষয় কীভাবে হয়েছে এটা দেখানোই উদ্দেশ্য।

মোটামুটি সুলতানি ও মোগল যুগ ভাগ করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কতকগুলি শহর এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে বা কতকগুলি দুই যুগের মধ্যেই পড়ে। সেগুলির বেলায় এই ধরনের কৃত্রিম বিভাজন খাটেনি। এ ছাড়া সূত্রনির্ভর বা প্রধানত প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা থেকে শহরগুলির চেহারা দেখার চেষ্টা হয়েছে বলে, সব শহর সমানভাবে গুরুত্ব পায়নি। শহরগুলির উত্থান-পতনের সাধারণ সূত্র বের করার চেষ্টাও করিনি। সে ধরনের কাজ বিশাল পটভূমিকাতে করতে গেলে আরও গবেষণা

প্রয়োজন। শহরগুলির নিজস্ব ধারা ধরবার চেষ্টা করা ছাড়া, পরিশিষ্টে এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সুভাষ চক্রবর্তী বইটি লিখতে তাগাদা ও প্রেরণা দুইই সমানভাবে দিয়েছেন। ওঁর কাছে নানান সময়ে অসময়ে মতামত চেয়েছি ও পেয়েছি। আনন্দ পাবলিশার্স বইটির জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন। এঁদেরকে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন নেই। লেখিকা বাণী রায় দশবছর আগে বাংলা ভাষায় শহরের উপর একটা ইতিহাসের বই লেখার কথা বলেছিলেন। আমি ওঁর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। ওঁর কাছে দেওয়া সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরে খুশি যদিও উনি আজ আর নেই। ওঁর স্মৃতির উদ্দেশে বইটি উৎসর্গ করলাম।

এই ধরনের বড় বইতে, নানা জায়গা থেকে সূত্র আহরণ করে লেখার ফলে ভুলভ্রান্তি থাকাটা স্বাভাবিক। সেগুলি আমাকে জানালে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

অনিরুদ্ধ রায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ক

সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ছোট বড় নানান ধরনের শহর গড়ে উঠেছিল। শহরের যে ইতিহাস আমরা পাই সেটা একটানা নয়—মাঝে মাঝে ইতিহাসের ছেদ পড়েছে। পশ্চিমি সভ্যতা ভারতীয় শহরের ইতিহাসকে গ্রামাঞ্চলের সভ্যতা বলে অভিহিত করে এসেছে যদিও বর্তমানকালে ভারতে পাঁচ হাজার জনসমষ্টি সমন্বিত বারো হাজারের বেশি শহর আছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর সব থেকে বড় শহরাশ্রয়ী সভ্যতা। ভারতের শহরের জনসংখ্যা আমেরিকার শহরের জনসংখ্যার থেকে বেশি। ১৯৮১ সালে ভারতের ছোট বড় শহরের সংখ্যা তিন হাজারের উপরে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় শহরের উপর ঐতিহাসিক কাজ খুব কমই হয়েছে। আরবান হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত পনেরো বছরে কিছু প্রকাশনা হয়েছিল; বর্তমানে তাতে ভাটা পড়েছে।

১৯১৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাট্রিক গেডেস সমাজতত্ত্বের দিক থেকে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯২০ সালের পর আরও কিছু ভৌগোলিক ও সমাজতত্ত্ববিদ এগিয়ে এলেও কাজ বিশেষ এগোয়নি। মাদ্রাজ জিওগ্রাফিকাল অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় ১৯৩০ এর দশকে কিছু লেখা বেরোয়। স্বাধীনতার পর নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু হয় ও নানা ধরনের লেখা বের হতে থাকে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রধানত ভৌগোলিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা এই উদ্যমের পুরোধা ছিলেন। ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশটি বই ভৌগোলিকরা শহরের উপরে লেখেন।

এই সব লেখার মধ্যে প্রথম দিকের লেখাগুলি ছিল প্রধানত একেকটি শহরের উপর। ওইসব শহরের কিছু ইতিহাস ইংরেজ আমলারাও লিখেছিলেন, যেগুলি প্রধানত বর্ণনামূলক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক বিষয় হিসেবে কোনও তীর্থ-শহর এবং কোনও বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে বন্দর-শহরের ইতিহাস লেখা হয়েছিল। প্রাদেশিক রাজধানী বা ভারতীয় রাজধানীর ইতিহাস রাজবংশের পরিচয় হিসেবেও লেখা হতে থাকে। অন্যদিকে ভৌগোলিকরা তাঁদের সময়ের কাছাকাছি শহরগুলির ভৌগোলিক চেহারা এবং শহরের কার্যকলাপের উপর জোর দিতে থাকে।

ভৌগোলিকরা শহরের ভৌগোলিক চেহারা নিয়ে লিখলেও, ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অর্থাৎ ওই সব শহরের আধা রাজনৈতিক

ও ভৌগোলিক বর্ণনা প্রতিটি শহরের ক্ষেত্রে আলাদা করে দেখা হতে থাকে। আমেরিকান ভৌগোলিকদের প্রভাব এঁদের উপর যখন পড়তে থাকে, তখন তাঁরা এলাকাভিত্তিক শহরের কেন্দ্রস্থল ও তার কাঠামো খুঁজতে থাকেন। এই ধরনের কাজের মধ্যে থাকে সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহার—শহরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার চেষ্টা—যে তত্ত্ব ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রয়োগ করা যায় কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু এই সব কাজের ফলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে আসে, যেগুলি আগেকার কালে আসেনি। যেমন বলা যায় যে শহরের সঙ্গে তার পশ্চাদভূমির সম্পর্ক কী, শহরের কোথায় কেন্দ্রবিন্দু ও শহরের বিন্যাস কীরকম—যে প্রশ্নগুলির সাহায্যে হয়তো শহরের উত্থান-পতনের ইতিহাস দেখা যেতে পারে। এর ফলে ভৌগোলিকরা এখন যেমন অনেকাংশে ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের দ্বারস্থ হচ্ছেন, তেমনি শেষোক্তরাও ভৌগোলিকের সাহায্য ছাড়া শহরের ইতিহাস সম্পূর্ণ করার কথা ভাবতে পারেন না। উপগ্রহ থেকে মানচিত্র পাবার ফলে এই কাজ এখন অনেকটাই দ্রুততালে চলতে পারে। যদিও সব প্রশ্নের সমাধান হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না।

খ

ভারতের প্রথম শহরাঞ্চল তৈরি হবার ইতিহাস এখনও পরিষ্কার নয়। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে প্রথম শহর তৈরি হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। এই শহরগুলি প্রায় ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা প্রায় ছশো বছর ধরে চলেছিল। এর পরেই শহর তৈরিতে ভাঁটা আসে। এই শহরগুলি পরিত্যক্ত বা লুপ্ত হলে আমরা আবার শহরের দেখা পাই উত্তর ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতে। এর পর থেকে নিরবধি কাল প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে শহরের ইতিহাস পাই। সাম্প্রতিক কালে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা উত্তর ও পূর্ব ভারতের শহরগুলির পত্তনের ইতিহাস লিখেছেন যেটি আমরা পরবর্তীকালে বিবেচনা করব। কিন্তু ৩০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে প্রায় ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শহরগুলি স্ফূর্তি লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গুপ্ত অধ্যায়ের পরবর্তী যুগে অনেকগুলি শহর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের পর আবার শহর তৈরিতে জোয়ার আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব থেকে ইংরেজদের আধিপত্যের সূচনা হলে অনেকগুলি শহর নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও নতুন কয়েকটি শহরের উত্থান হয় যেগুলি ইউরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ভারতের প্রথম 'শহর বিপ্লব' শুরু হয় সিন্ধু নদীর অববাহিকায় ও রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে। এর সঙ্গে পঞ্জাবের কিছু অংশ ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশকে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় 'শহর বিপ্লবের' কালে মধ্যগঙ্গার অববাহিকা ও দক্ষিণ ভারতে শহর তৈরির সূচনা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সারা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত জুড়েই এই শহর তৈরির যজ্ঞ চলছিল। দুটি শহরের মাঝে ছিল বিস্তীর্ণ ভূভাগ যেখানে শহরের কোনও ছবি আমরা পাই না।

সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে এই সভ্যতার মূল

কী ও জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সমকালীন বেলুচিস্তানের কৃষিসভ্যতার থেকে এর জন্ম, এটাও বলা হয়েছে। এই মতবাদ অবশ্য এখনও গৃহীত হয়নি কারণ দেখা যাচ্ছে যে ওই কৃষিসংস্কৃতি শহর-সংস্কৃতির পর্যায়ে যেতে পারেনি। এমনও বলা হয়েছে সমকালীন সুমেরীয় সভ্যতা থেকে সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব যদিও এই মতবাদের পক্ষে খুব বেশি জোরালো যুক্তি পাওয়া যায়নি।

ইজিপ্ট ও সুমেরীয় সভ্যতার উত্থানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড কতকগুলি কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন যেগুলি সিন্ধু বা হরপ্পার পক্ষে প্রযোজ্য হয়। ওঁর মতে লৌহআকর থেকে ধাতু করার ফলে ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হবার ফলে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। কিন্তু এই অবস্থা হরপ্পার পরবর্তী অবস্থার সঙ্গে প্রযোজ্য নয়। এর কারণ হিসেবে হয়তো বলা যায় যে ধাতুর ব্যবহার সীমিত থাকার ফলে ইজিপ্ট বা সুমেরীয় সভ্যতার পথে সিন্ধু সভ্যতা যেতে পারেনি। এর ফলে ওই যুগের সভ্যতা হরপ্পার পর পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারেনি যার জন্য শহর গড়ে ওঠার সুযোগও হয়নি।

উত্তর ভারতে যে শহরগুলি ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বে তৈরি হয়েছিল তাদের উত্থানের ইতিহাসও অজানা নয়। ঋগ্‌বেদ সংহিতার যুগ পেরিয়ে ততদিনে পরবর্তী বৈদিক যুগ এসেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে কেন্দ্রবিন্দু সিন্ধুর পূর্বে ও গঙ্গাউপত্যকার উপরার্ধে পৌঁছেছে। এই গতি ক্রমশ আরও পূর্ব ও দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। উত্তর-ভারতের প্রশস্ত মালভূমি এখন আগন্তুকদের সামনে অভাবনীয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত এনে দেয়। রাজ্যগুলি তৈরি হয়ে আসছে—রাজার চেহারাটাও পরিষ্কার হয়েছে—লোকেরা জাতিগত সংস্থার থেকে ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সংস্থায় অনেক বেশি নির্ভরশীল। এই সব এলাকার পুরনো অধিবাসীদের জন্য এইসব নতুন রাজত্বে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। যেটা অবশ্য নতুনদের তুলনায় অনেক নিচুতে। এই ঔপনিবেশিকদের, বিতর্ক চললেও যাদের প্রধানত আর্য বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে যায়। দক্ষিণে অবশ্য এই ভাষা ও সংস্কৃতি এতটা প্রাধান্য পায়নি—পূর্ব দিকেও এটা আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। এই মিশ্রণের ফলে নতুন ও পুরনো সংস্কৃতির আলাদা ধারা ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে।

কলাকৌশলের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে এই সময়ে লোহার আবির্ভাব হচ্ছে। এন. আর. ব্যানার্জির প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকেও কবে ও কীভাবে এর আবির্ভাব হল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মনে করা হয় যে রাজস্থানের খনি থেকেই প্রথম দিকের লোহা তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে যে লোহার প্রচলন বেশ বেশি ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে গঙ্গাযমুনার দোয়াবে ওই একই সময়ে ছাই-রঙা জিনিসগুলি (Painted Gray wares) চলছিল। কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এই জিনিসগুলির তারিখ প্রধানত ধরা হয় ৮০০ থেকে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। নতুন আগন্তুকরাই এই রঙিন জিনিসগুলির ব্যবহার এনেছিল কি না বলা যায় না। কিন্তু পরবর্তীযুগের আগন্তুকদের ভৌগোলিক বাসস্থানের মধ্যেই এই রঙিন চিত্রিত

জিনিসগুলির সন্ধান মেলে। যেহেতু আগন্তুকদের তারিখ ও ভৌগোলিক এলাকার সঙ্গে ওইসব জিনিসগুলির মিল রয়েছে, অতএব বৈদিকযুগের শেষপর্বের আগন্তুকরাই এইগুলির প্রচলনের জন্য দায়ি, এটা বলতে দ্বিধা হয় না।

লোহা স্থানীয় অর্থনীতিতে ও যথাক্রমে রাজনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল বলে বলা যায়। কৃষিতে, যাতায়াত ব্যবস্থায়, বাণিজ্যে—সর্বত্র এর ছাপ রয়ে গিয়েছে, যা নিয়ে কাজ এখনও চলছে। গঙ্গা যমুনা দোয়াবের জঙ্গল তাড়াতাড়ি কেটে জনপদ বসানো সম্ভব হয়েছিল লোহার ব্যবহারের ফলে। লাঙলের ডগায় লোহা লাগানোর ফলে কৃষির উৎপাদন বেড়ে যায়। কিন্তু এটাও ভাবা দরকার যে সাধারণ চাষির পক্ষে লোহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল কিনা; অন্তত রাজকীয় উৎসাহে পাথরের চাঁই কেটে কাজে লাগানো সম্ভব হত না যদি না লোহার ব্যবহারের প্রচলন হত। তামা বা ব্রোঞ্জের হাতুড়ি বা অন্যান্য যন্ত্রের থেকে লোহা এ কাজে বেশি উন্নত এতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে শহরগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও সূচনা হয়েছিল।

এখানে বলা দরকার যে এই নতুন ধাতুর প্রচলনের ফলে সামাজিক উন্নতি বিশেষ হয়নি। কিন্তু এই সময়ে আমরা রাজনৈতিক জনপদগুলির দেখা পাই। প্রতিটি জনপদের একটি করে রাজধানী ছিল তারও সন্ধান মেলে। লোহার যুগের প্রথম দিকের জায়গাগুলিতে যা প্রত্নতত্ত্বের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ওই সময়কার রাজধানীগুলি ঠিক শহর বলতে যা বোঝায় তা নয়। মনে হয় ওই জায়গাগুলি গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় কৌশাম্বী ও উজ্জয়িনীর বেলায়। প্রথমটির কালক্রম ধরা হয় ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব ও পরেরটির ৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব। এই দুটি জায়গাতেই দুর্গের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে হয়তো বলা যায় যে এগুলি আরও পরবর্তী সময়ের তৈরি।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতককে উত্তর ভারতের ইতিহাসের একটা মোড় বলা যেতে পারে। সাধারণত এই সময়কে আদি-ঐতিহাসিক যুগ বলে ধরা হয়। এই সময়কার রাজরাজড়ার বৃত্তান্ত বা ধর্মীয় ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপের প্রচুর ঐতিহাসিক সূত্র মিলেছে। ফলে এই সময়কে এই ধরনের সংজ্ঞা দেবার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

জনপদগুলির ভৌগোলিক চেহারা খুবই পরিষ্কার পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি—যেমন কোশল, মগধ, অবন্তি ইত্যাদি—মহাজনপদে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গঙ্গা উপত্যকায় এই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকাশলাভ ঘটে—যাদের লেখা থেকে আমরা ওই জনপদগুলি সম্বন্ধে প্রধানত তথ্য পাই। দুশো বছর পরে, এদের মধ্যে মগধ প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নন্দবংশ ও মৌর্যবংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে।

এই সময়ে আমরা কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ করি যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রার প্রচলন। প্রধানত বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে যে মুদ্রার ব্যবহার ও প্রচলন ছড়িয়ে রয়েছে—এটি তর্কের অপেক্ষা রাখে না। এর ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা ও পথঘাটের উন্নতি হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন মুদ্রায় খুব বেশি পরিমাণে রুপোর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যা বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়েছিল। হরপ্পার সভ্যতার পতনের পর এত

বেশি রুপোর ব্যবহার এই প্রথম দেখা যায়। হরপ্পার পর আমরা আবার লোহার ব্যবহারের প্রচলন পাই। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে কালো পালিশ করা জিনিসের আবির্ভাব দেখি যেগুলি গঙ্গা উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশিলা পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। বাণিজ্যের প্রসার না হলে যে এটা সম্ভব হত না তা বলাই বাহুল্য।

এই সংস্কৃতির মধ্য থেকে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার শহরগুলির উদ্ভব হয়েছিল। জনপদগুলির প্রাক্-শহর অবস্থার কীরকমভাবে পরিবর্তন হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া শক্ত। বুদ্ধের সময়ে আমরা ছোট ও বড় শহরের হদিস পাই। এর মধ্যে পাঁচটি—যেমন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, কৌশাম্বী ও বারাণসী বড় শহরও যেমন ছিল, তেমনি ছিল জনপদগুলির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। পালি সাহিত্যে ষাটটি শহরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলি যে পরবর্তীকালের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গ

হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী যদিও লাঙলের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় না। মেসোপটেমিয়ার লোকেদের মতো হরপ্পার লোকেরা উর্বর সমভূমিতে বাস করত। এখানে মেসোপটেমিয়ার মতো খাল কাটার কথা পাওয়া যায় না। বানের জল থেকে স্বাভাবিক সেচব্যবস্থা করা হয়েছিল। বার্লি, গম, মটরশুঁটি ও তৈলবীজ ছিল প্রধান কৃষি-উৎপাদন। এর সঙ্গে তুলো ও ধানের কথাও পাওয়া যায়। তামা ও ব্রোঞ্জ ছিল প্রধান ধাতু এবং লোহার কথা নেই। চক্র দিয়ে কুমোররা নানাধরনের মাটির কাজ করত। লিপি ছিল প্রায় ২৫০টি শব্দের যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দশমিকভাবে ওজন রাখার ব্যবস্থা ছিল। হরপ্পা সভ্যতার শহরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার কথা পাওয়া যায় যার মধ্যে পুরোহিতরা ছিলেন এবং যার চারপাশে ছিল অভিজাতরা। হয়তো রাজাই ছিলেন এই ধরনের পুরোহিত। প্রায় সমগ্র উপত্যকায় একই সংস্কৃতি চালু থাকায় মনে করা হয় যে এটি একটি সাম্রাজ্য ছিল। মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা দুটি রাজধানী ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

এই সভ্যতার আরও অন্যান্য শহরে এই ধরনের উন্নতি দেখা যায় না। এই সব শহরগুলি ছিল ছোট এবং প্রধানত এলাকার কেন্দ্রস্থল বলে ধরা যেতে পারে। খাম্বাজ উপসাগরে বড় শহর ছিল লোথাল। এ ছাড়া রাজস্থানের কালিবঙ্গানও বড় শহর ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শহরের কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। দুটিই নদীর ধারে ছিল, যা ছিল নাব্য। শহরের মধ্যে দুটি ভাগ দেখা যায়—একটি হচ্ছে দুর্গ, যেটি উঁচু জমির উপর ছিল ও অন্যটি হচ্ছে এলাকার শহর যেখানে অধিকাংশ লোকই বাস করত। এটা খুব পরিষ্কার নয় যে কেন দুটি শহরের দুর্গ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই দুর্গটি ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং ভিতরে অনেক বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ ছাড়া দুর্গের মধ্যে স্নান করার জায়গা, রাষ্ট্রীয় শস্যাগার, প্রাসাদোপম বাড়ি ইত্যাদি ছিল।

নিচুর শহরটি ছিল গ্রিড ধরনের। এখানে পথগুলি পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিক করে তৈরি। পথের তিনটি স্তরভেদ করা যায়—রাজপথ ১৪ মিটার চওড়া ও সবথেকে ছোট রাস্তা তিন মিটার চওড়া। শহরে বিশাল পয়ঃপ্রণালী পাওয়া যায়।

রাজপথের এই পয়ঃপ্রণালীগুলি ছিল ঢাকা। বাড়ি থেকে রাজপথ পর্যন্ত মাটির নালি পাওয়া গিয়েছে। পয়ঃপ্রণালী থেকে ময়লা চলে যেত নদীতে। এ ছাড়া বৃষ্টির জলের জন্য ছিল আলাদা প্রণালী। অধিবাসীদের জন্য জল আসত ইটের তৈরি কুয়ো থেকে।

সাধারণ লোকেদের বাসার আয়তনের মধ্যে তারতম্য লক্ষ করা যায়। ব্যারাকের এক ঘর থেকে বহুঘর বিশিষ্ট বাড়ির ও পাঁচিলযুক্ত বড় বড় প্রাসাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। সুতরাং শহরে ধনীরা ছাড়াও সাধারণ লোকেরাও ছিল। থাকার বাড়িগুলি একই মাপের পোড়ানো ইটের তৈরি—ফলে মনে করা যায় যে অনেক ইট একই মাপে তৈরি করা হত।

দুটি শহরের প্রত্যেকটির আয়তন প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটারের মতো এবং প্রত্যেকটির জনসমষ্টি প্রায় তিরিশ হাজার। এই দুটির মধ্যে মোহেঞ্জোদারো পুরনো এবং বড়। ছশো বছরের ইতিহাসে অন্তত ন'বার এটি নতুন করে তৈরি হয়েছে। কিন্তু শেষবার ছাড়া এর পথঘাটের কাঠামোর বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। হরপ্পা সম্ভবত পরবর্তীকালের তৈরি শহর। মনে করা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের জন্যই এটি দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে তৈরি হয়েছিল।

সবরমতি নদীর শাখার উপর লোথাল ছিল খাম্বাজ উপসাগরের সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দর দিয়েই মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। এ ছাড়াও, লোথাল ছিল শিল্পকেন্দ্র। নানাধরনের অস্ত্রশস্ত্র, হাতির দাঁতের জিনিস, কাপড়ের তৈরি বিভিন্ন জিনিস এখানে পাওয়া গিয়েছে। দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের বন্যায় এর বিশেষ ক্ষতি হয়। মনে করা হয় যে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বন্যায় এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

লোথাল পাঁচিলে ঘেরা; সম্ভবত বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য করা। সুতরাং এটি অন্যান্য হরপ্পা সভ্যতার শহরের মতো নয় যদিও এর কাঠামো অন্যান্য শহরগুলির মতোই। এরও দুটি ভাগ দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে উঁচু জমির উপর প্রাসাদ ও বড় বড় বাড়ি যেগুলি রাজা ও অভিজাতদের বাসস্থান বলে ধরা যায়। দ্বিতীয় ভাগ উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে সাধারণ লোকেদের থাকার জায়গা। পূর্ব দিকে একটা বড় জাহাজখানা ছিল, যার সঙ্গে খাল দিয়ে নদীর যোগ ছিল।

ছোট শহরের মধ্যে রাজস্থানের কালিবঙ্গান হরপ্পা সভ্যতার কাঠামো দিয়ে তৈরি। এটিও দুটি ভাগে তৈরি—একটি উপরের জমিতে ও একটি নিচু জমিতে। এর পথগুলিও গ্রিড ধরনের কিন্তু বাড়িগুলি সাধারণ মালমশলা দিয়ে তৈরি। এর কোনও পয়ঃপ্রণালী ছিল না। মনে হয় শহর হিসেবে এর স্থান খুব উঁচুতে ছিল না এবং তখন সাম্রাজ্যের দীপ্তি অস্তমিত। বেলুচিস্তান মাক্‌রান উপকূলেও আর একটি বন্দরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার কাঠামো ওই একই ধাঁচের।

হরপ্পা সভ্যতার নতুন নতুন শহর আবিষ্কৃত হলেও, মনে হয় শহরের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পাঁচভাগের বেশি ছিল না। বেলুচিস্তান থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ধরলেও, শহরভিত্তিক জনসমষ্টি খুবই কম। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের কী সম্পর্ক ছিল, এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্রধানত কৃষিকার্য ছাড়াও, কুমোরের কাজ করা মাটির জিনিস ও কাপড়ের তৈরি জিনিসের

শিল্প ছিল। শহরগুলিতে আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি হত যার মধ্যে যেমন দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসও রয়েছে, তেমনি বিলাসদ্রব্য, যেমন অলঙ্কার রয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতি প্রায় একই—ভাষা, ধর্মপরম্পরা ও বিশ্বাস ইত্যাদির ধাঁচ একই।

১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকেই হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলির পতনের আভাস পাওয়া যায়। ১৭০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত শহরগুলির আয়তন ছোট হতে থাকে। সুপরিকল্পিত পথগুলির উপরই বাড়ি এসে পড়ে, বাড়িগুলি ভাগ হতে থাকে। বাসস্থান ও শিল্পাঞ্চলগুলি মিশে যেতে থাকে ও পয়ঃপ্রণালীগুলির অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে শহরগুলি ধীরে ধীরে ধসে যাচ্ছে যদিও এই পতন চলেছিল প্রায় দুশো বছর ধরে। শেষকালে শহরগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায় যার কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। ১৮০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংস বলে ধরা হয়। শহর পরিকল্পনার যে উন্নতধারা হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছিল সে ধারাও পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়ে যায়।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণগুলির নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। যেহেতু শহরগুলি নদীর ধারে ছিল, অতএব বন্যার ফলে এগুলি ধ্বংস হয়েছিল বলে বলা হয়। কিন্তু সব শহরগুলিই একই সময়ে বন্যায় ধ্বংস হবে এটা মেনে নেওয়া শক্ত। এ ছাড়া, কৃষিতে লাঙলের ব্যবহার না থাকায়, উৎপাদন ছিল কম। ফলে লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বিপর্যয় দেখা দেয় যার চাপে শহরগুলির পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্য মত হচ্ছে যে বিদেশি শত্রুর আক্রমণের ফলে শহরগুলি ধ্বংস হয়। এই বিদেশিদের সাধারণত আর্য বলে ধরা হয় যার বৃত্তান্ত ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়। বেলুচিস্তানের কয়েকটি গ্রাম ধ্বংস হয়েছিল দক্ষিণ-রাশিয়া ও তুর্কিস্তান থেকে আগত লোকেদের আক্রমণের ফলে। এর কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যও আছে। এই সবই এখনও বিচারসাপেক্ষ।

ঘ

ভারতে শহর গড়ার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ—যাকে ঐতিহাসিকরা 'দ্বিতীয় শহর বিপ্লব' বলে আখ্যা দিয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে এটি লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের মধ্যেকার সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে ও একটি মিশ্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই দুই অঞ্চলের শহরগুলির মধ্যে কয়েকটি ধারা যে একই ধরনের এটি বুঝতে পারা কঠিন হয় না। উত্তর ভারতে বারাণসী ও পাটনা দক্ষিণ ভারতে মাদুরাই ও কাঞ্চিপুরম এই ধারা বহন করছে।

এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সমসাময়িক সাহিত্যে এই সময়কার শহরগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের পরবর্তী যুগের বৈদিক সাহিত্যে ও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে শহরের উল্লেখ আছে। ধর্মশাস্ত্রকে প্রধানত ৬০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ধরা হয়, যে সময়ের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণ ও বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রগুলি পাই। মৌর্য যুগে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* শহর সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য দেয়। বাল্মীকির *রামায়ণ* ও ব্যাসের *মহাভারত* এই সময়কার লেখা ধরলে, যদিও ঘটনাগুলি আগে ঘটেছিল, আমরা শহর

সম্বন্ধে বহু তথ্য পাই। তৎকালীন শহরজীবন সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায় বাৎসায়ণের *কামসূত্রতে*, পাতঞ্জলির *মহাভাষ্যতে*, *মনুস্মৃতি* ও পুরাণগুলিতে। এগুলির অবশ্য অনেকখানিই কবির উচ্ছ্বাস বলে ধরা যায়—যার বিস্তৃত আলোচনা অমলানন্দ ঘোষের লেখায় পাওয়া যায়। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থাকার ফলে এসবকে কল্পকথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দক্ষিণ ভারতের শহরগুলির প্রধান সূত্র তামিল ভাষায় লেখা। সঙ্গম যুগের তামিল সাহিত্য প্রধানত ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, নানা ধরনের লেখার আশ্রয় নিয়েছে, যার মধ্যে ব্যাকরণ ও মহাকাব্যও রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবও এই সব লেখার মধ্যে পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদ প্রধানত গ্রামীণ জীবনের জয়গান করেছে যার ছায়া আমরা *ধর্মশাস্ত্র* ও *ধর্মসূত্র*-র মধ্যেও পাই। ঋগ্‌বেদের সমকালীন বিদেশি আগন্তুকরা সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী বৈদিক যুগে এরা উত্তর যমুনা ও গঙ্গা অববাহিকায় আসতে থাকে। মনে হয় এটি সম্পন্ন হতে ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময় লেগেছিল।

আদি ঐতিহাসিক যুগে আমরা শহর সম্বন্ধে তথ্য পাই সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কালো পালিশ করা জিনিস, পোড়া ইটের কাঠামো, মুদ্রার প্রচলন, পাঁচিল ঘেরা শহরের কথা পাওয়া যাচ্ছে এগুলিও আমরা আগে দেখেছি। এই সময়কার আতরাঞ্জিখেরার প্রত্নতত্ত্বর সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান লোকবসতি যার থেকে শহরের আবির্ভাব। কিন্তু শহর তৈরির পরিকল্পনার কোনও চিহ্ন আমরা গঙ্গা উপত্যকায় পাচ্ছি না। পাথরের তৈরি বাড়িগুলি এলোমেলোভাবে করা। এমনকী এটিও বোঝা শক্ত যে কোথায় একটি বাড়ি শেষ হয়েছে ও আর একটি শুরু হয়েছে।

শহর পরিকল্পনার কাঠামো পাওয়া যায় তক্ষশিলার সিরকাপ শহরের মধ্যে যেটি ভারতীয় ও গ্রিকরা মিলে করেছিল। পরবর্তীকালে ভারতের পার্থিয়ানরাও এর প্রসার ঘটায়। এটির চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রাজপথ উত্তর দরজা থেকে সারা শহরের মধ্যে দিয়ে শেষ অবধি চলে গিয়েছে। ছোট ছোট রাস্তা এই রাজপথটিতে দক্ষিণ কোণে মিলেছে। বাড়িগুলির সীমানা চিহ্নিত করা। অমলানন্দ ঘোষ এটিকে পরিকল্পনার দিক দিয়ে বিদেশি বলে চিহ্নিত করলেও, হরপ্পা সভ্যতার শহরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে সমকালীন শহরগুলির মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রম।

এই ধরনের পরিকল্পনা মাফিক সমকালীন আর একটি শহর পাওয়া যায়—উড়িষ্যার শিশুপালগড়। আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি হলেও, এর পাঁচিল তৈরি করা হয় দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথম দিক নাগাদ। পরবর্তী শতাব্দীতে এই পাঁচিল আরও জোরদার করা হয়। দরওয়াজা ছিল আটটি—দুটি করে একদিকে এবং প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে শহরটি গ্রিড ধাঁচে তৈরি হয়েছিল।

কৌশাম্বী শহরের পাঁচিলের তারিখ ঠিক পাওয়া যায় না। তবে কালো পালিশ করা যুগের কিছু আগেই হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই যুগের আগেই অবশ্য আরও তিনটি শহরের পাঁচিলের কথা পাওয়া যায়। এগুলি হল মধ্যভারতের

এরাণ, উজ্জয়িনী ও বারাণসীর রাজঘাট। এরাণের পাঁচিল কবে হয়েছিল এ নিয়ে মতভেদ আছে—চ্যালকোলিথিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে করা হয়েছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী যুগে, প্রায় ২০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত, এটির ব্যবহার ছিল। এর থেকেই দেখা যায় যে কীভাবে গ্রামীণ সভ্যতা শহর সভ্যতায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

উজ্জয়িনীর মাটির পাঁচিল প্রায় এক কিলোমিটারের উপর। জায়গাটির পত্তন যদি ৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব বলে ধরা হয়। তা হলে এই পাঁচিল তার তিরিশ বছর পরে করা। কিন্তু নানাদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে এই পাঁচিল ঘেরা জায়গা আদি ঐতিহাসিক যুগের আগে নয়।

রাজঘাট সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। পুরনো বারাণসীর পুরনো মাটির পাঁচিলকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি বলা ধরা হয়। পুরনো রাজগিরের যে পাথরের দুর্গ রয়েছে, সেটি প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে করা। একটি উঁচু টিলার উপর দুর্গর পাঁচিল সমগ্র উপত্যকাকে ঘিরে রয়েছে। এর কোনও তারিখ নির্ণয় করা যায়নি। বিম্বিসার বা অজাতশত্রু যে নতুন রাজগির তৈরি করেছিলেন বলে বলা হয়, সেটি উপত্যকা ছাড়িয়ে। এখানেও পাঁচ কিলোমিটারের ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা মাটির পাঁচিল রয়েছে। এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুর্গ ছিল যেটি পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

বুদ্ধের সমকালীন শহর শ্রাবস্তিতে অন্তত ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেকার কোনও পাঁচিল পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে, অন্তত ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি মাটির পাঁচিল পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়কার আর একটি শহর, বৈশালীতে, পরপর তিনটি পাঁচিলের চেহারা পাওয়া যায়। প্রথমটির তারিখ ধরা হয় দ্বিতীয় খ্রিস্টপুর্বাব্দ ও শেষেরটি দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ বা তার পরবর্তীকালের।

শিশুপালগড় শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টপূর্ব বা তার কিছু পরে। তখনকার কোনও পাঁচিল পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, একটি মাটির পাঁচিল পাওয়া যায়, যেটি পরবর্তীকালে ইটের টুকরো দিয়ে জোরদার করা হয়েছিল। পশ্চিম দিকের পাঁচিলের দরওয়াজা এর বিশেষত্ব।

আরও কতগুলি দুর্গসম্বলিত বা পাঁচিলঘেরা শহরের কথা পাওয়া যায়। যার মধ্যে আমরা পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড়ের নাম উল্লেখ করতে পারি। পাটলিপুত্রর কথা মেগাস্থিনিস বলে গিয়েছেন যেটির উল্লেখ স্ট্রাবোর লেখায় পাওয়া যায়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ও চারপাশে ছোট খাল এটিকে আরও সুরক্ষিত করেছিল। মেগাস্থিনিসের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক এরিয়ান লিখছেন যে এর ৬৪টি দরওয়াজা ও ৫৭০টি বুরুজ ছিল। পাটনার শহরতলিতে বুলান্দিবাগে যে কাঠের দেওয়ালের অংশ পাওয়া গিয়েছে, তাকেই এই পাটলিপুত্র বলে ধরা হচ্ছে। কবে যে এই পাঁচিল তৈরি হয়েছিল, তার পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় না।

প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে পাঁচিল ঘেরা জায়গাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি তৈরির সময় প্রধানত ২০০ খ্রিস্টপূর্ব ও দ্বিতীয়টির ২০০ থেকে ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে, যখন মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের দিকে। এর মধ্যে অবশ্য

পাটলিপুত্রকে ধরা যায় না, কারণ এর প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রায় নেই।

শহরে প্রাসাদ বা বড় বাড়ির নিদর্শন প্রায় পাওয়া যায় না। তক্ষশিলার প্রথম শহরের থামওয়ালা বড় ঘরটিকে ঐতিহাসিকরা প্রধানত পুরোহিতদের থাকার জায়গা বলে ধরেছেন, যদিও আর একটি মত আছে যে এটি কোনও অভিজাতের বসার ঘর। তক্ষশিলার অন্য শহরে, অর্থাৎ সিরকাপে, বহু বাড়ি পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে প্রধানত কুষাণ যুগের প্রাসাদ, স্তূপ ইত্যাদি আছে।

কৌশাম্বীতে পাঁচিল ঘেরা জায়গার মধ্যে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আছে বলে মনে করা যায়। শহরে উত্তর-পূর্ব দিকে একটি মঠের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে এর সংস্কারও হয়েছিল।

রাজগৃহতে কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধবিহার ছিল বলে অনুমান করা হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে আরও কতকগুলি সৌধ করা হয়েছিল যেগুলি অশোক সম্প্রসারণ করেছিলেন। কিন্তু এর কতগুলি শহরের মধ্যে ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বারাণসীর কাছে সারনাথ বা বিদিশার কাছে সাচিঁ এই ধরনের। সুতরাং ভারতীয় শহর যে ধর্মবোধ অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি এটা বলা যায়।

পালি সাহিত্যে এই সব প্রাসাদের বা সৌধের উল্লেখ থাকলেও এগুলিকে অক্ষত অবস্থায় আর পাওয়া যায় না। তার একটা কারণ হতে পারে যে এগুলি প্রধানত কাঠের তৈরি যার ফলে এগুলির স্থায়িত্ব সাময়িক। সংযোগকারী ধাতুর কোনও চিহ্নও পাওয়া যায় না। তক্ষশিলা বা অনান্য কয়েকটি জায়গায় পোড়া ইটের টুকরো বা প্রাসাদের অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি সবই পরবর্তীকালের। বৈশালীতে প্রাক্-সুঙ্গ যুগের একটি ইটের দেওয়াল পাওয়া গেলেও, অন্যান্য ইটের ধ্বংসস্তূপগুলি সুঙ্গপরবর্তী যুগের। উজ্জয়িনী, বিদিশা ও অহিছত্রতে অবশ্য কিছু কিছু ইটের ব্যবহার পাওয়া যায়।

অন্যান্য প্রায় সব জায়গাতেই পোড়া ইটের ব্যবহার শুরু হয়েছে পরবর্তী যুগ থেকে যার নিদর্শন আমরা হস্তিনাপুর, রাজঘাট বা মথুরা থেকে পাই। এ থেকে বোঝা যায় যে ইটের ব্যবহার দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তার পর থেকে শুরু হয়েছিল এবং ক্রমশ এটাই প্রধান ছিল। প্রথম দিকের শহরগুলি প্রধানত মাটির ছিল, যেখানে পাথর পাওয়া দুর্লভ ছিল। এইরকম জায়গাতে কাঠের ব্যবহার হত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

শহরগুলিতে প্রথম থেকেই প্রায় প্রতিটি বাড়ির মধ্যেই পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আবর্জনা ফেলা হত মাটির নীচের কুয়োতে। এরও বিভিন্ন রকমফের দেখা যায়। কৌশাম্বীতে চারশো খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা রাখার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে কুয়ো, মাটির পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ছিল। এমনকী ঘরের মধ্যেও এই ধরনের শুকনো কুয়োর ব্যবহার পাওয়া যায়, যার থেকে মনে করা যেতে পারে এগুলি কোনও কোনও বাড়িতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছিল। শহরের মধ্যে খালি জায়গা না থাকার ফলে এরকম করা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার হবার পর থেকেই নানা প্রশ্ন ওঠে যে এর কতটা প্রভাব পরবর্তী সভ্যতার উপর পড়েছিল। গুজরাটে ও উর্দ্ধ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে কতকগুলি

প্রত্নতাত্ত্বিক স্যাক্ষ্য থেকে কেউ কেউ এই মত পোষণ করছেন যে পরবর্তী নগরায়ণ সিন্ধু-হরপ্পা সভ্যতার প্রভাবের ফলে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগের কলাকৌশল ও অন্যান্য অবস্থা এত নিম্নগামী যে এগুলি হরপ্পা সভ্যতার ধারা বলে মেনে নিতে পণ্ডিতরা দ্বিধাবোধ করছেন। কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই জায়গাগুলি যে নাগরিক সভ্যতার প্রমাণ দেয় না এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু রাজার ঢিপি সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা চলে। একটি ব্যতিক্রম বোধহয় করা যায় আরাবল্লীর গিলওণ্ড-এ বাণস সংস্কৃতি সম্বন্ধে। এখানে বিরাট বড় বাড়ি ও পোড়া ইটের তৈরি দেওয়াল পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাণস সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল প্রায় দু হাজার খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ যখন হরপ্পা সভ্যতার রেশ মিলিয়ে যায়নি। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তী সভ্যতার যথেষ্ট ফারাক লক্ষ করা যায়।

নগর-বিন্যাসের ধারার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায় যে হরপ্পা সভ্যতার নগর-বিন্যাসের পর আদি-ঐতিহাসিক যুগে যে নগর-বিন্যাস হয়েছিল তার মধ্যে একটা কালক্রমের ফারাক রয়েছে, অন্যান্য ফারাক থাকুক বা না থাকুক। এই দ্বিতীয় নগর-বিন্যাসের থেকে আবার পরবর্তী নগর-বিন্যাস যা আমরা আদি-মধ্যযুগে পাই তার সঙ্গে একটা ফারাক রয়েছে। কুষাণ পরবর্তী যুগে নগরায়ণের প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায়। আবার নগরায়ণ শুরু হবার প্রমাণ আমরা আদি-মধ্যযুগ থেকে পাই এবং কোনও কোনও পণ্ডিত এই আদি-মধ্যযুগকে 'তৃতীয় নগরায়ণ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে এই তৃতীয় নগরায়ণের ধারা শুরু হল কেন এবং আদি-ঐতিহাসিক নগরায়ণের ধারা থেকে এর পার্থক্য কোথায় আছে। যদি বলা যায় যে আদি-মধ্যযুগের নগরায়ণ একটি পৃথক ধারা, তা হলে এই পার্থক্যটি জানা দরকার।

আদি-ঐতিহাসিক যুগের নগরায়ণের প্রকৃতি বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। সমকালীন সাহিত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ও নানা ধরনের শিলালেখ থেকে এই প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। কিন্তু আদি-মধ্যযুগের নগরায়ণের সূত্র সে তুলনায় অনেক কম। শুধুমাত্র শিলালেখ, মুদ্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এই কাজ করতে হয়। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়া এইদিকে বিশেষ মনোযোগ না দেবার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। বহুদিন ধরেই ঐতিহাসিকরা এই দিকে ওই সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখনও কোনও ফল দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় একটি সুলিখিত প্রবন্ধে বহুদিন আগে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

৬

আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম বা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের চরিত্র নিয়ে বিতর্ক আছে। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা এই কালকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সময় বলে আখ্যা দিয়েছেন যখন বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়েছে, বড় বড় সাম্রাজ্য চলে যাচ্ছে। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্ভব হয় ও কৃষকের উপর চাপ বাড়তে থাকে।

ধর্মসংস্থানগুলি নানারকম দান পেতে থাকে। এরাই ক্রমশ ভূম্যধিকারী হচ্ছে বা তার সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে এই অবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে যার ফলে পূর্ববর্তী নগরগুলি ক্রমশ অবক্ষয়ের পথে যায়। গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতি স্বনির্ভর হয়ে যায়, যার ফলে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার কমে যায়।

রামশরণ শর্মার এই মতবাদ সর্বস্তরে গৃহীত হয়নি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এই দানগুলি কৃষির সংকোচ না প্রসার এই বিষয়ে বিভিন্ন শিলালেখ আলোচনা করে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বি. এন. এস. যাদব শর্মার মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সম্প্রতি রামশরণ শর্মা আর একটি গবেষণায় প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ভিত্তি করে নগরগুলির অবক্ষয়ের বিশাল চিত্র দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে কৌশাম্বী, শ্রাবস্তি, কপিলাবস্তু, বৈশালী ইত্যাদির মতো বড় বড় শহর ছিল। চিনা পরিব্রাজকের লেখা ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে শর্মা দেখাচ্ছেন যে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার শহরগুলিতে পুরনো ইটের ব্যবহার বেশি হতে থাকে এবং বহু নগর আরও কিছু পরে জনবসতি শূন্য হয়ে পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্য কমে যাওয়ার ফলে শহরগুলির অবক্ষয় হয়েছিল বলে শর্মা মনে করছেন যাকে উনি সামন্তব্যবস্থার অন্যতম লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। যেসব শহরগুলি ছিল, শর্মা সেগুলিকে মূলত রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং সামরিক ছাউনি হিসেবে দেখছেন। শর্মার মতে নগরজীবন ক্রমে রক্তশূন্য হয়ে উঠেছিল।

নগরগুলি অবক্ষয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকলেও, প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার শর্মার 'সামন্ততন্ত্র' মেনে নিতে রাজি নন একথা আগেই বলা হয়েছে। অধ্যাপক হরবনস মুখিয়াও শর্মার ভারতীয় সামন্তব্যবস্থার তত্ত্ব মানেন না। তাঁর মতে আদি ও মধ্যযুগে কৃষক উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল—ফলে সামন্তব্যস্থাসুলভ কৃষকের শোষণ ওইভাবে হয়েছিল কি না এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

নগরগুলির অবক্ষয় সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকলেও ওই সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্য কমে গিয়েছিল কিনা এ বিষয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আসলে বৈদেশিক বাণিজ্য কমে যাওয়া ও সামন্ততন্ত্রের প্রসার এটা বহু আগেই বেলজিয়ামের পণ্ডিত হেনরি পিরেন প্রচার করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার্মান পণ্ডিতরা এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও, অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিত এ তত্ত্ব গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমে সোচ্চার হয়েছিলেন ফরাসি অধ্যাপক মরিস লোমবার্ড। এঁরই লেখা থেকে আন্দ্রে উইন্‌ক পরবর্তীকালে শর্মার তত্ত্বর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। আমরা খুব সংক্ষেপে লোমবার্ড ও উইন্‌ক-এর বক্তব্য দেখব।

সপ্তম শতাব্দীর আগে সোনা চালান যেত প্রধানত পশ্চিম থেকে পূর্বে—পশ্চিম ইউরোপ থেকে বাইজানটিয়াম এবং ওখান থেকে সাসানিদ সাম্রাজ্য হয়ে ভারত মহাসাগরের উপকূলে। এর ফলে ইউরোপের সোনার পরিমাণ কমে যায় ও খুব নিকৃষ্ট ধরনের রূপার প্রচলন হতে থাকে। বাইজানটিয়ামের বাণিজ্য ছিল প্রধানত ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দিক ধরে। সাসানিদ বংশও তখন দিরহাম বলে রূপার মুদ্রা চালু করে। ইসলামের অভ্যুত্থানের আগে মধ্য এশিয়া ও ভারতের পশ্চিমে রূপার মুদ্রা

চালু ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে জমানো সোনা বেরিয়ে আসে এবং দ্বিধাতুর মুদ্রা চালু হতে থাকে। সাসানিদদের জমানো সোনা প্রচুর পরিমাণে চলে আসে যার সঙ্গে আফ্রিকার সোনাও পাওয়া যায়। এর ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য নতুনভাবে শুরু হয়, যেখানে সোনা ও রূপা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে। এটি পিরেন তত্ত্বের বিপরীত। পিরেনের তত্ত্বে ইউরোপের যে বাণিজ্যিক নিঃসঙ্গতা ছিল, উপরিউক্ত আলোচনায় তার বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরবীয় লেখকদের লেখায় ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে আরব ও ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যের সম্পর্ক আরও গভীর ছিল।

৭৬২ খ্রিস্টাব্দে আল-মনসুর বাগদাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করলে ও আরববিজয় প্রসারিত হলে, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্যের পুনরুত্থান সম্ভব হয়। ক্রুসেডের বহু আগেই ইসলামিক বাণিজ্য স্পেনের মধ্যে দিয়ে চলছিল। ইজিপ্ট ও সিরিয়ার যোগাযোগের সুযোগ নিয়ে, আমাফি ও ভেনিস ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের সুযোগ নিতে থাকে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসের বাণিজ্যিক ধারা পিরেনের তত্ত্বের পরিপন্থী।

একাদশ শতাব্দী থেকে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইসলামের প্রভাবমুক্ত ইউরোপ খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পায়, যার ফলে ইসলাম ধর্মকে ক্রমশ চিহ্নিত করা হতে থাকে হানাহানি ও কামের ধর্ম হিসেবে। ওই সময় থেকেই দেখা যায় যে ধাতুমুদ্রার চক্রাকার চলন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন মুদ্রার চলন দেখা যায় ক্রমশ উত্তরের দিকে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপ আবার সোনার মুদ্রায় ফিরে আসে যার মাধ্যমে ইউরোপের বৈদেশিক বাণিজ্য চলতে থাকে।

অষ্টম শতাব্দী থেকেই আরবরা পারস্য, পারস্য উপসাগর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে বিজয় অভিযান শুরু করেছে। আরবদের পারস্য উপসাগর নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে তাদের সিন্ধু বিজয় সহজ হয়ে আসে। এই বিজয়ের ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূল ও পারস্য উপসাগর একই রাজনীতি ও সংস্কৃতির কাছাকাছি আসে, যেটি ভারতীয় মহাসাগরের একটি বড় অংশকে একটা বাণিজ্যিক জগতের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লোহিত উপসাগরের বন্দরগুলি পারস্য উপসাগরের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। ভারতের সঙ্গে তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য জমে উঠেছে। ইন্দোনেশিয়া, চিন, মালয়, ভারত ও পারসিক উপসাগর ক্রমে একটি বাণিজ্যিক জগতের মধ্যে প্রবেশ করছে যার ফলস্বরূপ বাগদাদ শহরের অতিদ্রুত উন্নতি লক্ষ করা যায়। এই উন্নতির পিছনে ছিল এর বন্দর বসোরার অবদান, যার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সিরিয়া, ইজিপ্ট, উত্তর আফ্রিকা, ইস্পাহান, এমনকী মধ্য এশিয়ার আজারবাজাইন, আর্মেনিয়া ও খোরাসানের সঙ্গে।

একাদশ শতাব্দী থেকে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেলজুক তুর্কিরা পারসিক উপসাগর দখল করতে থাকে। অন্যদিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে মোঙ্গল আক্রমণ মধ্য এশিয়ায় একটি নতুন ক্ষমতা সূচিত করে, যার ফলে বাগদাদ পর্যন্ত তার গৌরব হারায়। এই সময়ে আব্বাসিদ বংশকে সরিয়ে দিয়ে ফতিমাইদ বংশ ক্ষমতায়

আসে যার বণিকরা দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার অদূরে যেতে চাইত না। ফলে আরব বণিকদের বিরাট সমুদ্রযাত্রা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

ফতিমাইদরা ক্ষমতা দখল করার ফলে মশলার বাণিজ্য এখন লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। প্রধান ঘাঁটি হয়ে যায় আল-ফুসতাত, পরবর্তীকালে যাকে কায়রো বলা হয়। এই বাণিজ্য আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইতালীয় বণিকদের মাধ্যমে যেত, যার জন্য ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে রেষারেষি বেড়ে যায়। এর ফলে কায়রো ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায় এবং ইজিপ্ট ও সিরিয়ার মাধ্যমে মাল বিতরণ করতে থাকে। পারসিক উপসাগরে খ্রিস্টীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে আরব বণিকদের শ্লথতার ফলেই বোধহয় চিনা বণিকরা সুযোগ গ্রহণ করে এগিয়ে আসতে থাকে। সুতরাং অষ্টম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে আরব-ভারত বাণিজ্য চরমসীমায় উঠেছিল তার কোনও সন্দেহ নেই। এই বাণিজ্য পড়তে থাকে একাদশ শতাব্দীর পর যখন পারসিক উপসাগরের বাণিজ্যে মন্দা দেখা যায়।

ভারতের দিক থেকে দেখলে পারসিক উপসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে একটি তফাত আছে। পারসিক উপসাগরের বাণিজ্য চলেছিল প্রধানত ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চিনদেশে। ফলে এই বাণিজ্য সময় সময় তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়। লোহিত সাগরের বাণিজ্য পাকাপাকি হলে ওই বাণিজ্য চলতে থাকে পূর্ব উপকূল ধরে, বিশেষত বাংলার কূল ঘেঁষে। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি হতে থাকে। এই সময় থেকেই ইউরোপীয় সোনার প্রাধান্য বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মশলার চাহিদাও বেড়ে যায়। ভারত-চিনদেশের বাণিজ্যিক পথের নতুন হদিস দেয় মালাক্কা প্রণালী যার মধ্যে দিয়ে গেলে চিন-ভারত বাণিজ্যপথ অনেকখানি কমে যায়। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই, লোহিত সাগরের বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। সে কারণে আমরা নীহাররঞ্জন রায়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন ও ভারতের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাণিজ্যবৃদ্ধির তত্ত্ব মেনে নিতে অক্ষম। একদিক থেকে দেখলে এই তত্ত্ব পিরেন তত্ত্বকেই বাংলা-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। আমরা দেখেছি যে পিরেন তত্ত্বর বাণিজ্য বিষয়ক বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না—অন্তত ভারত-পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যর ক্ষেত্রে। এ ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যর মধ্যে কতটা ধর্ম ছিল এ প্রশ্নও রাখা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে গুজরাট ও বাংলার বণিকদের আবির্ভাবের মধ্যে আর যা কিছু থাকুক না কেন, ধর্ম নেই। পরবর্তীকালে পতুর্গিজ ঐতিহাসিক টোমে পিরেজ পাসাই ও পিদিরের বাঙালি বণিক বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে হিন্দু বা মুসলমান বলে কোনও উল্লেখ নেই। তা ছাড়া, দ্বাদশ শতাব্দীর আগেই বাংলার নগরায়ণের যে ছবি পাওয়া যায়, যা আমরা পরে দেখব, তার সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামিক ধর্ম ও বাণিজ্য মেলানো কষ্টকর।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের লেখার মধ্যে দিয়ে ওই সময় থেকেই আরবিক ও ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে সুলেমান (৮৫১ খ্রি.), ইবন খুরদাধবিহ (৯৯২ খ্রি.), আল-মাসুদি (৯১৫ খ্রি.) ও আল-ইদ্রিসির (১১৬২ খ্রি.) লেখায় গুজরাট, কোঙ্কন, ও মালাবার উপকূলের ভারতীয় বন্দর ও শহরের কথা পাওয়া যায়। আল-মাসুদি লক্ষ করেছেন যে চৌল (সিমুর) বন্দরে প্রায় দশ হাজার মুসলমান বণিক ছিল। এদের মধ্যে সিরাফ, ওমান ও বসোরার বণিকদের উপস্থিতিও তিনি লক্ষ করেছেন। কয়েকজন বণিকদের নামও তিনি দিয়েছেন। নবম শতাব্দীর সমকালীন রাষ্ট্রকূট লেখমালা থেকে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মার্কোপোলো মালাবারের অনেকগুলি বন্দরের নাম করেছেন। এর প্রায় একশো বছর আগে ইহুদি বণিকদের চিঠি (যাকে গেনিজা চিঠি বলা হয়) থেকে ঐতিহাসিক এস. ডি. গয়েতিয়েন ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়ার উজ্জ্বল বাণিজ্যের কথা বলেছেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর ধসে গেলে পূর্ব ভারতে, বিশেষত বাংলায় আর কোনও বন্দরের কথা পাওয়া যায় না বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু নবম শতক থেকে আরবদের লেখায় সমন্দর নামে এক সমৃদ্ধ বন্দরের কথা পাওয়া যায়। এখন বলা হচ্ছে যে এই বন্দর চট্টগ্রামের কাছে ছিল যার বিবরণ আমরা ইবন খুরদাধবিহ ও আল-ইদ্রিসির রচনার মধ্যে পাই। ওই আরব লেখকরা সমন্দরের সঙ্গে উড়িষ্যা ও কাঞ্জিভরমের যে বাণিজ্যসংযোগ ছিল তার কথা বলেছেন। শ্রীলঙ্কা থেকেও সমন্দরে যাবার বৃত্তান্ত আরব লেখকদের রচনাতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করছেন যে ইবন বতুতার উল্লেখ্য সুদকাওয়ানই সমন্দর, যদিও এর বিশদ আলোচনা এখনও হয়নি।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে শর্মা-যাদব তত্ত্ব—বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল না ও তার ফলে নগরগুলির অবক্ষয়—মেনে নেওয়া যায় না যদিও নগরগুলির অবক্ষয় নিয়ে সন্দেহ নেই। মুদ্রার প্রচলন নিয়ে শর্মা-যাদবদের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ময়নামতীতে আদি-মধ্যযুগীয় মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রাগুলি থেকে হরিকেল, পট্টিকের ইত্যাদি জায়গার নাম পাওয়া যায় যেগুলি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ছিল। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মনে করছেন যে এগুলি আরাকানের মুদ্রার আদলে তৈরি করা। দশম শতাব্দীর পর থেকে মুদ্রার আকৃতি বড় হতে থাকে, যদিও ধাতুর পরিমাণ অপরিবর্তিত ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই মুদ্রাগুলি চলছিল এটা অনুমান করা শক্ত নয়।

তবে এটা মেনে নিতে হবে যে সমকালীন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে পাল-সেন আমলের কোনও মুদ্রা পাওয়া যায়নি। সমকালীন তাম্রশাসনে মুদ্রার নাম পাওয়া গেলেও, প্রধানত কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মালদ্বীপ থেকে পণ্যের বদলে বাংলায় কড়ি আসত একথা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরিব্রাজক মা-হুয়ান বলে গিয়েছেন। মুখোপাধ্যায় অবশ্য মনে করছেন যে কড়ির সঙ্গে পুরনো-জাতীয় রূপার মুদ্রার বিনিময় করা যেত।

আরব বিবরণে সোনা বা রূপার গুঁড়ো দিয়ে বাণিজ্য চালানো হত বলে বলা

হয়েছে। দ্বাদশ শতকের শেষ থেকে লেখমালায় যে শব্দটি পাওয়া যায়, তাকে গুঁড়ো বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। বাংলায় এই সোনা বা রূপার গুঁড়ো কড়ির ও মুদ্রার সঙ্গে বা কখনও কখনও তার পরিবর্তে চালানো হত। সামন্তপ্রথার যুগে, অর্থাৎ ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, যে সব দ্রব্য সামগ্রী যেত সেগুলি শুধু বিলাসদ্রব্য নয়—এদের মধ্যে খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যও ছিল। গেনিজা চিঠিতেও এই ধরনের সাধারণ ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। এ ছাড়া নুনের ব্যবসায়ীর কথা আলাদা করে পাওয়া যায়। সুতরাং সামন্তযুগে অর্থাৎ হাজার খ্রিস্টাব্দের আগে বাণিজ্য ভালরকম ছিল, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে এই ধরনের বাণিজ্য, যেটি প্রধানত বিলাসদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, নগরায়ণের প্রসার কতটা এনেছিল বলা শক্ত। ইওরোপের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের যে নিবিড় যোগাযোগ ঐতিহাসিক পিরেন দেখেছেন, ডব ইত্যাদি ঐতিহাসিকরা সেটাই নগরায়ণের প্রসারের মূল কারণ বলে ধরে নিতে অস্বীকার করেছেন। পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় তার নিজের ভিতরকার দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত ছিল বলে তাঁরা বলেছেন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। মার্ক ব্লখ নিজেই বিভিন্ন জায়গার সামন্তপ্রথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুতরাং ভারতভূখণ্ডের অর্থনীতি ও সমাজ কীভাবে আবর্তিত হচ্ছিল, তার ইতিহাস আলাদা। বিভিন্ন নগরায়ণের বৈচিত্র্যময় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমরা সে ছবিটা এবার দেখব।

১৯৭৩ সালের ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান ভারতভূখণ্ডের সামন্তপ্রথা পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র থেকে কতটা ভিন্ন তার কথা বলেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে উনি এক ধরনের সামন্তপ্রথা ছিল এটা মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করছেন না। কিন্তু সে প্রথার অবক্ষয়ের ফলে ভারতে নগরায়ণের প্রসার হয়েছিল এটা মানতে দ্বিধা বোধ করছেন। এটিও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে মুসলমানরা আসার পরে ইক্তা প্রথা শুরু হয় যেটি প্রধানত শহরভিত্তিক। তাঁদেরও বিরাট সৈন্যদলের জন্য কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যর প্রয়োজন বেশি হয়েছিল। নতুন নগরগুলির এই চাহিদা নগরায়ণের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এই অংশের সঙ্গে অবশ্য শর্মার বক্তব্যর বিশেষ অমিল নেই। শর্মাও বলেছেন যে কারিগররা শহরে ভিড় জমাচ্ছে যার ফলে নগরায়ণ মধ্যযুগে বিস্তার লাভ করে।

বলা দরকার এই শেষোক্ত মতের প্রবক্তা ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব। উনিই প্রথম বলেন যে ভারতে মুসলমানরা আসার সঙ্গে সঙ্গে 'দ্বিতীয় নগর বিপ্লব' শুরু হয়ে যায়। এই ধরনের নগর বিপ্লবে মূল ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশ থেকে আসা কারিগররা যারা দেশীয় কারিগরের সঙ্গে মিশে ছিল। এর ফলে বহু হিন্দু কারিগর মুসলমান হয়ে যায় প্রধানত সামাজিক বৈষম্য এড়াতে ও আর্থিক লাভের আশায়।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক ইরফান হাবিব এই মতের আংশিক পরিবর্তন করেছেন। উনি দেখাচ্ছেন যে শাসকশ্রেণীর শোষণের ফলে কৃষিসম্পর্ক নতুন ভাবে গড়ে ওঠে। এর ফলে পরগাছার মতো নতুন শহরের জন্ম হয় যেখানে শাসকশ্রেণী তাদের সৈন্যে ও অনুচরদের মধ্যে উদ্বৃত্ত বিতরণ করে। এগুলি শুরু হয় প্রায় ইক্তা প্রথার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে। ইক্তার প্রধান কেন্দ্রগুলিই প্রধান শহর হিসেবে ওই সব অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ

করে এবং, শহরগুলি আশেপাশের গ্রামগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। শুধু পরগাছা ছাড়াও, শহরগুলি শুরু হলে পর, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ধরনের সম্পর্ক অবশ্য নতুন কিছু নয়। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের আগে শহরগুলির বাণিজ্যই ছিল প্রায় প্রধান। মুসলমানরা পশ্চিম উপকুল ও সিন্ধুতে আসার আগে ওইসব অঞ্চলে অনেকগুলি শহর ছিল। ইক্তা প্রথার ফলে শহরগুলি বড় হতে থাকে। এর একটা কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান শহরগুলিতে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ও বিলাসদ্রব্যর চাহিদা বৃদ্ধি। শহরের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে উঁচুমানের জীবনযাত্রা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্যোতক বলে ধরা হতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে বড় বড় শহরের মধ্যে কতকগুলি ছোট শহরের আবির্ভাব হতে থাকে, যেগুলি ওইসব বড় শহরের উপর নির্ভরশীল। পরবর্তীকালে গুজরাট ও রাজস্থানে এই ধরনের ছোট ছোট শহরগুলির হদিস পাওয়া যায় যেগুলি কারাভান পথের ধারে। অর্থাৎ ইরফান হাবিব শুধু মাত্র বাণিজ্যকেই নগরায়ণের একমাত্র কারণ বলে ধরছেন না—এমনকী বৈদেশিক বাণিজ্যও প্রধান বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। এর একটা কারণ হচ্ছে যে হাবিব ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা প্রধানত দিল্লিকেন্দ্র থেকে ইতিহাস দেখছেন—উপকূল, যেমন বাংলা বা গুজরাট তাঁদের হিসেবের প্রায় বাইরে। ফলে প্রধানত কৃষিব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও তার গতির দিকে বেশি মন দিয়েছেন। দিল্লি শহরের ইতিহাসের দিকে তাকালে এ ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথম পর্ব

১

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর দিল্লি

দিল্লি নামটি ধিল্লি বা ধিল্লিকা শব্দটি থেকে এসেছে। ১১৭০ খ্রিস্টাব্দের বিজলীয়া শিলালেখ থেকে দিল্লি নামের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীকালের শিলালেখে দেখা যায় যে দিল্লি হরিয়ানার মধ্যে ছিল। পুরনো প্রবাদ মানলে অবশ্য দিল্লি শহর আরও পুরনো। দিল্লি গেজেটিয়ার ও হার্ন সাহেবের লেখায় এই প্রবাদগুলি পাওয়া যায় যেগুলির পুনরালোচনা করা অসমীচীন হবে না।

হার্ন ও গেজেটিয়ার-এর দেওয়া প্রবাদের বক্তব্য একই—সুতরাং আমরা একটি সারাংশ এখানে দিচ্ছি। হার্ন অবশ্য কেন যুধিষ্ঠিররা দিল্লি পরিত্যাগ করেছিলেন বলেছেন। গেজেটিয়ার লেখার সময়ে আর্যদের ভারতে আগমনের মত চালু ছিল। ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই আর্যরা এসে যমুনার পাড়ে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর তৈরি করেন। মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী বলা হয় যে যুধিষ্ঠির ও তার ভাইরা নাগরাজাদের হটিয়ে দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে নগর বসান। ওই নগর কোথায় ছিল তার সঠিক সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। বর্তমান দিল্লি শহরের কাছাকাছি কোথাও ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রবাদ অনুযায়ী ইন্দারপত বলে ছোট গ্রামটিকে এর কেন্দ্রস্থল বলে ধরা হচ্ছে; পরবর্তীকালে এখানে পুরনো কেল্লা তৈরি হয়েছিল। অধিকাংশ পুরনো লেখকই নিগমবোধ ঘাটকে এই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের মধ্যে ধরেছেন।

যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী রাজাদের কথা পুরাণে পাওয়া গেলেও প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্যদের সময়ে আমরা দিল্লির নাম প্রথম পাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম-এর মতে রাজা দিলুর নাম থেকেই দিল্লি নামটি এসেছে। উনি একে টলেমির দাইদালার-এর সমার্থক করেছেন। অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন যে পাণ্ডবদের অধস্তন কোনও রাজা—দিল্লিপা—থেকে এই নাম হয়তো আসতে পারে। এটি অবশ্য সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে কারণ ইন্দ্রপ্রস্থকে ধরা হয় দিল্লি শহরের অনেক আগে। উল্লেখযোগ্য যে কানিংহামের মতো পারসিক ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মত ছিল যে রাজা ধিলু বা দিলুর থেকে দিল্লি নামটি এসেছে। শকরা রাজা দিলুকে পরাজিত করে।

দিল্লির পরবর্তী প্রায় আটশো বছরের ইতিহাস আরও অন্ধকারময়। কুতুব মিনার-এর পাশে লোহার স্তম্ভ আছে। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যের প্রশস্তি লেখা আছে যেটা চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর সময়কার। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তোমর

বংশের এক রাজপুত রাজা এটিকে মথুরা থেকে এখানে এনেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। অবশ্য একটি পরম্পরায় বলা হচ্ছে যে এই তোমর বংশীয় কোনও রাজা দিল্লি তৈরি করেছিলেন ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে যদিও সাক্ষ্য প্রমাণে এর কোনও সমর্থন মেলে না।

লোহার স্তম্ভটির ঐতিহাসিকতা নিয়ে নানান আলোচনা হয়েছে। জেমস প্রিন্সেপ একে রাজা ধরের তৈরি বলে ধরে নেন। পরে ভিনসেন্ট স্মিথ একে চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়র তৈরি বলে বলেন। পরবর্তীকালে এই লোহার স্তম্ভের উপর রাজা অনঙ্গপালের লেখ পাওয়া যায় '১১০৯ সংবতে রাজা অঙ্গ দিল্লিতে লোকবসতি করান'। সময় লেখ অনুযায়ী ১০৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দ। উনিই শহরকে বড় করে তোলেন এবং *শালকোট* বলে একটি দুর্গ তৈরি করান।

এর প্রায় একশো বছর পরে তোমর বংশীয় কোনও রাজার কাছ থেকে আজমিরের চৌহানবংশীয় রাজা বিশালদেব বা বিগ্রহরাজা দিল্লি দখল করে নেন। রায় পিথোরা বা পৃথ্বিরাজ ছিলেন এই বিশালদেবের ভাইপো। এঁর সময়ে শালকোট দুর্গের প্রসার হয়—বাইরে একটা পাঁচিল লাগানো হয় যেটা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এর ফলে পুরনো দুর্গের চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়ে যায়। পৃথ্বিরাজ বা রায় পিথোরা ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে সিহাবউদ্দিন ঘোরিকে হারিয়ে দিলেও দু বছর পরে ঘোরি জয়লাভ করেন। রায় পিথোরা বন্দি হয়ে মারা যান এবং ঘোরির সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লি দখল করেন।

লোহার স্তম্ভের শিলালেখ থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও ঐতিহাসিক দিল্লিকে আরও কয়েক শতাব্দীর পুরনো বলে দাবি করছেন। ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যেসব গ্রিক ঐতিহাসিকরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই দিল্লির কথা বলেননি, কিন্তু মথুরার কথা বলেছেন। সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিসের কাছ থেকে শুনে ঐতিহাসিক এরিয়ান নদীর ধারের বাড়িগুলি কাঠের তৈরি বলে বলেছেন। ১৮১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৬১ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত গ্রিক-ব্যক্ট্রিয়ানরা বারবার ভারত আক্রমণ করেছিল। তাদের রচনা থেকে মথুরার উল্লেখ পাওয়া যায়, দিল্লির নয়। ৩৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনজন চিনা পরিব্রাজক ভারতে আসেন। এঁদের কারুর লেখাতেই দিল্লির কোনও উল্লেখ নেই। এমনকী হিউয়েন সাঙ মথুরা থেকে থানেশ্বর অবধি গিয়েছিলেন প্রায় দিল্লির উপর দিয়ে। কিন্তু দিল্লির কোনও উল্লেখ করেননি। গজনির মাহমুদ মথুরা ও কনৌজ লুঠ করেছিলেন। এখানেও দিল্লির কোনও উল্লেখ নেই।

এসব থেকে বলা যায় যে প্রায় তিনশো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দিল্লি শহর থাকলেও কিছুদিন পরে এটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। গজনির মাহমুদ ভারত ছেড়ে চলে গেলে পর একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দিল্লির পত্তন নতুন করে করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অনঙ্গপাল তোমর ছিলেন এবং এঁদের বসতি ছিল কনৌজে। মাহমুদের আক্রমণের ফলে এঁরা পালিয়ে ছিলেন এটা অনুমান করা শক্ত নয়।

অনঙ্গপাল-এর বংশধররা প্রায় এক শতাব্দী ধরে দিল্লি শাসন করছিলেন। ফলে অনুমান করা যায় যে তাঁরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন বাঁধের সাহায্যে। শিলালেখ থেকে অনুমান করা হয় এই

বাঁধ ইত্যাদি অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি। কিন্তু শিলালেখের নির্ভুল পাঠোদ্ধার হলে হয়তো তারিখ বদলে যেতে পারে।

১১৫১ সালে চৌহান রাজপুতরা দিল্লি দখল করে। কিন্তু তোমর রাজবংশের ছেলের সঙ্গে চৌহান রাজকুমারীর বিয়ের পর একটি মিশ্র রাজবংশ শুরু হয়। ফিরোজ শাহ কোটলার অশোক স্তম্ভে বিশালদেবের ১১৬৪ সালের শিলালেখ আছে। এতে বলা হচ্ছে যে ওঁর রাজ্যসীমা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত অর্থাৎ নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

যুদ্ধবিজয়ের পর কুতুবউদ্দিন স্বাধীন রাজা হননি। সিহাবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করতে থাকেন এবং ইতিহাসে দাসবংশ বলে যা পরিচিত তার সূচনা করেন। ১১৯৬ সালে কুতুবউদ্দিন একটি বড় মসজিদ তৈরি করেন যেটিকে তাঁর জামাই ইলতুতমিস আরও বাড়ান। কুতুবউদ্দিন-এর কুতুবমিনার ১২০০ সালে শুরু হয়। ১২২০ সালে ইলতুতমিস শেষ করেন।

কুতুবমিনার হিন্দু না মুসলমানি সৌধ এ নিয়ে একসময় বিশেষ বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। কারওর কারওর মতে এবং প্রধানত স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস ছিল এটি রায় পিথোরার তৈরি। ওঁর মেয়ে যাতে যমুনা নদী দেখতে পায়, তার জন্যই নাকি এটি উনি তৈরি করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম অবশ্য মনে করেন এটি মুসলমানি সৌধ—নামাজ পড়ার জন্যে, মুয়াজ্জান এখান থেকেই ডাক দিত। ১৮০৩ সালে শিখরটি পড়ে গেলে ইংরেজ রবার্ট স্মিথ একটি মোগল ধাঁচের শিখর বসান যেটি বাকি অংশটির সঙ্গে বেমানান। ফলে ১৮৪৮ সালে এটি নামিয়ে ফেলা হয়।

অনঙ্গপালের রাজধানী ছিল তুঘলকাবাদ থেকে পাঁচ কি.মি. দূরে সূরজকুণ্ডের পাশে। এখানে এখনও অনঙ্গপাল বলে একটি গ্রাম রয়েছে। সূরজপাল সূরজকুণ্ড তৈরি করেন। আধা-গোলাকৃতি পাথরখণ্ড দিয়ে তৈরি জলাধারটি পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা জল ধরার জন্যে তৈরি হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে ওখানে একটি মন্দিরও করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ফিরোজ শাহ তুঘলক কুণ্ডটির সংস্কার করেন।

প্রত্নতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে লালকোট দুর্গের দশ কি.মি. দূরে অনঙ্গপাল প্রথমে অনঙ্গপুর বলে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে লালকোট দুর্গে সরে আসেন। দুর্গের ভাঙা পাঁচিলের কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। রায় পিথোরা দুর্গটি বাড়ালে একে কিল্লা রায় পিথোরা বলা হত। রাজস্থানি রাজাদের কাছে দিল্লি কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল বলা শক্ত। এটিকে তাঁরা প্রধানত প্রান্তিক থানা হিসেবেই দেখেছিলেন। কুতুবউদ্দিন এটিকে তাঁর রাজধানীতে পরিণত করেন।

জামা মসজিদ ও কুতুবমিনার তৈরি হওয়ার পর, কুতুবউদ্দিন একটি নতুন দুর্গ তৈরি করেন মসজিদের উত্তর দিকে। একে বলা হত *হিসার-ই নউ* । বোধহয় মসজিদের সঙ্গে মাদ্রাসাও তৈরি করা হয়েছিল। তেরোটি দরজার একটির বাইরে ছিল কাপড়ের বাজার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিল্লির প্রধান সমস্যা ছিল জলের। দুর্গ থেকে বহুদূরে ছিল যমুনা নদী এবং কুতুবমিনার থেকে নদীর দূরত্ব ছিল প্রায় ১৮ কি.মি.। পাহাড়ি এলাকা বলে কুয়ো খোঁড়াও সহজসাধ্য ছিল না। ইলতুতমিস একটা বড় পুকুর খুঁড়ে দেন যাকে

বলা হত হাউজ-ই সামশি। ওই সময়ের মতো জলের সমস্যা মিটেছিল এবং লোকেরা এখান থেকেই জল নিত। পরবর্তীকালে কিছু দুষ্কৃতকারী এর নালাগুলি বন্ধ করে দেয়, ফলে জল শুকিয়ে যায়। ফিরোজ শাহ তুঘলক আবার নালা পরিষ্কার করিয়ে দিলে জল আসতে থাকে।

কুতুবমিনার থেকে হাউজ-ই সামশি ছিল তিন কি.মি. দূরে। অষ্টকোণ এই পুকুরের বর্ণনা রেখে গিয়েছিলেন মরোক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা। কিন্তু যে পরিমাণে শহরে লোক বাড়ছিল, তার চাহিদা মেটানোর জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সাধারণ লোকেদের মধ্যেও একটি প্রবণতা শুরু হয় নদীর দিকে যাবার। গিয়াসুদ্দিন বলবনের সময় গিয়াসপুরে একটি শহরতলি শুরু হয়। শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া এখানেই তাঁর দরগা বসান। ওই সময়ে এটিই ছিল যমুনার সব থেকে কাছের আস্তানা।

ক্রমশ জনপদ যমুনা নদীর দিকে এগোতে থাকে। যমুনা নদী ও গিয়াসপুরের মধ্যে মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ (বলবনের নাতি) একটি পাঁচিল ঘেরা প্রাসাদ করতে শুরু করেন। প্রাসাদটির নাম দেন কিলোখড়ি, যেটি বোধহয় ওখানকার গ্রামের নাম থেকে নেওয়া। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে কায়কোবাদ পুরনো দিল্লির বলবনি প্রাসাদ ‘কওশকে লাল’ ত্যাগ করে নতুন জায়গায় এসেছিলেন নির্ভেজাল আমোদ-প্রমোদ করার জন্য যেটি কড়া বলবনি শাসনে সীমিত ছিল। কায়কোবাদ প্রাসাদের সঙ্গে বাগানও তৈরি করেছিলেন। বারানির কথায়: ‘মালিক, আমির ও দরবারের অন্যান্য কর্মচারীগণ সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বশ্রেণীর মালিক, আমির ও বিশিষ্ট লোকেরা সুলতানের প্রাসাদের নিকটে তাহাদের আবাসস্থল নির্মাণ করিলেন। অন্যান্য লোকেরাও যখন দেখিল যে, সম্রাট কিলোখড়িতে বাস করিতে অধিক আগ্রহী, তখন সেখানেই তাহারা নিজেদের বাসস্থান হিসাবে কুটির ও প্রাসাদ নির্মাণ করাইল এবং চতুর্দিক হইতে সরদার ও আমির শ্রেণীর লোকেরা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল ও বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। কিলোখড়ি দেখিতে দেখিতে জনবসতিতে পরিপুর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।’ সুলতানের আমোদ-প্রমোদের খবর পেয়ে নানাধরনের লোক, যেমন বাদক, গায়ক, ভাঁড় ইত্যাদিরা এসেছিল, তার কথাও বারানি বলেছেন। এর ফলে চারপাশের জনবসতিও পরিপূর্ণ হয়ে যায় ‘এবং সকল প্রকার কুকাজে দেশ ভরিয়া গেল।’

সুতরাং জল আহরণের চেষ্টায় দিল্লি শহর শুধু নদীর ধার ধরে বাড়ছিল তা নয়। রাজা যেখানে থাকবেন, সেখানেই শহর শুরু হবে। মধ্যযুগেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এই নতুন শহরকে শহর-ই নৌ বলে বলা হতে থাকে। বারানির কথা ধরলে বলা যায় যে প্রাসাদকে ঘিরেই এই নতুন শহর তৈরি হচ্ছিল। বারানি যে ভাবে এই শহরের কুকাজের বর্ণনা দিয়েছেন ও মদের দাম বেড়ে যাবার কথা বলেছেন, তার থেকে মনে হয় এই নতুন শহরে উচ্চবিত্ত লোকেদের উপর ধর্মীয় প্রভাব ছিল অল্প। অর্থাৎ ধর্মের প্রভাবে বা শুধুমাত্র নিছক জল পেয়ে প্রাণরক্ষার তাগিদে শহর-ই নৌ তৈরি হয়নি। জালালউদ্দিন খলজির সময়ে শহরের আরও প্রসার হয় ও নতুন নতুন বাজারের পত্তন হয়।

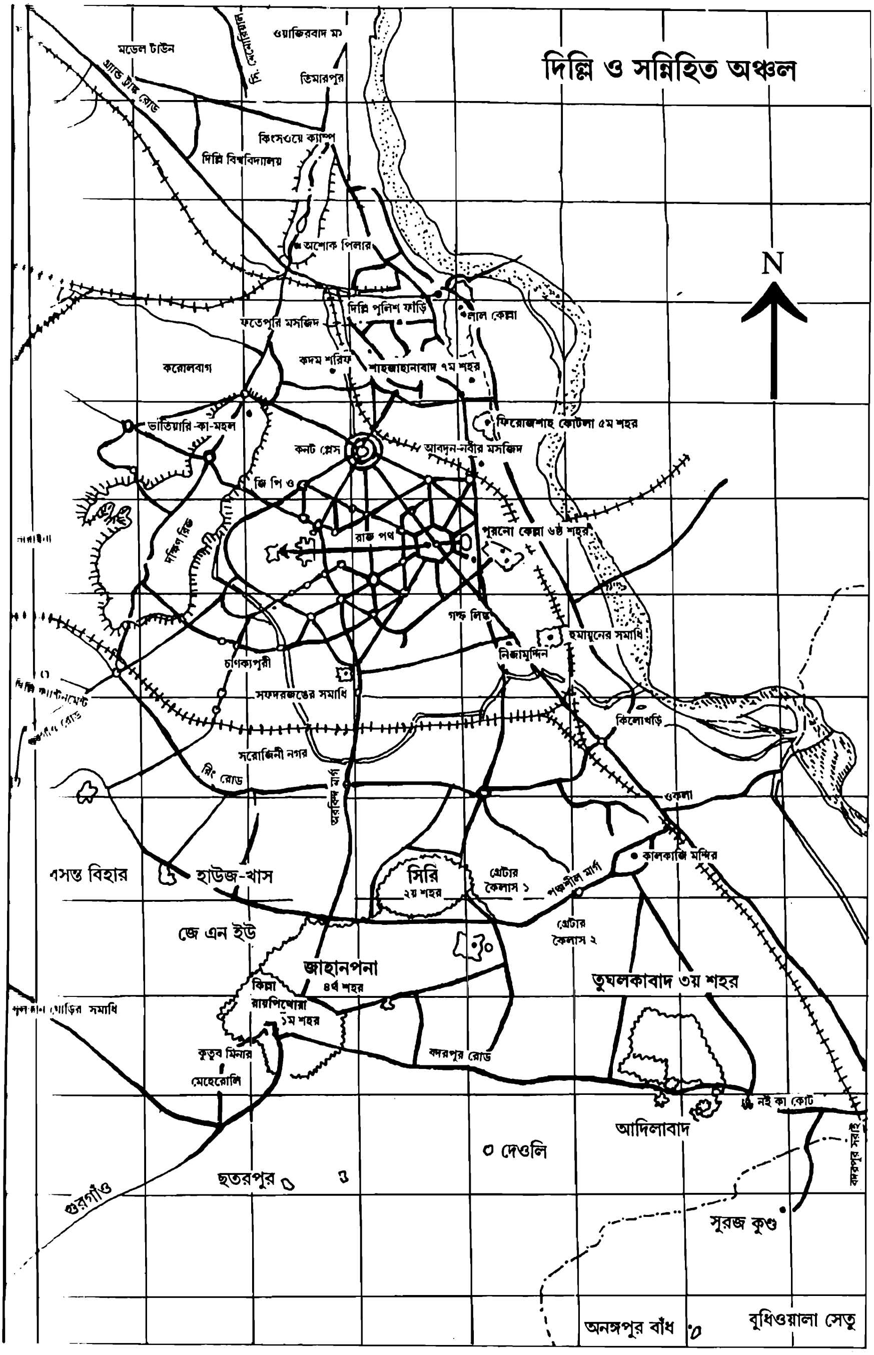
দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চল
N
ওয়াজিরবাদ
মডেল টাউন
গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড
তিমারপুর
কিংসওয়ে ক্যাম্প
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
অশোক পিলার
দিল্লি পুলিশ ফাঁড়ি
লাল কেল্লা
ফতেপুরি মসজিদ
কদম শরিফ
শাহজাহানাবাদ ৭ম শহর
করোলবাগ
ফিরোজশাহ কোটলা ৫ম শহর
ভাতিয়ারি-কা-মহল
কনট প্লেস
আবদুন-নবীর মসজিদ
জি পি ও
দক্ষিণ রিজ
রাজ পথ
পুরনো কেল্লা ৬ষ্ঠ শহর
গল্ফ লিঙ্ক
হুমায়ুনের সমাধি
নিজামুদ্দিন
চাণক্যপুরী
দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট
সফদরজঙ্গের সমাধি
কিলোখড়ি
সরোজিনী নগর
রিং রোড
অরবিন্দ মার্গ
ওকলা
কালকাজি মন্দির
বসন্ত বিহার
হাউজ-খাস
সিরি
২য় শহর
গ্রেটার কৈলাস ১
পঞ্চশীল মার্গ
গ্রেটার কৈলাস ২
জে এন ইউ
জাহানপনা
৪র্থ শহর
তুঘলকাবাদ ৩য় শহর
কিল্লা
রায়পিথোরা
১ম শহর
সুলতান গোড়ির সমাধি
কুতুব মিনার
বদরপুর রোড
মেহেরোলি
নই কা কোট
বদরপুর সরাই
আদিলাবাদ
দেওলি
ছতরপুর
গুরগাঁও
সুরজ কুণ্ড
অনঙ্গপুর বাঁধ
বুধিওয়ালা সেতু

সৌজন্য: দিল্লি ও তার সন্নিহিত অঞ্চল; আর্কিওলজিকাল সারভে অভ ইন্ডিয়া

বারানি বলছেন যে 'সুলতান আমির, মালিক, সরদার ও শহরের বিশিষ্ট লোকদিগকে কিলোখড়িতে আসিয়া অট্টালিকা ও গৃহাদি নির্মাণের আদেশ দিলেন। শহর হইতে বহু বাজারি লোককেও আনাইলেন। এইভাবে কিলোখড়ির বাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।' এর থেকে দুটি কথা পরিষ্কার পাওয়া যায়। প্রথমত, বহু অভিজাত পুরনো দিল্লিতে ছিল এবং কায়কোবাদের সঙ্গে আসেনি। দ্বিতীয়ত, এখানে সুলতান আদেশ দিয়ে শুধু অভিজাত নয়, ব্যাপারীদেরও আনিয়েছিলেন। সুতরাং পুরনো দিল্লি পরিত্যক্ত হয়নি, নতুন শহরও সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠেনি। এই আদেশ দেবার ব্যাপার আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যখন দেখি বারানি বলছেন যে, 'মালিক ও আমিরদের জন্য গৃহাদির ব্যবস্থা করা হইল এবং নূতন নির্মিত অট্টালিকাও তাহাদের মধ্যে বন্টন করা হইল।' এই প্রথম বোধহয় সরকার নতুন শহরের পরিকল্পনা করে শহর তৈরি করেন। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন না হবার ফলে এই পরিকল্পনার কথা জানা যায় না। কিন্তু বারানি বলছেন যে সুলতান 'কিলোখড়ির প্রাসাদকে সম্পূর্ণ করিয়া নানাবিধ নকশার দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন।' এখানে দেওয়ালে আঁকা নকশার কথাই বলা হচ্ছে যেটি আগে এই প্রাসাদে ছিল না। অর্থাৎ কায়কোবাদ প্রাসাদ নির্মাণে যে মনোযোগ দেননি, এই সুলতান সেটি দিয়েছিলেন।

কিন্তু সুলতানের আসার আগেই শহরে বাড়ি তৈরি করা শুরু হয়ে যায়। ফলে বারানির মতে নতুন বাড়ি তৈরি করতে সুলতানকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে এসে বাস করতে থাকে এবং 'বাজার ও গলি লোকজনদের দ্বারা ভরিয়া গেল।' এর থেকে বলা যেতে পারে যে প্রথমে বাড়ি তৈরি হয় ও পরে রাস্তা, যার ফলে গলির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধান রাজপথের কথা অবশ্য বারানি বলেননি।

বারানির লেখা থেকে মনে হয় যে সুলতান জালালউদ্দিনের বলবনি নিষ্ঠার ফলে অভিজাতরা যে সকলেই খুশি ছিলেন তা নয়। বলবনের ভাইপো মালিক চাজু যখন বিদ্রোহ করল, তখন তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বেশ বেশি ছিল। ফলে সুলতান জালালউদ্দিন বলবনের তৈরি প্রাসাদ 'কওশকে লাল'-এ এসে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে প্রথম কিলোখড়ির প্রাসাদে বসবাসের জন্য আসেন। এর আগে তিনি শহরের মধ্যে ঢোকেননি। ফলে পুরনো দিল্লিও একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছিল এরকম মনে করা যায় না।

বারানির লেখা থেকে মনে হয় সুলতান জালালউদ্দিনের রাজ্যাভিষেকের পরই দিল্লিতে দলাদলি শুরু হয়ে যায়। পুরনো বলবনি আমিররা ক্রমশ সুলতানের বিপক্ষে যেতে থাকে, যার সঙ্গে যোগ দেয় কায়কোবাদি ওমরাহরা যার প্রকাশ আমরা মালিক চাজুর বিদ্রোহের মধ্যে দেখি। সুলতান কারখানার খরচ কমাতে চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সাধারণ ব্যবসায়ীরাও সুলতানের বিপক্ষে চলে যেতে শুরু করে। এমনকী সুলতানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও হতে লাগল। এটা যে কেবলমাত্র ধর্মের গোঁড়ামির জন্য, যার ইঙ্গিত বারানি দিচ্ছেন, সেটা মনে হয় প্রধান কারণ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে তখনকার দিল্লি নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদে (যার মধ্যে মদ্যপান ছিল) বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বারানি নিজেও ওই ধরনের জলসায়

উপস্থিত থেকে এর প্রশংসা করেছেন। সুতরাং সুলতানের বলবনি কঠোরতা ও কাঠামোতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দিল্লি শহরের এই চারিত্রিক দ্বন্দ্ব থাকার ফলে নানারকম গোলমাল হয়েছিল। সুলতান জালালউদ্দিনের মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব থাকার ফলে তাঁকেও ভুগতে হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ক্রমশ বসতি করেছিল ইন্দারপত গ্রাম ও বর্তমান পুরনো কেল্লার কাছ পর্যন্ত। বহুসংখ্যক মোঙ্গল উপজাতির লোকেরা ওখানে বসতি স্থাপন করেছিল বলে ওই জায়গাটি ক্রমশ মোগলপুরা বলে পরিচিত হতে থাকে। সুতরাং অধ্যাপক আথার আলি যখন বলছেন যে পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে শহর ক্রমশ নদীর দিকে এগোচ্ছে, তখন সেটি মেনে নিতে বাধা নেই। কিন্তু শুধু জলের অন্বেষণই যে এর প্রধান কারণ এটি মানা যায় না। আলাউদ্দিন খলজির সময় পর্যন্ত এই নীতি চলতে থাকে। হঠাৎ এই নীতি বন্ধ হয়ে যায়।

মনে হয় বদাওন থেকে সুলতান আলাউদ্দিন নতুন শহরে এসে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এর পরই তিনি বলবনি শহরে গিয়ে 'কওশকে লাল' প্রাসাদে বসবাস করতে থাকেন এবং একেই শাহিমহল বলে ঠিক করেন। অর্থাৎ আর একবার রাজধানীর বদল হল—নতুন শহর থেকে পুরনো শহরের মধ্যে ফিরে গেল যদিও এই দুই শহরের মধ্যে জনবসতি হয়ে যাবার ফলে আলাদা করে আর দেখা হত না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউদ্দিন 'মহাভোগের জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।' শহরেও মহাধুমধাম ও আমোদ-প্রমোদ চলতে লাগল।

সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে কায়দুর নেতৃত্বে বিরাট মোঙ্গল সৈন্যদল ভারত আক্রমণ করে। সুলতান তাদের পরাজিত করলেও সাধারণ লোকেরা পাঁচিল ঘেরা দুর্গের মধ্যেই আশ্রয় নেয়। মনে হয় এই অবস্থার ফলে সুলতান সিরি অঞ্চলে তাঁর নতুন প্রাসাদ তৈরি করে সিরিকেই তাঁর রাজধানী বলে ঘোষণা করেন। বারানির কথা থেকে মনে হয় যে এর চারপাশেও তিনি বসতি করিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান জালালউদ্দিনের মতো ওইরকম শহর করিয়েছিলেন কিনা বারানি বলেননি। এ ছাড়াও দিল্লির দুর্গের সংস্কার করেন। এই মোঙ্গল আক্রমণের ফলে জনবসতির প্রসারের গতি অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে।

পুরনো দিল্লির উত্তর-পূর্ব দিকের মাঠে সিরি দুর্গ ও মহল করা হয়েছিল। প্রথম দিকে সৈন্যসামন্ত শুধু থাকায় একে বলা হত *লস্করগড়* । পরবর্তীকালে এর নাম হয়ে যায় *দার-উল খলিফা* । এখানেই তাঁর বিখ্যাত হাজার স্তম্ভের দরবারকক্ষ করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামই প্রথমে সিরি কোথায় তৈরি হয়েছিল এটি প্রমাণ করেন। সাহপুর জাট গ্রামটি এর মধ্যে ছিল এটি বলেছেন। ওঁর এই বক্তব্য পণ্ডিতমহল মেনে নিয়েছেন।

কুতুব দিল্লি ও কিলোখড়ির মধ্যেকার গোলাকৃতি সমান জমিতে প্রায় দুই কি.মি. জায়গা জুড়ে এই শহর তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়াও আলাউদ্দিন কুতুব দিল্লির জামা মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। এ সব থেকে মনে হয় যে দিল্লির লোকসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এর ফলে আমরা তিনটে শহর নিয়ে দিল্লি তৈরি হচ্ছে দেখতে পাই।

কুতুবের দিল্লি যাকে তখন *শহর* বলা হত, সিরিকে বলা হত *দার-উল খলিফা* এবং কিলোখড়ি যাকে বলা হত *শহর-ই নৌ* । জনবসতি বেড়ে যাবার ফলে শহরগুলির মধ্যেকার ফারাক খুব পরিষ্কার ছিল না। বারানি দিল্লিকে বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র বলে বলেছেন। বদাওন দরওয়াজার সামনে ছিল কাপড়ের বাজার যাকে বারানি *সরাই আদল* বলে বলেছেন। বারানি শস্য বাজারের কথাও বলেছেন যেটির অবস্থান ছিল মাণ্ডভি দরওয়াজার সামনে।

জনসমাগম বৃদ্ধি ও মোঙ্গল আক্রমণের ফলে জনবসতির প্রসারের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় একথা আগেই বলা হয়েছে। এর ফলে স্বভাবতই জলের সমস্যা দেখা যায়। সেদিক থেকে অবশ্য সিরির অবস্থান ছিল ভাল—অর্থাৎ নরম মাটির উপরে। তবুও সুলতান আলাউদ্দিন *হাউজ-ই সামশি* সংস্কার করেন। চারপাশে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে একটি ছত্রি করে দেন। সর্বভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থার মতে অবশ্য এই ছত্রি ইলতুতমিসের তৈরি। প্রবাদ আছে যে ইলতুতমিস স্বপ্নে হজরত নবির নির্দেশ পান ও পরদিন সকালে নবির ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখতে পান। কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য হাউজ-ই সামশি দূর হয়ে যাওয়ায় আলাউদ্দিন আর একটি পুকুর কাটান যার নামকরণ করা হয়েছিল প্রথমে *হাউজ-ই আলাই*। পরবর্তীকালে একে *হাউজ-খাস* বলা হয়। এর পাড়ের কিছু অংশ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সিরির লোকেদের পক্ষে এখান থেকে জল নেওয়া অনেক সহজ হয়েছিল। চতুষ্কোণ এই পুকুরের প্রতিটি ধার ছিল ৬০০ মি.। পরবর্তীকালে ইবন বতুতা বলেছেন যে এই পুকুর হাউজ-ই সামশির থেকে বড় এবং সারা বছর পুকুরে জল থাকত।

মোঙ্গল আক্রমণের ভয় কেটে যাবার ফলে জনবসতি প্রসারের গতি আবার শুরু হয়। সাধারণ লোকেরা নিজামুদ্দিনের দরগায় ক্রমাগত আসার ফলে শহর থেকে গিয়াসপুর পর্যন্ত জনবসতি শুরু হয়ে যায়।

আলাউদ্দিনের সময়কার দিল্লির লোকজনের কথা বারানি বলেছেন। কবি, সাহিত্যিক ও জ্যোতিষী প্রচুর পরিমাণে দিল্লিতে ছিল, যদিও বারানি বলছেন যে আলাউদ্দিন আমির খসরুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাননি। হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষী ও গণক প্রচুর সংখ্যায় ছিল ও তাদের কথা ছাড়া কেউ কোনও কাজ করত না। আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সুবিদিত। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মূল্য ও মজুরি কম থাকলেও সাধারণ লোকেদের হাতে অর্থ ছিল না, যার ফলে তারা এই সব সুবিধে নিতে পারেনি। মনে হয় হিন্দুদের উপর সেরকম বাধানিষেধ ছিল না—আলাউদ্দিনের দেহরক্ষীরাই ছিল হিন্দু পাইক। এদের সাহায্যে খসরু খান সিংহাসন দখল করেন। বারানির লেখা থেকে বলা যায় যে ওই সময় মূর্তিপূজা খুব বেড়ে যায় যার প্রতি স্বভাবতই বারানির প্রচুর অনীহা ছিল। এ ছাড়াও অভিজাতবর্গের মধ্যে বদল হচ্ছিল। নিচু শ্রেণীর কিছু লোক তাদের কার্যকলাপের ফলে অভিজাত হচ্ছিল যেটিও বারানির বিশেষ পছন্দ ছিল না। সুতরাং দিল্লি শহরের বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরেও পরিবর্তন হতে শুরু করে।

১৩২০ খ্রিস্টাব্দে তুঘলক শাহ সিংহাসনে বসেন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহ নাম নিয়ে। কুতুবমিনার থেকে ৮ কি.মি. দূরে তিনি একটি বড় দুর্গ তৈরি করেন যাকে

বর্তমান ঐতিহাসিকরা শহর বলছেন। খসরুকে পরাজিত করে অবশ্য গাজি মালিক (ওই নামেই তখন তিনি পরিচিত) ইন্দারপতে বাস করছিলেন। সুতরাং পুরনো শহর তখনও পরিত্যক্ত হয়নি। পরে তিনি আলাউদ্দিনের 'হাজার সুতুনে' আমির ওমরাহদের সঙ্গে যান। বারানি তুঘলকাবাদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেননি— সুলতান সেখানে বাস করছেন, এটিই বলেছেন মাত্র। তবে তিনি তুঘলকাবাদকে রাজধানী করেছিলেন বলে যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি বলেছেন যে সুলতান সেখানে মালিক, আমির ও পুত্রপরিজনসহ বাস করছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে তিনি এ প্রসঙ্গে তিনটি জায়গার নাম করেছেন—দিল্লি, সিরি ও তুঘলকাবাদ। তবে আগের বেলায় যেমন বসতি স্থাপন করার কথা বলেছিলেন, এখন সে কথা বলছেন না। সেইভাবে দেখলে বলা যায় যে রাজধানী বলে স্বীকৃত হলেও তুঘলকাবাদ দিল্লি ও সিরির মতো শহর ছিল না। সে ক্ষেত্রে জনসমাগম বেড়ে যাবার জন্য সুলতান তুঘলকাবাদ তৈরি করেছিলেন বলে অধ্যাপক আথার আলি যে মন্তব্য করেছেন, সেটি এ ক্ষেত্রে মানা কঠিন।

অর্ধকোণাকৃতি এই দুর্গের ব্যাসার্ধ ছিল সাড়ে ছয় কি.মি. এবং প্রায় পনেরো মিটার উচ্চতার পাথরের টুকরো দিয়ে ঘেরা পাঁচিল ছিল। পাঁচিলের গায়ে গম্বুজ তৈরি করার কথা বারানি বলেছেন। দক্ষিণ দিকে একটি বড় জলাধার ছিল যেটির জল ধরে রাখা হত বাঁধের সাহায্যে। এই বাঁধ থেকে খালের সাহায্যে জল জলাধারে নিয়ে আসা হত। তুঘলকাবাদকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। পুব দিকে বর্তমান সড়কের ধারে ছিল দুর্গ। এরই পশ্চিমে বড় জায়গা নিয়ে পাঁচিল ঘেরা প্রাসাদগুলি ছিল। এরই দূরে উত্তর দিকে ছিল শহর যার সাধারণ বাড়িগুলির ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান। এর ভিতরে পথের কিছু চিহ্ন আছে যা থেকে বলা যায় যে এটিও 'গ্রিড' ধরনে তৈরি অর্থাৎ একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পথ চলে গিয়েছে ওই ধরনের অন্যপথ ভেদ করে। দুর্গের ভিতর বিজয়-মণ্ডল গম্বুজ এখনও আছে। আরও কয়েকটি হলঘর ও মাটির নীচের সুড়ঙ্গর হদিস পাওয়া যায়। তুঘলকাবাদের উপর প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা যে কাজ করেছেন তার থেকে পরিষ্কার যে শহরটি পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল। যদিও বারানির বক্তব্য থেকে এ ধারণা আসে না। তবে শহরটি গিয়াসুদ্দিনের সময় হয়েছিল, না তার পরে হয়েছিল, এটি বলা শক্ত। অন্তত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এ উত্তর পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক আথার আলি আর এক জায়গায় বলছেন যে তুঘলকাবাদ একটি আলাদা জায়গা। প্রধানত সুলতান ও তাঁর সৈন্যদের থাকার জন্যেই এটি করা হয়েছিল। এটি দিল্লির পরিবর্ত শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। রাজধানী হলেই যে শহর তৈরি হয় না এটিই তার বড় নিদর্শন।

আমরা তুঘলকাবাদকে তিনটি ভাগে ভাগ করলেও, পার্সি ব্রাউন একে দুভাগ করেছেন যার মধ্যে একটি হল দুর্গ ও অন্যটি হল তার সংলগ্ন শহর। উনি বলেছেন যে ক্রুসেডের আগে দুর্গ তৈরি করার এই নিয়ম ছিল ইউরোপে, যে ধরন পশ্চিম এশিয়াতে দশম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ছিল। তুঘলকাবাদে, উনি বলেছেন, সুরক্ষার ব্যবস্থা পোড়া ইট দিয়ে করা হয়েছিল বলে, পুব দিকে একটি ঢালু দিক রয়েছে যার

অনুকরণ দিল্লিতে পাথরের দেওয়ালের মধ্যেও দেখা যায়। দুর্গটি সারা শহরের উপর দখল রেখেছে এবং এর পরিখার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এই অংশটি দুর্গ ও প্রাসাদ মেলানো যদিও দুটি আলাদা এলাকায় ভাগ করা। পরেরটিতেই রাজার থাকার জায়গা, জেনানা মহল, দেওয়ানখানা ইত্যাদি ছিল। কয়েকটি ঘরের ছাদের মধ্যে কাঠের বিম ব্যবহার করা হয়েছিল। এ ছাড়াও একটি লম্বা মাটির নীচের বারান্দা ছিল যার মধ্যে ঘর ছিল সারিবদ্ধভাবে। এই পথ ধরে দুর্গের পিছনের দরজায় পড়া যেত। দুর্গের ভিতরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ খবর সংগ্রহ ও অন্যান্য সমস্যা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সবথেকে ভাল অবস্থায় রয়েছে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধিসৌধ যেটি একটি ছোটখাটো দুর্গের মতো। এটি অবশ্য নতুন কিছু নয় কারণ আগেকার কয়েকটি মসজিদে এই ধরনের গড়ন দেখতে পাওয়া যায়।

মুহম্মদ তুঘলক এর বিপরীত দিকে একটি উঁচু টিলার উপর একটি নতুন দুর্গ তৈরি করেন যাকে প্রথমে মহম্মদাবাদ ও পরে আদিলাবাদ বলা হত। স্থাপত্যের দিক থেকে তুঘলকাবাদ দুর্গ থেকে এর তফাত পাওয়া যায় না। উঁচু পাঁচিল দিয়ে একে সংযোগ করা হয়েছিল তুঘলকাবাদের সঙ্গে।

পুরনো দিল্লি ও সিরির মধ্যেকার সমতল ভূমিতে ততদিনে লোকবসতি শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও তাদের কোনও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মুহম্মদ তুঘলক সিরি ও তুঘলকাবাদকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেন। ফলে তিনটি শহর মিলে একটি শহরে পরিণত হয়েছিল। এর নামকরণ করা হয়েছিল *জাহানপনা*।

তিনটি শহরে ঘেরা জাহানপনার ১৬টি দরজা ছিল—উত্তর-পশ্চিমে ৬টি, দক্ষিণে ৭টি এবং সিরির দিকে ৩টি। বর্তমানে শুধু দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের ভগ্নাংশই দেখা যায়। মুহম্মদ তুঘলক বর্তমান খিকড়ি গ্রামের কাছে একটি বাঁধ ও একটি জলাধারও তৈরি করেছিলেন। এই বিশাল শহরের শহরতলি প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে বারানি বলেছেন যদিও রাজধানী সরানোর ফলে এই শহরতলি ধ্বংস হয়ে যায় একথাও তিনি বলেছেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার অন্তত তিনটি সমকালীন সাক্ষ্য আছে। তিনজনেই বলেছেন যে দিল্লি একসময় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং সুলতান আবার সব লোককে দিল্লিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। একমাত্র বারানি বলেছেন যে দিল্লি জনশূন্য হলে পর আশেপাশের গ্রামের লোকজন এসে থাকতে শুরু করে। ফলে নিচু শ্রেণীর সাধারণ লোকেরা ছিল একথা কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলছেন। লোক স্থানান্তর করার পর দিল্লির ভয়াবহ অবস্থার কথা ইবন বতুতা বলেছেন। তাঁর লেখা থেকে সমকালীন দিল্লি শহরের একটি অনন্য সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হানসি থেকে পালাম হয়ে ইবন বতুতা দিল্লি পৌঁছোন। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, শহরটি শুধু ভারতের সব থেকে বড় শহরই নয়, পূর্ব দিকের যে কোনও মুসলমান শহরের থেকে বড় উনি বলছেন দিল্লি শহর আশেপাশের চারটি শহরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে। একটি দিল্লি, এটি হিন্দুদের পুরনো শহর ছিল যেটি মুসলমানরা অধিকার

করে। দ্বিতীয়টি সিরি যাকে দার উল খলিফা বলা হত। তৃতীয়টি তুঘলকাবাদ ও চতুর্থটি জাহানপনা। শেষেরটি মুহম্মদ তুঘলকের থাকার জন্য তৈরি। চারটি শহরকেই পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটি শহরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন মুহম্মদ তুঘলক, কিন্তু টাকার অভাবে সবটা করতে পারেননি।

ইবন বতুতা দিল্লির বাইরে হাউজ-ই সামশির কথা বলেছেন। বর্ষার সময় লোকে নৌকো করে এর মাঝখানের ছত্রিতে যেতে পারে। অন্যসময় জল থাকে না। ছত্রির মধ্যে একটি ছোট মসজিদ আছে যেখানে দরবেশরা প্রার্থনা করে। জল না থাকলে এই পুকুরের মধ্যে লোকেরা আখ, শসা, তরমুজ, কুমড়ো ইত্যাদি চাষ করে। দিল্লি ও সিরির মধ্যে একটি খাস পুকুর আছে। এর চারপাশে প্রায় চল্লিশটি ছত্রি আছে এবং গায়করা এখানে বাস করে।

দিল্লির সুলতানের প্রাসাদকে *দরসরা* বলে বলা হয়, এর বহু দরজা আছে। প্রথম দরজাতে রক্ষীরা ছাড়া বাঁশিবাদক ও ঢোলকবাদকরা থাকে। যখন কোনও আমির বা বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন, তখন ঢোলক বাজানো হয় এবং অতিথির নাম বলা হয়। তৃতীয় দরজা পর্যন্ত একই ব্যবস্থা চলতে থাকে। প্রথম দরজার পাশে উঁচু জায়গার উপর ঘাতকরা বসে থাকে। সরকার কাউকে হত্যা করার আদেশ দিলে দরবারকক্ষের বাইরে হত্যা করে তিন রাত ফেলে রাখা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজার মধ্যে নাকিব খাতা নিয়ে বসে। তার সামনে একটি সোনার দণ্ড আছে। দ্বিতীয় দরজা পেরিয়ে একটি বড় দরবারকক্ষ আছে সেখানে বহু লোক বসে। তৃতীয় দরজায় উঁচু জায়গার উপর খাতা নিয়ে লোকেরা বসে আছে। সুলতান যাকে ঢোকার আদেশ দিচ্ছেন, তার সঙ্গে এদের একজন ভিতরে যায়। তৃতীয় দরজার পরই বড় দরবারকক্ষে ঢোকা যায়। এই দরবারকক্ষকে বলা হয় *হাজার উস্তুন (হাজার সুতুন)*। যার মানে হাজার স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি কাঠের এবং ছাদও কাঠের। এই দরবার কক্ষতেই সুলতান বসে দরবার চালান।

দরবার সাধারণত বিকেলে বসলেও, সুলতান মাঝে মাঝে সকালে বসেন। উঁচু জায়গার উপর সাদা কার্পেটে মোড়া সিংহাসনের উপর পা মুড়ে সুলতান বসেন। বাঁ দিকে এবং ডান দিকে হাত রাখার জায়গা আছে। পিছনে রয়েছে কিছু বালিশ। সুলতান বসার পর উজির সামনে দাঁড়ায় ও সচিব দাঁড়ায় উজিরের পিছনে। এর পরে অন্যান্যরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী দাঁড়ায়। দরবারকক্ষের দুধারে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা দাঁড়ায়। এদের সামনে অন্যান্য আমলা ও বিশিষ্ট লোকজনরা দাঁড়ায়। এই দরবারকক্ষেই সুলতান নানারকম দান করেন ও বন্দিদের হত্যা করা বা অঙ্গচ্ছেদ করার আদেশ দেন।

দিল্লিতে ইবন বতুতাকে চার হাজার দিনার দেওয়া হয়েছিল তাঁর বাড়ি সংস্কার করার জন্য। এর পর তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করান তাঁর বাড়ির উলটো দিকে। দৌলতাবাদ থেকে ফিরে আসার পর দিল্লির জনসাধারণ যে দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছিল, তার কথা তিনি বলেছেন; তবে সুলতান যে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করেন, সে কথাও বলেছেন।

১৩৪০ সালে বিদ্রোহ ও দুর্ভিক্ষতে সুলতানি সাম্রাজ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

দিল্লির বড় দুটি পুকুরও শুকিয়ে গেলে জলের অভাব শুরু হয়ে যায়। আরাবল্লী পাহাড়ের পাথুরে মাটিতে তৈরি শহর রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যার ফলে স্বভাবতই যমুনা নদীর পাড়ে যাবার আকর্ষণ বেড়ে যায়। সুতরাং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যমুনা নদীর ধারে একটি দুর্গ তৈরি করলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল *ফিরোজাবাদ* । এটি পরে রাজধানী হয়। ১৩৮৮ সালে বারানি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা বলেছেন। সামশি সিরাজ আফিফ বলছেন যে এটি পুরনো দিল্লি থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে ছিল। ১৮টি গ্রাম নিয়ে করা হয়েছিল। মূল গ্রামটি ছিল গাওয়াই—পরবর্তীকালে এটিই ফিরোজ শাহ কোটলা। ঠিক কোন জায়গায় এটি করা হয়েছিল সেটি এখনও নির্ধারিত হয়নি। শহরটি ইন্দারপথ থেকে শুরু করে সুলতানা রাজিয়ার সমাধি পর্যন্ত ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক আফিফ বলছেন যে ইন্দারপথ থেকে শুরু করে *কৌশিক-ই শিকার* পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শেষের জায়গাতেই সুলতান ফিরোজ অশোকস্তম্ভ বসিয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে জনবসতি যমুনা নদীর পাড় দিয়ে প্রসারিত হচ্ছিল।

পুরনো ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাসাদ বা দুর্গের সঠিক হদিস পাওয়া যায় না। বর্তমান শহরের দক্ষিণ দিকের দরজার সামনে এই দুর্গের কিছুটা ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। কৌশিক-ই শিকারই ফিরোজ শাহ কোটলা কারণ ওখানে একটি তিনতলা বাড়ির উপরে অশোকস্তম্ভ বসানো। তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ের শিলালেখ এই স্তম্ভে আছে পালি ভাষায়, যার পাঠোদ্ধার করেন জেমস প্রিনসেপ। দিল্লি দরওয়াজার কাছে ফিরোজ শাহর দুর্গ আর তুর্কমান দরওয়াজার কাছে একটি কালী মন্দির ছাড়া এই শহরের কিছু অবশিষ্ট নেই।

ঐতিহাসিক বারানি সুলতান ফিরোজ শাহর তৈরি আরও দুটি অট্টালিকার কথা বলেছেন। এর মধ্যে প্রধান ছিল বিরাট জুম্মা মসজিদ। যার উঁচু চূড়া প্রায় আকাশে পৌঁছেছিল। নামাজ পড়ার জন্য এত ভিড় হত এখানে যে বারান্দা ও আশেপাশের গলি ও রাস্তাগুলি ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। এ ছাড়া সুলতান ফিরোজ তৈরি করেছিলেন হাউস-ই খাস-এর পাশে বড় একটি মাদ্রাসা। বারানি বলছেন যে অনেক লোক এই বাড়ির কাছাকাছি থাকার জন্য তাদের পুরনো বাড়ি ছেড়ে এখানে নতুন বাড়ি তৈরি করে থাকতে লাগলেন। এ ছাড়া সুলতান সিরিতে আর একটি বাড়ি তৈরি করেন যাকে বলা হত 'বালাবন্দ'। সুলতান একে বিরোধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করেন এবং নিজ খরচায় এই প্রতিষ্ঠান চালান। খরচের জন্য কয়েকটি গ্রামের কর ঠিক করে দেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের ফিরোজাবাদ শহর তুঘলকাবাদের মতোই সুরক্ষিত রাজধানীর পরিকল্পনায় তৈরি—কেবল ফিরোজ ওই পরিকল্পনাকে অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন, এমনকী উন্নত করেছেনও বলা যেতে পারে। এখন অবশ্য ফিরোজাবাদের মতো শহরের ওই প্রাসাদ দুর্গ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু এই বিরাট এলাকার মধ্যেই ছিল সবরকমের সুবিধে রাজপরিবারের বসবাস করার জন্য। ফিরোজ শাহ কোটলা নদীর পাড়ে সমতল জমির উপর থাকার ফলে পরিকল্পনা মাফিক করতে অসুবিধে হয়নি। দেড়শো বছর পরে এটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবার ফলে

এর আর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ভিতরের পরিকল্পনার ছকটা পাওয়া যায়। আধ মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া ছিল। এর বড় রাস্তা ছিল উত্তর-দক্ষিণে এবং এটিও ছিল দেওয়াল ঘেরা। মাঝে মাঝে ছিল বিশাল বুরুজ। এর প্রধান প্রবেশ পথ ছিল পশ্চিম দিকে, যেখানে ছিল বিরাট বড় একটি সুরক্ষিত দরজা। ভিতরে ঢুকলে পাওয়া যেত রক্ষীদের ঘর ও ময়দান। এই প্রধান দরজার বিপরীত দিকে ছিল বড় একটি ঘেরা জায়গা নদীর ধারে, যার মধ্যে ছিল প্রাসাদ ও ব্যক্তিগত বাড়ি। এগুলির অধিকাংশ ছিল দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো প্রধানত নদীর উপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করার জন্য।

কোটলার ভিতরের জায়গা চারকোনা বা আটকোনা উঠোনে ভাগ করা। সব থেকে বড় উঠোনে ছিল দেওয়ান-ই আম যার ফাঁকা জায়গার চারপাশে ছিল থাম দেওয়া বারান্দা যেখানে সরকারি ও রাজনৈতিক কাজ সম্পন্ন করা হত। বাকি অংশটায় নানা ধরনের সৌধ ছিল যার মধ্যে ছত্রি দেওয়া বাগান, হাম্মাম, পুকুর, সৈন্যদের ও দাসদাসীদের থাকার জায়গা ছিল। শহরের মাঝখানে ও নদীর দিকে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে ছিল জামা মসজিদ। অন্য একটি অংশে ছিল রাজার প্রার্থনা করার জন্য ছোট মসজিদ। সুতরাং বলা যেতে পারে যে দুর্গের প্রধান গড়ন যা পরে ভারতে আরও উন্নত হয়েছিল তা প্রথমে পাওয়া যায় দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলাতে। মনে হয় সমকালীন পৃথিবীতে দুর্গের গড়নের যা চেহারা ছিল ফিরোজ সেটিই করার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের গড়নের মধ্যে রোমক ও বাইজানটাইন প্রাসাদের কিছু অংশের মিল আছে। এর মধ্যে একটি সৌধ ছিল যেটি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে পিরামিডের মতো যার উপর অশোকস্তম্ভ বসানো আছে। সমকালীন ঐতিহাসিক সামশি সিরাজ আফিফ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কী ভাবে ওই স্তম্ভ এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বৌদ্ধ স্তম্ভ তাঁর শহরের মাঝখানে বসিয়ে ফিরোজ যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটি নতুন নয়। এর আগে কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুব মসজিদের আঙিনার মাঝখানে কুমারগুপ্তের লৌহস্তম্ভ বসিয়ে ওই একই ধরনের সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এগুলোই বোধহয় ভিন্ন সংস্কৃতির পরম্পরাকে নিজ সংস্কৃতির পরম্পরা করে নেবার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিল্লির সমকালীন সমাধিসৌধের মধ্যে তিনটির উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি ফিরোজ শাহর নিজের, দ্বিতীয়টি তাঁর উজিরের এবং তৃতীয়টি ফিরোজের পরবর্তী সুলতান করেছিলেন বিখ্যাত সাধু কবীরউদ্দিন আউলিয়ার। ফিরোজের সমাধিসৌধের সঙ্গে সম্ভবত ছিল মাদ্রাসা যার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ সব মিলিয়ে বলা হত *হাউস-ই খাস*। দ্বিতীয়টি ফিরোজ শাহ-র আমলা খান-ই জাহান তিলঙ্গানির যিনি ১৩৬৮ সালে মারা যান। এঁর সমাধিসৌধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি অষ্টকোণ। এর আগে ছিল চারকোনা সৌধ, প্রতি কোণে মিনার বসানো যা খানিকটা দুর্গের চেহারা নিত। খান-ই জাহানের সমাধিসৌধের সঙ্গে জেরুজালেমে ওমর-এর আটকোনা সমাধিসৌধের মিল আছে। পরবর্তীকালে এই ধরনের সমাধিসৌধ আরও উন্নত হয়ে ওঠে।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে সুলতানদের পুরনো দিল্লি অস্তমিত হয়ে গেল।

পাথরের উপর তৈরি ওই দিল্লি ছেড়ে সুলতান ফিরোজাবাদকে আরও সমতল ও নরম মাটিতে নিয়ে এলেন উত্তর ও উত্তর-পূর্বে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বা সামরিক অবস্থার কথা মনে করলে দিল্লির এই অবস্থান খুবই সুবিধেজনক। এর উত্তর ও উত্তর-পুর্বদিকের অবস্থান থেকে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথগুলির দিকে সতর্ক নজর রাখা সম্ভব ছিল। সুতরাং সুলতানরা পঞ্জাবকে এর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষাভূমি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। পাঁচিল ঘেরা দিল্লি শহর সেদিক থেকে জনসাধারণের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছে। ফলে এর বিভিন্ন নামকরণও করা হতে থাকে—যেমন *হজরত দিল্লি শহর, দার-উল মুল্ক, দার-উল খলিফা* ইত্যাদি।

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান মুইজুদ্দিন মুবারক শাহ *মুবারকপুর* তৈরি করেন যার নামকরণ করা হয় *মুবারকবাদ* বলে। এটিও নদীর ধারে ছিল। এটির অবশিষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। এর প্রায় এক শতাব্দী বাদে হুমায়ুন *দীন-পণাহ* শহর তৈরি করেন নদীর ধারে। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শের শাহ তিনকোণা লম্বা *শের-গড়* করেন। এটি ইন্দারপথ-এর কাছে ফিরোজাবাদ ও কিলোখড়ির মধ্যে। কিন্তু তার আগে শের শাহ আলাউদ্দিন খলজির সিরির দুর্গ ধ্বংস করে দেন।

এ সবের থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩৫০ বছরের মধ্যে শহরের কেন্দ্রস্থল এগারোবার বদলেছে। এক একটি কেন্দ্র গঁড়ে ৩২ বছর ধরে এক জায়গায় ছিল যার ফলে কোনও শহরই মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। কিন্তু শহরের এই কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র দশ মাইল দূরত্বের মধ্যে।

আগেই আমরা দেখেছি যে প্রধানত সুলতানরাই এই কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন করেছেন এবং লোকজনের বাসস্থান পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছেন। এই পরিবর্তনের দুটি কারণ ধরে নেওয়া হয়। প্রথমত ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে শহরের কেন্দ্রের উপর চাপ পড়ছিল এবং দ্বিতীয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ জলের অভাব বেড়ে যাচ্ছিল। যমুনা নদীর ঘন ঘন পথ পরিবর্তনও এই জলের অভাবের জন্য দায়ি। আরাবল্লী পাহাড়ের পক্ষে বর্ষার জল এত লোকের জন্য ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না।

কিন্তু ঘন ঘন কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও দিল্লি বেড়ে চলছিল যদিও আমির-ওমরাহরা কেন্দ্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাসস্থানেরও পরিবর্তন করতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই দিল্লি লম্বায় আট-দশ মাইল পৌঁছে গিয়েছিল। ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরলং দিল্লি লুঠ করলে এর জৌলুষ অনেকখানি কমে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতানি সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গেলে দিল্লির অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়ে। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই দিল্লি পরিত্যক্ত হয়ে যায় ও আগ্রা রাজধানী হয়ে যায়।

দিল্লির জনসংখ্যা কত ছিল এটি বলা শক্ত। ফিরোজাবাদের জনসংখ্যার একটি আভাস হয়তো দিতে পারা যায়। সামশি সিরাজ আফিফ বলছেন যে ফিরোজাবাদ শহরে আটটি বড় মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। এদের কয়েকটার নামও তিনি

দিয়েছেন—জামা মসজিদ, মসজিদ-ই খাস, মসজিদ-ই-মালিক-ই-সির-ই-সহ্যা,মসজিদ-ই নিজাম-উল-মুল্ক, কৌশিক-ই শিকার-এর জামা মসজিদ ও ইন্দারপত-এর মসজিদ। উনি বলছেন যে প্রতিটি মসজিদেই দশহাজার লোক নামাজ পড়তে পারত—অর্থাৎ আশি হাজার লোক দিল্লি শহরে একযোগে নামাজ পড়ত। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ওই সংখ্যক লোকই আসলে পড়ত। এ ক্ষেত্রে বারানি যে জামা মসজিদের আশেপাশের পথ ও গলিতে ভিড় জমত বলে উল্লেখ করেছেন তার কথা মনে করা যেতে পারে। বোধ হয় এর ফলেই সুলতান বিভিন্ন জায়গায় আরও মসজিদ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ছাড়া বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লা মসজিদ থাকত। এ সব থেকে ঐতিহাসিক হামিদা খাতুন নাকভি মনে করছেন যে ওই সময় নামাজির সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ আটাশ হাজার। এর সঙ্গে হিন্দুদের পরিবার ধরলে ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ লাখের কিছু বেশি।

নাকভির এই সংখ্যা মেনে নেওয়া শক্ত, মোগলযুগে যখন সমগ্র জনসংখ্যা আরও বেশি ছিল তখনও এত বেশি জনসংখ্যার নির্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না। এ ছাড়া নাকভির সংখ্যা মেনে নিলে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়াবে প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। এই বর্গমাইলের হিসেব থেকে যদি আমরা অন্তত তিনটি দুর্গ, বাগান, বাগিচা, পথঘাট, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি ছাড় দেই, তা হলে ঘনত্ব প্রায় চার হাজারে পৌঁছে যাবে। সুতরাং এই সংখ্যার অর্ধেক ধরে নিলেও ঘনত্ব বেশ বেশি থাকে। ১৩৯৯ সালের একটি বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে পুরনো দিল্লি ও সিরিতে ঘনবসতি ছিল।

শহরটির সুরক্ষা ভাল ছিল বলতে হবে কারণ কয়েকটি দুর্গ ছিল। পুরনো দিল্লি ও ফিরোজাবাদে যাতায়াত করার জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ যাতায়াত ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন। কত খরচ পড়বে সেটিও ঠিক করে দেন। সারা শহরটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল যদিও ইবন বতুতার সময় পর্যন্ত সবটা ঘেরা যায়নি। পরবর্তীকালে তা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পাঁচিলের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় স্তম্ভ ও বুরুজ বসানো ছিল। বাইরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছিল রক্ষীদের ঘর। শহরের ভিতরে কয়েকটি শস্যাগার ছিল যাতে বহুদিনের জন্য শহর অবরোধ ঠেকানো যেতে পারে। শহরের অনেকগুলি দরজা ছিল যার মধ্যে বদাওন দরওয়াজাই সবথেকে বড়। বাগদাদ দরওয়াজাকে পরে *লাল দরওয়াজা* বলা হত কারণ এর সামনে ছিল বধ্যভূমি। কত সংখ্যায় দরজা ছিল এটি বলা শক্ত কারণ বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন সময় ও সূত্র থেকে পাওয়া যায়। বারানি বলছেন কায়কোবাদের সময়ে বারোটি দরজা ছিল। ইবন বতুতা আটাশটি দরজার কথা বলেছেন। ১৩৯৯ সালে তিরিশটি দরজার কথা দেখা যায়। যার মধ্যে কুড়িটির হিসেব পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিনটি ছিল জাহানপনা থেকে সিরি যাবার জন্য। চারটি দরজা ছিল শহর থেকে বাইরে বেরোনোর জন্য। তেরোটি দরজা ছিল জাহানপনা পাঁচিলের মধ্যে। এই ধরনের বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে যে শহরের কেন্দ্রস্থলটি বারবার পরিবর্তন হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে অন্যান্য মধ্যযুগীয় শহরের মতো এই দরজাগুলি

সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খোলা হত এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দিল্লি বারবার আক্রমণকারীদের হাতে পড়েছে। উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে। তৈমুরের মতো আক্রমণকারীরা এসেছে উত্তর-পশ্চিম থেকে। দক্ষিণ দিক মেওয়াতি ও জাঠরা ক্রমাগত আক্রমণ করেছে। এ ছাড়াও আশেপাশের উপজাতিদের আক্রমণ তো ছিলই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জনবসতি ছিল আরাবল্লী পাহাড়ের গা ঘেঁষে। সেখানে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা তখন ছিল না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাঁধ তৈরি করে সুলতানরা জলাধার তৈরি করে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন। প্রায় বারোটি এরকম জলাধারের নাম ও চিহ্ন পাওয়া যায়। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দের সংস্কৃত শিলালেখ-এ এক ঠাকুর রায় পিথোরার দুর্গ থেকে দশ মাইল দূরে পালাম গ্রামের পুব দিকে একটি কুয়ো করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। এর আগে আর একজন হিন্দু কুতুব মিনার এর কাছে বড় একটি কুয়ো করেছিলেন। লোদি বাগানের বিপরীত দিকে সিঁড়ি দেওয়া কুয়োর চিহ্ন এখনও আছে। তুঘলকাবাদে পুরনো কুয়োর চিহ্নও পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে যমুনা নদী থেকে খালের সাহায্যে জল আনা হত। তুঘলকদের একটি খাল আরাবল্লী পাহাড় ঘুরে শহরের দক্ষিণে এসে পৌঁছয়। উলুঘ শাহর একটি খাল সুলতান ফিরোজ শাহ সংস্কার করেছিলেন। সুলতান যমুনা থেকে লম্বা একটি খাল কাটান শহরে জল আনার জন্য। আর একটি খালের কথা পাওয়া যায় চম্বল নদী থেকে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত। সুলতান ফিরোজ শাহ এই সব খাল কাটার ফলে দিল্লির আশেপাশের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথা বারানি বলেছেন, বিভিন্ন ধরনের শস্যও ফলানো হত তার কথাও বলেছেন। ফলে ক্রমবর্ধমান জনবসতিপূর্ণ দিল্লির খাদ্যের সুরাহা হয়েছিল এটি বলা যায়।

দিল্লি থেকে বিভিন্ন পথ দূর দূরান্তের শহরের দিকে চলে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ফেলা যায় বদায়ুন, কনৌজ, অযোধ্যা, কারা, আজমির, মুলতান, দৌলতাবাদ ইত্যাদি। মুলতান-কান্দাহার পথ দিয়ে মধ্য পশ্চিম এশিয়া যাওয়া যেত। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী স্থানান্তরিত করার জন্য দিল্লি-দৌলতাবাদ পথ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে জাঠ ও মেওয়াতিরা এ সব পথ বন্ধ করে রাখত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সুলতানরা এই পথগুলি খোলা রাখার ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

দিল্লিতে বিভিন্ন দেশের ও জাতের বণিকদের উপস্থিতির কথা পাওয়া যায়। বিদেশিদের মধ্যে প্রধান ছিল আরব, তুর্কি, খোরাসান, চিন ও মধ্য এশিয়ার বণিকরা। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু মুলতানি বণিকদের প্রাধান্য দেখা যায়। মুলতানি মুসলমান বণিকরাও ছিল। এদের মধ্যে কাজি হামিউদ্দিন মুলতানিকে *মালিক-উল তুজ্জার* উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শহরের উন্নতি বা এর জীবনযাত্রার জন্য মোগল যুগে বণিকদের যে উৎসাহ দেখি, সুলতানি যুগে তা পাওয়া যায় না।

সুলতানি যুগে দিল্লিতে বহু ধরনের বাজার ও দোকানের কথা পাওয়া যায়। আমির

খসরু বলেছেন যে দিল্লিতে পাখির দুধও পাওয়া যায়। বণিকদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সরাইখানা ছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলির নাম পাওয়া যায়— যেমন সরাই সামশি, সরাই সিকান্দার, মিয়া কি বাজার কি সরাই। লাডো কি সরাই (কুতুবমিনার ও তুঘলকাবাদের মধ্যে), নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার বিপরীত দিকে আরব-কি সরাই ইত্যাদি। সুলতান ফিরোজ শাহ প্রায় ১২০টি সরাই করেছিলেন। এদের রক্ষণাবেক্ষণ করত সরকারি কর্মচারীরা। সাধারণত থাকা ও খাওয়ার জন্য ভ্রমণকারীদের কোনও খরচ করতে হত না। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে সরাইখানার মধ্যে সব ঘরের আয়তন একরকম নয়। বিশিষ্ট ও ধনী ব্যক্তিদের জন্য বড় ঘর ছিল। চারপাশে পাঁচিল ঘেরা ও বুরুজ বিশিষ্ট সরাইখানাগুলি ছোট ছোট শহরের মতো। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সবই পাওয়া যেত।

দিল্লি শহরে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত। ভাড়াটে বাড়ির কোনও ক্ষতি না করলে গোলমাল হত না। বাড়ি কেনা বা বিক্রিও করা যেত। ইবন বতুতা এই বাড়ি কেনা ও বিক্রির বাজার ভাল ছিল বলে বলেছেন। দলবদ্ধ হয়ে বানজারারা শহরের ঢুকত না। এরা শহরে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে থাকত।

খাদ্যশস্য, জামা কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্রর জন্য সুলতানরা তিনটি কেন্দ্রীয় বাজার করে দেন। পশুপাখিদের জন্যও একটি আলাদা বাজার ছিল। খাদ্যশস্য বাইরে থেকে এলে মাণ্ডভি দরওয়াজার সামনে মাণ্ডভি বাজারে রাখা হত। এখান থেকে চালান যেত শহরের মধ্যেকার ছোট ছোট বাজারে। বারানি আলাউদ্দিন খলজির সময়কার প্রধান মাণ্ডভি বাজারের উল্লেখ করেছেন। এর কাছের শস্যাগার করা হয়েছিল শস্য মজুত করার জন্য। বলা বাহুল্য বিশাল খাজনা আসত এই বাজার থেকে।

কাপড়ের বাজারকে বলা হত *বাজাজাত*। এগুলি শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এর প্রধান বাজারটি ছিল জামা মসজিদ-এর কাছে *মাদ্রাসা-ই মুইজ্জি*-র পাশে। আলাউদ্দিন খলজি একে সরিয়ে নিয়ে যান। বদাওন দরওয়াজার ভিতর দিয়ে সবুজ প্রাসাদের দিকে একটি ফাঁকা জায়গা ছিল। ওখানেই উনি *সরাই আদল* বলে একটি বড় বাজার তৈরি করেন। যেটি নিয়ন্ত্রণ করত সরকার। কার্পাসের বাজাজাত ছাড়াও আরও অন্যান্য কাপড়ের বাজারের কথা পাওয়া যায় যেখানে খুচরো দরে কাপড় বিক্রি হত। কিন্তু সেগুলি সবই আসত প্রধানত বাজাজাত থেকে। কাপড়ের বণিকদের বলা হত বাজাজ যাদের উল্লেখ সমকালীন সূত্রে প্রায়ই পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মৌলানা বুরহানউদ্দিন বাজাজ, খাজা লতিফ ইত্যাদিরা ছিলেন ধনী বণিক। এঁরা প্রধানত দিল্লি ও অযোধ্যার মধ্যে কাজকারবার চালাতেন। খাজা লতিফ ছিলেন আমির খসরুর বন্ধু।

পশুপাখি ও দাসদের বাজারকে বলা হত *নাখখাস*। ১৩২০ সালে দিল্লিতে এই ধরনের দুটি বাজারের কথা পাওয়া যায়—একটি ছিল পুরনো ও অন্যটি নতুন। ইসলামিক সমাজে শরিয়াত স্বীকৃত দাসরা ছিল। কিন্তু দাস বলে এদের উপর কোনও দোষ আরোপ করা হত না বা দাসব্যবসায়কে অন্যায় বলে দেখা হত না। দাস মুক্ত হলে অন্যান্য শহরবাসীর মতোই সুযোগসুবিধে পেতেন। এমনকী অভিজাত পরিবারে বিয়ে করতেও কোনও আপত্তি ছিল না। সময়কালে দিল্লির সিংহাসনও

অলঙ্কৃত করেছেন। ১২০৬ থেকে ১২৮৬ সাল পর্যন্ত ইলবারি তুর্কি রাজারা ছিলেন প্রাক্তন দাস।

দিল্লিতে দাসেদের বাজার রমরমা ছিল। অভিজাতরা বহুসংখ্যক দাস রাখতেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা দেখানোর উদ্দেশে। আলাউদ্দিন খলজির পঞ্চাশ হাজার দাস ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের ১২০০ গায়ক দাস ছিল। ফিরোজ শাহর সময়ে দাসেদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় চার লক্ষ আশি হাজার, যার ফলে উনি একটি বিশেষ দপ্তর খুলেছিলেন। দাসীদের বলা হত *কানিজাক*। সঙ্গিনী, গায়িকা বা কাজের লোক হিসেবে তারা থাকত। দাস বিনিময় করা বা দাস দান করা একটি সাধারণ প্রচলিত প্রথা ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলক প্রতি মাসের চতুর্থ দিন রাখতেন পুরুষ দাসদের ও পঞ্চম দিন দাসীদের মুক্তি দেবার দিন হিসেবে।

দাসদের জন্য দুটি নাখখাস বা বাজারের কথা পাওয়া যায়। ক্রমে আরও বাজার বাড়তে থাকে। খাজা বান্দা নওয়াজ এর বাড়ি ছিল পালাম দরওয়াজার কাছে। এখানে একটি দাসের বাজার ছিল যেখানে থেকে এক বণিক তার কাজকর্ম চালাত। বহু দালাল এসে যাওয়ার ফলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। আলাউদ্দিন খলজি এই দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত দালালদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন। দালালদের উপর আদেশ ছিল দাসদের সম্বন্ধে ও দাস বিক্রির সম্পূর্ণ দলিল রাখার জন্য। কোনও মুসলমান দাসকে কোনও অ-মুসলমানের কাছে বিক্রি করা যেত না।

দাস-দাসীর মূল্য সময় সময় বদলেছে। ১৩১৬ সালে যে দাসীর মূল্য ছিল ৫ থেকে ১২ তঙ্কা, ১৩৫০ সালে ওই মূল্য বেড়ে নিয়ে দাঁড়ায় ২০ তঙ্কাতে। ১৩১৬ সালে ঘরের কাজের জন্য দাসের মূল্য ছিল দশ থেকে পনেরো তঙ্কা। ১৩৫০ সালে এটিও বেড়ে গিয়ে ২০ তঙ্কায় দাঁড়ায়। বাংলা থেকে যে সব দাস আসত তাদের মূল্য ছিল কম। দাসব্যবসা করে বহু লোক ধনী হয়ে যায়। এদের মধ্যে ছিলেন খাজা হাসান যিনি গজনি ও খোরাসানে দাস সরবরাহ করতেন।

দাসেদের অনেকেই নতুন ধরনের কারিগরি শিল্পের কাজ করতেন। কিন্তু এরা ছাড়াও শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারিগররা দিল্লিতে আসতে থাকে। বিদেশি কারিগররা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। চিনদেশের কারিগররাও দিল্লিতে আসে। এরা নতুন শিল্প প্রচলন করে যার মধ্যে রয়েছে কার্পেট বোনা ও কাগজ তৈরির শিল্প। এমনকী পুরনো শিল্পও নতুনভাবে তৈরি করতে শুরু করে। এগুলির মধ্যে পড়ে রেশম ও উলের দ্রব্য, চিকনের কাজ, টিন ও চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

এই বিদেশি কারিগরদের আসার আগেই অবশ্য রায় পিথোরার সময় দেশি কারিগররা ওখানে ছিল। কিন্তু ১২০৬ সাল থেকেই শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের কারিগররা আসতে থাকে। আমির খসরু বিভিন্ন কসবা থেকে যে সব কারিগররা এসেছিল তার উল্লেখ করেছেন। এই দেশীয় ও বিদেশি কারিগররা মিলে কাপড়ের কাজ ও লোহার কাজে উৎকর্ষ লাভ করে।

শহরের কাঠামোর মধ্যে ধর্মীয় বা জাতিগত বিভেদ দেখতে পাওয়া যায় না। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত না হবার ফলে এই ধরনের ফারাক তৈরি হতে পারেনি। সাধারণত এক একটি মহল্লায় একই ধরনের কারিগররা বসতি করেছিল। প্রতিটি

মহল্লায় একজন করে মোড়ল বা প্রধান মহল্লাদার থাকত। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বদলে মহল্লাগুলিতে বসতি করার কারণ ছিল কাজের ঝোঁক। এমনকী ক্রমে ক্রমে দেশি ও বিদেশি কারিগরের মধ্যেকার তফাত চলে যেতে থাকে। শহর ও বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রভেদ চলে যায়। সাধারণত সরকার এই ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করত না। সমকালীন দলিলে দিল্লির কুটির শিল্প ও উৎপাদনের বহু উল্লেখ আছে। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের কাপড়, কার্পেট, উলের কাপড়, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, তীর ধনুক, কাগজ, পাথরের কাজ, টুপি, তেল, সাবান, সোনার কাজ, রং, চিনি ইত্যাদি। ফলে বিভিন্ন মহল্লায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে যেখানে ওই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগররা জমায়েত হয়। পরিকল্পনাবিহীন ভাবে শহর গড়ে ওঠায় ও ঘন ঘন শহর কেন্দ্রের পরিবর্তন হবার ফলে বিশ্বাস বা জাতের ভিত্তিতে শহর গড়ে ওঠেনি। শহর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে শহরতলি গড়ে উঠতে থাকে যেগুলিকে সাধারণত *কসবা* বলা হয়। কসবা কী এ নিয়ে বিতর্ক প্রচুর হয়েছে। কিন্তু এটি যে গ্রাম নয় সেটি পরিষ্কার। সমকালীন দলিল থেকে বোধ হয় যে এটি একটি ছোট শহর কিন্তু সুরক্ষিত নয় অর্থাৎ কোনও পাঁচিল নেই। ফলে এগুলির সঙ্গে গ্রামের কোনও বিভেদের সীমানা নেই। অন্যান্য জায়গাতেও কসবার উৎপত্তি দেখা যায় যার কিছু অংশ আমরা বাংলার ইতিহাসের মধ্যে দেখব।

২

রাজস্থান ও গুজরাট

২.১ রাজস্থান

আমরা আগে দেখেছি যে ইক্তা প্রথার ফলে ইক্তাদারদের থাকার জায়গাগুলি শহরে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কিন্তু এ ছাড়াও আভ্যন্তরীন বাণিজ্য-পথের ধারের জায়গাগুলি বড় হয়ে উঠেছিল ও ক্রমশ শহরে পরিণত হয়। বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগসূত্র আছে এরকম ছোট ছোট শহরগুলিও গড়ে উঠতে থাকে। কারাভান বাণিজ্যর ফলে এইরকম বহু ছোট শহরের উদ্ভব হয়। কিন্তু রাজস্থানের শহরগুলির চরিত্র ও কাঠামো আলাদা বলেই বোধ হয়।

সাহিত্য ও শিলালেখ থেকে রাজস্থানের অনেকগুলি শহরের কথা জানতে পারা যায়। মনে হয় ইসলাম আসার আগে এই শহরগুলির কাঠামো ছিল জাতপাতের ভিত্তিতে ধরা। ইসলাম আসার পর তার ছাপ শহরগুলিতে রেখে দিয়েছে।

রাজস্থানের শহরগুলি প্রধানত দুর্গভিত্তিক অর্থাৎ দুর্গের চারপাশ ঘিরে তৈরি হয়েছিল। অনেকগুলির মধ্যেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে শহরের চারপাশে পাঁচিল দিয়ে শহরকে সুরক্ষিত করলেও, দুর্গ তার পাঁচিল সমেত শহর থেকে আলাদা থাকে। রাজা একই জাতি বা উপজাতির হলেও শারীরিক বিচ্ছিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গের মধ্যে রাজার প্রাসাদ ও প্রধানত অভিজাতদের কিছু বাড়ি ছিল। দুর্গের বাইরে বাজার ছিল শহরের প্রধান কেন্দ্রস্থল যেখানে দুটি বড় পথ মিশেছে ও চলে গিয়েছে শহরের দরজায়। কিন্তু শহরের কেন্দ্রস্থল ও প্রান্ততে কোনও নিয়মিত প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায় না। শহরের বড় পথ থেকে ছোট ছোট গলি চলে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। বলা বাহুল্য যে শহরগুলি পরগাছার মতন ছিল—গ্রামাঞ্চল থেকে মাল আসত শহরে। তার বদলে গ্রাম পেত খুব কম।

রাজস্থানের শহরগুলি ৪০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি বাড়ছিল প্রধানত তিনটি স্বাধীন রাজবংশের কল্যাণে—গুর্জ্জর, সনভির বা সিন্ধু ও ডেলাভি রাজ্য যেটি মরুভূমির পশ্চিমে ও দক্ষিণে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে শহরগুলির প্রসারণ থেমে যায় প্রধানত রাজপুত ও তুর্কিদের লড়াই-এর জন্যে। রাজপুত

রাজ্যগুলির মধ্যেকার হানাহানি ও বিভেদও এই অবস্থার জন্য দায়ি। দিল্লির সুলতানরা রাজস্থান জয় করলে বংশগুলির পতন হয় ও ফলে শহরগুলিরও অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ওই সময়ে শহরগুলির কাঠামোর মধ্যে মুসলমান শহরের কাঠামোর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে দিল্লির সুলতানি শাসনক্ষমতা কমে গেলে রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীন বংশের শাসন শুরু হয়। এর ফলে পুরনো শহরগুলি জেগে ওঠে ও নতুন শহরের পত্তন হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি ছিল শাসনতান্ত্রিক শহর—যেমন যোধপুর, পোখরান, নাগোর, জালোর ইত্যাদি। এগুলি সবই প্রায় পাঁচিলে ঘেরা দুর্গসমেত শহর।

বড় সড়ক দিয়ে বাণিজ্য যাতায়াতের ফলে কতকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত বা পশ্চিম ভারতে যাবার পথ ছিল রাজস্থানের মধ্যে দিয়ে। দিল্লি-আহমদাবাদ সড়ক দিয়ে কারাভান যাতায়াত করত। এর ফলে আমরা কতগুলি ছোট ছোট শহরের কথা পাই যেগুলি প্রধানত বাণিজ্যিক কারণেই তৈরি হচ্ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হনুমানগড়, বারমের, পাইপার, মেরতা ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা হ্রাস পেলে ভারতভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এ সব জায়গার শাসকরা এইসব শহর তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকটি জায়গায় ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহরগুলির মধ্যে আমরা একটা নতুন আদর্শবাদ দেখতে পাই। রাজস্থানে ও বাংলায় ভক্তিমার্গের প্রসার এই নতুন শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইগুলির কার্যকারণ নিয়ে এখনও গবেষণা হয়নি, ফলে মতামত দেওয়া কঠিন। এর কিছু অংশ আমরা পরে দেখব।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে রাজপুত শহরগুলি একটি চেহারা নিয়েছিল। গোয়ালিয়র শহরের একটি বাড়ির বর্ণনা বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে অমর করে রেখেছেন। উনি মানসিংহ ও বিক্রমজিৎ-এর বাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন যার মধ্যে মানসিংহের বাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বড় একটা পাহাড়ের পাথর থেকে বাড়িটা কেটে তৈরি করা। পুব দিক ৪০ থেকে ৫০ গজ উঁচু ও প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা। কোনও কোনও অংশ চারতলা—নীচের তলা দুটি খুব অন্ধকার। প্রত্যেক দিকে পাঁচটা ছত্রি আছে—প্রত্যেক দুটোর পরে একটা ছোট চতুষ্কোণ ছত্রি। বড়গুলোর উপরে তামার ঝকঝকে পাত লাগানো। বাইরের দেওয়ালের গায়ে রং করা শৈলি লাগানো—মনে হয় যেন চারপাশে সবুজ কলাগাছের মধ্যে বাড়ি। দরজাকে হাতিপোল বলে—মাহুতসুদ্ধ হাতি খোদাই করা। নীচের একটা জানালা থেকে এই হাতি দেখতে পাওয়া যায়। বসার ঘর দোতলায়—একটা উনুনের ধাঁচে তৈরি। এগুলোর মধ্যে বাতাস প্রায় চলাচল করে না। মানসিংহ-র ছেলে বিক্রমজিৎ-এর বাড়ি তার বাবার বাড়ির মতো নয়। এটা দুর্গের উত্তর দিকে মাঝামাঝি জায়গায়। এই বাড়ি থেকে মানসিংহর বাড়ি পর্যন্ত ঢাকা একটা পথ চলে গিয়েছে—বাইরের লোক এই পথ দেখতে পায় না।

বাড়ির এরকম বৈশিষ্ট্য থাকলেও রাজস্থানি শহরগুলির কাঠামোর চেহারা প্রায়

একধরনের। এদের রাস্তাগুলি ছকে বাঁধা নয়—ফলে এলোমেলোভাবে শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছে; যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে শহর তৈরি করার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

সব রাজস্থানি বড় শহরে আমরা পাঁচিল দেখি যার সামনেটা জলভর্তি নালা দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ভিতরে শত্রু ঠেকানোর জন্য জলবিহীন গভীর কুয়ো আছে যেগুলো বাইরে থেকে দেখা যায় না। দুটি বড় পথ শহরের কেন্দ্রে এসে বিভক্ত হয়ে দরজার দিকে চলে গিয়েছে। বড় রাস্তা থেকে ছোট ছোট বহু গলি এঁকেবেঁকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে। শহরটা বিভিন্ন মহল্লায় ভাগ করা—কোনওটা চতুষ্কোণ, কোনওটা বা অষ্টকোণ। নানাধরনের বাড়ি ও মন্দির শহরে আছে। এ ছাড়া আছে বিভিন্ন মহল্লায় বাজার। সাধারণত উচ্চবর্ণের লোকেরা, যেমন ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর, আলাদা মহল্লায় বাস করে। নিচু শ্রেণীর ও অন্ত্যজ লোকেরা হয় শহরের প্রান্তে, নয়তো শহরের বাইরে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এরা শহরের দক্ষিণ বা পশ্চিমপ্রান্তে বাস করে। এদের মধ্যেও ভাগ আছে। অন্ত্যজ ও আরও নিচু শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অন্ত্যজরা প্রধানত কারিগর। কিন্তু নিচু শ্রেণীর লোকেদের কোনও মর্যাদা নেই। এরা হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি। বাংলার কোনও কোনও সমকালীন লেখকদের লেখায় এদের উল্লেখ আছে, যা আমরা পরে দেখব।

২.২ গুজরাট : খাম্বাজ

নবম ও দশম শতাব্দীর আরব ভৌগোলিকদের লেখায় আল-জুর্জ দেশের কথা পাওয়া যায় যেখানে প্রতিহার বংশের রাজারা রাজত্ব করছিলেন। এরা আরবদের বিপক্ষে ছিলেন বলে বলা হয়েছে। আল-মাসুদি ক্যাম্বে উপসাগরের দুপাশে প্রচুর গ্রাম ও শহর ছিল বলেছেন। একাদশ শতাব্দীতে আল-বেরুনি গুর্জররাষ্ট্রর কথা বলেন।

গুজরাটে বিজেতা হিসেবে প্রথম আসে সুলতান আলাউদ্দিন-এর সৈন্যদল। এর সঙ্গে রাজা কর্ণর মন্ত্রী মাধব-এর যে কাহিনী গুজরাটে প্রচলিত ছিল, তা এখন ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে আলাউদ্দিনের সেনাপতি নসরৎ খান সোলাঙ্কি রাজা কর্ণর রাজধানী পাটান বিনা বাধায় জয় করে লুঠ করেন। সোমনাথ লুঠ করার পর নসরৎ খান সমৃদ্ধশালী বন্দর খাম্বাজ লুঠ করেন। তুর্কিরা শুধু লুঠ করতে এসেছিল, সুতরাং তারা ফিরে যায়। ১৩০৬ সালের পর আলাউদ্দিন মালিক আহমদকে স্থায়ীভাবে গুজরাট জয়ের জন্য পাঠান। রাজা কর্ণ এবারও তাঁর রাজধানী পাটান পরিত্যাগ করে ওয়ারাঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্র দেও-র কাছে আশ্রয় নেন। ১৩০৬ সালের আর এক সেনাপতি আলপ খান গুজরাটের শাসনকর্তা হয়ে পাটান-এ আসেন।

গুজরাট দিল্লির অন্তর্ভুক্ত হলে পর রাজপুতদের কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙে পড়ে। তুর্কিরা রাজপুত ক্ষমতার উপরের অংশটা ভাঙলেও নীচের অংশে হাত দেয়নি। ফলে রাজপুত শক্তি বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রান্তিক সীমানাগুলি প্রায় একই রকমভাবে চলতে থাকে যার মধ্যে চম্পানীর শহর উল্লেখযোগ্য যা আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু সমতলভূমির ছোট ছোট ভূম্যধিকারীরা নতুন বিজেতাদের কর দিতে থাকলে ও কাগজে কলমে অধীনতা স্বীকার করে নিলে, আগেকার মতোই চলতে থাকে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো সংঘর্ষ হলেও, প্রায় এক শতাব্দী ধরে তুর্কিরা এই ব্যবস্থার বদল করেনি। গুজরাটে সুলতানাত তৈরি হলে পর কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়মকানুন আরোপ করা হতে থাকে ও বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন করা হতে থাকে।

গুজরাট বিজয়ের পর থেকেই তুর্কি শাসকরা শহরগুলির মুসলমানদের নিজেদের অনুকূলে টানবার চেষ্টা করতে থাকে। এর একটা কারণ ছিল তুর্কিদের শাসন ছিল প্রধানত শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলপ খান আসার আগেই মুসলমান বণিকরা শহরে ছিল। এদের মধ্যে কিছু ভারতীয় মুসলমান যেমন ইসমাইলি শিয়া ও বিদেশি আরবরাও ছিল। ক্যাম্বে ও পেটলাডের দুটি সমকালীন শিলালেখ থেকে ওইসব মুসলমানদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাবা অর্জুন শাহর সমাধিতে আর একটি শিলালেখ পাওয়া যায় যার তারিখ তুর্কিদের গুজরাটে আসার ষাট বছর আগেকার। ক্যাম্বে শহরের আরও কয়েকটি শিলালেখ থেকে দেখা যায় যে আলপ খান এই সব মুসলমানদের প্রতি কীরকম বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করেছিলেন। পাটান শহরে আলপ খান একটা সুন্দর আদিনা মসজিদ তৈরি করেছিলেন।

খাম্বাজ

মাহি নদীর উত্তরে ক্যাম্বে বা বর্তমান খাম্বাজ শহর নদী থেকে উঁচু জমির উপর ছিল। দক্ষিণ দিকে মাহি নদীর জলাভূমি যা উত্তর দিকেও বিস্তৃত ছিল। বন্দর ও শহরের মধ্যেকার কাদার জমির কথা পরিব্রাজকরা বলে গিয়েছেন।

খাম্বাজ শহরের তিন কি.মি. উত্তরে প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে নাগর বন্দরের কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে যার থেকে একে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়কার বলে ধরা হয়। নাগর থেকে বন্দরটি খাম্বাজে সরে আসে বলে ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতাব্দীতে। এর আগে খাম্বাজে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খাম্বাজে পাওয়া গিয়েছে প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেখানে খাম্বাজের বন্দর ছিল। শহরের উন্নতি শুরু হয় প্রায় হাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে যখন নাগর ব্রাহ্মণরা খাম্বাজে বসতি শুরু করতে থাকে। ওই সময় নাগাদ পারসিকরা সুরাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৭০ মাইল দূরে সন্‌জামে আসতে থাকে। পুরনো খাম্বাজ শহর দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শুরু হলেও বাজারগুলির অবস্থান ছিল প্রধান সড়কের উপর পশ্চিমে ও উত্তরে। এর থেকেই উত্তর-পশ্চিমে শহরের প্রসার শুরু হয়ে যায়।

চালুক্যদের সময়ে অর্থাৎ দশম শতাব্দী থেকেই আরবরা খাম্বাজ শহরের উল্লেখ

করছেন। দশম শতাব্দীর গোড়ায় আল-মাসুদি খাম্বাজ উপসাগরের গভীরতা নীল নদ ও ইউফ্রেটিসের থেকে বেশি বলেছেন। তবে ভাঁটার সময় কেবলমাত্র মাঝখানে জল থাকে। খাম্বাজ উপসাগরের উপকূলে বহু গ্রাম ও শহরের কথা বলে আল-মাসুদি খাম্বাজের এমারল্ড পাথর যে মক্কায় সাদরে গৃহীত হয় তার কথা বলেছেন।

দশম শতাব্দীর শেষ দিক মূলরাজ সোলাঙ্কি গুজরাট জয় করে ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন খাম্বাজ শহরের পত্তন করেন বলে বলা হয়। উনিই নাগর ব্রাহ্মণদের এনে বসতি করান ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে প্রবাদ আছে। একাদশ শতাব্দীতে আল-বেরুনি খাম্বাজকে সোলাঙ্কি রাজ্যের প্রধান বন্দর বলে অভিহিত করেছেন। স্থলপথে এর সঙ্গে মুলতানের যোগ ছিল—অর্থাৎ উত্তর ভারতে ছিল খাম্বাজ বন্দরের পশ্চাদভূমি যেখানকার মাল এই বন্দর দিয়ে যেত। জলপথে কচ্ছর সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। পারস্য, আরবদেশ, সোফালা এবং মালাবার ও করমণ্ডলের বন্দরগুলির সঙ্গে ক্যাম্বের যোগাযোগ ছিল একথা আল-বেরুনি বলেছেন। চিনের জাহাজ এ বন্দরে আসত এটাও তিনি বলেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর রাজা সিদ্ধরাজ সোলাঙ্কির সময়ে ব্রোচ বন্দর ও সোমনাথ-পাটানের বাণিজ্য খাম্বাজ নিয়ে নিয়েছে। গজনির মাহমুদ ও মোঙ্গলদের, ক্রমাগত আক্রমণের ফলে সোমনাথ-অনিলওয়াড় সড়কটি বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় থেকেই কল্যাণ-এর চালুক্যদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ফলে খাম্বাজ এলাকার বাণিজ্য নিজের বন্দরে আসতে সক্ষম হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আল-ইদ্রিসি খাম্বাজে এসে দেখেন যে সিদ্ধরাজ সোলাঙ্কি গুজরাটের বহির্বাণিজ্য দখল করেছেন এবং বহু জাহাজ ক্যাম্বে উপসাগরে আসছে। খাম্বাজ শহরে তিনি প্রচুর সংখ্যায় আরবীয় ও পারসিক মুসলমানদের দেখেছেন যারা ওখানে মসজিদ তৈরি করেছে। ওই সময়ে খাম্বাজের দুর্গও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ১৩০০ সাল নাগাদ প্রায় দশ হাজার ঘোড়া পারস্য থেকে মালাবার ও খাম্বাজের বন্দরে আসছিল। কিন্তু ততদিনে তুর্কি সৈন্যরা খাম্বাজকে তার পশ্চাদভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এর ফলে মালব, রাজস্থান ও পঞ্জাবের সঙ্গে ক্যাম্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভ্রমণকারী মার্কোপোলো খলজি আক্রমণের আগে ১২৯০ সালে খাম্বাজকে শিল্পকেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। এখানে চামড়ার চটি, শোবার মাদুর, সোনা ও রূপার জরি ইত্যাদি তৈরি হত যেগুলি বাইরে রপ্তানি হত। বিদেশ থেকে আসত সোনা, রূপা, তামা, অন্যান্য ধাতুর দ্রব্য ও ঘোড়া। খাম্বাজের বণিকরা ছিল প্রধানত মুসলমান ও পারসি। খালাসির কাজ করত কোলি ও রাজপুতরা।

খলজিদের লুণ্ঠনের পরেও, ইবন বতুতা ১৩৪৬ সালের আগে খাম্বাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মসজিদ ও নানাধরনের বাড়ি দেখে তার প্রশংসা করেছেন। অধিকাংশ বণিকই বিদেশি যারা এই সব সুন্দর বাড়ি আর বিশাল মসজিদ তৈরি করেছে। বন্দরে কয়েকটি জাহাজকে মাটি কাদার মধ্যে দেখেছেন ভাঁটার সময়। জোয়ার এলে এগুলো আবার জলে ভাসতে থাকে। বড় বড় জাহাজগুলি অবশ্য খাম্বাজের বিপরীত দিকে মাল খালাস করে দেয়। ওগুলো তখন ছোট নৌকো করে খাম্বাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৩২৫ সাল নাগাদ খাম্বাজ তুঘলক সাম্রাজ্যের মধ্যে এলেও ১৩৪৬ সালে গুজরাটে বিদ্রোহ হয়। ফলে তুঘলক ১৩৪৭ ও ১৩৪৯ সালে খাম্বাজ লুঠ করেন। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরে গুজরাটে বিদ্রোহ হয় এবং মুজফর শাহ-এর নাতি আহমদ শাহ ১৪১১ সালে স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের পত্তন করেন। ইনি বন্দরের সামনের অংশ পরিষ্কার করে জাহাজ চলাচলের সুবিধে করে দেন। মনে হয় মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে উনি কিছু ভিতরে নতুন রাজধানী আহমদাবাদ তৈরি করেন। পরবর্তী একশো বছরে, আহমদ শাহ ও মুহম্মদ বেগারার সময়ে আহমদাবাদ ও খাম্বাজ শহরের বিশেষ উন্নতি হয়। ১৪৮৭ সালে হিয়েরোনিমো ডি সান স্টেফানো খাম্বাজে বহু 'মুর' বণিক আলেকজান্দ্রিয়া ও দামাস্কাস থেকে আসছে তার কথা বলেছেন।

আহমদ শাহ প্রথম-এর সময়ে আরও কয়েকটি শহরের নাম পাওয়া যায়। মনে হয় দধিমতি নদীর উপর দোহাদ শহরের প্রতিষ্ঠা উনিই করেছিলেন। দোহাদের পাথরের শিলালেখ থেকে আমরা আরও কতকগুলো শহরের নাম পাই। যার মধ্যে রয়েছে চম্পানীর, আহমদাবাদ, বাগলানা ইত্যাদি। অন্যান্য শিলালিপি থেকে ধর ও শাদিয়াবাদ শহরের নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া মসজিদ আছে পাটান, খাম্বাজ, ধোলকা, আহমদাবাদ, চম্পানীর ও বরোদাতেও।

মুহম্মদ বেগারা (১৪৫৯-১৫১১) চম্পানীর শহরের প্রসার করেছিলেন। ছোট অবস্থায় শহরটি আগেই ছিল—এটি আমরা পরে দেখব। এ ছাড়া, আহমদাবাদ থেকে প্রায় ২৫ মাইল দুরে ভাতারক নদীর উপর মুহম্মদাবাদ বলে এক শহর প্রতিষ্ঠা করেন। শহরটি অবশ্য পঞ্চাশ বছর পরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

লুডভিকো দি ভারথেমা ১৫০৩ সালে খাম্বাজ পৌঁছান। তিনি দেখেন যে শহরটা সমুদ্র থেকে প্রায় তিন মাইল ভিতরে এবং জোয়ারের সময় ছাড়া মাঝারি জাহাজও বন্দরে যেতে পারে না। কিন্তু তিনি পলিমাটি জমার কোনও কথা বলেননি। খাম্বাজ শহরে তখন প্রচুর পরিমাণে কাপড় তৈরি হচ্ছিল। কর্নেলিয়ান পাথরও প্রচুর তৈরি হয় তার কথাও বলেছেন। রেশম ও তাঁতের কাপড়ের কাজ এখানে পশ্চিম এশিয়ার ও ভারতের অন্যান্য জায়গার থেকে বেশি। শহরের পাঁচিলও তখন তৈরি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ততদিনে খাম্বাজের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। খাম্বাজের দুটি হাত-এর কথা পতুর্গিজ লেখক টোমে পিরেজ বলেছেন। এক হাত পূর্ব দিকে বাণিজ্য করছে ও অন্যটি পশ্চিম দিকে। ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগিজরা এলে পশ্চিম দিকের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। পর্তুগিজরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না আনতে পারার ফলে গুজরাটি বণিকদের বাণিজ্যের অবস্থা ততটা খারাপ হয়নি। কিন্তু খাম্বাজ যে পড়ে আসছে, তার আভাস আমরা পর্তুগিজ ভ্রমণকারী দুয়ার্ত বারবোসার লেখায় পাই।

বারবোসা খাম্বাজকে ভাল শহর বলেছেন। যেখানে মুর ও 'হিদেন'রা (হিন্দু) থাকে। অনেক ভাল বাড়ি আছে টালির ছাদ দেওয়া যেগুলো দেখে বারবোসার পর্তুগিজ বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। রাস্তাগুলো পরিষ্কারভাবে তৈরি এবং খালি

জায়গা আছে। বড় বড় বাড়ি আছে পাথর আর চুন সুরকির কাজ করা। বহু হিন্দু ও মুসলমান বণিক আছে যাদের অনেকে বেশ ধনী। বহু ধরনের কারিগর আছে যারা ফ্লান্ডার্স-এর কারিগরের মতো যন্ত্রের কুশলী কাজ করে। সব জিনিসই এখানে সস্তা। বহু বিদেশিরা এখানে বাস করে। এ শহরেই তাঁতের কাপড় বোনা হয়। এ ছাড়া রেশমের কাপড়, খারাপ ধরনের ভেলভেটের কাপড়, সাটিন এবং টাফেটার কাজও হয়। উল্লেখযোগ্য যে বারবোসা বলছেন যে, শহরে বলদে বা ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখা যায়। এগুলি করে প্রধানত জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়াও যাতায়াতের জন্য নানারকম কাজ করা ও রেশমের কাপড়ে মোড়া কাঠের পালকিও দেখা যায়। মেয়েরাও এগুলো চড়ে যাতায়াত করে। হাতির দাঁতের কাজ করা তরোয়ালের বাঁট, দাবা খেলার গুটি, চুড়ি ও খাটের পায়া পাওয়া যায়। তা ছাড়া আছে অনেক ধরনের পাথরের কাজ করার কারিগর ও স্বর্ণকার। নানা ধরনের কাঁথা ও মাদুরও পাওয়া যায়। এটা এমন একটা শহর যেখানে সবধরনের কাজের জন্য কারিগর পাওয়া যায়।

প্রাক্-মোগল যুগের শহর হিসেবে খাম্বাজ একটা সম্পূর্ণ বন্দর-শহর বলা যেতে পারে। একদিকে যেমন বন্দরের বাণিজ্য চলছে, অন্যদিকে তেমনি শহর ও শহরতলিতে নানা ধরনের কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে। যেগুলি বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে ইবন বতুতার মতো বারবোসা বন্দরে জাহাজ আসার অসুবিধের কথা বলেননি। ফলে বন্দরের পশ্চাদভূমির ও অগ্রভূমির একটা নিবিড় যোগাযোগ দেখা যায় ফলে এটিকে সম্পূর্ণ বন্দর-শহর বলা যায়।

পর্তুগিজদের আসার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে খাম্বাজ শহরের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। গোয়া ও দিউ শহর প্রতিষ্ঠিত হলে খাম্বাজ থেকে এই দুটি শহরের চালানিই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৫৬৩ সালে সিজার ফ্রেডারিক খাম্বাজে দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, যখন ছেলেমেয়ে বিক্রি করে দিতে বাবা-মারা বাধ্য হচ্ছে। খুব অল্প টাকায় পর্তুগিজরা এদের কিনে নেয়। কিন্তু তখনও মালবাহী নৌকোয় করে নানারকমের মশলা খাম্বাজে আসছিল। বলা যায় খাম্বাজের বাণিজ্য কমে গেলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। খাম্বাজের দোকানে চিনা রেশম, ভেলভেট, হাতির দাঁতের কাজ, বিভিন্ন ধরনের কাপড়, নীল, চিনি, আফিম, ওষুধ, মূল্যবান রত্ন, ফল ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছিল।

মনে হয় এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মোগল আক্রমণের আগে ফরাসি পরিব্রাজক ভিনসেন্ট ল্য ব্লঁ খাম্বাজকে বড় ও বর্ধিষ্ণু শহর বলেছেন, যেখানে বহু জাহাজ যাতায়াত করে। ইটালির শহরের সঙ্গে তুলনা করে, ফরাসি পরিব্রাজক বলেছেন যে এটাই পূর্ব দিকের সবথেকে ধনী শহর যেখানে জীবনধারণের সবকিছু পাওয়া যায়। যে কোনও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা উনি লক্ষ করেছেন। ততদিনে পর্তুগিজ সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, যেটা দেখা যায় খাম্বাজের বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের মধ্যে দিয়ে। দিও ও হরমুজ-এর প্রভাব স্পষ্ট। আরব ও পারস্যদেশে সরাসরি মাল যাচ্ছে যদিও পূর্ব দিকের বাণিজ্যর কোনও উল্লেখ ল্য ব্লঁ করেননি। মক্কা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকেও নানান জিনিস খাম্বাজে আসে। খাম্বাজকে উনি ফরাসিদের রুঁয়ে-র মতো বড় এবং কায়রোর মতো চেহারা বলেছেন। তখনও গোয়ার চালান যাচ্ছে খাম্বাজ থেকে। সুতরাং খাম্বাজ-এর যে দ্বৈত চেহারা—একদিকে

সরাসরি বৈদেশিক বাণিজ্য ও অন্যদিকে গোয়ার চালানকারী—রয়ে গিয়েছিল। পর্তুগিজরাও চাইছিল যে গোয়ার প্রভাবের মধ্যেই খাম্বাজ থাকুক এবং অন্যদিকে স্বাধীন হিসেবে থাকুক।

১৫৭৩ সালে মোগল সম্রাট আকবর গুজরাট বিজয় করেন যদিও কিছুকাল পরেই নানা বিদ্রোহ দেখা দেয়। খাম্বাজেও ওই সময়ে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৫৮৩-৮৪ সালে গুজরাটের শেষ সুলতান মুজাফর শাহ (দ্বিতীয়) মোগলদের হাত থেকে গুজরাট পুর্নরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি।

খাম্বাজের তিন কিলোমিটার উত্তরে নাগরে অধ্যাপক আর. এন. মেহতা ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে প্রথম জনপদের সন্ধান পেয়েছিলেন। একাদশ খ্রিস্টাব্দের সময়কার জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি খাম্বাজ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পাওয়া যায়, যেখানে জৈন মন্দিরের কিছু ভগ্নাংশও পাওয়া গিয়েছে। খলজিদের সময়কার জামা মসজিদ শহরের শাসনতান্ত্রিক এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। ওই জায়গায়ই শহরের দরবার অঞ্চল বা কেন্দ্রস্থল বলে ধরা যেতে পারে। বাজার এলাকাতেও আর একটি মসজিদ দেখা যায়। খাম্বাজের দুর্গের খুব অল্প অংশই আছে। উত্তর দিকের অংশ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্গের অন্তত চারটি দরজার কথা পাওয়া যাচ্ছে। মেহতা মনে করছেন যে দুর্গের দুটি করে দরজা একদিকে ছিল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হিসেবে।

বহুযুগের প্রস্তর সাক্ষ্য হিসেবে মেহতা খাম্বাজের শহরের ইতিহাস এইভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে মাহি নদীর উঁচু পাড়ে খাম্বাজ শহর হয়। প্রথম দিকে জনবসতি ছিল ব্রাহ্মণভাদা ও কোলামভাদার দিকে যেখানে তীর্থঙ্করদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ততদিনে এটা একটা ছোট শহরে রূপান্তরিত হয়েছে যার প্রধান সড়ক উত্তর-দক্ষিণ দিক দিয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে শহরটি উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হতে থাকে। ইসলাম আসার পর শহরের কেন্দ্রস্থলে জামা মসজিদ তৈরি হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শহরটি মাণ্ডাই ও পিঠ অবধি প্রসার লাভ করে। এগুলির চারপাশ ঘিরে একটি পাঁচিল এ সব জায়গাকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে আসে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে থেকে শহরতলি তৈরি হতে থাকে যার মধ্যে পিরোজপুর ও জাহাঙ্গিরপুরা উল্লেখযোগ্য। কাপড় তৈরির কারিগররা ও কাছের পাহাড় রতনপুরা থেকে কেটে আনা পাথরের পালিশ করার কারিগররাও এইসব শহরতলিতে থাকতে শুরু করে।

শহরের সাধারণত দশটি দরজা ছিল যার প্রত্যেকটিরই একটি করে নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে মকাই দরজা ও ফুরজা উল্লেখযোগ্য। মকাই দরজা প্রধানত মক্কার দিকে মুখ করা ও শহরের বাইরে বেরোনোর-দরজা। ফুরজা ছিল সমুদ্রের দিকে এবং ভিতরে আসার দরজা। এ ছাড়া গাভারা দরজা পাওয়া যায়, যেটিকে ঘাস-বিচালি রাখার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। মনে হয় গাভারা শব্দের সঙ্গে মাল যুক্ত থাকার ফলে এই দরজাটিতেই কারাভানিরা মাল নিয়ে নামাত বাইরে থেকে এসে। এই ধরনের নামগুলি আলোচনা করে অধ্যাপক মেহতা বলছেন যে খাম্বাজ শহরের অধিবাসীরা দুর্গের মধ্যেই থাকত, কিন্তু শহরতলি তখন তৈরি হতে শুরু হয়েছে। হিন্দু ও জৈনরা প্রধানত ছিলেন শহরের পূর্ব দিকে এবং মুসলমান ও পারসিকরা শহরের পশ্চিম দিকে

থাকতেন।

১৫৯৫ সালের মধ্যে আকবর গুজরাট প্রদেশের পুনর্বিন্যাস করেন। ষোলোটি সরকার থেকে পঁচিশটি সরকার তৈরি করা হয়। খাম্বাজ এখন আহমদাবাদ সরকারের চুরাশি পরগনার একটা হয়ে যায়। এর মধ্যে খাম্বাজের বিপরীত দিকে গোগা বন্দরও ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে আবুল ফজল খাম্বাজ শহরকে বড় শহর বলে অভিহিত করেছেন যেখানে বিভিন্ন ধরনের বণিক থাকে। এখানে ভাল বাড়িও রয়েছে। ১৬০২-সালে আকবর যখন খাম্বাজ বন্দরের খাজনা যুবরাজ সেলিমকে দেন, তখন সেটা বেড়ে বাৎসরিক আশি হাজার টাকা হয়েছিল। ১৫৯৪ সালে জেসুইট পাদরিরা এখানে এসে দেখেন যে একশোটি পতুর্গিজ পরিবার এখানে বাস করছে। ১৫৯৭-৯৮ সালে আকবর ওদের একটি ফরমান দিয়ে গির্জা বানানোর অনুমতি দেন। কিন্তু ১৬০৫ সালে পাদরি সুয়ারেজ যখন খাম্বাজে আসেন, তখনও গির্জা তৈরি হয়নি। ততদিনে পতুর্গিজ পরিবারের সংখ্যা কমে আশিতে দাঁড়িয়েছে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই খাম্বাজের অবস্থার অবনতি হতে থাকে এ আমরা দেখেছি। ১৬১১ সালে উইলিয়াম ফিঞ্চ-এর বর্ণনায় এর প্রমাণ মেলে। উনি বলেছেন যে শক্ত দরজাগুলির সোজাসুজি লম্বা, চওড়া বাঁধানো রাস্তা। দুপাশের বাড়িগুলি ভাল এবং বড়। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে গোড়ার দিকে শহর তৈরি করার একটা পরিকল্পনা ছিল। ততদিনে খাম্বাজ বন্দরে জাহাজ আসা কমে প্রায় দুশোতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে সত্ত্বেও ফিঞ্চ বলেছেন যে গুজরাটের প্রধান বাজার হল খাম্বাজ। পরবর্তী ভ্রমণকারী টমাস বেস্ট ততদিনে পতুর্গিজদের নিয়ন্ত্রণ দেখছেন ওই বন্দরের বাণিজ্যের উপরে এবং নিকোলাস ওরদিংটন ১৬১৩ সালে দেখেছেন যে খাম্বাজ শহরের সঙ্গে বাইরের গ্রামাঞ্চলের পথ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে, প্রায়ই মাল লুঠ হয়ে যায়।

মুকারাব খান ছিলেন খাম্বাজের মুৎসুদ্দি (শাসনকর্তা) ও সুরাটের শাহবন্দর। তিনি ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিকে খাম্বাজে আসতে উৎসাহ দেন। জন জুরদাঁ ওই সময়ে এসেছিলেন। তিনি বলছেন যে গুজরাটের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল খাম্বাজে আসে ও বছরে দুই কি তিনবার গোয়াতে পাঠানো হয়। ওই বাণিজ্য পতুর্গিজরাই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইংরেজরা ১৬১৬ সালে ও ওলন্দাজরা ১৬১৭ সালে খাম্বাজে কুঠি বানায়। জাহাঙ্গির ১৬১৭ সালে খাম্বাজে এসে টাঁকশাল তৈরি করান যেখান থেকে প্রথম রূপার মুদ্রা ১৬১৮ সালে বের হয়।

জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে খাম্বাজ বন্দরের দারোগা কল্যাণ রাই, ইটের শক্ত দেওয়াল করান। এর ফলে খাম্বাজ ও তার শহরতলিতে সুরক্ষার ভাব আসে বলে জাহাঙ্গির মনে করেছেন। জাহাঙ্গির তাঁর আগমন উপলক্ষে খাম্বাজের শুল্ক কমিয়ে দেন ও গুজরাট প্রদেশ শাহজাহানের জায়গির করে দেন।

১৬২৩ সালের ভ্রমণকারী পিয়েত্রো দেলা ভালা বলেছেন যে এই দেওয়ালের মধ্যে খাম্বাজের শহরতলি যুক্ত হবার ফলে শহরটি এলোমেলোভাবে বড় হয়ে উঠেছিল। বাড়িগুলি ছিল সুরাটের ধরনের প্রধানত ইট ও টালি দিয়ে করা। ছাদ থেকে নালি দিয়ে নীচে বর্ষার জল ফেলার ব্যবস্থা ছিল। জলের জন্য নানাধরনের

পুষ্করিণী শহরের মধ্যে করা হয়েছিল। তবে মসজিদের ও মন্দিরের সামনে ভিখারিদের অসম্ভব ভিড়। প্রধানত পারসিক ও পতুর্গিজ ভাষা এখানে চলত তবে সংস্কৃত ভাষাকে উৎসাহ দেওয়া হত। বাইরের পথগুলি বিপজ্জনক; ওখানে সশস্ত্র ভিখারিরা লুটতরাজ করে। শহরের লোকসংখ্যা প্রচুর।

১৬৩১ সালেও এই অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। জোয়ানেস দ্য লে দেখেছেন যে পতুর্গিজরাই প্রধানত খাম্বাজের বন্দর ব্যবহার করছে। ব্রোচ বা আহমদাবাদ যাবার পথগুলি সুরক্ষিত নয়। উনি অবশ্য বলছেন যে সুরাটের থেকে খাম্বাজ তিনগুণ বড় এবং তিনটি দেওয়াল দিয়ে শহরটি ঘেরা। এর থেকে মনে হয় একবারে দেওয়াল তৈরি হয়নি। শহরতলি গড়ে ওঠার পর সেটিকে আবার দেওয়ালের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এর একটা কারণ হয়তো এই যে খাম্বাজের প্রধান শিল্পগুলি ছিল শহরতলিতে যেখানে কারিগররা বাস করত। দ্য লে বন্দরে জাহাজ পরিপূর্ণ থাকতে দেখেছেন যা থেকে মনে হয় যে বন্দরের কাজকর্ম আগের মতোই চলছিল। উনি বলেছেন যে রাস্তাগুলি সোজা এবং বাঁধানো। সুতরাং ষষ্ঠদশ শতকের মাঝামাঝি যে সংকট এসেছিল তার থেকে শহরটি বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হয় প্রধানত পতুর্গিজ বাণিজ্যের সাহায্যে ও পরে ইংরেজ-ওলন্দাজ কুঠি হবার ফলে।

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষেও খাম্বাজ সুরাটের থেকে বড় ছিল এটা মনে করছেন ভ্রমণকারী ম্যান্ডেলস্লো। উনি মির্জা বেগ নামে এক বড় বণিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন যে তিনি জলের ধারে তাঁর জাহাজ বানানোয় ব্যস্ত। নদীর অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি ইবন বতুতার সময় থেকে। আরব ও পারস্য উপসাগরের সঙ্গে বাণিজ্য হচ্ছে প্রধানত তাঁতের ও রেশমের কাপড়ের। শহরে লোক বাড়ার সঙ্গে বাড়ি তৈরি করার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল যেটা সুরাট শহরেও দেখা যায়। খাম্বাজের অভিজাতদের বাড়ির ছাদগুলি সমতল এবং নালির সাহায্যে জল বের করার ব্যবস্থা আছে। তবে অধিকাংশ বাড়িরই দেওয়াল মাটির—মাঝে মাঝে পাথর বসানো ও প্লাস্টার করা। এর ফলে দেওয়ালগুলি চকচক করে। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই তবে অভিজাতরা সোনা-রূপার বাসন ব্যবহার করে। স্থানীয় কারিগর ও ছোট ব্যবসায়ীদের অবস্থা খুব খারাপ—দিনে ৬ পেন্সের বেশি রোজগার নেই। দিনে একবার খায় নুন-ঘি মাখানো খিচুড়ি। এদের বাড়িগুলি মাটির, উপরে সবুজ পাতা ছাওয়া। বণিকদের অবস্থা একটু ভাল।

চতুর্থ দশক থেকেই খাম্বাজের পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফরাসি পরিব্রাজক বুলইয়ে ল্য গুজ খাম্বাজকে আহমদাবাদের পরে স্থান দিলেও এর পতনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এর জন্য উনি দায়ি করছেন নদীর পলিমাটি পড়ে বন্দর বন্ধ হয়ে যাবার জন্য। এঁর সমসাময়িক স্বর্ণকার তাভারনিয়ার বলেছেন যে সমুদ্র সরে যাবার ফলে বড় জাহাজ কাছে আসতে পারছে না এবং প্রায় দশ মাইল দূরে নোঙর করতে বাধ্য হচ্ছে। উনি বলেছেন যে শহরটি বড় এবং বাড়িগুলি পর্তুগিজদের অনুকরণে তৈরি। এই সব বাড়ির অনেকগুলিই ভেঙে পড়ছে। এমনকী শহরের ভিতরের আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। উনি বলছেন যে খাম্বাজের পতনের ফলে সুরাটের উত্থান হয়েছে।

১৬৬৫ সালের ওলন্দাজ ভ্রমণকারী গোতিয়ার স্কুটেন-এর লেখা থেকে পরিষ্কার যে সুরাট খাম্বাজের থেকে অনেক বেশি উন্নতি করেছে। উনিও বলছেন যে ভাঁটার সময় নদীতে জল থাকে না। উনি বলছেন যে শহরে বারোটা দরজা ও তিনটে বাজার আছে। এ ছাড়া আছে কয়েকটা সুন্দর বাড়ি ও বাগান। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল খুবই উর্বর। স্কুটেন বলছেন খাম্বাজের বাণিজ্য বানিয়াদের হাতে। আগেকার মতোই বাণিজ্য চলছে।

পরের বছর আসেন ফরাসি পরিব্রাজক থেভনো। উপসাগরের দক্ষিণে শহর। এটা প্রায় সুরাটের মতন বড় কিন্তু অত লোক এখানে নেই। এর চারপাশ ইটের দেওয়ালে ঘেরা এবং কিছুদূর অন্তর মিনার আছে। রাস্তাগুলি বড় এবং প্রতিটিরই শেষে দরজা আছে যেগুলি রাত্রিবেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাড়িগুলি খুব উঁচু এবং পোড়ামাটির ইটে তৈরি। দোকানগুলিতে নানারকম সুগন্ধি, রেশম ও অন্যান্য জিনিসে পরিপূর্ণ। হাতির দাঁতের প্রচুর জিনিস এখানে পাওয়া যায়, যেগুলি এখানেই তৈরি হয়। নিমোদ্রা নামে একটি গ্রামের পাশে যে টিলা আছে, তার থেকে অ্যাগট পাথর তৈরি হয়। ব্রোচে যাবার পথে প্রায় আট মাইল দূরে এই জায়গা। শাসনকর্তা দুর্গের মধ্যে থাকেন। দুর্গটি সুন্দর নয়। শহরের বাইরে প্রচুর সংখ্যায় সুন্দর বাগান আছে। একটির মধ্যে মার্বল পাথরের সমাধিসৌধ আছে যেটার এখন আর রক্ষণাবেক্ষণ নেই বলে ভাঙছে। এর তিনটি উঠোন আছে। একটি বহুস্তম্ভযুক্ত। এটিও ভেঙে পড়ছে। ওখানেও যুবরাজের সমাধি রয়েছে। শহরের মধ্যে অসুস্থ জীবজন্তুর জন্য একটি হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এটিও ভেঙে যাচ্ছে। শহরতলি প্রায় শহরের মতোই বড় এবং ওখানে নীল হয়। সমুদ্র শহর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে যদিও আগে জল শহরে চলে আসত। এর ফলে বাণিজ্য কিছুটা কমে গিয়েছে কারণ বড় জাহাজ এখন সাত/আট মাইল দূরে থাকে। জোয়ার এত জোরে আসে যে জাহাজগুলি ভিতরে আসতে ভয় পায়। এ ছাড়া পশ্চিম দিকে একটা খাড়ি আছে। পর্তুগিজ ছোট জাহাজগুলি এখান থেকে রাত্রে সুরাট বা গোয়ায় যায় প্রধানত মালাবার জলদস্যুদের ভয়ে। অনেক সময়ে পাথরে লেগে এই নৌকাগুলির দুর্ঘটনা ঘটে। গরুর গাড়ি ভাঁটার সময় সুরাটে যায় যদিও স্থলপথে লুটতরাজের ভয় রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে নদী পলিমাটি পড়ে বুজে যাচ্ছে এটা প্রধানত বলা হচ্ছে ১৬৪০ সাল থেকে ১৬৭০ সালের মধ্যে যখন সুরাটের উত্থান হচ্ছে। এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সমুদ্র পশ্চিম উপকূল থেকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছিল। সুরাটেও ওই একই কার্যকারণ ছিল, কিন্তু সুরাটের তখন উন্নতি হচ্ছিল। প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক মেহতা বলেছেন যে খাম্বাজের পতনের সঙ্গে নদীতে পলিমাটির জমার কোনও যোগ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজরা যে দুটো সমীক্ষা করে তাতে দেখা যায় যে নদীর বিশেষ কোনও পরিবর্তন গত হাজার বছরে হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই দেখা যায় যে নদীর জল জোয়ার-ভাঁটার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং খাম্বাজের পতনের অন্য কারণ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দেখা যায় যে খাম্বাজের সমস্যা আহমদাবাদের সঙ্গে জড়িত। গুজরাট থেকে মোগল শাসন ধীরে ধীরে অপসারণ হয়ে যায় ও

মারাঠিরা চেষ্টা করে এর দখল নিতে। কিন্তু মারাঠিদের মধ্যে কলহ থাকার ফলে বিভিন্ন সময়ে খাম্বাজ ও তার শহরতলিকে আক্রমণ করা হয়েছে। এই নৈরাজ্যের সময় নানান উপজাতি, কোলি, গ্রাসিয়া, কাটিয়া ইত্যাদিরা, রাজপুতদের সঙ্গে নিয়ে খাম্বাজের পশ্চাদভূমি অরক্ষিত করে দেয়। অষ্টাদশ শতকের খাম্বাজের ইতিহাস মারাঠি, উপজাতি ও পরে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীন হবার ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন খাম্বাজে আসেন। তিনি দেখেন যে লোকেরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শহরটি তখনও বড় ও শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আহমদাবাদ ও সুরাটে পশ্চাদভূমির মাল যাচ্ছে। অর্থাৎ তখনও ওই দুই শহরের মাল পাঠানোর জায়গা হিসেবে খাম্বাজ কাজ করছে। খাম্বাজের দুর্মূল্য রত্নের কাজ চমৎকার চলছে। এমনকী গুজরাটের অন্যান্য জায়গাতে শস্য পাঠাচ্ছে। কিন্তু নৈরাজ্য শুরু হয়েছে। রাজপুত ও কোলিরা শহরের দরজার কাছ পর্যন্ত লুঠ করছে—কোনও কোনও সময়ে ভিতরে এসে দিনের বেলায় শহরের একাংশ লুঠ করে যাচ্ছে। শাসনকর্তার ঠেকানোর কোনও ক্ষমতা নেই। সমকালীন ইংরেজ বণিকদের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে কীভাবে নৈরাজ্যের ফলে দীর্ঘকাল ধরে আহমদাবাদের রাস্তায় আর মাল পাঠানো যাচ্ছে না। খাম্বাজের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হবার মুখে। মারাঠি সর্দাররা প্রায় প্রতিবছর খাম্বাজ ঘিরে রেখে টাকা নিয়ে চলে যায়। শাসনকর্তা এই টাকা বণিকদের কাছ থেকে জোর করে তুলে নেন যার ফলে বণিকরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

১৭৪৩ সালে নবাব মোমিন খান মারাঠিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুজরাট শাসন করতে শুরু করলে খাম্বাজে শান্তি নেমে আসে। তখন থেকে শুরু হয় আবার বাণিজ্য যার ফলে পঞ্চাশের দশকের প্রথমে খাম্বাজের আয় বেড়ে যায়, অন্তত, ষোড়শ শতাব্দীর শেষের অবস্থার থেকে। ১৭৫৪ সালে খাম্বাজের আয় হয়েছে প্রায় চার লাখ টাকার কাছে।

১৭৫১ সালে জোসেফ টিফেনথেলার খাম্বাজে এসেছিলেন। উনি বলছেন যে এটা একটি বড় শহর যার চারপাশ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালগুলির মাঝে গোল মিনার আছে। বাড়িগুলি ইট ও চুনের। দেওয়ালের কাছের বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে। রাস্তাগুলি চওড়া নয়, ময়লা জমে থাকার ফলে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বাজার ও চক দেখার মতো নয়। পুব দিকে দুর্গ যার চারকোণে চারটি গোল মিনার আছে। এর ভিতরে শাসনকর্তা থাকেন। ইংরেজদের কুঠি কাছে। এরা খাম্বাজ থেকে তাঁত রপ্তানি করে। পেটলাড দরজার বাইরে একটি শহরতলি যার বাড়িগুলি ধসে পড়েছে। প্রায় কোনও লোক ওখানে নেই। মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। প্রায় দুশো পারসি আছে। দেওয়ালের বাইরে জেলেদের গ্রাম। খাম্বাজের চারপাশের গ্রামে প্রচুর রেশম আর তাঁতের কাপড় তৈরি করা হয়। প্রথম দিকে জাহাজগুলি দেওয়ালের কাছ পর্যন্ত আসতে পারত; এখন দূরে দাঁড়ায়। ওই সময়ে বন্দরে সত্তরটি ছোট জাহাজ নোঙর করা ছিল। বড় জাহাজ কাছে আসতে পারে না। তখন শহর শাসন করছে তিনজন মিলে—দামাজি গায়কোয়াড়, পেশোয়ার প্রতিনিধি ও নবাব। এরা মোগল সম্রাটকে আর কোনও খাজনা পাঠায় না। টিফেনথেলার খাম্বাজের অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ

করেছেন।

এরপরে চলে মারাঠি-ইংরেজ লড়াই খাম্বাজ দখলের জন্য। খাম্বাজ শহরের মধ্যে দুটি দল হয়ে যায় একটি মারাঠা দল ও অন্যটি ইংরেজ দল। নবাব মোমিন খান দুটি দলের হাত থেকেই স্বাধীন হবার চেষ্টা করেন। মারাঠা দলের মধ্যে সংহতি না থাকায়, তাদের সর্দাররা ক্রমাগত টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে যার ফলে নবাবকে ক্রমাগত করের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয় বা নতুন নতুন কর বসাতে হয়। গোলমালের ফলে বণিকরা শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকে। প্রধানত আরব ও পারস্যদেশীয় বণিক মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলে চলে যায় যেখানে এই ধরনের চাপ নেই। অন্যদিকে ইংরেজরা খাম্বাজের বাণিজ্য নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করে। শহরের উৎপাদন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইংরেজরা নবাবের শাসনযন্ত্রের আমলা ও কেরানিদের নিজেদের দলে রাখতে চায়। কিন্তু এটাতেও তারা সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি।

১৭৯৪ সালে ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষর প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে খাম্বাজে ইংরেজ বাণিজ্য পড়ে গিয়েছে। প্রায় কোনও কারিগর আর খাম্বাজে নেই, এরা নবাবের অত্যাচারে চলে গিয়েছে। মারাঠা অধিকৃত অঞ্চল, জাম্বুসর ও ভাওনগর অনেক উন্নতি করেছে। এমনকী ব্রোচ শহরের বাণিজ্য বাড়ছে। দিল্লির অধীনে যখন খাম্বাজ ছিল, তখন এর আয় ছিল বার্ষিক দশ লাখ টাকা। এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র চার লাখ টাকা। শহরের শহরতলি আর নেই—দেওয়ালের মধ্যে মাত্র চার মাইল জায়গা নিয়ে আছে। ১২টি দরজার মধ্যে মাত্র দশটি খোলা হয়। ১৭৯৫ সালের আর একটি প্রতিবেদনে ওই কথারই পুনরুক্তি করা হয়েছে। নবাবের অত্যাচার ছাড়াও ১৭৯০ ও ১৭৯১ সালের দুর্ভিক্ষর ফলে খাম্বাজের জনসংখ্যা অত্যন্ত কমে গিয়েছে।

১৮০২ সালের বাসিন চুক্তিতে পেশোয়া খাম্বাজকে তার পরগণা সমেত ইংরেজ কোম্পানিকে দেন। কোম্পানি ১৮০৭ সালে নবাবকে এটি ইজারা দেন। ১৮১৮ সালে ইংরেজরা খাম্বাজ থেকে তাদের কুঠি ও দাবি তুলে নেয়। নবাব স্বাধীন হলেও, রাজনৈতিকভাবে কোম্পানির অধীনে থাকেন। চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানির নিশান কুঠির বাড়ির উপর উড়তে থাকে। ততদিনে খাম্বাজ একটা ছোট শহরে পর্যবসিত হয়েছে।

২.৩ চম্পানীর

বরোদার প্রায় বিশ কি.মি. উত্তর-পূর্বে চম্পানীর বলে একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, যার পুনরুদ্ধার করেছেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহতা। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চম্পানীর ছিল রাজপুত রাজা রাওয়াল জয়সিংহের দখলে। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা একে রাই বাছি বলেছেন। দু বছর অবরোধ করার পর, মাহমুদ শাহ ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে একে দখল করেন। *মিরাত-ই সিকান্দারি* থেকে জানা

যায় যে মাহমুদ শাহ এখানকার জলবায়ু পছন্দ করেন ও এখানেই গুজরাটের রাজধানী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। *তরাকৎ-ই আকবরি*-র লেখক নিজামুদ্দিন বলছেন যে মাহমুদ শাহ মহাফিজখান নামে একজনকে এই শহর তৈরি করার দায়িত্ব দেন। কিন্তু মিরাত-ই সিকান্দারি থেকে আর একজন খোরাসানির কথা জানা যায় যিনি শহরের বাগানগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে কয়েকজন মিলে এই শহরটির পরিকল্পনা করেছিল। উৎখননের ফলে এই শহরের চেহারাটা এখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মাহমুদ শাহর বিজয়ের আগের চম্পানীর কীরকম ছিল, তার চেহারা পাওয়া যায় একটি সংস্কৃত নাটকে। ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ দ্বিতীয়কে গুজরাটের রাজা গঙ্গাদাস পরাজিত করলে বিজয় উৎসব উপলক্ষে গঙ্গাধর একটি নাটক লেখেন যার নাম দেন *গঙ্গাদাস প্রতাপবিলাস* । ১৯৭৩ সালে এটি ছাপা হয়। এর মধ্যে সপ্তম সর্গে চম্পানীরের একটি মানচিত্র দেওয়া আছে। নাটকটির মধ্যেও ভৌগোলিক এলাকার উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একটি মানচিত্র পাওয়া যায় যখন চম্পানীর পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। যে কয়েকটি ভারতীয় মানচিত্র পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে চম্পানীরের মানচিত্রই উল্লেখযোগ্য যদিও এগুলিকে রেখাচিত্র বলাটাই সঠিক হবে।

পরিকল্পনাকারীরা কারাদ ও জোরভানের মধ্যেকার সমতল ভূমি বেছে নিয়েছিলেন যাতে শহরের দুই সীমান্ত পরিষ্কার বোঝা যায় প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে। মধ্যযুগের ভারতীয় শহরে ওই ধরনের জায়গা বাছা নতুন নয়—উত্তর ও পশ্চিমের বড় বড় শহরগুলিতে একই জিনিস দেখা যায়। কতকগুলি দুর্গের সমষ্টি, একটি আর একটির উপর দিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে শহর তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শহরের কেন্দ্রে ছিল জামা মসজিদ, যে অবস্থান ইসলামিক ধ্যানধারণার অন্তর্গত। প্রাক্-মুসলমান ভারতীয় শহরগুলিতে এই জায়গায় মন্দির থাকত। কেন্দ্রস্থলের পশ্চিমে ছিল রাজকীয় আবাস বা *হিসার-ই খাস।*

রাজকীয় এলাকাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি দপ্তরখানা ছিল পূর্ব দিকে। পশ্চিম দিকে প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। সব জায়গাটাই ছিল দুর্গের মতন—শক্ত ও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে ছিল খোলা জায়গা, বাগান, থাকার বাড়ি এবং রাজার মসজিদ। প্রাসাদে ঢোকার পথ ছিল রাজকীয় আবাসের মধ্যে দিয়ে। পাঁচটি জায়গা, যেগুলিকে *মাণ্ডভি* বলা হত, পেরিয়ে রাজপ্রাসাদে যেতে হত। প্রাসাদের জন্য আলাদা পাঁচিল ছিল—এখন অবশ্য সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পাঁচিলের মধ্যে খোলা জায়গা, প্রাসাদ ও বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাসাদের পিছনে ছিল বাগান ও বিনোদনের জায়গা, যেটিকে আমরা রাজকীয় এলাকার তৃতীয় অংশ বলে অভিহিত করতে পারি।

হিসার-ই খাস থেকে দুর্গের পাঁচিল প্রায় দেড় কি.মি. বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। এই পাঁচিলের মধ্যেকার জায়গাকে *হিসার-ই জাহানপনা* বলে ধরা যেতে পারে। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের পাহাড়ে গিয়ে এই পাঁচিল শেষ হয়েছে। হিসার-ই জাহানপনা গোলাকার আকৃতির বড় জায়গা। কিন্তু এর দক্ষিণ-পূর্ব দিক প্রসারিত। পাথরের খণ্ড

ও ইটের তৈরি প্রধানত চুন-সুরকি দিয়ে। সমস্ত শহরটাকেই এই পাঁচিল বেষ্টন করে রয়েছে।

এই শহরের বৈশিষ্ট্য ছিল এর যাতায়াতের ব্যবস্থা। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ও পুল বা সাঁকো করে দেওয়া হয়েছিল। বড় পথগুলি শহরের প্রান্ত থেকে কেন্দ্রস্থলে চলে গিয়েছে। এরকম নয়টি বড় পথ দেখা যায়। যার ফলে শহরটির চেহারা সূর্যকিরণের ছটার মতো হয়েছিল। ইসলামি ধরনের তৈরি বলে স্বভাবতই জামা মসজিদ ও হিসার-ই খাস ছিল প্রধান কেন্দ্র। পথগুলি ছিল সোজা এবং ভালভাবে তৈরি। বিভিন্ন জায়গায় ও কোণে একে অপরকে বিভক্ত করে সোজা চলে গিয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে শহরটি পরিকল্পনামাফিক তৈরি করা হয়েছিল। এমনকী ছোট ছোট রাস্তাগুলিও সমান্তরালভাবে ও সোজা চলে গিয়ে একে অপরকে বিভক্ত করেছে যার ফলে শহরে বহু মোড় দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের রাস্তা দুরকমের ছিল। এক ধরনের ছিল যেগুলি প্রধান প্রধান পথগুলিকে বিভক্ত করে সংযোগ তৈরি করছে। আর এক ধরনের পথ ছিল যেগুলি শহরের মধ্যে অন্ধগলিতে শেষ হয়ে গিয়েছে। দুর্গের বাইরে একটি নালা ছিল এবং দুর্গের মধ্যে পাঁচিলের পরেই খোলা জায়গা দেখতে পাওয়া যায় যেটি বোধহয় সৈন্য চলাচলের সুবিধের জন্য করা হয়েছিল। দরজা থেকে সোজা পথ জামা মসজিদের পাশ দিয়ে হিসার-ই খাস-এ চলে গিয়েছে। যেখান থেকে দরজা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। পথগুলি দরজাতে শেষ হয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে ওখানে বুরুজ বসানো ছিল। হিসার-ই খাস-এর দরজাগুলি ছিল আরও সুরক্ষিত। পরবর্তীকালে ইটের পাঁচিল দিয়ে আরও সুরক্ষিত করা হয়।

এরকম পাহাড়ে ঘেরা সুরক্ষিত জায়গার প্রধান সমস্যা ছিল জলের। একটি নালার উপর বাঁধ তৈরি করে পুষ্করিণী করা হয়েছিল। এর থেকে পূর্ব দিকে একটি বড় পুষ্করিণী পাওয়া যায় যার নাম ছিল *তালাও-ই-ইমাদ-উলমুল্ক*। এর অপর্যাপ্ত জল শহরে জলের চাহিদা মেটানোর পর প্রাসাদের পিছনের বিনোদনের জায়গাতে জল সরবরাহ করত। এ ছাড়াও শহরে আরও কয়েকটা পুষ্করিণীর কথা পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে এক পুষ্করিণী তৈরি করা হয়েছিল যার নাম ছিল *কসবিন তালাও*। সিঁড়ি দিয়ে নেমে জল অবধি যাওয়া যেত। দুর্গের পাঁচিল এর একটি অংশকে সুরক্ষিত করেছিল। পাহাড়ের উপরে পুষ্করিণী ছাড়াও, আরও ছোট কয়েকটা পুকুর ছিল শহরের মধ্যে।

শহরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুয়ো পাওয়া যায়। সাধারণ কুয়ো ছাড়াও সিঁড়ি দেওয়া কুয়োও ছিল। বৃষ্টির জলও কয়েকটি জায়গাতে ধরা হত। মনে হয় এগুলি সবই পরিকল্পনা মাফিকই করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে কূপ ও পুষ্করিণী করা অসম্ভব নয়। নদীর ধারে ছিল বহু ঘাট ও কয়েকটি সাঁকো।

শহরের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল নানাধরনের ধার্মিক সংস্থা, বাগান, বাজার, পেশাগত কাজ করবার জায়গা, লোকেদের বাসস্থান ইত্যাদি। এর মধ্যে বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছিল। কতকগুলি বাজার ছিল শহরের মধ্যে এবং কতকগুলি দরজার বাইরে। বাজারে কতগুলি দোকান ছিল দুঘরের। আবার অনেকগুলি এক

ঘরের। প্রধানত বড় রাস্তার দুপাশে দোকানগুলি সারিবদ্ধভাবে ছিল। আর একটি পথের ধারের দোকানগুলি থেকে মনে হয় বাজার দরজার বাইরেও চলে গিয়েছিল। একপাশের শেষে একটি ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় সেটিই ছিল শুল্ক নেবার জায়গা। মনে করা হয় যে হিসার-ই খাস-এর বাইরে কতকগুলি দোকান ছিল। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের অভাবে পরিষ্কার করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এ ছাড়া ছোট ছোট গলিতে কিছু দোকান ছিল। ধর্মীয় সংস্থাগুলির বাইরের খোলা মাঠে পণ্য বিনিময় বা বেচাকেনা হয়তো হত।

বড় পথের ধারে দরজার কাছে মসজিদগুলি ছিল। কেন্দ্রস্থলের জামা মসজিদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এইসব মসজিদের সঙ্গে লাগোয়া ছিল মাদ্রাসা ও তীর্থযাত্রীদের থাকার জায়গা। শহরের জীবনযাত্রায় এদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ফলে জনসাধারণের যাতায়াতের পথের উপরেই এগুলি করা হয়েছিল।

চিত্তবিনোদনের দুই ধরনের জায়গা ছিল বলে অনুমান করা হয়। একটি ছিল সর্বসাধারণের জন্য ও অন্যটি ব্যক্তিগত। তালাও-ই-ইমাদ-উলমুল্ক-এর ধারে মসজিদ ও দোতলা বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। ওই বাড়িই চিত্তবিনোদনের বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হত। ওই বাড়ির কাছে ঘেরা একটি স্নানের জায়গা ও তার সঙ্গে লাগোয়া কয়েকটি ইমারতের ভগ্নাবশেষ আছে। এর থেকে ধরে নেওয়া হয় যে ওগুলি ছিল প্রধানত আমোদ-প্রমোদের জন্য। আর একটি এরকম জায়গা পাওয়া গেছে জোরভান-এ পথের ধারে। এখানে ঘাট ও ছত্রি পাওয়া গেছে যার থেকে মনে করা হয় যে এ জায়গাটা বাগান হিসেবে ব্যবহার করা হত। সাধারণত বড় বাগানের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র, যার মধ্যে বাড়ি, হাউস ইত্যাদি ছিল। শহরের মধ্যে কয়েকটি ছাড়া শহরের বাইরেও এরকম কয়েকটি জায়গা পাওয়া গিয়েছে।

প্রধান পথ থেকে দূরে কারিগরদের কাজ করার ও থাকার জায়গার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাথরের কাজের কারিগর ও শস্য পিষবার কারিগরদের জায়গা নির্ধারণ করা যায়। লোহার কাজ করার কারিগরদের জায়গাও পাওয়া গিয়েছে। পূর্ব দিকে শহরের বাইরে ছিল সৈন্যদের জায়গা। শহরের আওতা থেকে এরা স্বাধীন ছিল বলতে পারা যায়।

লোকেদের বাসস্থানের চাররকম বিভাজন অধ্যাপক মেহতা করেছেন। প্রথম ছিল বড় জায়গা যার মধ্যে অনেকগুলি বাড়ি ছিল। এরপর আসে ছোট ছোট থাকার জায়গা। তৃতীয় ছিল বর্তমান শহরের পাড়ার (গুজরাটে পোল বলা হয়) মতো ব্যবস্থা। চতুর্থত ছিল কোনও খোলা জায়গার চারপাশে বাড়ি। বাড়িগুলি অধিকাংশই ছিল পাথরের টুকরো, ইট, চুন ও সুরকি দিয়ে জোড়া দেওয়া। কখনও কখনও পুরনো বাড়ির অংশ নতুন বাড়িতে লাগানো হত। প্রথম ধরনের বাড়িগুলি ছিল বড় যার মধ্যে আমরা বাগান, আস্তাবল, চাকরদের জন্য আলাদা থাকার জায়গা, জলের আলাদা ব্যবস্থা ইত্যাদি পাই। এগুলি সবই বিলাসবহুল বাড়ি যার মধ্যে ঘর ও দালান চিত্রিত করা। এগুলির সঙ্গে একাধিক বাগান থাকত। এই ধরনের বিলাসবহুল ব্যবস্থা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না।

শহরে বিভিন্ন ধরনের বাড়ির চেহারা দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি

বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সব থেকে সাধারণ ছিল এক ঘরের বাড়ি। অন্যান্যগুলির মধ্যে খোলা বারান্দা পাওয়া যায়। দুটি ঘর একসঙ্গে লম্বালম্বি ভাবে ছিল। আর এক ধরনের বাড়ি ছিল খোলা জায়গার চারপাশ ঘিরে কতকগুলি ঘর। একটি নতুন ধরনের ছক পাওয়া যায় যার মধ্যে দেখা যায় যে খোলা বারান্দার পিছনে একটি বড় কেন্দ্রীয় ঘর। এই ঘরের দুপাশে দুটি ছোট ঘর। এর ফলে বাড়ির সামনের চেহারাটা অনেক বড় হয়ে যায়।

চম্পানীরে বাড়ি থেকে ময়লা জল দুভাবে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। একটি হচ্ছে ওই জলকে বাগানের মধ্যে ব্যবহার করে নিঃশেষ করে দেওয়া। কিন্তু বেশিরভাগ জলই নর্দমার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে নালা বা রাস্তায় অথবা ঝরনার জলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হত। বর্ষার জল নিয়ে যাবার জন্যে আলাদা নালি ছিল। বিভিন্ন জায়গায় শৌচাগারের হদিস পাওয়া যায় । এর থেকে মনে হয় যে প্রতি সকালে এগুলি পরিষ্কার করা হত। কোথায় এ সব ফেলা হত সেটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়নি। মনে হয় শহরের বাইরে কোনও জায়গায় এগুলি ফেলা হত।

শহরের মধ্যে কয়েকটি জায়গায় কবরখানা দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে এগুলি ছিল নিচু শ্রেণীর লোকেদের জন্যে। এ ছাড়া ধর্মীয় জায়গার মাঠে বা বড় কোনও জায়গার মধ্যে কবরখানা ছিল। এ সব জায়গায় সমাধির পাথর বা সমাধিস্তম্ভ ইত্যাদিও দেখা যায়। সমাধিসৌধের বাগানে বা মসজিদের বাগানে অভিজাতদের কবরখানা ছিল। কবরখানার মধ্যে শ্রেণী বিভাজন শহর ও শহরতলিতে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে চম্পানীরের শহরতলি শুরু হতে থাকে। পশ্চিম, দক্ষিণ ও পুব দিকেই প্রধানত এই শহরতলি দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে প্রধানত বিশাল সমাধিসৌধ ও মসজিদ পাওয়া যায়। চম্পানীরের বড়লোকদের এটিই ছিল শহরতলি। দক্ষিণ দিকে জনবসতির ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি কারণ সাধারণ লোকেরা এই দিকেই বসতি শুরু করতে থাকে। পুব দিকে বাজার ও কয়েকটি পথ দেখা যায়। উত্তর দিকেই কেবলমাত্র এই প্রসার বেশি হয়নি।

পরিকল্পনামাফিক শহর তৈরি হলেও, শহরের জনবসতি বেশি হয়নি। বহু জায়গায় জনবসতি ছিল সামান্য। এ সব জায়গায় সেরকম কোনও সৌধ বা বাড়ির কাঠামো পাওয়া যায়নি। হুমায়ুনের আক্রমণের পর থেকেই চম্পানীরের পতন শুরু হয়। বাহাদুর কিছুটা পরিমাণে চম্পানীর পুনর্দখল করে পুরনো চেহারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি রাজধানী চম্পানীর থেকে সরিয়ে নিলে এখানকার অভিজাতরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যায়। এর ফলে পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে চম্পানীর একটি ছোট শহরে পর্যবসিত হয়ে যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগিজ ভ্রমণকারী দুয়ার্ত বারবোসা গুজরাটের প্রথম শহর হিসেবে খাম্বাজকে বলেছেন। এর পরেই তিনি চম্পানীরের বর্ণনা দেন সুন্দর শহর হিসেবে। উনি বলেছেন যে রাজা চম্পানীরে বাস করেন। শহরটি ভিতরের দিকে এবং একটি বড় সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। এখানে প্রচুর খাবার হয়। প্রচুর পরিমাণে গম, চাল, নানারকমের ডাল ইত্যাদি হয়। এখানকার লোকেরা

গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি রাখে। নানাধরনের ফল পাওয়া যায়। শহরের চারপাশে পাহাড় যেখানে হরিণ ও অন্যান্য শিকার পাওয়া যায়। নানাধরনের কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি রাখে পাখি শিকার করার জন্য। পাহাড়ে যাবার জন্য পোষা চিতাবাঘও রাখে। বিভিন্নরকম পশু সম্বন্ধে রাজার কৌতূহল আছে এবং তিনি এইসব সংগ্রহ করেন। পর্তুগালের রাজার জন্য একটি গণ্ডারও তিনি পাঠিয়েছিলেন।

চম্পানীর থেকে আরও ভিতরে গিয়ে বারবোসা আহমদাবাদ শহরে পৌঁছোন, যাকে তিনি চম্পানীরের থেকে বড় শহর বলে বলেছেন। এটি অনেক বেশি ধনী শহর এবং রাজা এখানেই থাকেন বলে বারবোসা বলছেন। গুজরাটের তৃতীয় রাজা আহমদ শাহ তাঁর নামে এই শহর তৈরি করেন। ১৪১১ সাল থেকে উনি এখানকার মসজিদ ও অন্যান্য বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেন। মাহমুদ শাহ চম্পানীর দখল করে তাঁর রাজধানী করলে, আহমদাবাদের গৌরব অনেকখানি চলে যায়। ১৫৩৫ সালে হুমায়ুন এ শহরটি লুঠ করেন। মোগল যুগে এ শহরের গৌরব আবার বাড়তে থাকে যখন এটি গুজরাটের রাজধানী হয়।

উল্লেখযোগ্য যে বারবোসা ক্রমাগত চম্পানীরের সঙ্গে আহমদাবাদের তুলনা করেছেন। উনি বলছেন যে দুটো শহরই শক্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং এর বাড়িগুলি পর্তুগালের শহরের মতো পাথর দিয়ে তৈরি। শহরের ভিতরে বড় বড় পুকুর আছে এবং কুয়োও আছে খাবার জলের জন্য। সাধারণত উটের সাহায্যে এরা মাল নিয়ে যাতায়াত করে। অনেক মিষ্টি জলের ঝরনা আছে যেখান থেকে মাছ ধরা হয়। নানাধরনের ফলের বাগান ও বাগিচা আছে। এই সব শহরগুলিতে ও অন্যান্য শহরেও রাজা শুল্কবিভাগের লোক ও খাজনা সংগ্রহকারক রেখে দিয়েছেন। এরা ভুল করলে বা গোলমাল করলে শাস্তি পায়।

প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য ও সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনা বিচার করে অধ্যাপক মেহতা চম্পানীর দুর্গের বর্ণনা দিয়েছেন। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে দুর্গের পাঁচিলকে বলা হত *হিসার-ই আম*। এই পাঁচিল সারিয়া ডাকারিয়া পাহাড় থেকে পবগড় পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এর নয়টি দরজা ছিল। একদিকে এই পাঁচিল দুর্গের আতাক পাঁচিলের সঙ্গে মিশেছে এবং অন্যদিকে এটি পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। পাঁচিলটি ছিল এক মিটার চওড়া ও ছয় মিটার উঁচু। এটি পাথরের খণ্ড ও ইট দিয়ে তৈরি ও চুন সুরকির সাহায্যে জমাট বাঁধা। এর থেকে একটু ছোট একটি পাঁচিল চলে গিয়েছে জোরভান উপত্যকার দিকে ও অন্যটি ভদ্রকালী উপত্যকার দিকে।

এই প্রথম পাঁচিলের পরেই সিরাহ-ই খাস-এর পাঁচিল। দশ মিটার উঁচু পাথর সাজিয়ে গাঁথা, এই পাঁচিল রাজপ্রাসাদ ও সংলগ্ন বাড়িগুলিকে ঘিরে রেখেছে। এর মধ্যেই ছিল সরকারি দপ্তরখানা। এর তিনটি দরজা পাওয়া যায়।

পাহাড়ের নীচে শহরঘেরা প্রথম পাঁচিলের মধ্যে ছিল *আতাক* দরজা যেটি জনসাধারণ বেশি ব্যবহার করত। সমস্ত পাঁচিলটাই একটি অনিয়মিত গোলাকার চেহারা নিয়েছিল। এর চারটি দরজা ছিল ও পুব দিকে একটি ছোট দরজা ছিল। নানারকম পাথর ছোড়ার যন্ত্র, যেমন *মঞ্জানিক,* ছিল পাঁচিলের উপর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। এই পাঁচিল পেরিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় *মাচ্ছি* বলে আর এক

ধরনের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এটি অবশ্য রাজপুত রাজাদের সময়েই করা হয়েছিল—গুজরাটের সুলতানরা এটি অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলেন। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপরে আরেকটা দুর্গ ছিল যার প্রাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভদ্রকালী উপত্যকার কাছে গিয়েছে। এখানে একটি সুন্দর তিনতলা প্রাসাদ এখনও রয়েছে। এই ত্রিস্তর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই থাকার জায়গা, জলাধার ইত্যাদি তৈরি করে প্রায় স্বনির্ভর করে তোলা হয়েছিল।

সম্ভবত হুমায়ুন মাণ্ডু থেকে ধর, দোহাদ হয়ে চম্পানীরের পুব দিকে এসে পৌঁছান। এখানে চিত্তবিনোদনের জন্য প্রাসাদ, হাউস ও মসজিদ ইত্যাদি ছিল। একটি পুকুরের কথা আবুল ফজল বলেছেন যেটি এখনও আছে এবং যাকে *ভাদা তালাও* বলে বর্তমানে বলা হয়। এখানে তাঁর সৈন্য জমায়েত করে হুমায়ুন সহজেই প্রথম স্তরের দুর্গ দখল করে নেন। বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুর্গগুলিতে সৈন্য সমাবেশ করেন। আবুল ফজলের বক্তব্য যে বাহাদুর শাহ শহরের এই অংশে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে এটি প্রমাণিত হয়নি। অধ্যাপক মেহতা অনুমান করছেন যে তৃতীয় দুর্গের দরজায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল যেখানে বাহাদুর শাহি সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। হুমায়ুনের জেতার প্রধান কারণ হিসেবে অধ্যাপক মেহতা বলছেন যে হুমায়ুনের অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলেই বাহাদুর শাহর পরাজয় ঘটে।

২.৪ আহমদাবাদ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে গুজরাটের সোলাঙ্কি-বাঘেলা শাসন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বর ফলে প্রায় শেষ হয়ে যায়। কর্ণ বাঘেলা ছিলেন এ বংশের শেষ রাজা যিনি অনিলবাদ-পাটান এর সিংহাসনে বসেছিলেন। এর পরই গুজরাটে মুসলমান শাসকদের শাসন শুরু হয়ে যায়। জাফর খান আসেন শাসনকর্তা হিসেবে দিল্লির প্রতিনিধি হয়ে যিনি 'মুজঃফর শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষে কাম্বই-এর যুদ্ধে ইনি প্রাক্তন শাসনকর্তা মালিক মুফারাকে হারিয়ে স্বাধীন গুজরাটের পত্তন করেন। ১৪০৭ সালে জাফর খান নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর নাতি আহমদ শাহ প্রথম-কে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। তখন তিনি সবরমতি নদীর কাছে অসওয়াল গ্রামে ছিলেন এবং এখানেই আহমদ শাহ তাঁর রাজধানী গড়ে তোলেন প্রায় ১৪১১ সাল থেকে।

আহমদশাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ শাহকে বারংবার রাজপুত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। ১৪২৮ সালে ইদার এর দখল পেলে আহমদ শাহ তাঁর রাজধানী ওখানে সরিয়ে নিয়ে নামকরণ করেন আহমদনগর যেটি পরবর্তীকালে হিম্মতনগর নামে পরিচিত হয়েছিল।

আহমদাবাদ প্রতিষ্ঠিত করার সময় আহমদ শাহ তাঁর গুরু সরখেজ-এর শেখ আহমদ খাটু গঞ্জ বক্স-এর আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লেখক আলি মুহম্মদ খান তাঁর অমর গ্রন্থ *মিরাত-ই আহমদিতে* লিখছেন যে প্রতিষ্ঠা পর্বে চারজন আহমদ ও বারোজন কালান্দর ফকির সাহায্য করেছিলেন, যাঁরা দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য।

১৪১১ সালের পর থেকে অসওয়াল গ্রামে দুর্গ তৈরি হয়ে যায় যার চিহ্ন এখনও আছে। প্রায় ১৬ হেক্টর জমি নিয়ে যে প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরি হয়েছিল, তার চৌকো ভদ্র গম্বুজ এখনও আছে। পূর্ব দিকে ভদ্রকালীর যে সংস্থা আছে তার সঙ্গে এ নামের সাদৃশ্য থাকলেও কোনও যোগাযোগ পাওয়া যায় না।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে আহমদাবাদের দুর্গ একটি রাজত্বকালের মধ্যে তৈরি হয়নি। ভদ্র দুর্গ ছাড়া আহমদ শাহর পক্ষে আর বড় দুর্গ তৈরি করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলছেন যে এর অধিকাংশ অংশ সম্পূর্ণ করেন মুহম্মদ বেগারা ১৪৮৬-৮৭ সালের চম্পানীর বিজয়ের পর। *মিরাত*-এর লেখক বলছেন যে শহরে আছে বারোটা দরজা, ১৩৯টি গম্বুজ এবং ছয় হাজারের উপর পাঁচিলের উপর যুদ্ধোপযোগী জায়গা। পাঁচিলটা ছিল প্রায় দশ কি.মি. জুড়ে। উত্তর দিকে ছিল দিল্লি, শাহপুর ও দরিয়াপুর দরজা। পুব দিকে ছিল কালুপুর, রায়পুর ও শরঙ্গপুর দরজা। দক্ষিণ দিকে অষ্টদিয়া, জামালপুর ও দেধিয়া দরজা এবং পশ্চিম দিকে ছিল খান-ই জাহান, রাইখদ ও খানপুর দরজাগুলি। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা শহরের প্রশংসা করে বলেছেন যে শহরটিতে ৩৬০টি মহল্লা ছিল যার প্রত্যেকটাই স্বনির্ভর। আমরা আগেই দেখেছি যে পর্তুগিজ পরিব্রাজক দুয়ার্ত বারবোসা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একে খাম্বাজের পরেই স্থান দিয়েছেন এবং চম্পানীরের থেকে বড় বলে বলেছেন।

গুজরাটে মুসলমান বিজয়ের পর থেকেই স্থাপত্যে ও শিল্পে স্থানীয় ছন্দর সঙ্গে দিল্লির ইসলামিক ছন্দর একটি মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকেই গুজরাটের নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছে যেটি অন্যান্য প্রাদেশিক ধারার মতো নিজস্ব প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। জাফর খান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও আহমদ শাহ প্রথম-এর সময়ে এই নতুন ধারার সৃষ্টি তৈরি হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ সবের মধ্যে হিন্দু শিল্পী ও কারিগররা হিন্দুপ্রভাব মিশিয়ে দিয়েছেন স্বভাবতই। গুজরাটের মসজিদে মিহরাব, মিম্বার ও মিনারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কারুকার্যকরা গম্বুজ, স্তম্ভ ইত্যাদি হিন্দু ধারা। এইসব মসজিদের মধ্যে হিন্দু ভাস্কর্যর পরিচয় পাওয়া যায়। আহমদাবাদ রাজধানী হলে আহমদ শাহ (১৪১১-৪২) ও মুহম্মদ শাহ বেগারার সময়ে স্থাপত্যশিল্প চরমে উঠে। গুজরাটে স্থাপত্যধারার নতুন দৃষ্টান্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আহমদাবাদ, চম্পানীর ও মাহমুদাবাদে দেখতে পাওয়া যায়। মোগলযুগে আমরা আহমদাবাদ শহরের বিস্তৃত বিবরণ দেখব বিভিন্ন ইউরোপীয় পরিব্রাজকের লেখনী থেকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বারবোসা আহমদাবাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। উনি বলেছেন যে শহরে শক্ত দেওয়াল, বাড়িগুলি পর্তুগিজ ধরনের পাথর আর চুন দিয়ে করা। বড় বড় উঠোন আছে যার মধ্যে জলাধার ও মিষ্টি জলের কুয়ো আছে। উটই

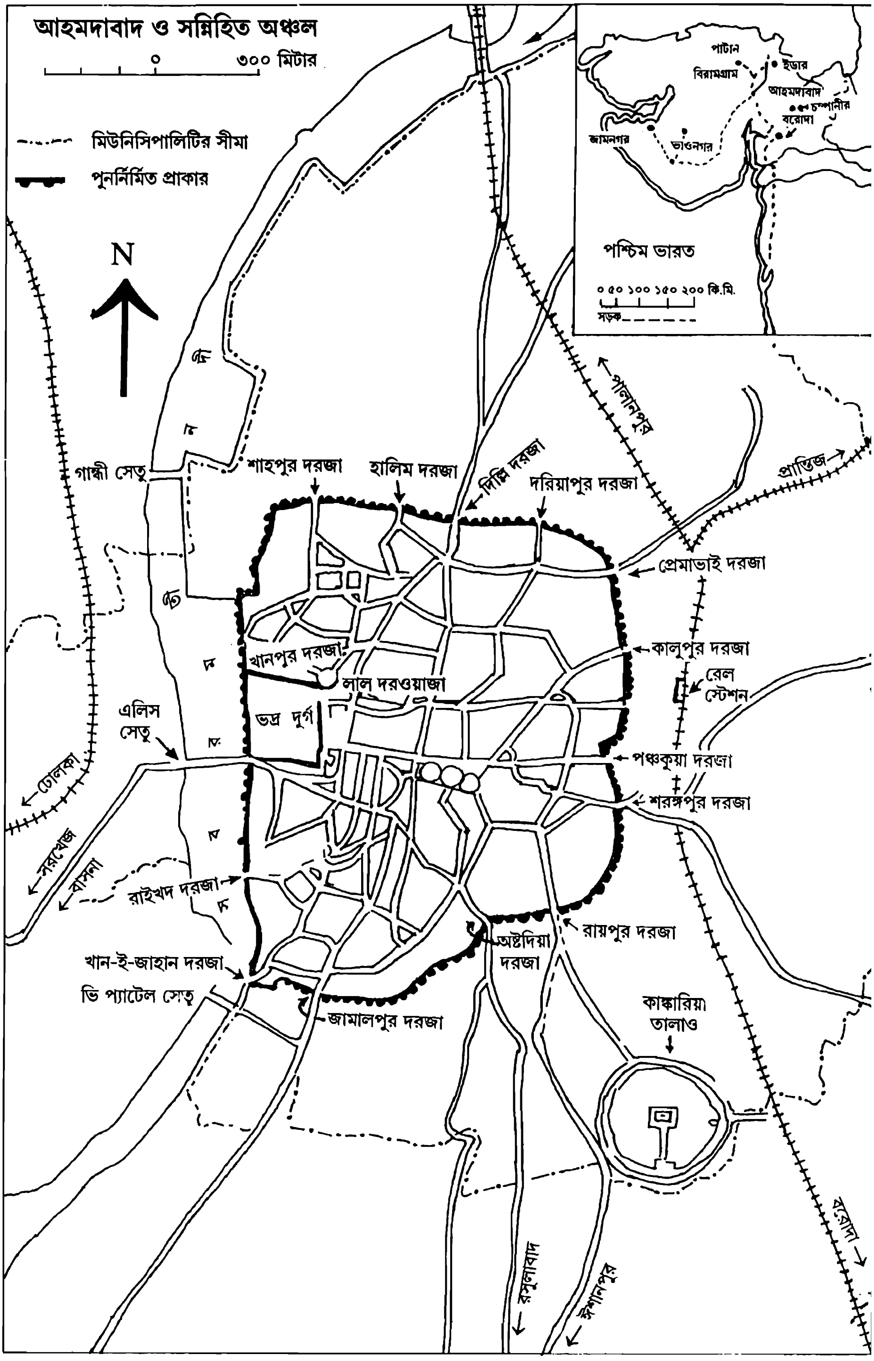

আহমদাবাদ ও সন্নিহিত অঞ্চল

০ ৩০০ মিটার
মিউনিসিপালিটির সীমা
পুনর্নির্মিত প্রাকার
N
পাটান
ইডার
বিরামগ্রাম
আহমদাবাদ
চম্পানীর
বরোদা
জামনগর
ভাওনগর
পশ্চিম ভারত
০ ৫০ ১০০ ১৫০ ২০০ কি.মি.
সড়ক
পালানপুর
প্রান্তিজ
গান্ধী সেতু
শাহপুর দরজা
হালিম দরজা
দিল্লি দরজা
দরিয়াপুর দরজা
প্রেমাভাই দরজা
কালুপুর দরজা
রেল স্টেশন
খানপুর দরজা
লাল দরওয়াজা
ভদ্র দুর্গ
এলিস সেতু
পঞ্চকুয়া দরজা
শরঙ্গপুর দরজা
ঢোলকা
সরখেজ
বাসনা
রাইখদ দরজা
রায়পুর দরজা
অষ্টদিয়া দরজা
খান-ই-জাহান দরজা
ভি প্যাটেল সেতু
জামালপুর দরজা
কাঙ্কারিয়া তালাও
রসুলাবাদ
ঈশানপুর
বরোদা

সৌজন্য: আহমদাবাদ; আর্কিওলজিকাল সারভে অভ ইন্ডিয়

প্রধান মালবাহী জন্তু। এখানে ফলের ও ফুলের বাগান আছে। এখানে রাজার শাসনকর্তা আছে অন্যান্য শহরের মতো যে খাজনা সংগ্রহ করে। অর্থাৎ ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমে আহমদাবাদের উত্থান দেখা যায় না।

মোগল আমলের আহমদাবাদের প্রথম বিস্তারিত বর্ণনা দেন সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় উইলিয়াম ফিঞ্চ। একে উনি ভাল শহর বলেছেন। নদীর উপরে শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ও বুরুজ আছে। দুর্গটি বড় ও শক্ত। তখন ওই দুর্গে ছিলেন প্রাদেশিক সুবাদার জাহাঙ্গির কুলি খান। এই শহরের বাড়িগুলি এশিয়া বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশের বাড়ির সঙ্গে তুলনীয়। রাস্তাগুলি বাঁধানো ও চওড়া। এখান থেকে প্রতি দশদিনে মাল নিয়ে দুশো গাড়ি যায় খাম্বাজের উদ্দেশে। বড়লোক বণিক আছে। প্রচুর কারিগর আছে যারা খোদাই করে, আঁকে, সোনা ও রূপার জরির কাজ করে, পাথরের কাজ করে। দরজাগুলিতে সারা সময় পাহারা দেওয়া হয়। অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে বা বেরোতে পারে না। চারক্রোশ দুরে সারখেজ শহর আছে যেখানে নীল হয়, কিন্তু বিয়ানার মতো এত ভাল নয়। কিছুদুরে কোলিদের রাজা আছে যার সতেরো হাজার সৈন্য আছে।

এঁর সমসাময়িক হচ্ছেন নিকোলাস ওরথিংকটন যিনি আহমদাবাদকে গুজরাটের প্রধান শহর হিসেবে ধরেছেন। উনি বলছেন যে এটি প্রায় লন্ডন এর সমান বড় এবং খুব শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। নদীর পাশে সমতল জমিতে এটি অবস্থিত। এখানে সব বণিকরা বাস করে। এরা ছাড়া খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দুরা থাকে। এখানে সোনা ও রূপার জরি করা কাপড়, ভেলভেট, টাফেটা ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া যায়। যে মহল্লায় আর্মেনিয়ান ও অন্যান্য খ্রিস্টানরা থাকে, ওখানে উনি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। তখন সুবাদার ছিলেন আবদুল্লা খান ফিরোজ জং। এই শহরের তিন ক্রোশ দূরে সরখেজ শহর যেখানে নীল তৈরি হয়। এখানে গুজরাট রাজাদের সমাধি আছে। সারা দেশ থেকে লোক আসে এগুলি দেখতে। এর প্রায় দেড় মাইল দুরে সুন্দর একটি বাগান আছে যার মধ্যে নদীর ধারে আছে সুন্দর একটি বাড়ি। এটির মধ্যে খানখানান এর বাড়ি আছে যেখানে এখন কেউ থাকে না। আহমদাবাদে একজন ফরাসি জেসুইট পাদ্রি আছে খুব গরিব অবস্থার মধ্যে। পর্তুগিজরা চলে যাওয়ার ফলে তার খাবার মতন টাকাও নেই। একশো বছরের মধ্যে আহমদাবাদের প্রচুর উন্নতি হয়েছে।

১৬৩৮ সালে ম্যান্ডেলস্লো আহমদাবাদে আসেন সুরাট থেকে। ভদ্র দুর্গের সামনে একটি বড় চক আছে যাকে বলা হয় *ময়দান শাহ*। এটি ১৬০০ ফুট লম্বা ও ৮০০ ফুট চওড়া এবং নারকেল ও খেজুর গাছের সারি আছে। মধ্যে মধ্যে লেবু গাছও আছে যেগুলি অনেক রাস্তাতেও দেখা যায়। ময়দানে সবচেয়ে বড় বাজার বসে। এ ছাড়া শহরের মধ্যে আরও চারটি বাজার আছে। ভদ্র দুর্গকে উনি গুজরাটের সবথেকে বড় দুর্গ বলেছেন। ভিতরে ইটের তৈরি রাজপ্রাসাদ। এর দরজার উপরে পর্দার পিছনে সংগীতশিল্পীরা দিনে চারবার সংগীত পরিবেশন করে। সব মুসলমান দেশগুলিতে ও পারস্যদেশেও এটি প্রচলিত। প্রাসাদের ঘরগুলি বড় গিলটি করা ও রঙিন চিত্র দিয়ে সাজানো। শহরের দেওয়াল মজবুত। এর বারোটা দরজা আছে, যার সামনে গভীর

পরিখা। এটিতে অবশ্য তখন বহু জায়গায় জল ছিল না।

শহরের যে বর্ণনা ম্যান্ডেলস্লো দিয়েছেন তাতে উনি শহর ও শহরতলিসুদ্ধ প্রায় ২১ মাইল ধরেছেন। রাস্তাগুলি চওড়া এবং ব্যক্তিগত ও সরকারি বাড়িগুলি খুব বড়। শহরে রাতদিন পাহারা থাকে এ ছাড়া শহরে প্রচুর সৈন্য আছে। আহমদাবাদের দোকানে পৃথিবীর সবকিছু পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁত ও রেশমের কাপড়। এ ছাড়া সোনা ও রূপার ব্রোকেড জরি দেওয়া পাওয়া যায় যেগুলি পারস্যদেশের জিনিসের মতো। ম্যান্ডেলস্লোর সময়ে তাঁত ও রেশম মেশানো কাপড় তখন সবে তৈরি হচ্ছিল। এগুলি ছিল সোনার ফুল বসানো। কিন্তু তখন সাধারণ লোকের এ কাপড় ব্যবহার করা বারণ হয়েছিল কারণ সব উৎপাদনই রাজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিদেশিরা এগুলি কিনতে পারে যদি তারা দেশের বাইরে এগুলি নিয়ে যায়। এ ছাড়াও রেশমের অন্য ধরনের কাপড় ছিল। তাঁত ও সোনা বসানো রেশমের গালিচাও পাওয়া যেত। নানাধরনের খাবার, রত্ন ও অন্যান্য পাথর শহরে পাওয়া যায়।

শহরের মধ্যে ও শহরের বাইরে এত বেশি বাগান আছে যে ম্যান্ডেলস্লো বলছেন যে মনে হয় যেন একটিই বাগান। শহরের বাইরে ছিল, যার পথ ছিল সোজা ও দুপাশে গাছের সারি বসানো। শহরে প্রচুর বাঁদর দেখেছেন এবং কুঠিতে যে একদিন দেড়শো বাঁদর এসেছিল তার কথা বলেছেন। শহরের বাইরে পুব দিকে শান্তিদাস জৈন-এর মন্দিরও দেখেছিলেন এবং তার বিশদ বর্ণনাও দিয়েছেন। শান্তিদাস জৈন বিখ্যাত বণিক ছিলেন এবং সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে আলাপ ছিল।

আহমদাবাদ দেখে ম্যান্ডেলস্লোর যে উচ্ছ্বাস সেটি থেভনোর বর্ণনায় পাওয়া যায় না, যদিও থেভনোর বর্ণনা আরও বিশদ। উনি বলছেন যে শহরটি সবরমতি নদীর পাড়ে সমতল জমির উপর। নদী এমনিতে গভীর নয়, কিন্তু বর্ষাকালে চারপাশের জায়গা প্লাবিত করে দেয়। এখানে ইটের দেওয়াল ঘেরা বহু বাগান আছে যেগুলির ছত্রি দেওয়া দরজা আছে। একটি সুন্দর জলাধার রয়েছে যার মধ্যে একটি সুন্দর বাগান আছে। একটি সাঁকো দিয়ে যেতে হয়। বাগানের শেষে থাকার জায়গা আছে। এটি বোধহয় *হাউস-কি কুতুব*, যেটি ১৪৫১ সালে শেষ হয়। ম্যান্ডেলস্লোও এটির উল্লেখ করেছেন।

থেভনো তখনও শহরতলিতে রয়েছেন যেখানে তিনি মাঝে মাঝে বাড়ি ও গ্রাম দেখেছেন। কয়েকটি সমাধিসৌধও দেখেছেন যার নাম করেননি। এগুলি আগেকার সুলতানদের যার মধ্যে আহমদ শাহ প্রথম-এর সমাধি আছে। থেভনো বলছেন যে এটিই বাইরের শহরতলি। ওখানে থেকে ছোট পিছনের দরজা দিয়ে একটি রাস্তায় যাওয়া যায় যার দুপাশে সারিবদ্ধ বাড়ি। এই রাস্তা দিয়েই প্রথমে শহরতলি ও পরে শহরে যাওয়া যায়।

ইট ও পাথরের দেওয়াল দিয়ে শহরটি ঘেরা। দেওয়ালের মাঝে কিছু দূরে দূরে গোলাকার বড় বুরুজ আছে। শহরের বারোটি দরজা এবং শহরতলি ধরলে এটির ব্যাসার্ধ প্রায় দশ মাইল। এর দেওয়াল ও সৈন্য সব সময়ে প্রস্তুত রাখা হয় কারণ আশেপাশের রাজপুত রাজারা মাঝে মাঝে আক্রমণ করে। এদের ভয় অবশ্য বাদুর (ভাদওয়ার) এর রাজাকে। এর রাজধানী খান্দেশে। থেভনো একটি সরাইখানায়

ছিলেন যেখানে উনি গুজরাটের এক রাজার স্ত্রীর কবর দেখেন। এটি সম্ভবত *রানি-কি কাটরা*। এর পরে উনি ওলন্দাজদের কুঠিতে যান যেখানে উনি থেকে যান। কুঠিটি সব থেকে বড় ও লম্বা রাস্তায়। আহমদাবাদের সব রাস্তাই চওড়া। কিন্তু এটি ওগুলোর থেকে প্রায় তিরিশ ফুট বেশি চওড়া। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে তিনটি সুন্দর খিলান আছে।

এই খিলানগুলির মধ্য দিয়ে গেলে *ময়দান-ই শাহ*-তে পড়া যায়, যাকে রাজার চক বলে। এটি চারশো ফুট চওড়া ও সাতশো ফুট লম্বা। এর চারপাশে গাছ লাগানো। দুর্গের দরজাটা এর পশ্চিম দিকে, তিন খিলানের বিপরীত দিকে। সরাইখানার দরজাটি দক্ষিণ দিকে। একই দিকে ছয়/সাতটি কামান বসানো আছে। সুন্দর রাস্তাগুলির প্রথমে বড় বড় দরজা করা। এই ময়দানের মধ্যে কয়েকটা ছোট বাড়ি আছে যেগুলি কোতোয়ালের বিচারালয়। এর মাঝখানে একটি উঁচু গাছ। এই গাছের উপর একটি নিশানা রাখা আছে। যারা তীরন্দাজি অভ্যাস করে, তারা এখানে এসে এটি করে।

থেভনো এর পরে দুটো বড় বুরুজের মাঝখানে একটি বড় দরজার মধ্য দিয়ে দুর্গের ভেতরে গিয়েছিলেন। ঘরগুলো সেরকম কিছু নয় যদিও দুর্গের দেওয়ালটি খুব মজবুত পাথর দিয়ে করা। এরকম পাথরের দেওয়াল শহরে বিশেষ দেখা যায় না। ময়দানের সরাইখানাটি জায়গাটাকে সুন্দর করে তুলেছে। সামনে কয়েকটা থাকার জায়গা এবং স্তম্ভের উপর বারান্দা। এই বারান্দাগুলি পাথরের। মাঝখানে সুন্দর করে কাটা আলো আসার জন্য। আটকোনা একটি বড় দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকতে হয় যেটি একটি গম্বুজের মতো। ভিতরে চারটে ছোট দরজা যার পর কয়েকটা বারান্দা দেখা যায়। বাড়িটি পাথরে তৈরি চতুষ্কোণ দোতলা। মার্বলের মতো উজ্জ্বল এবং চারপাশে ঘর যেখানে বিদেশিরা থাকতে পারে।

ময়দানের কাছে রাজার একটি প্রাসাদ আছে। এর দরজার উপরে বড় বারান্দা যেখানে সংগীতশিল্পীরা বসে দিনে চারবার বাজনা বাজায়। এর মধ্যে কয়েকটা ঘর আছে যেগুলোতে সোনার লতাপাতা নকশা করা। ইংরেজদের কুঠি শহরের মাঝখানে। এদের বাড়ি ভাল ও কয়েকটা উঠোন আছে। এদের গুদাম লাহোর ও দিল্লির কাপড় দিয়ে ভর্তি যা নিয়ে তারা প্রচুর বাণিজ্য করে।

আহমদাবাদে ছোট বড় অনেক মসজিদ আছে। যেটি প্রধান সেটি হল জামা মসজিদ যেখানে শুক্রবারের প্রার্থনা হয়। ওইদিন শহরের সব ধর্মপ্রাণ লোকেরা এখানে জড়ো হয় এবং মসজিদগুলির মধ্যে এটিই সবথেকে সুন্দর। ওলন্দাজ কুঠির রাস্তা থেকেই এই মসজিদে ঢুকতে হয় কতকগুলি বড় সিঁড়ি পেরিয়ে। প্রথমে যেটি চোখে পড়ে সেটি একটি বড় উঠোন, প্রায় ১৪০ ফুট লম্বা ও ১২০ ফুট চওড়া। এর ছাদ আছে ৩৪টি স্তম্ভের উপর। বারোটি গম্বুজ আছে। এর সামনে তিনটি খিলান আছে এবং পাশে দুটি বড় দরজা যার মধ্যে দিয়ে এখানে আসা যায়। প্রত্যেক দরজার বাইরে একটি উঁচু মেহরাব আছে যেখান থেকে মুয়াজ্জিন লোককে প্রার্থনা করতে ডাকেন। এর প্রধান গম্বুজটি সুন্দর ও পাশে কয়েকটি ছোট গম্বুজ আছে—সঙ্গে দুটি মিনার। সব মিলিয়ে দেখতে ভাল লাগে। মেঝেটা মার্বল পাথরের। ইমাম এর

সিংহাসন অন্যান্য মসজিদের মতোই। দক্ষিণ দিকের কোণে উঁচু দেওয়ালে ঢাকা একটি জায়গা যেখানে মহিলারা আসেন। ওখানে উনি দুশো ফকিরকে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন।

আহমদাবাদে বহু হিন্দু থাকার ফলে প্রচুর মন্দির আছে। শান্তিদাস-এর মন্দিরই এর মধ্যে প্রধান। এর চারপাশের দেওয়ালের মার্বল পাথরে মহিলাদের ভাস্কর্য খোদাই করা। এ ছাড়াও মানুষ ও জন্তুদের ভাস্কর্য দেওয়ালে করা আছে। ১৬৩৮ সালের আগে ৯ লাখ টাকায় এটি করা হয়েছিল যা আমরা পরবর্তী ইতিহাস থেকে পাই। ঔরংজেব যখন গুজরাটের সুবাদার ছিলেন, তখন তিনি এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের আদেশে এটি আবার মন্দির করা হয়। শান্তিদাস অবশ্য মূর্তিটি অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে আর একটি মন্দির করে দেন। থেভনোর লেখা থেকে মনে হয় তখনও এটি মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়নি।

থেভনো এর পর রসুলাবাদে (শহর থেকে দেড় মাইল দূরে) শাহ আলম-এর সমাধিসৌধের কথা বলেছেন। পরবর্তী ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এটি তৈরি হয় ১৫৩১-৩২ সালে। শাহ আলম ছিলেন গুজরাটের বুখারি সৈয়দদের নেতা। থেভনো বলছেন যে ভারতীয়রা মনে করে যে ইনি অলৌকিক শক্তিধর ছিলেন যার ফলে বহু লোক এখানে আসে। এই চতুষ্কোণ বাড়ির প্রতি কোণে সাতটি গম্বুজ আছে ও মাঝখানে একটি বড় গম্বুজ আছে। ভিতরে একটি বড় ঘর যার দুটি মার্বল পাথরের দরজা আছে যার গায়ে ক্রিস্টাল ও মুক্তো বসানো। মেঝেটা মার্বল পাথরের। জাফরি করা জানালাটি তামার যার মধ্যে বিভিন্ন মূর্তি খোদাই করা। এর মাঝখানে এই সাধুর সমাধি একটি বিছানার মতো যার উপর বিভিন্ন রঙের রেশমের মুক্তো বসানো চাদর আছে। এখানে অনেক ঝোলানো আলো রয়েছে। উঠোনের বিপরীত দিকে আরও কয়েকটি সমাধি ও একটি মসজিদ যার পাশে গরিবদের থাকার ব্যবস্থা আছে। মসজিদের পিছনে একটি বাগান।

থেভনো বলেছেন যে আহমদাবাদে এত বাগান আছে যে উপরে উঠে দেখলে মনে হয় জঙ্গলের মধ্যে শহর। নদীর পাড়ে শহরের বাইরে রাজার বাগান আছে, যেখানে সব ধরনের গাছ আছে। দুপাশের গাছের সারির মধ্য দিয়ে হাঁটার পথটি এত সুন্দর যে মনে হয় প্যারিসের *কুর দ্য লা রেনের* মতো। বাগানের ভিতরে ধাপ দেওয়া বাগান আছে। সব থেকে উপরের ধাপে উঠলে আশেপাশের গ্রামগুলি দেখা যায়। বাগানের কেন্দ্রস্থলে চারটি পথ মিলিত হয়েছে। ওখানে চারটি স্তম্ভযুক্ত একটি ছত্রি আছে যেখানে শহরের যুবারা হাওয়া খায়। নীচে একটি জলাধার আছে। এর থেকে কিছুদূর এগোলে বেশ কিছু সমাধিসৌধ আছে যেখানে গুজরাটের রাজারা সমাহিত রয়েছেন।

শহরের প্রায় চার মাইল দূরে সরখেজ শহরে থেভনো গিয়েছিলেন। এখানে গুজরাটের রাজাদের ও যুবরাজদের সমাধি আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে যে আগে এটিই ছিল গুজরাটের রাজধানী যা থেভনোর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। শাহ আলমের সমাধিসৌধর মতো আর একজন সাধুর সমাধি এখানে দেখেছেন একই ধরনের অলংকারযুক্ত। তফাত এই যে এখানে তেরোটি গম্বুজ রয়েছে। এটি শেখ

আজম খাট্টুর সমাধি যেটি ১৪৪৬ সালে শেষ হয়। এর পাশে থেভনো একটি মসজিদ দেখেছেন যেটি তাঁর মনে হয়েছে জামা মসজিদের থেকে ছোট। এর পাশে একটি বড় পুকুর আছে, যার পাশে গুজরাটের রাজা, রানি ও যুবরাজদের কবর রয়েছে। এটি জামা মসজিদের অনুকরণে তৈরি। পরবর্তীকালের বার্গেসের মতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি মসজিদের মধ্যে এটি অন্যতম। পুকুরটা করেছিলেন মাহমুদ বেগারা। এই জায়গার পাশে কয়েকটা মন্দির আছে এবং থেভনো বলছেন যে আহমদাবাদে যে নীল বিক্রি হয়, তার সবই আসে সরখেজ থেকে।

শহরের বাইরে থেভনো একটি সুন্দর কুয়োর উল্লেখ করেছেন যাকে বার্গেস বলছেন *দাদা হরির কুয়ো*। এটি চৌকো ও উপরটা সাতটি খিলানের ছত্রি দিয়ে ঢাকা। খিলানের মধ্যে ফাঁক থাকায় আলো আসে। দুই দিকে নীচে নামার সিঁড়ি আছে যেগুলি দিয়ে প্রায় ছ'তলা নেমে যাওয়া যায়। প্রত্যেক তাকেই দাঁড়ানোর জায়গা আছে। শহরের মধ্যে পাখিদের জন্য হাসপাতাল রয়েছে। জন্তুরাও অসুস্থ হলে এখানে আসে। আহমদাবাদের বাইরে বহু জঙ্গল আছে যেখানে চিতাবাঘ শিকার করা যায়। এখানকার শাসনকর্তা কয়েকটা চিতাবাঘ ধরে সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এগুলি ধরে ময়দানে রাখা হয় যাতে তারা মানুষের সান্নিধ্যেও ঠিক থাকে। এর পরে আহমদাবাদের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। শহরে কী কী তৈরি হয়, তারও সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন।

ম্যান্ডেলস্লো আসার প্রায় ত্রিশ বছর পরে থেভনো এসেছিলেন। ম্যান্ডেলস্লোর বর্ণনায় যেমন আমেদাবাদের উত্থান লক্ষ করা যায় থেভনোর বিস্তৃত বর্ণনায় এর গুরুত্বও বোঝা যায়। কিন্তু দুজনেই যে সৌধগুলির কথা বলেছেন সেগুলি সবই প্রাক্-মোগল যুগের। তবে মোগল যুগে যে শহরের উন্নতি হয় প্রধানত শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য, সেটি অনস্বীকার্য। ম্যান্ডেলস্লোর কিছু পরে এসেছিলেন তাভারনিয়ার। উনি আহমদাবাদকে ভারতের বড় শহরগুলির অন্যতম বলে ধরেছেন। এর প্রধান কারণ হিসেবে ওঁর লেখা থেকে দেখা যায় যে এই শহরে রেশমের কাজ খুব সুন্দর যা বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের মধ্যে করা হয়। এ ছাড়াও মোরা, চিনি ও নীল এর উল্লেখ করেছেন। সরখেজে সুলতান আহমদের মসজিদের কথা বলেছেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে সবরমতি নদীর দুই পারেই বসতি ও শিল্প ছিল কারণ তাভারনিয়ার নদী পার হবার বিষয়ে বেশ মনোযোগ দিয়েছেন। গরিব লোকেরা গোল মাটির হাঁড়ি করে বা সাঁতার কেটে পার হয়। কৃষকরা অনেকসময় ছাগলের চামড়া গায়ে বেঁধে পার হয়। তাভারনিয়ার প্রথম এসেছিলেন ১৬৪২ সালে, কিন্তু তারপর দশ-বারো বার এসেছিলেন। সুতরাং কোন সময়ের কথা তিনি বলছেন এটি বলা শক্ত। রেশমের যে অসাধারণ কাজ আহমদাবাদে হত, তাঁর লেখাই তার সাক্ষী।

১৮৬৩ সালের প্রথম দিকে ফরাসি বণিক মার্তোঁ এসেছিলেন। উনি বলছেন যে ভারতের মধ্যে সব থেকে বড় শহর আহমদাবাদ, যা দিল্লি ও আগ্রার থেকেও বড়। ভারতের শহরগুলি সুন্দর নয় বলে উনি মন্তব্য করেছেন কারণ এর কোনও সাজানো ভাব নেই। এ ছাড়া কোনও বাড়ি পাথরের, কোনওটা ইটের, কোনওটা খড়ের ও

কোনওটা বা কুঁড়েঘর, তালপাতায় ছাওয়া—সব মিলে মিশে গোলমাল হয়ে যায়। অধিকাংশ রাস্তাই বাঁধানো নয়। ফলে গরমের সময় প্রচুর ধুলো ওড়ে আর বর্ষাকালে কাদা হয়ে যায়। আহমদাবাদ একটি ধনী শহর। এখানে কয়েকজন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি থাকেন। এ জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে রেশমের কাপড় ও সোনা ও রূপার জরি করা ব্রোকেড হয়। এ ছাড়া এখান থেকে সাদা মোটা কাপড় চালান যায় এবং রং করা কাপড়ও প্রচুর পাওয়া যায়। সরখেজ এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে যেখানে নীল হয়। ওখানে মসজিদগুলো ভালভাবে তৈরি। ওখানে একটি চমৎকার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ওটাই প্রাচীন গুজরাটের প্রাসাদ। ওর কাছে একটি মসজিদ আছে যেখানকার ইমামকে ওখানে সমাহিত করা হয়েছে। মুসলমানদের কাছে তিনি সাধু। আহমদাবাদ থেকে বরোদার পথ খুব অনিশ্চিত কারণ প্রায়ই লুঠতরাজ হচ্ছে। মোগল তার সর্বশক্তি দিয়েও এই ধরনের রাহাজানি ঠেকাতে পারছে না। আশেপাশে কয়েকটা ছোট রাজা আছে যারা এই রাহাজানিগুলি করে নিজের রাজ্যে ফিরে যায়। গুজরাটের পুরনো সুবাদার মুহম্মদ আমিন খান শহরের একমাইল দূরে ঘিলাসপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। মার্তোঁ ও তাঁর সঙ্গীরা ওই বাড়িতে রাত্রে বিশ্রাম করেছিলেন। কিন্তু সারারাত ধরে লুটেরারা ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্র নিয়ে বাড়ির চারপাশে ঘুরছিল যদিও আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। 'এরা বন্দুককে ভয় পায়। ভোর হতেই এরা চলে গিয়েছিল।'

আহমদাবাদের উপর দিয়ে যে রাজনৈতিক ঝড় চলে গিয়েছিল সেটি জানা। নিকোলাই মানুচ্চি ও বার্নিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন যে দারাশুকোকে কীভাবে আহমদাবাদের দুর্গে আশ্রয় দেন মুরাদবক্সের শ্বশুর শাহনওয়াজ খান। এখান থেকেই সৈন্যসংগ্রহ করে দারা আজমিরের দিকে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক আলি মুহম্মদ খান তাঁর বই *মিরাত-ই আহমদি*তে মোগল-মারাঠা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে শহরের ও দুর্গের ক্ষতি হতে লাগল তার বর্ণনা দিয়েছেন। *রসমালা*তে বর্ণনা আছে যে কীভাবে মারাঠারা আহমদাবাদ দখল করেছিল। ইংরেজ ও মারাঠাদের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ও মারাঠা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আহমদাবাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।

৩

মালব ও দাক্ষিণাত্য

৩.১ মান্ডু

মালবের প্রধান দুর্গ-শহর মাণ্ডু উঁচু টিলার উপরে ধর শহরের ২৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। উঁচু পাহাড়ের উপরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ছিল বলে মুসলমান শাসকেরা মাণ্ডুকে *শাহিদাবাদ* বা আনন্দের শহর বলে অভিহিত করেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গির সাত মাস মাণ্ডুতে ছিলেন এবং বর্ষাকালে মাণ্ডুর অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

মাণ্ডুর প্রথমদিকের ইতিহাস প্রবাদে ঢাকা। পরবর্তী ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখেছেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে আনন্দ দেও রাজপুত এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন। ধর জেলার একটি মন্দিরের শিলালেখ থেকে (৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ) মাণ্ডপ-দুর্গা নামে একটি জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মাণ্ডপ-দুর্গাকেই মাণ্ডু বলে ধরা হচ্ছে। মাণ্ডু নামটি এই *মাণ্ডপ* কথাটি থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়। কারণ পারসিক সাহিত্যেও মাণ্ডভ ও মাণ্ডুকে সমার্থক করে দেখানো হয়েছে। মাণ্ডপিকার নাম আবার পাওয়া যায় দশম শতাব্দীর একটি শিলালেখ থেকে। এ ছাড়াও মাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষ থেকে এই সময়কার আর একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে এই সময় থেকে মাণ্ডুর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। দশম শতাব্দীর শেষ থেকে পারমার বংশ মালবে ক্ষমতা নিয়ে প্রথমে উজ্জয়িনী ও পরে ধর শহরে রাজধানী বসায়। এই বংশের রাজা, মুঞ্জ ও ভোজ-এর স্মৃতি মাণ্ডু থেকে এখনও মুছে যায়নি। মাণ্ডুর প্রাসাদ চত্বরের মধ্যে মুঞ্জা-তালাও বলে একটি পুকুর এখনও ওঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। মাণ্ডুতে রাজা ভোজ-এর আরাধ্য দেবী সরস্বতী বা বাগদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পারমার রাজা বিন্ধবর্মনের মন্ত্রী বিলহানের লেখা একটি বড় শিলালেখ (দ্বাদশ শতাব্দীর) মাণ্ডুতে পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী শতাব্দীর রাজাদের মাণ্ডব-দুর্গা সমন্বিত সিলমোহর মাণ্ডু থেকে পাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ধর-এর পরিবর্তে মাণ্ডু রাজধানী হয়ে গিয়েছিল। সুলতান ইলতুতমিস মালব আক্রমণ করলেও মাণ্ডু আক্রমণের আগে

পারমার রাজা দেবপালের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যায়। ফলে মাণ্ডু আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। সুলতান জালালউদ্দিন খলজি মালব আক্রমণ ও লুঠ করলেও মাণ্ডুতে আসেননি। ফলে হিন্দু শাসকদের অধীনে এই দুর্গটি থাকে। ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি আইন-উল-মুল্ক হিন্দু সেনাপতি গোগাদেবকে হারিয়ে মাণ্ডু দখল করে দিল্লির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

মুসলমান শাসনকর্তারা অবশ্য ধর-এ তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। ধ্বংসাবশেষ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু হিন্দু ও জৈন মন্দিরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। মুহম্মদ তুঘলকের সময়ে মালবের শাসনকর্তা দিলওয়ার খান ঘোরি প্রায় স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন। দিলওয়ার খান ধর-এ তাঁর রাজধানী রাখলেও প্রায়ই মাণ্ডুতে আসতেন। তাঁর সময়কার তৈরি তারাপুর দরজা ও রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত মসজিদটি তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

১৪০৪ সালে দিলওয়ার খান-এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আলপ খান হোসাঙ শাহ উপাধি নিয়ে রাজধানী মাণ্ডুতে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সাতাশ বছর রাজত্ব করে মালবের সীমানা তিনি অনেক বাড়িয়ে যান যার ফলে দিল্লি, গুজরাট ও জৌনপুরের রাজাদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই গোলমাল হত। কিন্তু এ সবের মধ্যে একবার পরাজিত হয়েও, তিনি দিল্লি দরজা, জামা মসজিদ এবং তাঁর নিজের সমাধিসৌধ তৈরি করতে পেরেছিলেন। অনুমান করা হয় যে প্রাসাদ চত্বরের মধ্যেকার অনেকগুলি বাড়ি তাঁর সময়েই হয়েছিল। দুর্গের সুরক্ষার জন্য তিনি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করে তোলেন। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমকালীন মুসলমান লেখকরা ও জাহাঙ্গির পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় বলে বলেছেন। ১৪৩৫ সালে হোসাঙ শাহ মারা গেলে ওঁর ছেলে মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন। পরবর্তী বছরে তাঁর মৃত্যু হলে খলজি বংশের মাহমুদ খান রাজা হন। মেওয়ারের রাণাকে পরাজিত করে উনি মাণ্ডুতে সাততলা উঁচু স্তম্ভ তৈরি করান, যার শুধু নীচের তলাটি এখন পাওয়া যায়। তাঁর সময়ে ইজিপ্টের খলিফা তৈমুরের নাতিকে দূত হিসেবে মাণ্ডুতে পাঠান।

১৪৬৯ সালে মাহমুদ শাহ মারা গেলে তাঁর বড় ছেলে গিয়াসউদ্দিন সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে মাণ্ডুতে জাহাজমহল ইত্যাদি বাড়ি তৈরি হয়। পরবর্তীকালে রাজা মাহমুদ শাহ দ্বিতীয়কে গুজরাটের রাজা মুজঃফর শাহ ১৫২৬ সালে পরাজিত করেন। ১৫৩৪ সালে হুমায়ুন মাণ্ডু দখল করে মালব ছেড়ে চলে গেলে খলজি বংশের একজন আমলা মাল্লু খান কাদির শাহ নাম নিয়ে ১৫৩৬ সালে সিংহাসনে বসেন। ১৫৪২ সালে শের শাহ মালব জয় করেন। তাঁর শাসনকর্তা ১৫৫৪ সালে মারা গেলে, শাসনকর্তার এক ছেলে মালিক বায়াজিদ সুলতান বাজ বাহাদুর নাম নিয়ে মাণ্ডুর সিংহাসনে বসেন।

রানী দুর্গাবতীর কাছে পরাজিত হয়ে বাজ বাহাদুর সংগীতে মন দেন। বাজ বাহাদুর ও রূপমতির গল্পকথা মাণ্ডুর প্রবাদ হয়ে রয়েছে। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আধম খান বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করলে বাজ বাহাদুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান। রেওয়া কুণ্ড ও সংলগ্ন প্রাসাদ রূপমতির নামের সঙ্গে প্রবাদগাথায় জড়িয়ে

আছে। আকবর কয়েকবার মাণ্ডুতে এলেও এর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। জাহাঙ্গির মাণ্ডু দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং পুরনো বাড়িগুলির সংস্কার করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে যা বক্তব্য রেখেছেন, সেটি আমরা দেখব। শাহজাহানও মাণ্ডুতে আসেন এবং তাঁর সভার চারজন স্থপতিও এখানে আসেন। হোসাঙ শাহর সমাধিফলকের একটি শিলালিপিতে ওস্তাদ হামিদের নাম আছে যিনি তাজমহল তৈরি করেন। ১৭৩২ সালে মল্লার রাও হোলকার মালবের মোগল শাসনকর্তাকে হারিয়ে ধর-এ তাদের প্রধান কেন্দ্র করেন। মাণ্ডু ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হতে থাকে।

মাণ্ডুর পশ্চিম দিকে পাহাড়ে পুরনো দুর্গের কিছু অংশ গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। যাকে বলা হয় বুধিমাণ্ডু। জঙ্গলের মধ্যে বড় হ্রদ ও পাঁচটি বড় মন্দিরের চিহ্নও দেখা যায়। দুই একটি দরজার চিহ্নও আছে। মনে করা হয় বর্তমান মাণ্ডুর আগে ওইখানে মাণ্ডু দুর্গ ছিল যেটি দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং নতুন মাণ্ডু গড়ে ওঠে। দুটি উঁচু পাহাড়ের মধ্যেকার গভীর মালভূমিতে নতুন মাণ্ডু গড়ে উঠে। সুতরাং পাহাড়ের চেহারার উপরে মাণ্ডুর চেহারা অনেকখানি নির্ভর করে আছে।

পারমার রাজারা প্রধানত মুঞ্জা-তালাও ঘিরে তাদের প্রাসাদ এলাকা তৈরি করেছিল। ফলে এই জায়গা ঘিরেই তৈরি হয়েছিল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। তিনদিকে ছিল গভীর উপত্যকা এবং দক্ষিণে ছিল পাহাড় যার তলায় শহর গড়ে উঠেছে। এর ফলে এর একটি স্বনির্ভরতা দেখতে পাওয়া যায়। প্রাক্-মুসলমান যুগের কিছু মন্দির এখানকার লোহানি গুহায় দেখা যায়—হিন্দু সময়কার—চুন সুরকি ছাড়া শুধু পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি। মুসলমান শাসকদের সময়ে সংস্কার করা হয়েছিল চুন ও সুরকির সাহায্যে। রামপাল দরজায় প্রাক্-মুসলমান যুগের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মাণ্ডুর চারপাশের উঁচু পাহাড়গুলি শক্ত পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এ ছাড়া মাণ্ডু দুর্গর মধ্যে দুটি জায়গা ছিল পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত—একটি উত্তরে মুঞ্জা-তালাও ও প্রাসাদ এলাকা ও অন্যটি দক্ষিণে বাজ বাহাদুর ও রূপমতির তথাকথিত প্রাসাদ ও রেওয়া কুণ্ড। এ ছাড়া রেওয়া কুণ্ডর বিপরীতদিকে সোনগড় পাহাড়ও বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল বলে ফেরিস্তা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

দুর্গের মধ্যে আসার প্রধান পথ ছিল উত্তর দিক থেকে যেখানে ছিল দিল্লি দরজা, কারণ দিল্লি ছিল ওইদিকে। ফলে এইদিকে ছিল পরপর অনেকগুলি দরজা ও সারি সারি দেওয়াল। এ ছাড়া পাঁচিলে ছিল অনেক বুরুজ। প্রধানত এই দিক থেকেই দুর্গের উপর আক্রমণগুলি হয়েছিল। ফলে দরজার অবস্থা ভগ্নপ্রায়। এর উপরের অংশটাও পড়ে গিয়েছে এবং এর ভিতরের দরজা পর্যন্ত ছিল ঢাকা। ছাদটা অবশ্য এখন নেই। পাঁচিলটা দক্ষিণ-পশ্চিমে তারাপুর দরজা পর্যন্ত গিয়েছে। ইতিহাসে এই দরজাও বিখ্যাত হয়ে আছে কারণ এই দরজা দিয়েও আক্রমণ করা হয়েছে। হুমায়ুন এই দরজা দিয়েই আক্রমণ করেন। ১৪০৬-৭ সালের একটি ছোট শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে যার ফলে এটি দিলওয়ার খানের সময়কার তৈরি বলে বলা যায়।

পাঁচিলটি এর পরে সোনগড় পাহাড়ে চলে যায়। এখানে একটি ছোট দুর্গ ছিল যেখানে ১৫৩৪ সালে গুজরাটের বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের আক্রমণের ফলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হুমায়ুন এটি অবরোধ করলে এর পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গা ঘেঁষে দড়ির সাহায্যে বাহাদুর শাহ নেমে পালান।

র‍্যালফ ফিচ ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষদিকে মাণ্ডুতে আসেন যাকে তিনি মাণ্ডভি বলছেন। বড় শক্ত শহর বলে তিনি একে অভিহিত করেছেন। উঁচু পাহাড়ের উপর শহরটা দাঁড়িয়ে এবং বড় জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আকবর নাকি বারো বছর ধরে এটি অবরোধ করেছিলেন, যেটি ইতিহাসের বিচারে টেঁকে না। বাজারের প্রবাদ শুনে ফিচ এটি লিখেছেন এটি ভাবতে অসুবিধে হয় না। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে উইলিয়াম ফিঞ্চ এসেছিলেন, ভাল বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। পাহাড়ের উপর তৈরি কিন্তু একটি গাড়ি যেতে পারে। পাহাড়ের গায়ে পাঁচিল দিয়ে ঘেরার মধ্যে একটি ভিতরে ঢুকবার দরজা আছে যার উপরে দুর্গ ও প্রাসাদ রয়েছে। বাঁ দিক দিয়ে একটু এগোলে একটি উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় আর একটি দুর্গ। অর্থাৎ ফিঞ্চ যে তারাপুর দরজা বা দক্ষিণ দিক দিয়ে ঢুকেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঁ দিকের দুর্গটিই সোনগড় ও দরজার উপরে যে প্রাসাদ বলছেন সেটি বাজ বাহাদুর ও রূপমতির প্রাসাদ যাকে উনি চিত্ত বিনোদনের প্রাসাদ বলছেন। শহরটি প্রায় তখনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে ছিল কতকগুলি সমাধি ও মসজিদগুলি। কয়েকটি পুরনো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়েছিল। পুরনো শহরটা উত্তর দরজা থেকে দক্ষিণ দরজা পর্যন্ত—পুব ও পশ্চিমে এটি মাত্র দশ ক্রোশের মতো। পুব দিকে ফাঁকা জায়গা তখনও ছিল। উত্তর-দক্ষিণের পথটা তখনও দেখা যায়। কিন্তু এটি 'গিরিডন' ধারার নয়—পূর্ব-পশ্চিমের ওরকম লম্বা পথ উত্তর-দক্ষিণের পথকে বিভক্ত করেনি। একটি কারণ হতে পারে যে সোনগড় ও বাজ বাহাদুর-রূপমতির প্রাসাদ প্রধান শহরাঞ্চল থেকে বিক্ষিপ্ত ছিল মনে হয়। শহরটা বরঞ্চ গড়ে উঠছিল প্রধানত দিল্লি দরজা বা উত্তর দিক থেকে ও পাহাড়ের ধার ঘেঁষে দুপাশে বাড়ছিল। কিন্তু জালিমহল পেরিয়ে আর যেতে পারেনি। বাজ বাহাদুর-রূপমতির প্রাসাদ ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ফলে ওখানে শহরের প্রসার আটকে যায়। শহরের মধ্যে ষোলোটি পুকুর ছিল এটি ফিঞ্চ বলেছেন। বাড়িগুলি ভাল পাথরে শক্ত করে তৈরি এবং প্রত্যেকটিরই দরজা আলাদা—যেটি ফিঞ্চ খ্রিস্টান জগতে দেখেননি। ফিঞ্চ সুলতান মাহমুদ শাহর তৈরি বিজয়স্তম্ভ দেখেছিলেন—১৭০টি সিঁড়ি দিয়ে তৈরি খুব উঁচু। এর চারপাশে ঢাকা বারান্দা করা যার মধ্যে জানালা। এ ছাড়াও বড় এক মসজিদের মধ্যে চারজন রাজার সমাধি দেখেছেন। এটিই হোসাঙ শাহর তৈরি জামা মসজিদ। সব দেখে ফিঞ্চের মনে হয়েছিল যে জায়গাটি দখল করা সম্ভব নয়। কিন্তু হুমায়ুন যে বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য নিয়ে জয় করেছিলেন, সেটিও বলছেন। উল্লেখযোগ্য যে ফিঞ্চ দেখেছেন যে শহরের বাইরে প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত শহরতলি চলে গিয়েছে। কিন্তু ফিঞ্চের সময়ই সেটি পরিত্যক্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কতকগুলি সরাইখানা, মসজিদ ও সমাধি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই—কোনও মানুষ আর আসে না।

র‍্যালফ ফিচের সমসাময়িক পর্যটক ছিলেন পাদরি মনসারেট। নর্মদা নদী পার

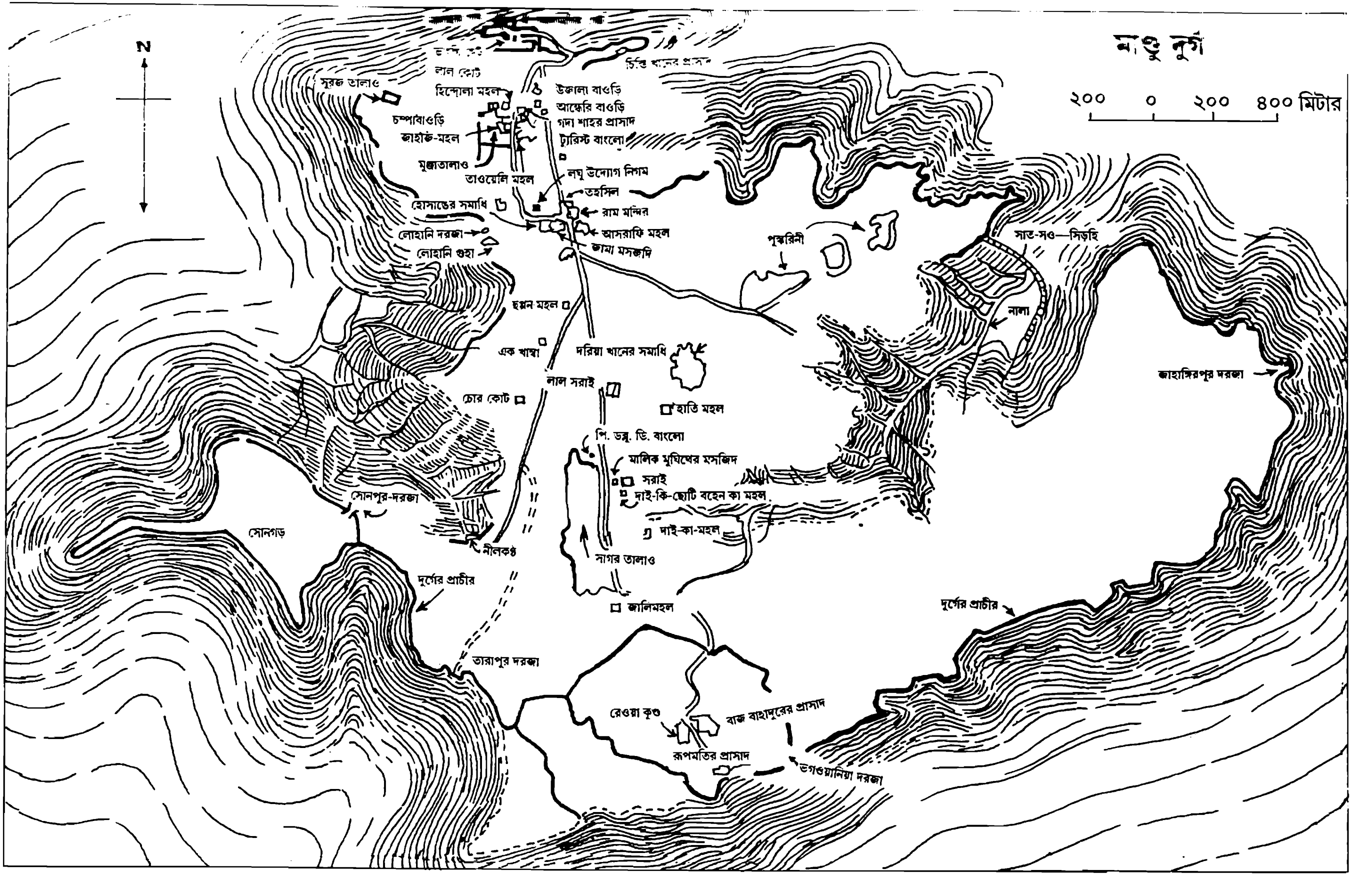
মাণ্ডু দুর্গ
২০০ ০ ২০০ ৪০০ মিটার
N
লাল কোট
সুরজ তালাও
হিন্দোলা মহল
উজালা বাওড়ি
আন্ধেরি বাওড়ি
চম্পাবাওড়ি
গদা শাহর প্রাসাদ
জাহাজ-মহল
ট্যুরিস্ট বাংলো
মুঞ্জাতালাও
তাওয়েলি মহল
লঘু উদ্যোগ নিগম
তহসিল
হোসাঙের সমাধি
রাম মন্দির
লোহানি দরজা
আসরাফি মহল
লোহানি গুহা
জামা মসজিদ
পুষ্করিণী
সাত-সও—সিড়হি
নালা
ছপ্পন মহল
এক খাম্বা
দরিয়া খানের সমাধি
জাহাঙ্গিরপুর দরজা
লাল সরাই
চোর কোট
হাতি মহল
পি. ডব্লু. ডি. বাংলো
মালিক মুঘিথের মসজিদ
সরাই
দাই-কি-ছোটি বহেন কা মহল
সোনপুর-দরজা
দাই-কা-মহল
সোনগড়
নীলকণ্ঠ
সাগর তালাও
দুর্গের প্রাচীর
জালিমহল
দুর্গের প্রাচীর
তারাপুর দরজা
রেওয়া কুণ্ড
বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ
রূপমতির প্রাসাদ
ভগওয়ানিয়া দরজা

সৌজন্য: 'মাণ্ডু': আর্কিওলজিকাল সারভে অভ ইন্ডিয়া

হবার দুদিন বাদে তিনি মাণ্ডুতে আসেন। উনি বলছেন যে শহরটি ২৪ মাইল গোলাকার—সবটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং কয়েক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে গিয়েছে। বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যে এমনভাবে তৈরি শহর দখল করা খুব শক্ত। ঢোকবার পথটা খুব সরু এবং পরপর তিনটি পাঁচিল দিয়ে ঢাকা। জলের কোনও অভাব নেই কারণ বহু পুকুর এর মধ্যে রয়েছে। মনসারেট মুসলমান লেখকদের লেখায় বিশ্বাস করেননি। তবে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছেন যে এটি মুসলমানদের তৈরি। ওঁর মতে মোঙ্গলরা বাইরে থেকে এসে এটি তৈরি করেছিল। পরে পাঠানরা হটিয়ে দেয়। ওরা শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়।

শহরের ভিতরে গিয়ে একটি কামান পড়ে থাকতে দেখেন। ওর পাশে বড় একটি প্রাসাদ আছে পুরনো রাজাদের। যেখানে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে থাকতে দেখেছেন। এখানে একটি চমৎকার দুর্গ আছে ও অর্ধেক তৈরি সমাধি। এর থেকে মনে হয় যে পাদরি দিল্লি দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন। প্রাসাদটি হিন্দোলা মহল ও সমাধিটি হোসাঙ শাহর, যদিও বলা হয় যে ১৪৪০ সালে মাহমুদ খলজি এটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। বর্ণনা দেখে অবশ্য মনে হয় যে তখন ওটা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি গির্জার ধরনের তৈরি একটি মন্দিরের কথা বলেছেন। কেউ কেউ একে বিজয়স্তম্ভ বলে ধরেছেন কিন্তু এটি রাম মন্দির হতে পারে। কারণ এর পাশে জামা মসজিদের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় মনসারেট আর বেশিদূর এগোননি। যদিও মাণ্ডু তখনও পরিত্যক্ত হয়নি।

সম্রাট জাহাঙ্গিরও দিল্লি দরজা দিয়ে আসেন। কারণ তিনি প্রথমেই হোসাঙ শাহর সমাধি ও বিপরীতদিকে জামা মসজিদ সম্পূর্ণ করেছিলেন। জাহাঙ্গির যদিও বলছেন যে বাড়ি বা প্রাসাদগুলি ভেঙে যায়নি, কিন্তু তার আগে তাঁর স্থপতি আবদুল করিম যে বাড়িগুলি মেরামত করেছিল, তার কথা বলেছেন। এর পিছনে প্রায় তিন লাখ টাকা খরচ করা হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের সময়ে মাণ্ডু ছিল মালবের একটি সরকার এবং এর খাজনা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মতো বছরে। অতএব মাণ্ডু তখন যে প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দিল্লি দরজা দিয়ে ঢুকলে ডান দিকে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন এলাকা পাওয়া যায় যেখানে হিন্দোলা মহল রয়েছে। এই বাড়ি প্রধানত গোপনীয় আলাপ আলোচনার জন্য ধরা ছিল এবং বাঁ দিকে পরপর দুটি পুকুর পেরিয়ে গদা শাহর প্রাসাদ, যেটি সর্বসাধারণের জন্য দরবার ছিল বলে ধরা হয়। পুকুর থেকে উপরের দুর্গতে জল নিয়ে যাবার জন্য জল তোলবার যন্ত্র ছিল। ফলে এই পুরো এলাকাটাই রাজকীয় প্রাসাদের এলাকার মধ্যে পড়ে। এরপর দক্ষিণ পর্যন্ত বাড়ি বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না। রাজকীয় এলাকার শেষ হচ্ছে জামা মসজিদে। এই উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার পথে দুটো সরাই-এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। মনে হয় দরিয়া খানের সমাধি থেকে শুরু করে জালিমহল পর্যন্ত ছিল সাধারণ শহর ও যার মধ্যে ছিল বাজার, যদিও তার কোনও চিহ্ন এখন আর নেই। জাহাঙ্গিরের সাত মাস থাকার সময়ের মধ্যে তিনি দরবার বসিয়েছিলেন এবং বহুলোক বাইরে থেকে এসেছিলেন যার মধ্যে টমাস রো ও করিয়াট উল্লেখযোগ্য। এঁদের থাকার জন্য বাড়ি ঠিক করে

দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিক কোথায় বাড়ি ছিল, সেটি অনুমান করা শক্ত। জালিমহল পেরিয়ে দক্ষিণে শুরু হয়েছে বাজ বাহাদুর ও রূপমতির দুর্গ-প্রাসাদ। এসব থেকে মনে হয় যে মাণ্ডু প্রধানত সরকারি শহর হিসেবে ছিল। যেসব লোক সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা ও কিছু ধর্মীয় লোকেরা ছাড়া আর বেশি কেউ ছিল না। এর ফলে আমরা শুধু সমাধি, মসজিদ ও অভিজাতদের বাড়ির বা সমাধির অংশ দেখি। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সাধারণ লোক এসে শহরের বাইরে বসবাস করতে শুরু করে, যার ফলে শহরতলি গড়ে উঠতে থাকে। ১৫৮০-র দশকে এই শহরতলি প্রচুর প্রসারিত হয়েছিল। অর্থাৎ শের শাহ ও হুমায়ুনের আক্রমণের পরেও মাণ্ডু আবার চলতে থাকলেও, আকবরের গুজরাট বিজয়ের পর এর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। কিছু পর থেকে এটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কোনও কোনও শাসনকর্তা এখানে এসে থাকলেও এর আগেকার জৌলুস আর ফিরে পায়নি। অর্থাৎ সরকারি উদ্যমে তৈরি হয়েছিল এবং সরকারি উদ্যম চলে গেলে এর পতন হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে টমাস রো-র লেখা থেকে বোঝা যায় যে মাণ্ডুর অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছে। ১৬১৭ সালের তেসরা মার্চ জাহাঙ্গিরের দলের সঙ্গে টমাস রো মাণ্ডু এসে পৌঁছোন। ৬ মার্চ রো শহরে ঢোকেন এবং ওখানে গির্জা ও একটা সমাধি দেখতে পান। রাজার একজন আমলা ওটা দখল করেছিল। কিন্তু রো অনুমতি জোগাড় করে ওকে সরিয়ে নিজে বাড়িটা অধিকার করেন। মাণ্ডু থেকে সুরাটে লেখা রো-র চিঠি থেকে বোঝা যায় যে উনি দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ধারে কিছু উপরে ছিলেন যেখানকার বাতাস ভাল। কিন্তু এটা রাজার বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে এবং জলের বড় অভাব। ওঁর বর্ণনা অনুযায়ী তারাপুর দরজার পাশে ওই ধরনের একটা মসজিদ, সামনে সমাধি ও আশেপাশে আরও কয়েকটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এটাও মনে করা হয় যে রো-র আগে ওই মসজিদ থাকার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। রো বলছেন যে জলের পুকুরগুলি আমির ওমরাহরা দখল করে নিলে সাধারণ লোকেরা খুব কষ্ট পেয়েছিল। রো-র আর একটা অপ্রকাশিত চিঠি থেকে জানা যায় যে তাঁর জন্য জল আনতে তাঁর লোকেদের প্রায় চার মাইল পর্যন্ত বাইরে যেতে হয়েছিল। শেষকালে রো ঘোড়া চড়ে গিয়ে একটা পুকুর খুঁজে পান যেটা একজন খান-এর দখলে ছিল। রাজার অনুমতি নিলে রো ওর কাছ থেকে রোজই জল পেতেন। এ জলটা অবশ্য ঝরনার জল যেটি খুঁজে পেয়েছিল টমাস হার্বার্ট। কিছু দিন বাদে ওই জল নিয়ে কাজির লোকেদের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল। কিন্তু রো-র জলের অভাব কমে গেলেও, সাধারণ লোকের কষ্ট কমেনি। মাণ্ডুর রাস্তায় উঁচু দামে জল বিক্রি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গির নর্মদা থেকে প্রতিদিন বিশ উট জল আনার ব্যবস্থা করেন।

জলের এত অভাব হবার কারণ বোধহয় জলের নালিগুলি বন্ধ হয়ে জায়গাটি পরিত্যক্ত হবার জন্য। ফলে জাহাঙ্গির চলে যাবার পর আবার জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনীতে অবশ্য জলের অভাবের উল্লেখ কোথাও নেই।

রো-র বক্তব্য থেকে মনে হয় যে লম্বায়—উত্তর থেকে দক্ষিণ—শহরটি তিন চার মাইলের বেশি বড় নয়। পূর্ব ও পশ্চিমে পাহাড়ের সারি কখনও এগিয়ে এসেছে,

কখনও বা পিছিয়ে গিয়েছে। এই পাহাড়ের গা ঘেঁষে উঁচুতে ও নিচুতে বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো সবই অভিজাতদের বাড়ি বলে মনে হয়। এরই একটাতে, এখানে অবশ্য মসজিদ বলে বলা হচ্ছে, রো ছিলেন। ফলে সাধারণ লোকেরা পথের দুধারে ফাঁকা জায়গায় কুটির বেঁধে ছিল যার কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের অভাবে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যর অভাবে এর থেকে পরিষ্কার করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

৩.২ বাহমনি, গুলবর্গা

মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময় দৌলতাবাদে কিছুকাল রাজধানী থাকলেও, চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাহমনি সুলতানরা নতুন জায়গায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ প্রধানত দাক্ষিণাত্যের অভিজাতদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে স্বাধীন হয়ে যান। নানা ধরনের বিদ্রোহ দমন করে উনি গুলবর্গাতে রাজধানী স্থাপন করেন। ওখানে একটি দুর্গ ও নানা ধরনের বাড়িও তৈরি করান। ১৩৫৮ সালে ওঁর মৃত্যুর সময় বাহমনি রাজ্য উত্তরে মাণ্ডু থেকে দক্ষিণে রায়চুর ও পুবে ভোগা থেকে পশ্চিমে দাভোল ও গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজারা ওঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

১৩৫৮ সালে আলাউদ্দিন হাসানের মৃত্যু হলে পর মুহম্মদ প্রথম রাজা হন। অন্তত তিনটি সৌধ তাঁর সময়ে তৈরি হয়েছিল যেগুলি এখনও পর্যন্ত আছে। এগুলি হল গুলবর্গা দুর্গের মধ্যে জামা মসজিদ, গুলবর্গা শহরে শাহিবাজার মসজিদ ও ওসমানাবাদে হজরত শামসউদ্দিনের সমাধি—যাদের মধ্যে তুঘলকি ও বিদেশি ধারার ছাপ পাওয়া যায়। শাহিবাজার মসজিদে তুঘলকি দেওয়ালের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেটা মুহম্মদ প্রথম-এর সমাধির দরজায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গুলবর্গা দুর্গের মধ্যেকার জামা মসজিদে পারসিক, তুর্কি ও হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট যার ফলে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য শিল্পের আঙ্গিক একটা নতুন মোড় নিয়েছিল। ভারতের অন্যান্য মসজিদের মতো খোলা আকাশের নীচে জমায়েত না করে এখানে সমস্ত মসজিদই ছাদে ঢাকা, যার সঙ্গে ইউরোপের স্প্যানিশ ও তুর্কি মসজিদের তুলনা করা চলে।

১৩৭৫ সালে মুহম্মদ প্রথম-এর মৃত্যু থেকে ১৩৯৭ পর্যন্ত অর্থাৎ ফিরোজ শাহর গুলবর্গার সিংহাসনে আরোহণ করা পর্যন্ত দেশে অশান্তি চলতে থাকে। দিল্লির প্রভাব ক্রমশ কমে যায় এবং তার জায়গায় বহু বিদেশি প্রধানত পারস্য উপসাগরীয় উপকূল ও কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর উপকূল থেকে আসতে থাকে। ইরান, ইরাক ও আরবদেশ থেকে যারা এসেছিলেন, তাঁরা প্রধানত কবি, সাহিত্যিক, ধর্মীয় লোক, কারিগর, বণিক ও সৈন্যরা। বাহমনি সুলতানরা এদের মধ্যে কোনও কোনও লোককে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলেন। বাকিরা নিজের তাগিদেই এসেছিল।

ফিরোজ শাহর সময়ে হিন্দু ও অন্যান্য প্রভাব বাহমনি সাংস্কৃতিক জীবনে ছাপ রেখে যায়। ফিরোজ নিজে উদ্যোগ নিয়ে দাভোল ও পশ্চিম এশিয়ায় জাহাজ পাঠান। বহির্বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গুলবর্গা শহর বাড়তে থাকে। দরবেশ হজরত সৈয়দ মুহম্মদ জেসু দরাজ গুলবর্গায় এসে প্রাসাদের কাছে আস্তানা গড়েন; যদিও পরে ওঁকে সরে যেতে হয়। পারসিক-বাহমনি-হিন্দু প্রভাবে ফিরোজের সমাধি তখনকার কালের স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময় ছিল।

রাজ্যের মধ্যে সংহতি ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার ফলে গুলবর্গা শহরের আয়তন লোকসংখ্যার তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে ফিরোজ শাহ ফিরোজাবাদ নামে একটা বড় শহর তৈরি করেন ভীমা ও বুহোরা নদীর সংযোগ স্থলে যার উপরে পণ্ডিত ক্লস ফিসার একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানকার স্থাপত্যশিল্প বিস্ময়কর হলেও গুলবর্গার থেকে একেবারে আলাদা নয়। ভীমা নদীর পারে শহরটির বৈশিষ্ট্য ছিল বড় বড় পথ সোজা চলে গিয়েছে যার দুধারে দোকান। এটা অবশ্য কিছু নতুন নয়। সমকালীন পাণ্ডুয়াতেও এই ধরনের পথের ও দোকানের সারি পাওয়া গিয়েছে। এখানকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে ভীমা নদীর জল পাইপের সাহায্যে তিনি প্রাসাদের মধ্যে এনেছিলেন। সমকালীন বিজয়নগর থেকে এটা আলাদা। বিজয়নগরে প্রধানত বিরাট পুষ্করিণী কেটে তার জল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিক থেকে এটা দিল্লির ব্যবস্থার থেকেও আলাদা। পাঁচিলে ঘেরা দুর্গ তৈরি করে এর চারটি দরজা চারটি পথ দিয়ে শুরু। দুর্গের ভিতরে রাজকীয় সব ব্যবস্থাই পাওয়া যায়—*দিওয়ান-ই খাস,* হারেমের জন্য *কাঞ্চনি মহল* যার চারপাশে নানা ধরনের ঘর ছিল বিশিষ্ট মহিলাদের জন্য। জেনানা মহলের মধ্যেও খিলান দেওয়া ঘর পাওয়া যায়। এ ছাড়া মুসাফিরখানা ও মসজিদও ছিল। সাধারণের জন্য রান্না করা ও খাওয়ানোর জায়গাও পাওয়া যায় যদিও এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিজয়নগরেও এরকম জায়গা পাওয়া গিয়েছে। ফিরোজাবাদের খাওয়ার ঘরটিতে গম্বুজ ও পিরামিডের মিশ্রণ করা হয়েছিল। যা তুঘলকি স্থাপত্যশিল্প থেকে বাহমনি শিল্পের স্বকীয়তার দিকে নিয়ে যায়।

ফিরোজ শাহ বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দুই দাসের ক্রীড়নক হয়ে তাঁর ভাই আহমদ শাহকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। আহমদ শাহ যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরোজ শাহর জীবিতকালেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুলবর্গাতে মসজিদ তৈরি করলেও সমকালীন ফারসি সাক্ষ্য অনুযায়ী আহমদ শাহ তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে (১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ) বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

কেউ কেউ বলেন যে গুলবর্গায় সাধু জেসু দরাজের মৃত্যুর বেদনায় আহমদ শাহ রাজধানী পরিবর্তন করেন। কারণ আহমদ শাহ সাধুর অনুচরের সমান ছিলেন। এটা একটা কারণ হলেও প্রধান কারণ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে গুলবর্গায় লোকসংখ্যা বেড়ে যাবার ফলে ফিরোজ নতুন শহর বসান। সে শহরটিও বড় নয়—ফলে ওই শহর রাজধানী হবার উপযুক্ত ছিল না। সবথেকে বড় কারণ বোধহয় যে ওই শহর বাহমনি সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে নয়। বরঞ্চ দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ের কোলে বিদরের অবস্থান সেদিক থেকে ভাল। এ ছাড়া গোদাবরী নদীর ধারে হওয়ার

ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি মাত্রায় হতে পারবে বলে ধরা হয়েছিল। আহমদ শাহর স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে ফিরোজাবাদের স্থাপত্য শিল্পের যোগ খুব কম যদিও মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আসা লোকের সংখ্যা ফিরোজের সময়কার তুলনায় বোধহয় বেশিই ছিল। ওঁর শিল্পে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার প্রভাব খুব বেশি পাওয়া যায়।

৩.৩ বিদর

বিদরের পুরনো ইতিহাস নল ও দময়ন্তীর প্রবাদের সঙ্গে জড়িত। এখানে হিন্দুদের পুরনো কিল্লা ও জলাধার পাওয়া গিয়েছে যেখান থেকে প্রাসাদে জল যেত। এই কিল্লার পাশে আহমদ শাহ তাঁর দুর্গ তৈরি করেন এবং পরবর্তী বংশধররা তার মধ্যে বহু সংযোজন করেছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার গজ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। চতুষ্কোণ এই দুর্গটি ছিল প্রায় এক মাইল লম্বা ও আধমাইল চওড়া। বিদর পাহাড়ের ধারে এটা করা হয়েছিল—পূর্ব দিকে এর উচ্চতা ছিল সমুদ্রতল থেকে ২৩৩০ ফুট। এর চারধার ঘিরে যে খাল ছিল, তার মাঝখানে বড় বড় পাথরের চাড় ফেলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে একটা খালের জায়গায় আমরা তিনটি খাল দেখতে পাই। দেওয়ালে অনেকগুলি বড় বড় বুরুজ ছিল যার প্রত্যেকটিরই একটা করে নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বারি *তোপ কা বুরুজই* ছিল সব থেকে বড়।

পুব দিক দিয়ে ঢুকলে প্রথমে যে দরজাটা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় *শারজা* দরজা। এটি পরবর্তীকালে ঔরংজেব তৈরি করেছিলেন। আহমদ শাহর সময়ে এটি অন্য কোনও অবস্থায় ছিল কিনা বলা শক্ত। পরবর্তী যে দরজাটি পাওয়া যায় সেটিকে বলা হয় *নহবত* দরজা কারণ এটি দিয়েই *নহবতখানায়* যাওয়া যায়। এটি আহমদ শাহর সময়কার তৈরি। এর পর আমরা পাই তৃতীয় দরজা যাকে *গম্বুজ* দরজা বলা হয়। বাঁকানো খিলান এবং সমান গম্বুজের ব্যবহার কিছুটা তুঘলকি স্থাপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর পরে পাওয়া যায় *সোলা খাম্বা* মসজিদ যেটি বিশাল আকারের ষোলোটি স্তম্ভের উপর তৈরি করা হয়েছিল। এর ছাদে একটি জলাধার ছিল যেখান থেকে মসজিদে ও বোধহয় প্রাসাদে জল চালান যেত। কিন্তু এই মসজিদটি গুলবর্গার জামা মসজিদের অনুকরণে তৈরি। উল্লেখযোগ্য যে ষোলোটি স্তম্ভ থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনারত যে কোনও লোকই ইমামকে দেখতে পেত। ১৯২৯ সালের খননকার্যের ফলে জানা যায় যে পাশে যে সৌধটি আছে সেটি দরবারকক্ষ। এ ছাড়াও বোধহয় পরবর্তীকালের তৈরি *দেওয়ান-ই খাস* ও *দেওয়ান-ই-আম* পাওয়া যায়। বাহমনি যুগে অবশ্য এদের বলা হত *আওয়ান-ই-বার-ই-খাস* ও *আওয়ান-ই-বার-ই-আম।* এগুলির চারপাশে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর পাওয়া যায় যেগুলি দরবারের কাজের সঙ্গে জড়িত।

এখান থেকে *তখত মহল* বা সিংহাসন ঘর এবং প্রাসাদের অন্যান্য অংশে যাওয়া যায়। ঔরংজেবের বিজয়ের প্রাক্কালে আদিলশাহি শাসনকর্তা প্রাসাদ এলাকা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেন। ফলে অনেক বাড়িই ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তখত মহলের দেওয়াল, স্নানঘরের দেওয়াল ও *হাজার কুঠুরি* বা হাজার ঘরের অংশবিশেষ উদ্ধার করা গিয়েছে। তখত মহলের কাছে বিশাল বড় হলঘর পাওয়া গিয়েছে যা ৭৫ ফুট ও ৩৫ ফুট এর সমান। এ ছাড়া উজ্জ্বল টালি দিয়ে তৈরি সিঁড়ি দিয়ে মাটির নীচের ঘরে যাওয়া যায়। তখত হলটিতে ইরানি প্রভাব খুব বেশি ছিল বলে পণ্ডিত গোলাম ইয়াজদানি মন্তব্য করেছেন। নানাধরনের রঙের টালি দিয়ে তৈরি করা এই হলঘরে ইরানি প্রতীক—উদীয়মান সূর্য ও বাজ-এর প্রতীক পাওয়া যায়। প্রাসাদের বিভিন্ন দরজায় কালো পাথরের ও স্তম্ভের মধ্যেও হিন্দুধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলছেন যে দুর্গটি সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে দুর্গটি সম্পূর্ণ হবার আগেই আহমদ শাহ নতুন রাজধানীতে চলে যান।

বিদরের সমকালীন বর্ণনা আমরা পাই রুশ ভ্রমণকারী আথানাসিয়াস নিকিতিন-এর লেখা থেকে। নিকিতিন ১৪৭০-এর দশকে বিদরে আসেন। একে উনি বলছেন বড় শহর। এখানে ঘোড়া, রেশম, কালো দাস ও অন্যান্য জিনিসের ভাল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ শহরে কেবলমাত্র ভারতে তৈরি জিনিস বিক্রি হয়। প্রায় সবাই কালো আর পাজি এবং মেয়েরা ডাইনি বা বেশ্যা। এখানে খোরাসানিরা রাজত্ব করে—রাজা ও অধিকাংশ অভিজাতই খোরাসানি। হিন্দুরা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে খালি পায়ে চলে ও প্রায় জামাকাপড় পরে না। বিদর থেকে ৪০ মাইল দূরে ঘোড়া বিক্রির মেলা হয় যেখানে বিদর থেকে প্রায় দশ হাজার ঘোড়া বিক্রি হয়।

বিদরের সুলতানের বয়স কুড়ি এবং অভিজাতরাই একে পরিচালনা করে। এর থেকে মনে হয় মুহম্মদ শাহ তৃতীয়র সময়ে (১৪৬৩-১৪৮৬) নিকিতিন এসেছিলেন, সম্ভবত ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে। মুহম্মদ গাওয়ান তখন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নিকিতিন একেই *মালিক-ই তুজ্জার* বলছেন যার অধীনে ছিল দু লাখ সৈন্য।

বিদরের লোকসংখ্যা প্রচুর বলে নিকিতিন বলেছেন। সাধারণ লোকেরা অত্যন্ত গরিব এবং অভিজাতরা অত্যন্ত ধনী ও বিলাসি। এরা রুপোর পালকি করে প্রচুর সৈন্য নিয়ে যাতায়াত করে।

সুলতানের প্রাসাদে সাতটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজাতেই ১০০টি রক্ষী ও ১০০টি মুসলমান লেখক আছে যারা কে কখন ঢুকছে ও বেরোচ্ছে লিখে রাখে। শহরের মধ্যে বিদেশিদের প্রবেশ নিষেধ। নিকিতিন প্রাসাদটিকে অত্যন্ত সুন্দর বলে বলেছেন। প্রায় প্রতিটি পাথরই সুন্দরভাবে কাটা ও সোনার জল দিয়ে মোড়া। প্রাসাদের মধ্যে কয়েকটি বিচারালয় আছে। সারারাত বিদর শহর কোতোয়ালের লোকেরা পাহারা দেয়। এরা ঘোড়ায় চড়ে মশাল নিয়ে চলাফেরা করে। বিদরের রাস্তায় বড় বড় সাপ দেখা যায়। হিন্দুরা প্রায় সবাই নিরামিশাষী। নিকিতিন নিজেকে খোরাসানি মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে শহরে চার মাস ছিলেন।

নিকিতিনের রচনার মধ্যে নানা অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। এক জায়গায় উনি বলেছেন যে বিদরে সব রকমের খাবার পাওয়া যায়। আবার আর এক জায়গায় তিনি

টাটকা সবজি পাওয়া যাচ্ছে না বলে বলেছেন। এ ছাড়া তিনি সব অভিজাতই খোরাসানি বলে বলেছেন। কিন্তু পরে বলছেন যে চারজন হিন্দু মন্ত্রী ছিল।

নিকিতিন-এর লেখা ও সমকালীন পারসিক সূত্র থেকে হারুন খান শেরওয়ানি ধরেছেন যে বিদর শহর পনেরো মাইল লম্বা ও প্রায় ততখানিই চওড়া। নিকিতিন একে মুসলমান হিন্দুস্থানদের প্রধান শহর বলেছেন। এখানেই মাহমুদ গাওয়ান তাঁর বিখ্যাত মাদ্রাসা তৈরি করেন যেটি লম্বায় ২৫০ ফুট ও চওড়ায় ১৮০ ফুট। মাহমুদ-এর চিঠি থেকে জানা যায় যে উনি ইরান ও ইরাক থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বিদরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিকিতিন আসার সময়েই ১৪৭২ সালে এই মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল যা সমকালীন শিলালেখ থেকে জানা যায়। নিকিতিন এর কোনও উল্লেখ করেননি। নিকিতিন অবশ্য মাহমুদ-এর ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন যে প্রতি রাত্রে খাবার জন্য পাঁচশো লোক আসত, যার মধ্যে মাত্র তিন জন ছিল মন্ত্রী। এর থেকে মনে হয় যে বিদেশ থেকে যে সব বিলাসদ্রব্য আসত, সেগুলি সবই সুলতান ও অভিজাতদের জন্য। শহরে সাধারণ লোকদের ক্রয়ক্ষমতা ছিল না এবং কোনও চাহিদাও ছিল না। বিভিন্ন পেশার লোকেদের সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না।

অন্য অনেক তৈরি করা শহরের মতো বিদর পরিত্যক্ত হয়ে যায়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসানের পর বিদর একটি সাধারণ শহর হিসেবে চালু থাকে গুলবর্গার মতো। বিজয়নগর বা ফতেপুর সিক্রির মতো মাটির তলায় চলে যায়নি যদিও আগেকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জৌলুষ আর ছিল না বললেই চলে। বরঞ্চ পরবর্তীকালে গোলকুণ্ডার চমকপ্রদ উত্থান ও মোগল সাম্রাজ্যের রথযাত্রায় বিদর ও গুলবর্গার দীপ্তি অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। রাজা ও অভিজাতদের প্রস্থানের পর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা এই সব শহরে অব্যাহত থাকে।

৪

বিজয়নগর

হাম্পি গ্রাম থেকে বিজয়নগর শহরের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের কাছে এই জয়যাত্রার মূলে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ যার ছোঁয়া আরও পরিষ্কারভাবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ও ইতিহাসে পাই। বাংলার মধ্যযুগের প্রধান শহর গৌড়ের উপর পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের লেখা পাই। কিন্তু সমকালীন বিজয়নগর শহরের উপর এই ধরনের লেখা প্রায় বিরল। ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট সিওয়েল ১৯০০ সালে বিজয়নগরের উপর যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার প্রথম ভাগ রাজনৈতিক কার্যকলাপের ইতিহাস ও দ্বিতীয় ভাগে সমকালীন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীদের অনূদিত বর্ণনা। ইতিহাসকে রোমান্টিক রচনায় নিয়ে এলেও, সিওয়েল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের প্রতি কর্তব্য করতে ভোলেননি। বিজয়নগর প্রতিষ্ঠার বহু পরম্পরার উল্লেখ করে তিনি যে পরম্পরা গ্রহণ করেছেন, সেটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। এটা কিছু নতুন নয়। সমকালীন প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্দার কানিংহাম-এর লক্ষণাবতী খুঁজে বের করার চেষ্টার মধ্যে এই মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। যেটা বিস্ময়কর সেটা হচ্ছে যে ১৯৭৩ সালে সর্বভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ হাম্পির উপর যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাতে ওই ইংরেজ মনোভাবকেই স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। হিন্দু প্রতিরোধ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে যে বিজয়নগরের জন্ম সেটা বারবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই একই মনোভাব অস্পষ্টভাবে আমরা পাই পরবর্তীকালে প্রয়াত অধ্যাপক বারটন স্টাইনের লেখা *কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার* প্রথম খণ্ড থেকে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নানান দিক ও প্রধানত অর্থনৈতিক আলোচনা চাপা পড়ে যায় সেটা বলাই বাহুল্য। এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠার একটা কারণ হয়তো এই যে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা নগরায়ণের ইতিহাস আলোচনা করার জন্য যে তত্ত্ব দরকার, তার খোঁজ ব্যাপকভাবে করেননি। উত্তর ভারতে এ প্রচেষ্টা হলেও বা প্রাক্-মুসলিম যুগ সম্বন্ধে কিছু কিছু চেষ্টা হলেও, দক্ষিণ ভারতে এ চেষ্টা সবে শুরু হয়েছে।

এই প্রচেষ্টা হয়তো একভাবে করা যায় যেটা আমরা এখানে দেখব। সেটি হচ্ছে বিজয়নগর শহরের ইতিহাসের সঙ্গে পূর্ব ভারতের গৌড় বা পশ্চিম ভারতের খাম্বাজ-

এর ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করলে নানান দিক আলোকিত হবে। এর মধ্য থেকে বিজয়নগর শহরের উত্থান-পতনের ইতিহাসের হদিস পাওয়া যাবে।

আমরা আগে দেখেছি যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দিল্লি সুলতানদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। যার ফলে দূর প্রান্তের প্রদেশগুলি বিভিন্ন রাজবংশের মাধ্যমে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এদের রাজধানীগুলিই গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিবর্তিত হয় যদিও অনেক ক্ষেত্রে সে শহর ছেড়ে, ওই সব রাজারা নতুন জায়গায় রাজধানী ও শহর বসান। বাহমনি সুলতানদের প্রথমে গুলবর্গাতে ও পরে বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা এই ধরনের দৃষ্টান্ত।

সমকালীন বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ওই একই ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুলতান ইলিয়াস শাহর অধীনে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একটি শাসনতন্ত্রের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য হয়ে যায়। প্রায় এক শতাব্দী ধরে এর রাজধানী থাকে উত্তর বাংলার পাণ্ডুয়া শহরে। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহর সময়ে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল অভিযানের প্রাক্কালে গৌড় পরিত্যাগ করে সুলতান গঙ্গার পারে তাণ্ডায় রাজধানী স্থাপন করেন। বাংলার এই ইতিহাস আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখব। উল্লেখযোগ্য যে শুধু বাহমনিদের ইতিহাসের সঙ্গে নয়, বিজয়নগরের ইতিহাসের সঙ্গেও এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। পরম্পরা অনুযায়ী বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা ধরা হয় ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের পর শহর পরিত্যক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তিনটি ক্ষেত্রেই, বাংলা, বাহমনি ও বিজয়নগর, নগরায়ণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে স্থানীয় শক্তির স্বাধীনতা প্রকাশের মধ্যে যাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আখ্যা দিলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়।

পরম্পরা অনুযায়ী প্রাচীন যুগ থেকেই হাম্পি ধর্মক্ষেত্র হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রবাদ ছিল যে এখানেই কিষ্কিন্ধ্যাক্ষেত্র ছিল যাকে বলা হত পম্পা ক্ষেত্র। কানাড়া ভাষায় তুঙ্গভদ্রা নদীর পুরনো নাম পম্পা। রাম এখানে এসে বালি বধ করেন বলে কথিত আছে এবং কাম্পিলার পথে মাল্যবন্ত পাহাড়ে বাস করেছিলেন বলে বলা হয়। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিকের পাহাড়কে মাতঙ্গ পর্বত বলা হয় যেখানে সুগ্রীব আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

বিজয়নগরের উত্থানের আগে বিভিন্ন রাজবংশ এই জায়গায় অধিকার প্রসারিত করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাদামির চালুক্য বংশ, কাদম্ব বংশ, হোয়সালা বংশ, যাদব, রাষ্ট্রকূট ও অন্যান্যরা। একাদশ শতাব্দীতে হাম্পির ১৯ কি.মি. দূরে পশ্চিমে চালুক্যদের রাজধানী ছিল কাম্পিলাতে। হাম্পি এদের অধীনে ছিল বলে মনে করা হয়। ১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে কাম্পিলা মুহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রবাদ আছে যে মুহম্মদ বিন তুঘলক কাম্পিলার খাজাঞ্চিখানা থেকে হরিহর ও বুক্ককে দিল্লি নিয়ে যান। কিছুকাল পরে বিদ্রোহ হলে হরিহর ও বুক্ককে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হলে এরা স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর শহরের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ পারে এই শহরটি ছিল উত্তর পারের পুরনো কেল্লা আনেগুণ্ডির বিপরীত দিকে। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে শহরটি তৈরি হয়ে যায়। সঙ্গম বংশের রাজারা ছিলেন বিজয়নগরের প্রথম দিকের শাসক এবং এদের আরাধ্য দেবতা ছিল ভগবান বিরুপাক্ষ। ১৩৫৭ সালে হরিহর মারা গেলে বুক্ক ১৩৭৭ সাল অবধি রাজত্ব করেন যে সময়ের মধ্যে তিনি চিনদেশেও দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি মাদুরা জয় করে রাজ্যসীমা বাড়ান। এঁর ছেলে দ্বিতীয় হরিহর-এর সময়ে (১৩৭৭-১৪০৪) উত্তর দিকের সীমানা ছিল কৃষ্ণা নদী এবং সম্ভবত সিংহলও কিছু সময়ের জন্য জয় করা হয়েছিল। এঁর ছেলে প্রথম দেবরায়ের সময় ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলো কন্টি বিজয়নগরে আসেন যার বর্ণনা আমরা পরে দেখব।

এর ছেলে দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়ে (১৪২২-১৪৪৬) পারস্যর দূত আবদুর রাজ্জাক বিজয়নগরে আসেন। তিনি একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। উনি বলছেন যে ওই সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সিংহল থেকে গুলবর্গা ও উড়িষ্যা থেকে মালাবার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ১৪৪৩ সালে রাজ্জাকের বিজয়নগরের বর্ণনা আমরা পরে দেখব।

দ্বিতীয় দেবরায়-এর পরে বিজয়নগরের পতন শুরু হয় ও যথাক্রমে সালুভা বংশ ও তুলুভা বংশের রাজারা রাজত্ব করতে থাকেন। তুলুভা বংশের সব থেকে বিখ্যাত রাজা হলেন কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-২৯) যাঁর সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য উন্নতির শিখরে উঠেছিল। এঁর সময়েই পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা—দুয়ার্ত বারবোসা, ডোমিঙ্গো পায়েজ ও ফারনাও নুনিজ বিজয়নগরে আসেন। প্রধানত এঁদের বর্ণনা থেকেই শহরের ছবি পরিষ্কার হয়ে আসে। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরে আবার পতন শুরু হয় এবং অরভিদু বংশের রাজা সদাশিবের সময়ে কৃষ্ণা নদীর পারে তালিকোটার যুদ্ধে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির কাছে পরাজিত হয়। বিজয়ীরা বিজয়নগর শহর ধ্বংস করে দেয় যদিও সদাশিব প্রাণ বাঁচিয়ে পেনুকোণ্ডাতে পালান ও সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। মোগলরা পরবর্তীকালে বিজয়নগর দখল করে ও পরে নিজামের রাজত্বের মধ্যে চলে যায়। ১৭৮০ সালে হায়দার আলি এ জায়গাটি দখল করেন। বিজয়নগর শহর মাটির তলায় চলে গেলে ১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা বহু মন্দির ও অন্যান্য জায়গা বের করেন যে কাজ এখনও চলছে। দুঃখের বিষয় যে অতি উৎসাহের ফলে বিভিন্ন সৌধ পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে, যেগুলি ওইভাবে ওখানে ছিল কিনা সন্দেহ আছে। এ ছাড়া প্রচলিত প্রবাদগুলি প্রায় বিনা বিচারে মেনে নেওয়া হয়েছে যার ফলে শহরের পুরনো ছক তৈরি করা শক্ত হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থার প্রকাশনায় একটা রেখাচিত্র দেওয়া আছে। এর থেকে ও শহরের অংশবিশেষ পরীক্ষা করলে দুটি দিক সামনে আসে। প্রথমত শহরটি পাহাড়ে ঘেরা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিকে যেখানে নদীটি ভিতরের দিকে বাঁক নিয়ে একটা বাঁকানো ধনুকের মতো হয়েছে তার ভিতর দিকে তৈরি। এর অপর পারে, অর্থাৎ উত্তর দিকে ছিল পুরনো দুর্গ আনেগুণ্ডি যেটির অবস্থান ছিল ধনুকের বাইরের দিকে। মধ্যযুগের শহর সাধারণত বাইরের দিকে তৈরি কারণ নদীর মাঝখানটা শহরের কাছে থাকে যার ফলে জল নেবার সুবিধা হয় এবং শহরের দুই

প্রান্ত প্রসারিত হতে বাধা থাকে না। শহরটি নদীর পার ধরে চলতে থাকে যতক্ষণ না নদী আবার ভিতরে বাঁক নেয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে এবং দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও মধ্যযুগের শহর বাঁকের ভিতরে পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে জল নেবার একটা সমস্যা দেখা যায় প্রধানত মাঝখানের অংশের। সুবিধে এই যে শহরের দুই প্রান্তের অধিবাসীদের জলের সমস্যা বড় হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়ত যেটা দেখা যায় এই রেখাচিত্র থেকে সেটি হচ্ছে যে রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা নদীর থেকে বেশ দূরে। ফলে প্রাসাদ এলাকার জলের জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছিল যা আমরা ধ্বংসাবশেষ ও সমকালীন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীদের বর্ণনা থেকে পাই। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা থাকার ফলে এই সমস্যার সমাধান বিজয়নগরের রাজারা করতে পেরেছিলেন। প্রধানত রাজপ্রাসাদের চেয়ে উঁচু এলাকায় বড় বড় পুকুর কেটে ও সেখান থেকে পাথরের তৈরি বড় নালি দিয়ে প্রাসাদ এলাকায় জল আনার ব্যবস্থা করেন। প্রাসাদের কাছে এই এলাকায় ওই পাথরের নালি এখনও রয়েছে। পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরাও বলে গিয়েছেন যে পাথরের নালির সাহায্যে জল আনা হত। অর্থাৎ সমকালীন দিল্লিতে যেমন নদী থেকে নালি বা খাল কেটে জল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বিজয়নগরে তার কোনও চিহ্ন নেই। কেন নদীর উত্তর পার থেকে দক্ষিণ পারে এরা এলেন শহর বসাতে, তার কোনও যুক্তি এখনও পাওয়া যায়নি। একটা অনুমান করা যেতে পারে এবং এটি কেবলই অনুমান মাত্র, যে নদী ওই সময়ে অর্থাৎ হরিহর ও বুক্কর শহর প্রতিষ্ঠার সময়ে বাঁক নিচ্ছিল। ফলে মনে হতে পারে যে আনেগুণ্ডির একটা অংশ জলের তলায় চলে যেতে পারে। আর একটিও অনুমান করা যেতে পারে। বর্তমান বিজয়নগর শহর উত্তর, দক্ষিণ ও পুবে পাহাড়ে ঘেরা—কেবলমাত্র পশ্চিম দিকই খোলা আছে। ফলে সুরক্ষিত জায়গা হিসেবে শহরটির অবস্থান সুন্দর। এই জন্য শহরের প্রসার কেবলমাত্র পশ্চিম দিকে অর্থাৎ হসপেটের দিকেই হতে থাকে। বিজয়নগর থেকে হসপেট পর্যন্ত যে শহর প্রসারিত হচ্ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ এ অঞ্চলে না হওয়ায়, পরিষ্কার ছবি পাওয়া শক্ত।

কমলাপুরম ও হাম্পি গ্রামের মধ্যেই প্রধানত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। তুঙ্গভদ্রার তীরে স্বভাবতই ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। দুর্গের মধ্যেই কয়েকটি মন্দির ও প্রাসাদ এলাকার ধ্বংসাবশেষ, যার অনেকখানি ১৯৭৫-এর পরে খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

বর্তমানে শহর ঘিরে সাতটি পাঁচিলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যদিও সব জায়গায় এটি সমান অবস্থায় নেই। দক্ষিণের শেষের পাঁচিলটি হসপেটের দক্ষিণে প্রায় তিন কি.মি. অবধি চলে গিয়েছে। আর একটি পাঁচিল হসপেটের দক্ষিণ দিক দিয়ে যেতে দেখা যায়। তৃতীয়টি শহরের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম পাঁচিল বর্তমান মালপানাগুড়ির উত্তর ও দক্ষিণে হসপেট থেকে হাম্পি রাস্তার উপর পাওয়া যায়। ষষ্ঠ পাঁচিলটি কমলাপুরম-এর পুকুরের উত্তর দিকের বাঁধ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে উত্তরে বাঁক নিয়েছে। এর পুব দিকটা শেষ হয়েছে পাহাড়ে। সপ্তম পাঁচিলকেই সমকালীন ভ্রমণকারীরা বর্ণনা করেছেন এবং এটাই আসল শহরটিকে প্রদক্ষিণ করে রেখেছে। এটারই অবস্থা সব থেকে ভাল। মাল্যবন্ত রঘুনাথ মন্দিরের

পুব থেকে এটি চলে গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এই পাঁচিলের দক্ষিণের শেষে রয়েছে দরোজি দরজা। এখান থেকে পাঁচিলটি পশ্চিম দিকে প্রায় সোজা হয়ে পুব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে এবং প্রাসাদের দক্ষিণে কিছুদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর কিছু পরে আবার শুরু হয়ে এটি পাহাড়ে চলে যায় এবং তালারিগুট্টা দরজার কাছে থেমে যায়। মনে হয় যে পাঁচিলটি ঘুরে গিয়ে আবার মাল্যবন্ত রঘুনাথ মন্দিরে মিশেছে। এ দিকটাতে পাঁচিলের গায়ে বহু বুরুজ ও দরজা দেখতে পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে বুরুজগুলি ছিল প্রধানত উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। কয়েকটি দরজার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। তালারিগুট্টা দরজাটি ছিল প্রধানত আনেগুন্তি থেকে বিজয়নগরে আসার দরজা। দরোজি শহর থেকে বিজয়নগরে ঢোকার দরজা ছিল দরোজি দরজা। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল গম্বুজওয়ালা দরজা। প্রায় ১৮ মিটার উঁচু এই দরজাটি সমকালীন কারিগরদের দক্ষতা প্রমাণ করে। পুব এবং দক্ষিণ থেকে বিজয়নগর শহরে ঢোকার এটাই ছিল প্রধান দরজা। এর ডান দিকে রক্ষীদের থাকার ঘর ছিল যেগুলি থামওয়ালা বারান্দার মতো দেখতে।

এই সাতটি পাঁচিলে ঘেরা শহরের মধ্যে আরও পাঁচিল ছিল যেগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছিল। ভীমা দরজা থেকে একটা পাঁচিল পুবে ও অন্যটি দক্ষিণ দিকে চলে গিয়ে সপ্তম পাঁচিলের সঙ্গে মিশেছে। হাম্পির অন্যান্য দরজার মতো ভীমার দরজায় ছিল দুটো বাঁক, উঁচু পাঁচিল এবং থামওয়ালা বারান্দা ও অনেক মণ্ডপ যেগুলিকে রক্ষীদের ঘর বলে ধরা হয়েছে।

প্রাসাদ এলাকায় নানা পাঁচিলের ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় যে, প্রাসাদ এলাকা ও শহরের মধ্যে ভাগ করার জন্য পাঁচিল ছিল। আকাশ থেকে ছবি তুলে দেখা গিয়েছে যে শহরের ভিতরের অংশ বা প্রাসাদ এলাকা আলাদা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে এই পাঁচিল সপ্তম দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে এসেছে এবং পাঁচিলের বাইরে এসে মিশেছে। পুবে তথাকথিত হাতিশালার পুব দিক থেকে কতকগুলি মন্দিরকে বাইরে রেখে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুদুর চলে এসেছে ও পরে চন্দ্রশেখর মন্দির ও অষ্টকোণ স্নানাগারের পুবে চলে গিয়েছে। এর পরেই পাঁচিলটি প্রাসাদ এলাকার দক্ষিণ দিক দিয়ে যায়।

প্রাসাদ এলাকার পাঁচিলের অনেকগুলি বড় দরজা ছিল ঢোকার জন্য যার মধ্যে পুবে তিনটি ও পশ্চিমে দুটি দরজার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব দিকের দরজাটি বড় ও শক্ত—এতে একজন যোদ্ধার খোদাই করা ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় এটি পশুপতি বাজারে যাবার দরজা ছিল। ওই সময়ে বোধহয় এটি ছিল জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথ—বর্তমানে চাষের জমি। সব থেকে পুরনো দরজার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এর দক্ষিণের দরজা থেকে।

পুব ও দক্ষিণ দিক থেকে শহরে ঢোকার প্রধান দরজা ছিল গম্বুজ দরজা। হসপেট থেকে শহরে ঢুকতে গেলে প্রথমে এই দরজা পার হয়ে ভীমা দরজার সামনে আসতে হত। এটি ছিল ভিতরের দ্বিতীয় পাঁচিলের দরজা। এটি পেরিয়ে গেলে আসতে হয় প্রাসাদের পাঁচিলের কাছে যার জন্য ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের দরজা। এটি ছিল অষ্টকোণ স্নানাগারের পুবে এবং এটি দিয়ে ভিতরে গেলে শহরের মাঝখানে

পৌঁছানো যায়। এখান দিয়ে গেলেই প্রাসাদ এলাকার বাড়িগুলির সামনের বিরাট চত্বরে এসে পৌঁছানো যায়। এ ছাড়াও আরও ছোট ছোট দরজার অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেগুলি দিয়ে শহরে ঢোকা যেত। পাহাড়ের উপরেও প্রাসাদের পাঁচিলের দরজা পাওয়া যায়। ওই পাঁচিল দুর্গের পাঁচিলের সঙ্গে মিশেছে আরও ছোট-বড় পাঁচিলের সাহায্যে।

আমরা আবার জলের বিষয়ে ফিরে আসি। সমকালীন ভ্রমণকারীরা যাঁরাই বিজয়নগরে এসেছিলেন, তাঁরাই সেচ ব্যবস্থা ও জল নেবার ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পর্তুগিজ পর্যটক নুনিজ বলছেন যে কৃষ্ণদেব রায় দুটি পাহাড়ের মাঝে একটি ছোট হ্রদ তৈরি করেছিলেন। এর জন্য গোয়ার শাসনকর্তা জোয়াও দেল পন্টো গোয়া থেকে আসেন। ধনুকের মতো একটি বড় বাঁধ তৈরি করেন যার মুখে বড় দরজা বসানো ছিল ও এর নীচে ছিল পাথরের নালি। দরজা খুলে দিলে নালি দিয়ে জল যেত শহরে এবং অনেক চাষ-আবাদের জমিতেও জল দেওয়া হত। নুনিজ বলছেন যে চাষের উন্নতি হওয়ায় খাজনা প্রায় বিশ হাজার পারাদো বেড়ে যায়। সিওয়েল যখন গিয়েছিলেন তখন হ্রদে জল ছিল না এবং এর উঁচু পাড় ধরে হসপেট যাবার রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। সিওয়েল-এর মতে এই হ্রদের জল ব্যবহার করা হত কৃষ্ণদেব রায়-এর তৈরি নতুন শহর নাগলপুর-এর জন্য (নতুন নামকরণ হসপেট)। এর প্রধান দরজা ছিল বিজয়নগরে যাবার রাস্তা।

লংহার্স্ট অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন যে ওই একটি হ্রদের জল থেকে এতগুলি জায়গায়—পুরনো ও নতুন শহর ও চাষের জমি—জল দেওয়া সম্ভব ছিল কিনা। যদি তাই হয়, তা হলে হ্রদের জলের মাত্রা চারপাশের উঁচু জমির থেকে উপরে যাওয়ার কথা। উনি বলছেন যে চাষের জমির জল আসত প্রধানত তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে পাথরের নালির সাহায্যে। অন্যদিকে প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকার পাথরের নালির উচ্চতা থেকে বোধ হয় যে এখানকার জল আসত প্রধানত শহরের উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড় থেকে। কিন্তু প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকায় কোনও পুকুর পাওয়া যায় না। সুতরাং লংহার্স্ট মনে করছেন যে এখানকার জল আসত কুয়ো থেকে প্রচলিত ভারতীয় রীতি অনুযায়ী। অর্থাৎ বলদের সাহায্যে চামড়ার বালতি করে জল তুলে সরাসরি নালিতে দেওয়া হত, যার থেকে অন্যান্য সংলগ্ন নালিতেও জল যেত। নালির যা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে প্রধানত প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকায় ও স্নানাগারগুলিতে জল এইভাবে কুয়ো থেকে তুলে আনা হত। সুতরাং নদী থেকে প্রাসাদে জল সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অতএব নুনিজ ও পায়েজ-এর অভিমত গ্রহণ করা যায় না। এ ছাড়া কৃষ্ণদেব রায়-এর হ্রদটি প্রাসাদ এলাকা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। কুয়ো থেকে জল পাথরের নালি দিয়ে কিছুদূর নেবার পর নালিটি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি নালি যায় জেনানা মহল ও অষ্টকোণ স্নানাগার অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে ও অন্য নালিটি যায় পশ্চিম দিকের পাঁচিলের সমান্তরাল হয়ে চন্দ্রশেখর মন্দিরের দিকে যেখান থেকে এটি রানির স্নানাগারের দিকে চলে গিয়েছে। এর পাশে একটি বাঁধাই করা সুন্দর কুয়ো দেখা যায়। মনে হয় এই কুয়োর থেকেই জল তুলে নালি দিয়ে একটা ছোট পুকুরে নিয়ে যাওয়া হত। এখান

থেকে বলদের সাহায্যে, চামড়ার বালতি করে জল তুলে একটা উঁচু স্তম্ভের উপর বসানো জল রাখার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত, যেখান থেকে ঢাকা দেওয়া নালির সাহায্যে ওই দুই নালির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হত।

আমরা এবার শহরের ও প্রাসাদ এলাকার যেসব সৌধগুলি আছে তার একটা আলোচনা করব। কমলাপুরম থেকে এগোলে যেটি প্রথমে চোখে পড়ে সেটিকে রানির স্নানাগার বলে বলা হয়। এটি ইন্দো-সারাসেনিক রীতিতে তৈরি একটি বাড়ি এবং প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এটির চারপাশে একটি পরিখার চিহ্ন আছে যদিও এতে জল এখন আর নেই। বাড়িটির মাঝখানে একটি ছোট পুকুর বা সাঁতার কাটার জায়গা যার পাশে ঝুলবারান্দা দিয়ে ঘেরা। এর দেওয়ালে ও খিলানে ইটের কারুকার্য দেখা যায় যেটি লোটাস মহলেও দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় দুটি বাড়িই একই সময়ে তৈরি। উল্লেখ্য যে এই ইন্দো-সারাসেনিক রীতি যার বহু প্রমাণ বিজয়নগরে ছড়িয়ে রয়েছে, তার কোনও উল্লেখ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ-এর *হাম্পি* বইটিতে নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটি যে রানির স্নানাগার তার কোনও প্রমাণ নেই এবং জেনানা মহল থেকে লোকালয়পূর্ণ আধ মাইল পথ পরিক্রমণ করে কেন এখানে রানি স্নান করতে আসবেন তারও কোনও পরিষ্কার উত্তর নেই। এটাকে অবশ্য প্রমোদের জায়গা বলে ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু তা হলে রানির স্নানাগার নামটির বদল হওয়া দরকার। এ ছাড়া বাইরের পাঁচিলের একেবারে গা ঘেঁষা জায়গাতে রানি কেন স্নান করতে আসবেন তারও উত্তর পাওয়া কঠিন।

এই বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে প্রাসাদ এলাকা। রানির স্নানাগার থেকে সোজা উত্তরে গেলে একটা ছোট পুকুরপারে একটা বিরাট পাথরের চত্বর, যাকে বলা হয় *মহানবমী-ডিব্বা* বা *দশেরা-ডিব্বা*। নবরাত্রি উপলক্ষে যে সব উৎসব হত, সেটি এখানেই হত। পায়েজ এর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে উড়িষ্যা বিজয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় এটি তৈরি করেন। পায়েজ অবশ্য একে বলেছেন বিজয় প্রাসাদ। সমকালীন ভ্রমণকারীরা এটি যে বহু স্তম্ভবিশিষ্ট ও চিত্রিত প্রাসাদ ছিল, সেটা বলেছেন। যদিও তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। তিনটি ধাপে তৈরি করা, চতুষ্কোণ এই পাথরের তৈরি জমিটি চল্লিশ বর্গ মিটার। এটি উত্তর দিকে মুখ করে আছে এবং এর তিনটি ধাপের দেওয়ালে হাতি, ঘোড়া, যোদ্ধা ইত্যাদি খোদাই করা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালেও এই ধরনের খোদাই করা কাজ দেখা যায়, যদিও মনে হয় এগুলি পরবর্তীকালের। পশ্চিম দিকে কুড়ি মিটার উঁচু থেকে নামার জন্য পাথরের ধাপ রয়েছে যেখান থেকে রাজা দশেরা উৎসব উপলক্ষে নেমে আসতেন। পূর্ব দিকে একটা বড় ঘর বেরিয়ে আছে যার দেওয়ালে খোদাই করা বহু মূর্তি দেখা যায়। মনে হয় বিজয়নগরে চিনা দূতরা আসার পর, তাদের অনুকরণ করে এই খোদাইগুলি করা হয়েছিল। ডিব্বার মধ্যে বহু বিদেশি মূর্তির খোদাই করা কাজ দেখা যায় যার মধ্যে আরব ঘোড়া বিক্রেতাদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া নানা ধরনের পশুরও চেহারা পাওয়া যায়।

রানির স্নানাগার থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে হাম্পির রাস্তায় কিছুদুর এগোলে একটি বড় আটকোনা বাড়ি দেখা যায়। রানির স্নানাগারের মতো এটিও ইন্দো-

সারাসেনিক রীতিতে তৈরি এবং ওই একই সময়ে তৈরি বলে মনে করা যেতে পারে। বিভিন্ন দিকে খিলানের মধ্য দিয়ে ভিতরে যাবার প্রবেশপথ আছে। এর মাঝখানে একটি ফোয়ারা বসানো আছে ও সামনে একটি বড় পাথর থেকে কাটা খোলা নালির মতো আছে। বলা হয় যে উৎসবের সময়ে গরিবদুঃখীদের জন্য এখানে দুধ ধরে রাখা হত। যে মাটির নালির সাহায্যে ফোয়ারায় জল আসত, তার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বাড়িটি বিজয়নগরের মধ্যে স্থাপত্য শিল্পধারার একটা ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। বাড়িটিতে জল আসত পাথরের নালির সাহায্যে বোধহয় কাছাকাছি কোনও কুয়ো থেকে। এই বাড়িটির বিপরীত দিকে পাথরের নালির চিহ্ন পাওয়া যায় ও মাঝে মাঝে বড় পাথরের চাঁই দেখা যায়। এই পাথরের চাঁইগুলির মাঝখানটা চাপা। মনে হয় এগুলি তীর্থযাত্রীদের বা ভ্রমণকারীদের বিশ্রামের জন্য করা হয়েছিল।

চন্দ্রশেখর মন্দিরের কিছুদূরে উত্তর দিকে একটা আটকোনা পুকুর দেখা যায় যার মাঝে একটা ছত্রি বসানো রয়েছে। এই পুকুরের চারপাশ ঘিরে একটা ঢাকা বারান্দা চলে গিয়েছে। গঠনরীতি দেখলে আগেকার বাড়ির সময়ের বলে বলা যায়। মনে হয় আমোদ-প্রমোদের জন্যই এটি ব্যবহৃত হত। কমলাপুরম থেকে বিজয়নগরে এলে বাঁ দিকে বড় একটা হ্রদ দেখা যায় যেটি বিজয়নগরের মধ্যে সব থেকে বড়। এটির চারপাশ হিন্দু গঠনরীতির মতো পাথরে গাঁথা। পূর্বোক্ত পাথরের নালি থেকে এখানে জল আসত।

মহানবমী ডিব্বার প্রায় একশো চল্লিশ মিটার পশ্চিমে একটা বড় আকারের পাথরের জমি দেখা যায় যার উপর *অধিষ্ঠান* ছিল। পর্যটক আবদুর রাজ্জাক বলেছেন যে, প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকায় এটিই ছিল সব থেকে উঁচু বাড়ি। এর মধ্যে খাম্বাজের গর্ত থেকে মনে হয় যে এটি প্রায় একশো স্তম্ভ বিশিষ্ট হলঘর ছিল। এর মুখ ছিল উত্তর দিকে। দুধারে উঁচু অধিষ্ঠানে যাবার জন্য দুটি বড় সিঁড়ি ছিল। সব থেকে উঁচু অধিষ্ঠানে যাবার আগে মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট গোলাকার জায়গা আছে। পুব ও পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়ে এখানে আসা যায় এবং মনে করা হচ্ছে যে পশ্চিম দিকের সিঁড়িটি মহিলাদের জন্য ছিল। পুব দিক থেকে প্রাসাদে যাওয়া সহজ। এটিই রাজার দরবারকক্ষ এবং প্রাসাদ এলাকার অন্যান্য সৌধের তুলনায় প্রাচীনতম। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা বাঁধানো চত্বর আছে যেখানে সম্ভবত হোম করা হত। দরবারকক্ষের দক্ষিণে একটা ঘেরা জায়গা আছে যেটি মহিলাদের ও তাদের দাসীদের জন্য সুরক্ষিত। পর্যটক পায়েজ বর্ণনা দিয়েছেন যে পথের দুধারে পঁয়ত্রিশটা একতলা বাড়ি ছিল জেনানাদের ও তাদের দাস-দাসীদের জন্য। এগুলি বোধহয় পশ্চিম দিকে ছিল এবং বাগান ও প্রমোদবাসাগুলি ছিল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

এই দরবারকক্ষের সামনে ছিল বাঁধানো চত্বর যার কথা আগে বলা হয়েছে। এখানেই নর্তকী, মল্লযোদ্ধা ইত্যাদিরা নানা রকমের খেলা প্রদর্শন করত। এখানেই সারা রাজ্যের বড় বড় নেতা ও অভিজাতরা আসতেন তাঁদের উপঢৌকন নিয়ে। মহানবমী ডিব্বার বিপরীত দিকের জমিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হত। এখানেই সাম্রাজ্যের হাতি ও ঘোড়া পুজোর জন্য দেওয়া হত। পুরোহিত ও রাজা ছাড়াও, মহিলারাও এই পুজো দিতেন। খুব সম্ভব হাতি-ঘোড়াদের জল খাওয়ানোর জন্য

বাঁধাই করা পাথরের নালি এখনও দেখা যায়। এখানকার উৎসবের সময় পর্তুগিজ ভ্রমণকারী নুনিজ উপস্থিত ছিলেন এবং একটি মনোগ্রাহী বর্ণনা রেখে গিয়েছেন।

নুনিজ এখানকার খোদাই করা ভাস্কর্যর কথা বলেছেন, যার কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। হাতিদের শোভাযাত্রার চিত্রের মধ্যে লম্বা চুলওয়ালা পুরুষ ও মহিলা দেখা যায় যার থেকে লংহার্স্ট এই লোকগুলিকে জৈন ধর্মাবলম্বী বলে ধরেছেন। ১১২৯ খ্রিস্টাব্দে জৈন প্রচারক মালাধর দেব-এর শ্রাবণবেলগোলায় মৃত্যু সম্পর্কে পাথরে উৎকীর্ণ লিপিও এখানে পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া, জৈন ও বৌদ্ধদের পছন্দ বক ও কুমীরের খোদাই পাওয়া যায়। রাজার শিকারের একটি ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে একটি লোক বল্লম দিয়ে বাঘ মারছে ও অন্যদিকে দুটি লোকের হাতে এক অজানা অস্ত্র। এরা একদল কুকুর নিয়ে হরিণ শিকার করছে। এ ছাড়াও নুনিজ যে মুষ্টিযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন তার খোদাই করা ভাস্কর্য দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে রাজা বা অভিজাত বা সেনাধ্যক্ষদের চুল লম্বা, যেটি জৈন রীতি বলে কেউ কেউ ধরেছেন। কিন্তু ছোট চুলের শিকারিও রয়েছে। এর থেকে বলা যেতে পারে যে অভিজাত ছাড়া লম্বা চুল কেউ রাখতে পারত না। তবে এটাই শুধু জৈন রীতি কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। মহানবমীর উৎসব ছাড়াও 'হোলি' বা রং-এর উৎসবের কথা ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা বলেছেন। নিকোলো কন্টি দেখেছিলেন যে রাজা ও রানির গায়ে হলুদ রং দেওয়া হচ্ছে। খোদাই করা ভাস্কর্যে এই উৎসবের চিত্র দেখা যায়।

এর কাছেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও জমির পাথরের ভিত্তির গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্য দেখা যায়। ওই একই ধরনের শোভাযাত্রা, শিকার, নর্তকী ও উৎসবের দৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু দরবারকক্ষের সঙ্গে এর একটা তফাত রয়েছে। প্রাসাদের দেওয়াল ইট ও প্লাস্টার দিয়ে তৈরি ও কাঠের স্তম্ভ দিয়ে রক্ষিত ছিল। দোতলা বা তিনতলা প্রাসাদ প্রধানত এই কাঠের স্তম্ভের উপরই দাঁড়িয়েছিল। প্রত্নতত্ত্বর কাজের সময়ে কাঠের ছাই, পোড়া ইট ও প্লাস্টারের টুকরো পাওয়া গিয়েছে যার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রাসাদটিতে আগুন ধরবার পর এটি জমির উপর পড়ে যায়। এর কাছে একটা ঘর পাওয়া যায় মাটির নীচে। এর উপরেও একটি তলা ছিল যেটি এখন পড়ে গেছে। মাটির নীচে শোভাযাত্রা করে যাবার মতো পথ রয়েছে যার থেকে মনে করা হয় যে এটি একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনাগৃহ বা মন্দির। নীচে নামবার পাথরের সিঁড়িও আছে।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন এলাকার পশ্চিমে একটা ঘেরা জায়গা আছে। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী এটিকে টাঁকশাল বলা যায় যদিও তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই এলাকায় সাম্প্রতিক কালে যে উৎখনন হয়েছে তার ফলে আরও কয়েকটি সৌধের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে বিজয়নগরের তিনটি যুগের কথা বলা যায়। এখান থেকেই খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মি শিলালেখের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া খ্রিস্টাব্দ ১০৭৬-এর চালুক্যবংশীয় একটি শিলালেখ পাওয়া যায় যার থেকে চালুক্য-বিক্রম সাল-এর শুরু বোঝা যায়। এই উৎখননের ফলে তিনটি এলাকা দেখা যাচ্ছে—(১) টাঁকশাল এলাকা, (২) মহানবমী ডিব্বার পশ্চিমের অংশ ও (৩) দরবারকক্ষর দক্ষিণের এলাকা। টাঁকশাল এলাকায়

নানাধরনের হলঘরের ও বাড়ির ভাঙা অংশ পাওয়া যাচ্ছে যার ফলে মনে হতে পারে যে এই অংশটি বসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। দরবারকক্ষের দক্ষিণ এলাকায় জনবসতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মাটির নীচের প্রার্থনাগৃহ বা মন্দিরকে প্রধানত চালুক্যদের সমসাময়িক বলে ধরে নিলেও, বিজয়নগরের পত্তনের আগেকার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এই এলাকার তৈরির সময়কালের পরিষ্কার চিত্রও পাওয়া যায় না। দরবারকক্ষটি প্রথম দিকের সময়ে তৈরি; কিন্তু পরবর্তীকালে আরও সংযোজন করা হয়েছে। এখানেও স্থাপত্যশিল্পের তিনটি সময়কাল একে অপরের উপর রয়েছে এটি বোঝা যায়।

প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণে হাজারা-রাম মন্দির এখনও বর্তমান। রামচন্দ্রর মূর্তি ধরলেও বিষ্ণুর উদ্দেশে এটি তৈরি। মন্দিরে অবশ্য এখন কোনও মূর্তি নেই এবং এখন এটি ব্যবহৃত হয় না। প্রথম দিকের চালুক্য মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। মন্দিরটিকে চিত্র প্রদর্শনীর প্রধান ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। রামায়ণের বিভিন্ন দিক এর পাঁচিলের গায়ে ও স্তম্ভের মধ্যে খোদাই করে দেখানো আছে। বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃত শিলালেখ এখানে পাওয়া গিয়েছে যার থেকে দেখা যায় যে এটি ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে শুরু হয়েছিল। ১৫২১ সালের আর একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে উত্তর-পূর্ব কোণে কল্যাণ মণ্ডপটি ওই সময়ে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন দিক দেখলে মনে হয় যে মন্দিরটি কৃষ্ণদেব রায়ের আগেই ছিল। অন্য ধরনের বা আগেকার যুগের স্তম্ভ এখানে দেখা যায় এবং বিজয়নগরের ধরনের স্তম্ভ কমই পাওয়া যায়। এ ছাড়া, গোপুরও দেখা যায় না।

টাঁকশালের উত্তরে একটা ঘেরা জায়গাকে বলা হয় *দানায়ক*-এর জায়গা (*দণ্ডনায়ক* বা প্রধান সেনাপতির অপভ্রংশ)। এটি একটি বিরাট ঘেরা জায়গা যার মধ্যে আরও কয়েকটি দেওয়ালের ভাঙা অংশ পাওয়া যায়। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। একটা জায়গায় বড় প্রাসাদের ভিতও পাওয়া গিয়েছে যার তিনটি ধাপ চোখে পড়ে। স্তম্ভের নানারকম ভগ্নাংশ ও ভিতও পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদের মতো এটিও উত্তর দিকে মুখ করা। মনে হয় এটি বড় দরবারকক্ষ ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি সৌধের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে যাকে মসজিদ বলা হয়। তিন দিক ঘেরা স্তম্ভযুক্ত একটা বড় হলঘর আছে। ছাদে উলটো পদ্ম করা মিনার দেখা যায়। দুপাশের দেওয়ালে বাইরে যাবার পথে খিলান দেওয়া দরজা। মনে হয় খোলা চত্বরকে ঘিরে একটা পুরনো দেওয়াল ছিল। এই সৌধটিরও মুখ উত্তর দিকে এবং মসজিদ হবার সম্ভাবনা কম। এর উত্তর-পশ্চিমে একটা বড় দেওয়ালের ভাঙা অংশ আছে যার জন্য একে *ইদগা* বলা হচ্ছে। এর উত্তরে একটা চতুষ্কোণ ঘর আছে যার পুব ও পশ্চিম খোলা।

দানায়ক-এর ঘেরা জায়গা মনে হয় শাসনকার্যের দপ্তর ছিল। এখানে একটা উঁচু নজরদারি বুরুজ আছে। মনে হয় আরও অনেকগুলি এরকম বুরুজ ছিল যার মধ্যে মাত্র দুটো এখন অক্ষত অবস্থায় আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণের বুরুজটি চমকপ্রদ এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে একে মুসলমান বুরুজ বলা হয়। চতুষ্কোণ এই বুরুজটি

পাথরের তৈরি। নীচে একটা ছোট ঘর আছে এবং উপরে যাবার সরু সিঁড়ি আছে। উপরেও একটা ছোট ঘর আছে। ছাদে কয়েকটি ছোট গম্বুজ আছে।

হাজারা-রাম মন্দিরের কিছু উত্তরে বিরাট ঘেরা জায়গা জেনানা মহল বলে পরিচিত। এই দেওয়ালের প্রধান দরজা ছাড়া এখানকার বাকি সব বাড়িই ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। বাইরের দেওয়ালের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যত দেওয়াল উঁচু হচ্ছে, ততই তার ঘনত্ব কমে আসছে। মনে হয় মহলগুলিকে আলাদা করা ও লোকচক্ষুর বাইরে রাখার জন্য এই উঁচু দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল। এর ভিতরে যাবার তিনটি দরজা পাওয়া যায় এবং প্রধান প্রবেশপথটি পশ্চিম দিকে মুখ করা। পরের দুটি ছোট দরজা সাম্প্রতিক কালে করা হয়েছে।

ঘেরা জায়গার মাঝখানে একটা বড় প্রাসাদের ভিত দেখা যায়। এটাই মনে হয় রানির প্রাসাদ কারণ এটাই এখানকার সব থেকে বড় প্রাসাদ। রানি বা অন্যান্য মহিলারা যে আলাদা প্রাসাদে থাকতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুর রাজ্জাকের কথায়। উনি বলছেন যে রাজা এদেরকে ডেকে পাঠাতেন। কেউ কেউ অবশ্য এটিকে *দিওয়ানখানা* বা কাছারি বলেছেন। কিন্তু স্থাপত্যশৈলী বিচার করলে এটি মানা যায় না। এই বাড়ির উত্তর ও দক্ষিণে দুটি নজরদারি বুরুজ এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। হয়তো মহিলারা এগুলি থেকে ঘেরা জায়গার বাইরের কার্যকলাপ দেখতেন।

জেনানা মহলের সব থেকে সুন্দর বাড়ি পদ্ম মহল। দোতলাটি মনে হয় পরে যোগ করা হয়েছে কারণ সিঁড়িটি খুবই সরু এবং স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে মিশ খায় না। এটির চারপাশ খোলা এবং অনেকগুলি স্তম্ভ উপরের তলাকে ধরে রেখেছে। দোতলায় কয়েকটি ছোট ছোট জানলা আছে, যেগুলিতে কাঠের খড়খড়ি লাগানো, যা বিজয়নগরের আর কোনও বাড়িতে পাওয়া যায় না। বাড়িটির বৈশিষ্ট্য এই যে হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্যশৈলীর চমৎকার মিশ্রণ এতে রয়েছে, যার দৃষ্টান্ত অবশ্য আরও দু-একটি বাড়িতে পাওয়া যায়। ঘেরা জায়গার দক্ষিণ দিকে একটা পুকুরের মধ্যে ছত্রি রয়েছে। পুব দিকে একটা ছোট বাড়ি রয়েছে যেটা বোধহয় রক্ষীদের ঘর। পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা যে মহিলারক্ষীদের কথা বলেছেন, এটি তাদের বাড়ি হতে পারে। ঘেরা জায়গার বাইরে দক্ষিণ দিকে একটা ছোট মন্দির আছে রঙ্গ-র। প্রায় নয় ফুট উঁচু হনুমানের পাথরের মূর্তি এখানে আছে।

ঘেরা জায়গার পুব দিকে একটা বাড়িতে সারিবদ্ধ ঘর আছে যাকে সাধারণত হাতিশালা বলা হয়। লম্বা এই বাড়িতে এগারোটা ঘর আছে যার উপরের ছাদে গম্বুজ লাগানো। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে একে হাতিশালা বলা হয় যদিও কোনও লোহার আংটা বা রড কিছু দেখা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আবদুর রাজ্জাক হাতিদের পায়ে শিকল বেঁধে মাটিতে ও ছাদে লোহার আংটার সঙ্গে লাগানোর কথা বলেছেন। কোনও কোনও বড় হাতিকে একাধিক লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হত। এ ছাড়াও হাতিশালা রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন এলাকায় না থেকে জেনানা মহলের এত কাছে থাকবে কেন তার কোনও পরিষ্কার উত্তরও নেই। হাতিশালা অনুযায়ী বাড়িটি বড় বেশি সুন্দর।

তথাকথিত হাতিশালার কাছে দক্ষিণমুখী গথিক ধরনের একটা ভাঙা বাড়ি দেখা

যায়। সামনে খিলান করা বারান্দা ছাড়া, জেনানা মহলের ভিতরে যে রক্ষীদের বাড়ি আছে, এটি তারই ধরনের। এই বাড়িটিকে অনেক সময় সংগীত মহল বলে বলা হয়েছে। আগের রক্ষী ঘরের মতোই। প্রবেশদ্বার মাত্র একটা এবং দক্ষিণমুখী। অবশ্য এর ভিতটা আরও উঁচু। পাথর দিয়ে গাঁথা। ছাদ পড়ে যাওয়ায় উপরের অংশে কী ছিল বোঝা যায় না। প্রত্যেকটি ছোট ঘরের সামনে স্তম্ভ রয়েছে এবং এটা হওয়া সম্ভব যে ঘরগুলি ছোট দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা ছিল। হাম্পির পুরনো বাজারে কয়েকটি ভাঙা ঘরের অংশ এখনও এমনিভাবে রয়েছে। উৎখননের সময় অনেক মাটির দেওয়ালের অংশ পাওয়া গিয়েছে যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে দুটি বাড়িই একত্রে লাগানো ছিল। এমন হতে পারে যে এটি একটি ধর্মশালা ছিল। অবশ্য এটাও হতে পারে যে এটি জেনানা মহলের পুরুষরক্ষীদের ঘর। পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা বলেছেন যে জেনানাদের মহিলা ও পুরুষরক্ষী দুই-ই ছিল। তা হলে জেনানা মহলের মধ্যের বাড়িটি মহিলারক্ষীদের এবং এটি পুরুষরক্ষীদের এটা মনে করাই সঙ্গত হবে। কিন্তু একে কোনওক্রমেই সংগীত মহল বলে মনে করা যায় না। এই ধরনের জলসা প্রধানত পদ্ম মহলে হত বলে ধরা হয়।

হাতিশালার পূর্বে কতকগুলি ছোট মন্দির দেখা যায়। এগুলি ব্রাহ্মণ্য ও জৈনধর্মীয়। একটি ভাঙা জৈন মন্দিরে ১৪২৬ খ্রিস্টাব্দের দেবরাজ দ্বিতীয়র একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। এতে বলা হচ্ছে যে রাজা পরশনাথ-এর একটা পাথরের চিত্যালয় করে দিচ্ছেন। এই মন্দিরের উত্তর-পূর্ব দিকে একটা বড় বাজার ছিল যাকে *পশুপতি বাজার* বলা হত যার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। এরই কাছে একটি সরস্বতী মন্দির আছে এবং তার কাছে গভীর অষ্টকোণ স্নানাগার রয়েছে যার চারপাশে স্তম্ভযুক্ত খোলা বারান্দা আছে। মাঝখানে একটি অষ্টকোণ জলাধার দেখা যায়। কাছে চন্দ্রশেখরের মন্দির যেটিকে বিজয়নগর স্থাপত্যশৈলীর প্রধান নিদর্শন বলে ধরা হয়।

দানায়ক-এর ঘেরা জায়গা ছেড়ে হাম্পির পথে এগোলে মাটির নীচের মন্দির পাওয়া যায় যা আগেই আলোচিত হয়েছে। পশ্চিম দিকে আরও এগোলে ঘেরা জায়গায় একটা পাথর থেকে কাটা নরসিংহর মূর্তি দেখা যায়। এর পাশেই লক্ষ্মীদেবী ছিলেন যদিও একটি মাত্র হাত অবশিষ্ট আছে। এর সামনে লাগোয়া পাথরের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ এটি তৈরি করেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় এটি রক্ষার জন্য দানও দেন। এটি ২২ ফুট উঁচু। এটিকে ঘিরে একটি মন্দির করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয়নি। এর পাশে একটি ছোট শিবমন্দির রয়েছে। এ দুটির উত্তরে একটু উঁচু জায়গায় রয়েছে বড় একটি কৃষ্ণ মন্দির। ভিতরের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যা বিজয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে এই মন্দিরটি ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন। এর একটি বড় দরজা ছিল যেটি এখন ভেঙে পড়েছে। এর পূর্ব দিকে চারটি বাজারের একটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর সামনের পথেই রথযাত্রার উৎসব হত। এর পশ্চিম দিকে একটি ছোট বিষ্ণু মন্দির ও একটি গণেশের মূর্তি দেখা যায়।

আরও কিছুদূর চড়াই যাবার পর পথটি হাম্পি বাজারে নেমে গিয়েছে। যাবার পথে কতকগুলি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় যেগুলির সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি।

এর পরই আসে গণেশের মন্দির। আরও নীচে নামলে জৈন স্থাপত্যশৈলীতে করা কয়েকটি জৈন মন্দির দেখা যায়। মনে হয় একসময় জৈন ধর্মাবলম্বীরা প্রচুর সংখ্যায় এখানে আসতেন।

পূর্ব দিকে আরও নেমে গেলে বিখ্যাত হাম্পি বাজার যার সামনে রয়েছে বিজয়নগরের সব থেকে পুরনো মন্দির পম্পাপতি বা বিরুপাক্ষ মন্দির। পম্পাকে ব্রহ্মার মেয়ে বলে ধরা হয় এবং পম্পাপতি পম্পার স্বামী। তুঙ্গভদ্রা নদীকে এখানে পম্পা নদী বলা হচ্ছে। হেমকুণ্ড পর্বতের উত্তরে ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিকে এই মন্দির। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য যে গর্ভগৃহে যাবার দরজা চালুক্যশৈলীর ও তার সঙ্গে কালো পাথরের চালুক্যশৈলীর খোদাই করা স্তম্ভ রয়েছে। এই ধরনের কাজ সাধারণত একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর যার থেকে মনে হয় যে গর্ভগৃহ বিজয়নগরের পূর্ববর্তীকালের। পর্তুগিজ ভ্রমণকারী পায়েজ এই মন্দিরে এসেছিলেন এবং চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। উনি বলছেন যে এই মন্দিরটি প্রধান দরজার পূর্ব দিকে। এর সামনে একটা সুন্দর রাস্তা আছে যেখানকার বাড়িগুলি সুন্দর ও বারান্দা দেওয়া। এখানে তীর্থযাত্রীরা বিশ্রাম করে। রাজারও এই রাস্তায় একটা প্রাসাদ আছে যেখানে তিনি এসে থাকেন। উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। একটা বিরাট দরজা আছে যেখানে নানা ধরনের ভাস্কর্য খোদাই করা আছে। এটা পেরোলে একটা বড় চত্বর যার মধ্যে মূর্তিসুদ্ধ একটা মন্দির রয়েছে। দরজার বিপরীত দিকে খোদাই করা চারটি স্তম্ভ রয়েছে—দুটি গিলটি করা ও অন্য দুটি তামার। সব থেকে কাছেরটা রাজা কৃষ্ণদেব রায় দিয়েছেন। দরজা থেকে গর্ভগৃহ পর্যন্ত সব কিছুই তামার পাতে ঢাকা ও গিলটি করা। রাতে প্রায় দু হাজার বা তিন হাজার প্রদীপ জ্বলে। পায়েজের বর্ণনা আরও বেশি বড় কিন্তু এখানে আমরা রথযাত্রা ও হাম্পি বাজারের বর্ণনা কিছুটা দেখতে পারি। পায়েজ মন্দিরের বাইরে দুটি কাঠের রথ দেখেছিলেন, যেগুলি তাঁর কাছে বেশিদিনের পুরনো মনে হয়নি। একটার বয়স তো তিনি ধরেছেন মাত্র দু-তিন বছর। রথ দুটি মন্দির থেকে টেনে রাস্তার শেষে নিয়ে যাওয়া হত এবং আবার টেনে মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হত। বিজয়নগরে চারটি বড় বাজারের মধ্যে এই বাজারটিই প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। পায়েজ যে ধরনের দরজা বা গোপুর-এর কথা বলছেন তার একটি কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৩ সালে তৈরি করেছিলেন। ভিতরের পূর্ব দিকে তেতলা উঁচু এই গোপুর পেরিয়ে প্রধান মণ্ডপে যেতে হয়। এটি পূর্ব দিকে মুখ করা। বিরূপাক্ষের গর্ভগৃহর সামনে একটি *অন্তরাল*, একটি *অর্ধমণ্ডপ* ও একটি বড় *মহামণ্ডপ* রয়েছে, যাকে অনেক সময়ে রঙ্গ মণ্ডপও বলা হয়। ১৫১০ সাল নাগাদ বিজয়নগর শৈলীতে কৃষ্ণদেব রায় এটি তৈরি করেছিলেন। এর ছাদের ভিতরদিকে বিজয়নগর চিত্রকলার প্রচুর নিদর্শন আছে। চিত্রিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিদ্যারণ্য শোভাযাত্রা করে যাওয়া, দ্রৌপদী লাভের জন্য অর্জুনের ধনুর্ব্বেদ পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তুঙ্গভদ্রা নদীর ছোট একটি শাখা এই মন্দিরের চত্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিচুতে নেমে মন্দিরের রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে এসে বাইরের চত্বরের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। হাম্পি বাজারের রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে এগোলে একটি দোতলা মণ্ডপ ও তার মধ্যে বারোটি কালো পাথরের স্তম্ভ আছে

যেগুলি পরবর্তী চালুক্যদের সময়ের। মণ্ডপের পিছনে একটি বড় পাথরের নন্দী আছে।

এর পাশ দিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে উত্তর-পূর্ব দিকে গেলে উত্তর দিকের শেষে আর একটা বড় রাস্তার ভগ্নস্তূপের মধ্যে পড়তে হয়। এটাই ছিল *সুলাই বাজার* বা নাচনেওয়ালিদের রাস্তা যেটা ধরে অচ্যুৎ রায়ের মন্দিরে যাওয়া যায়। রাস্তার দুধারে বাড়িগুলি এখন ভেঙে পড়েছে এবং এখন চাষআবাদ হচ্ছে। মাতঙ্গ পর্বতের পিছনে এই রাস্তাটি একসময় যে সুন্দর ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা পুকুর আছে যার মাঝখানে ছত্রি রয়েছে। মনে হয় নাচনেওয়ালিরা এখানে স্নান করতেন। প্রত্যেক নাচনেওয়ালির আলাদা ঘর ছিল যেমন হাম্পি বাজারের রাস্তার দুধারে দেখা যায়।

ভ্রমণকারী পায়েজ এই নাচনেওয়ালিদের সাধারণ বেশ্যা বলে ধরেননি। উনি বলেছেন যে মন্দিরের যে কোনও উৎসবেই এই নাচনেওয়ালিরা নাচগান করতে করতে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মন্দিরে যায়। এমনকী নবরাত্রি উৎসবেও তিনি নাচনেওয়ালিদের দেখেছেন দু সারিতে নানা ধরনের সোনা, হীরে ও মোতির অলংকার পরে নাচছে। মন্দিরের সামনের চত্বরেও সকালে এদের তিনি নাচতে দেখেছেন। আর এক জায়গায় পায়েজ এদের ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। গলায় এরা সোনা, হীরে, মোতি ও রুবির হার পরে, হাতে ও কোমরে ওই ধরনের অলংকার, এমনকী পায়েও তিনি অলংকার পরতে দেখেছেন। পায়েজ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে এই পেশার মহিলারা এত ঐশ্বর্য পাচ্ছে কেন। উনি বলছেন যে অন্য মহিলারাও আছে যাদেরকে জমি দেওয়া হয়েছে এবং তার এত দাসী রয়েছে যে সংখ্যা নিরুপণ করা সম্ভব নয়। উনি শহরের এক মহিলার কথা বলছেন যার কাছে এক লক্ষ পারাদোর বেশি মুদ্রা রয়েছে। উনি যা দেখেছেন তার পর অবিশ্বাস করার কারণ দেখছেন না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এরা দেবদাসী যদিও পায়েজের বিবরণে সেটা পরিষ্কার নয়।

অসংখ্য মন্দির ও প্রাসাদে ভরা, বোধহয় ভারতভূখণ্ডের সব থেকে বড় মধ্যযুগীয় শহর, বিজয়নগরের সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। ভ্রমণকারী পায়েজ এর একটা বর্ণনা দিয়েছেন, তার সারাংশ আমরা এখানে দিচ্ছি। পায়েজ এক বড় পাহাড়ে উঠে শহরটার সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শহরটি অনেকগুলো পাহাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকায়, সম্পূর্ণ চেহারাটা তিনি পাননি বলে স্বীকার করেছেন। ওঁর কাছে চমৎকার দেখতে এই শহরটা রোম শহরের মতো বড় মনে হয়েছিল। বহু বাগান আছে এবং এ ছাড়াও গাছ প্রচুর আছে—প্রায় জঙ্গলের মতো। কয়েকটি হ্রদ ছাড়াও, বহু নালার সাহায্যে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুসলমানদের আলাদা এলাকা আছে যার একটু নিচু দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। এই দিকে বহু ফলের বাগান আছে—এমনকী সাদা আঙুরের ক্ষেতও দেখা যায়।

শহরে অগণিত লোক এবং সৈন্য নিয়ে পথে চলতে গেলেও এগোনো যায় না। প্রচুর হাতিও আছে। পৃথিবীর মধ্যে এই শহরই সব থেকে ভাল যেখানে সব কিছু পাওয়া যায়। চাল, গম, শস্য, ভুট্টা, বার্লি, মুগ ও অন্যান্য ডাল, ছোলা ইত্যাদি খুব

সস্তা দরে পাওয়া যায়। রাস্তা ও বাজারে অগণিত বলদ মাল নিয়ে যাচ্ছে এবং বহু জায়গায় এদের যাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। নানাধরনের পাখির মাংস শহরে সস্তায় কেনা যায়। বাইরে একটু বেশি দাম। ইটালির পায়রার মতো পায়রা পাওয়া যায়। খরগোসও পাওয়া যায়। এগুলি সবই বাজারে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় ও খুব সস্তা। নানাধরনের ফল ও দুধ সস্তা দরে পাওয়া যায়।

পায়েজকে বলা হয়েছিল যে বিজয়নগর শহরে এক লক্ষ বাড়ি আছে। এগুলি সবই একতলা। প্রত্যেকটি বাড়িই নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। নদীর অন্য পারে আর একটি শহর। এর তিনটি দরজা, যার একটা নদীর দিকে। নদী পার হয়ে শহরে ঢুকতে গেলে এই দরজা ব্যবহার করা হয়। উত্তর দিকের দরজা অনেক বেশি মজবুত। আর একজন পর্তুগিজ ভ্রমণকারী ফারনাও নুনিজ কৃষ্ণদেব রায়ের নাগলপুর (বর্তমান হসপেট) শহর তৈরির কথা বলেছেন। শহরটি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তিনি একটা বড় বাঁধানো রাস্তা তৈরি করেন যার দুপাশে বাড়ি তৈরি করা হয়। তাঁর আদেশমতো অভিজাতরা এখানে তাদের প্রাসাদ করে। শহরে একটা বড় রাস্তা আছে যেটা প্রায় দেড় মাইল লম্বা। নুনিজ-এর কাছে রাস্তাটিকে বড় সুন্দর লেগেছিল। যদিও এ রাস্তার কোনও অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। এ শহরে মাল নিয়ে যেতে গেলে বা মাল নিয়ে বেরোতে গেলে, কর দিতে হয় যার থেকে রাজা বছরে ৪২,০০০ পারাদো পান। বিজয়নগরে বা নাগলপুরে কিছু তৈরি হয় না—সবই বাইরে থেকে আসে। বিজয়নগরের প্রধান দরজা বছরে বারো হাজার পারাদোতে ইজারা দেওয়া হয়। এই দুটো শহরে প্রতিদিন বাইরে থেকে মাল নিয়ে দু হাজার বলদ আসে। শহরের বাইরের জমিতে গম, ছোলা, পান ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে হয়। উল্লেখযোগ্য যে নুনিজ বলছেন, যে রাজার ছয় লক্ষ সৈন্য আছে প্রধানত তাঁর অভিজাতদের অধীনে। এই অভিজাতদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জমি দেওয়া আছে, যার থেকে আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তারা রাজাকে দেয় ও বাকি পঞ্চাশ ভাগ রাখে নিজেদের ও সৈন্যদের খরচের জন্য। কত সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি থাকবে এটাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এর ফলে সাধারণ লোকের দুর্গতির সীমা নেই কারণ যাদের হাতে জমি আছে তারা অর্থসংগ্রহ করার চেষ্টায় নানান অত্যাচার করে।

সমকালীন বিজয়নগরে লোকসংখ্যা কত ছিল সেটা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। ভ্রমণকারীদের কয়েকটি মন্তব্য থেকে একটা সংখ্যা অনুমান করতে পারা যায়। যে সময়ে পায়েজ রোমের সঙ্গে বিজয়নগরের তুলনা করেছেন, সে সময়ে রোমের জনসংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ হাজার। সুতরাং বলা যায় যে পায়েজ জনসংখ্যার দিক থেকে তুলনা করেননি। বিজয়নগরে তখন এর থেকে অনেক বেশি লোক ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পায়েজ আর এক জায়গায় এক লাখ বসতবাড়ির কথা বলেছেন যেগুলো পাকা বাড়ি বলে মনে হয়। অন্য আর একজন পর্তুগিজ ভ্রমণকারী, দুয়ার্ত বারবোসা, অবশ্য কেবল মাটির কুঁড়েঘরের কথা বলছেন। অধ্যাপক ইরফান হাবিব ও শিরিন মুসভি ফতেপুর সিক্রির জনসংখ্যা নির্ধারণ করার সময় পরিবারপিছু গড়ে পাঁচ জন ধরেছেন। সেটা ধরলে, পায়েজের বসতবাড়ির সংখ্যা অনুযায়ী, কুঁড়েঘরের লোকজনকে বাদ দিয়ে, সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ। অন্য আর একদিক থেকেও দেখা

যায় আবদুর রাজ্জাক ও নুনিজ মোট সৈন্যসংখ্যা পাঁচ/ছয় লক্ষ ধরেছেন। এটা ধরলেও ওই একই পাঁচ লক্ষ আসে কারণ সব সৈন্য রাজধানীতে ছিল না। সুতরাং পায়েজ কেন রোম শহরের সঙ্গে তুলনা করলেন এটা জানা দরকার। রোমে তখন নদীর ধার দিয়ে বসতি শুরু হয়েছিল এবং মনে হয় পায়েজ ওই ধরনের প্রসার লক্ষ করে এই তুলনা করেছেন। তা ছাড়া রোম শহর যেমন পাহাড়ের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, বিজয়নগরের সঙ্গে তার মিল রয়েছে—অন্তত পায়েজের কাছে তা মনে হয়েছিল।

কিন্তু এই পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যা ধরলে বিজয়নগরকে সমকালীন বিশ্বের সবথেকে জনবহুল শহর বলে ধরা যায়। সমকালীন গৌর ও ফতেপুর সিক্রির জনসংখ্যা দু লক্ষর কিছু বেশি। সুতরাং বিজয়নগরের জনসংখ্যার ঘনত্ব (density of population) একটি বিরাট সমস্যা। গৌর শহরের ক্ষেত্রে আর এক প্রবন্ধে অনুমান করেছিলাম প্রতি বর্গমাইলে দু হাজার। ফতেপুর সিক্রির ক্ষেত্রে এই অনুমান করা হয়নি। কারণ সেখানে খাজনা থেকে জনসংখ্যার অনুমান করা হয়েছিল। বিজয়নগরের ক্ষেত্রে কয়েকটি অনুমান করা যেতে পারে। সমকালীন ভ্রমণকারী নিকোলো কন্টি বিজয়নগরের ব্যাসার্ধ ধরেছেন ষাট মাইল। যদি এটিকে ষাট বর্গমাইল ধরা হয়, তা হলে প্রতি বর্গমাইলে ১২০০ জন পাওয়া যায়। পাহাড়, পাঁচিল, প্রাসাদ এলাকা, অসংখ্য মন্দির ও অভিজাতদের বাড়ি ইত্যাদি বাদ দিলেও, এ সংখ্যা বড় নয়। কিন্তু আরও সহজ গণনা হতে পারে ধ্বংসস্তূপের প্রসারতা থেকে যে কাজটি এখনও হয়নি। কিন্তু এটাতে কোনও সন্দেহ নেই যে মধ্যশহর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি ছিল, প্রান্তিক এলাকার তুলনায়। ফ্রিজ ও মিশেলের গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকার তুলনায় শহরের মাঝখানে ঘনবসতি ছিল। ভ্রমণকারীরা প্রাসাদ এলাকা থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে যেতে জনবহুল পথ, বাজার ও পথে হাঁটার সমস্যার উল্লেখ করেছেন। ওই পথের দুধারের সারিবদ্ধ বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এই ঘনবসতির সাক্ষ্য দেয়।

এই বিশাল জনবহুল শহরের প্রধান সমস্যা খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগান দেওয়া। ভ্রমণকারীরা বলেছেন, শহরের মধ্যে কিছু জায়গায় ধান ও তরকারির চাষ হয় যা মধ্যযুগীয় শহরের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই উৎপাদন প্রধানত অল্প কয়েকজন লোকের চাহিদাই পূরণ করতে পারে। নুনিজ পরিষ্কার বলছেন যে শহরে কোনও খাবার উৎপাদন হয় না—প্রতিদিন বলদে করে মাল আসে। অন্য আর একজন বলেছেন যে দূরদূরান্ত এমনকী মালাবার থেকেও মাল আসে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে নানা সংখ্যায় পাঁচিল থাকলেও গ্রামাঞ্চল ও দূর প্রদেশগুলির সঙ্গে এই শহর অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত ছিল শুধু নয়, তাদের উপর নির্ভরশীলও ছিল। খাজনার অর্ধেক প্রদেশ থেকে আসত এই শহরে যার অর্ধেক রাজা ব্যয় করতেন শহরে সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি রাখবার জন্য। ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান এই পদ্ধতিকে ধর্মীয় ও আইনানুগ যথার্থতা দান করেছিল।

কিন্তু এর মধ্যেও একটা সমস্যা রয়ে গিয়েছে। ভ্রমণকারীরা বিজয়নগরের বাজারের প্রতুলতা শুধু বলেননি, বাইরের দামের তুলনায় যে শহরের ভিতরে দাম

কম, সেটাও বলেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই সব মাল ভিতরে আসার জন্য কর দিতে হত। অর্থাৎ যাতায়াতের খরচ ও করের বোঝার পরেও বাইরের তুলনায় শস্যর দাম ভিতরে কম। এর থেকে দুটো অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত, বলা যায় যে উৎপাদন জোর করে করা হচ্ছে যার কথা নুনিজ বলেছেন। অর্থাৎ উৎপাদনকারীরা তাদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না যার ফলে শাসকশ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের কাছে মূল উৎপাদন খুব কম দামে বিক্রি হচ্ছে। রাজধানীতে অর্থের জোগান অত্যন্ত বেশি হওয়ায় অর্থাৎ ক্রেতার অর্থ থাকায় ওই মাল রাজধানীতে আসছে ও কম দামে বিক্রি হচ্ছে। মনে হয় মালের তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ার ফলে রাজধানীতে প্রভূত অর্থের জোগান সত্ত্বেও দাম বাড়েনি। দ্বিতীয়ত, ওই একই মাল, যখন উদ্বৃত্ত হিসেবে উৎপাদক সরাসরি বিক্রি করছে শহরের বাইরে তখন তার দাম বেশি। অর্থাৎ এখানে বিক্রেতা বা উৎপাদক তার মজুরির মূল্য পাবার চেষ্টা করছে। রাজধানীর কাছে এ চেষ্টা নিরর্থক কারণ ভিতরের দাম বাইরের থেকে কম। এর ফলে বিজয়নগর শহর একটা প্রায় পিরামিডের উচ্চস্তরের অবস্থায় রয়েছে। টাকা, মাল, খাবার, সবই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এই শহরে। বলা যায় যে এই শহর সমগ্র সাম্রাজ্যকে শুষে নিচ্ছে এবং বিনিময়ে প্রায় কিছুই দিচ্ছে না। মধ্যযুগীয় ভারতীয় শহরের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিজয়নগরে এর মাত্রা এত বেশি হয়ে যায় যে পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

বিজয়নগরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেদের কার্যসূত্রে এখানে বাস করার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একচেটিয়া ও কঠোর মনোভাব দেখা যায়নি। মসজিদ বা ইদগা-র অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতরা তর্ক করতে পারেন। সমকালীন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা অবশ্য পরিষ্কার বলেছেন যে মুসলমানদের থাকার এলাকা আলাদা ছিল। ওই বিতর্কিত মসজিদ বা ইদগা ওখানে পাওয়া যায়নি। কিন্তু যে এলাকা ওই ভ্রমণকারী নির্দেশ করছেন সেখানে কোনও মসজিদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়নি, যদিও প্রত্নতত্ত্বর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ফেরিস্তা বলেছেন যে বিজয়নগরের রাজারা ক্রমাগত মুসলমান শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও, মুসলমানদের ধর্মে হাত দেননি। তিনি আরও বলেছেন যে, দ্বিতীয় দেবরায় মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরি করেছিলেন। উনি বলছেন যে মুসলমানদের উৎসাহ দেবার কারণ ছিল তারা ভাল ধানুকি ও ঘোড়সওয়ার। একটামাত্র সৌধই মসজিদের কাছাকাছি বলে মনে হয়, সেটি দানায়কের ঘেরা জায়গার মধ্যে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এটিকে মসজিদ বলে মানা শক্ত। পর্তুগিজদের লেখা থেকে ফেরিস্তার সমর্থন মেলে। মুসলমান সৈন্যরা যে বিজয়নগর শহরের সৈন্যদলে ছিল তার কথা পর্তুগিজ ভ্রমণকারী লিখে গিয়েছেন। শহরের বাজার দেখলে এই ধরনের লোকেদের উপস্থিতির কথা আরও পরিষ্কার হয়ে আসে। শহরের বাজারে সব রকম পশু ও পাখি জীবন্ত অবস্থায় বিক্রি হত তার কথা পায়েজ ও নুনিজ বলে গিয়েছেন। নুনিজ আরও বলেছেন যে, রাজা গরু ও মোষের মাংস ছাড়া আর সব পশু ও পাখির মাংস খেতেন যার জন্য অভিজাতরা তাঁকে নানা ধরনের পশু ও পাখি উপহার দিত। নবমীর উৎসবে মোষ বলিদান দেওয়া হত সেটা পর্তুগিজরা দেখেছেন। সুতরাং হিন্দু ধর্মের

কঠোরতা অন্তত খাবার বেলায় বিজয়নগরে ছিল না। মুসলমানরা ছাড়াও বিদেশি বণিক প্রচুর আসত। বিশেষত পর্তুগিজরা সোনার মুদ্রার বিনিময়ে ঘোড়া বিক্রির জন্যে আসত। ফলে শহরের সংস্কৃতি একটা মিশ্র সংস্কৃতি ছিল যেখানে উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, ঘোড়া, দেবদাসী এমনকী বেশ্যাদের সহাবস্থানের কথা দেখা যায়। কিন্তু নিরামিষাশী জৈন বণিক বা বৌদ্ধদের সংখ্যা কম ছিল মনে করার কারণ নেই। অসংখ্য জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরে এ নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থাপত্যশৈলীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলামি রীতির নিদর্শন মেলে। একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন শহরের বাজারে বাজারি পণ্য হিসেবে টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে, অন্যদিকে একটা মিশ্র সংস্কৃতি শহরকে অনেক বেশি জীবন্ত করে রেখেছিল। উল্লেখযোগ্য এই সব উৎসবে নদীর কোনও স্থান নেই—এখানে পাহাড় শহরের উপর অনেক বেশি চাপ রেখেছে। শহরের প্রসারণও আমরা দেখি নদীর পাড় দিয়ে নয়, দেশের অভ্যন্তর দিয়ে যেখানে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন বাজারি পণ্য হিসেবে আসবে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর রচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে তুঙ্গভদ্রার তীর বিজয়নগরের জগতে উপেক্ষিত।

এই ধরনের বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় অত্যাচারের মাত্রা কিছু কম ছিল না। এর মধ্যেও কিছু কিছু কেন্দ্রীয় কর গ্রামের উপর বসত যা মাঝে মাঝে বাড়ানো হত। অধ্যাপক মহালিঙ্গম বিজয়নগরের শিলালেখগুলি অনুধাবন করে দেখাচ্ছেন যে গ্রামবাসীরা নানাভাবে বর্ধিত কর বা যা চিরাচরিত কর নয় তা আরোপ করার বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ জানাত। সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়াও সহজতর পন্থা ছিল গ্রাম ছেড়ে সবাই মিলে চলে যাওয়া। অর্থাৎ সমাজের নীচের তলায় একটা দ্বন্দ্ব বরাবরই ছিল, এটা সহজেই অনুমেয়। বিজয়নগর শহরের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত করের প্রয়োজন বেশি হচ্ছিল, ফলে ওই দ্বন্দ্বের পরিমাণও বাড়ছিল এটা মনে করা যেতে পারে। শহরের বিন্যাসের মধ্যে এই শ্রেণীবিভাজন চোখে পড়ে। ভিটল মন্দিরের সামনের রাজপথে পর্তুগিজ ভ্রমণকারী শুধু উচ্চবিত্তর বণিক, অভিজাত ও রাজার প্রাসাদ দেখেছেন। এমনকী বারান্দাওয়ালা বড় বড় বাড়ি রাখা ছিল উচ্চ শ্রেণীর তীর্থযাত্রীদের জন্য। আবদুর রাজ্জাক কালিকট থেকে দীর্ঘযাত্রার পর ক্লান্তি ঘোচান এই ধরনের একটি বাড়িতে।

এই ধরনের পরগাছাশ্রয়ী উৎসবমুখর শহরে বহু বাজার থাকবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ভ্রমণকারীদের বর্ণনা থেকে ও প্রত্নতত্ত্বর সাক্ষ্য থেকে এরকম চারটি বড় বাজার ছিল এটা বোঝা যায়। কিন্তু এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রায়-বিচ্ছিন্ন এলাকায় ছোট বাজার ছিল সেটা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন নিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার বলদ আসছে তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায়। যা পাওয়া যায় না তা হল নদীপথে মাল যাতায়াত ব্যবস্থা। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চল ও প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেবল স্থলপথেই চলাচল করত। ফলে আমরা প্রান্তিক প্রদেশ থেকে রাজধানী পর্যন্ত বহু ছোট ছোট কসবা বা বাজার শহরের কথা পাই, যেগুলি কেন্দ্রীভূত শক্তির কল্যাণে কোনওদিনই বড় হতে পারেনি। এই ব্যবস্থায় শহরের মধ্যে শিল্প উৎপাদনের বিশেষ কোনও বিবরণ পাই না। যেটুকু পাওয়া যায় তা

যৎসামান্য মাত্র যা প্রায় সব মধ্যযুগীয় শহরেই আছে। কোনও শহরতলির কথাও আমরা পাই না, যা অন্যান্য সমকালীন মধ্যযুগীয় শহরের বৈশিষ্ট্য। অতএব বিজয়নগর শহর যতই বড় ও ঐশ্বর্যশালী হচ্ছে, ততই তার ঐশ্বর্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং শহর ও বাইরের জগতের মধ্যে প্রভেদ বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান অভিজাতবর্গ ও সৈন্যদের জন্য বিলাসদ্রব্য ও যুদ্ধের ঘোড়া প্রয়োজন যা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আনতে হচ্ছে। এই বিদেশি বাণিজ্যের প্রধান সুবিধে পেয়েছে গোয়া। এই মুদ্রা অর্জন করতে গেলে সাম্রাজ্যের রপ্তানি বাড়ানো দরকার—শিল্পজাত দ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেটা বিজয়নগরে উৎপাদিত হয় না। ফলে রাজধানী ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বণিকজাতির উপর এবং গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনের উপর। গ্রামীণ পঞ্চায়েতের সঙ্গে এই ধরনের শাসনব্যবস্থার দ্বন্দ্ব শাসকশ্রেণীকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা বিজয়নগরের পতনের একমাত্র কারণ বলে সংঘটিত মুসলমান শক্তির আক্রমণকে বলে ধরেছেন। অর্থাৎ মূলে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই ও হিন্দুদের পরাজয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রধান আদর্শ হলে তালিকোটার একমাত্র যুদ্ধে এত বড় ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের পতন হত না। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বিজয়নগরের মুসলমান সৈনিকদের চক্রান্তের কথা বলেছেন—তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ওই যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। আমরা দেখি যে তালিকোটার যুদ্ধের পরেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে সব অভিজাতরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তারা কেউই মুসলমান নয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিজয়নগর শহর লুঠ করে আশেপাশের গ্রামীণ উপজাতিরা, যারা কেউই মুসলমান নয়। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক আমরা দেখেছি। যুদ্ধের বর্ণনায় মনে হয় যে অভিজাতদের বড় একটা অংশ রাজাকে সাহায্য করেনি। এরাই পরে বিদ্রোহ করে। এই ধরনের মনোভাবের পিছনে ধর্মের আদর্শ মধ্যযুগের ইতিহাসে খুঁজতে যাওয়া বৃথা—অন্তত পলাশির প্রান্তরে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের ওই শিক্ষাই দেয়। তালিকোটার যুদ্ধ নিমিত্তমাত্র—সাহিত্যিক হলে হয়তো বলা যেত যে উপেক্ষিতা তুঙ্গভদ্রা নদী শেষবারের মতো তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

৫

গোয়া

কয়েকটি শিলালেখ থেকে বোঝা যায় যে গোয়া কাদম্ব বংশের রাজধানী ছিল। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ কাদম্ব বংশের প্রথম রাজা ত্রিলোচন কাদম্ব গোয়ার পত্তন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এই বংশ গোয়া নিজেদের অধিকারে রাখে। এর পর এটি কোনও মুসলমান শাসকের হাতে চলে যায়। ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের হরিহর-এর সেনাপতি মাধব এটি দখল করেন। ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাহমনি রাজবংশের দ্বিতীয় মুহম্মদ-এর সেনাপতি মুহম্মদ গাওয়ান এটি দখল করে নেন। এর পর বিজাপুরের আদিলশাহি রাজবংশ এটি নিয়ে নেয়। কালিকটে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামলেও বিজাপুরের হাতে গোয়া ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যখন আলবুকার্ক এটি দখল করেন। কিন্তু ইউসুফ আদিল শাহ ওই বছরের ২৩ মে পুনর্দখল করেন। নবাগত পর্তুগিজ রণতরীর সাহায্যে আলবুকার্ক গোয়াতে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয়বার শহর দখল করেন ২৫ নভেম্বর ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে। এর পরই তিনি শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করেন। এর ফলে গোয়ার অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং পর্তুগিজদের পূর্ব সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সঙ্গে আসেন নতুন শাসনকর্তা মার্টিন আলফনসো। ইব্রাহিম আদিল শাহ ওই সময়ে সালসেট ও বারদেস পর্তুগিজদের দিয়ে দেন। ইব্রাহিম আদিল শাহ আবার গোয়া আক্রমণ করে পরাজিত হলে পর্তুগিজরা বড় পাঁচিল তুলে গোয়াকে সংরক্ষিত করতে চায়। কাজ শেষ হবার আগে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম আদিল শাহ আবার আক্রমণ করেন। দশ মাস যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হয়ে ফিরে যান।

পর্তুগিজদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হতে থাকে ওলন্দাজ কোম্পানির আগমনের পর। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে তারা গোয়া অবরোধ করলেও পরে তা তুলে নেয়। কিন্তু তারা পর্তুগিজ অধিকৃত অন্যান্য জায়গা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় ফলে পর্তুগিজদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মারাঠা ও ভোঁসলেরা নানান দিক থেকে পর্তুগিজদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকে। মারাঠারা বারদেস দখল করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গোয়ার নবাগত শাসনকর্তা লরিকাল

মারাঠাদের হারিয়ে দিয়ে বারদেস দখল করেন। তিনি ভোঁসলেদেরও পরাজিত করেন।

স্থানীয় লোকেরা গোয়া দ্বীপের পুরনো নাম বলেন *তিসভাদি* বা ত্রিশটি গোষ্ঠী। দ্বীপটি একটি ত্রিভুজের মতো। এর পুরো এলাকা ৪৮ বর্গমাইল। প্রধান ভূখণ্ড থেকে দুটি নদী একে আলাদা করে রেখেছে—একটি মাণ্ডভি ও অন্যটি জুয়ারি। হিন্দুরা এ দুটি নদীকে বলে গোমতী ও আগনসিনি। দুটি নদীই এক জায়গায় মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে যেখানে বড় বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরের বাঁ দিকে আগুয়াদা দুর্গ যার উপর বহু কামান আছে। ডান দিকে মারমাগোয়া দুর্গ। মাণ্ডভির মুখ অবধি এগোলে আরও দুটো ছোট দুর্গ দেখা যায়। আরও এগোলে পাঞ্জিম শহর— গোয়ার রাজধানী। এর তলায় রিবন্দর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। অনেককাল আগে রিবন্দর থেকে পুরনো শহরের দুপাশে ছিল সুন্দর সুন্দর বাড়ি যার বর্ণনা কয়েকজন ভ্রমণকারী দিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে অবশ্য এই বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে।

গোয়া নাম নিয়ে মতদ্বৈত আছে। কারওর কারওর মতে পরশুরামক্ষেত্রর গোভারাষ্ট্র থেকে এই নামকরণ হয়েছে যার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। কয়েকটি শিলালেখতে গোপকাপুরী ও গোপকাপট্টন কথাটি দেখা যায়। পর্তুগিজ লেখক দিয়েগো দ্য কুতো বলেছেন গোমত শব্দটি থেকে গোয়ার নামকরণ হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত বা কানাড়া সাহিত্যে গোমত শব্দটি পাওয়া যায় না। ১৩৯১ খ্রিস্টাব্দে তাম্রপত্র থেকে গোয়া শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে যার থেকে মনে হয় যে পর্তুগিজরা আসার আগেই গোয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। হিন্দুদের কাছে বহুকাল ধরেই গোমন্ত শব্দটি অতি পরিচিত। মহাভারত, হরিবংশ, স্কন্দপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে এই শব্দটি পাওয়া যায়। শব্দটির সঙ্গে বীর-এর কাজকর্মের যোগ আছে। এ ছাড়াও গোয়া ও আশেপাশের জায়গার নাম কূভা, গোভা ও গোভে হিসেবে পাওয়া যায়। অন্তত দ্বাদশ শতাব্দীর একটি শিলালেখতে গোভে শব্দটি পাওয়া গিয়েছে। গ্রিকদের নানা ধরনের নামকরণ নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈত রয়েছে।

আরবদের নামকরণের সঙ্গে গ্রিকদের বিশেষ মিল নেই। কয়েকজন পণ্ডিত আরবদের কাওয়ার সঙ্গে গোয়ার মিল খুঁজে পেয়েছেন। কেউ কেউ আরবি শব্দ সিন্দবারকে গোয়া বলেছেন। বহু আরব ভৌগোলিক সিন্দবার-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত একে সিন্দান বা সজ্জান-এর সমার্থক বলে ধরেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রেখাচিত্রে সিন্দবারকে চিন্তাবার বলে ধরা হয়েছে।

কাদম্ব বংশের পুরনো গোয়া ছিল জুয়ারির দক্ষিণপারে। কানাড়ি শিলালেখতে একে গোভে এবং সংস্কৃত শিলালেখতে একে গোপকাপুরী বা গোপকাপট্টন বলে বলা হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে কাদম্বদের এটাই ছিল রাজধানী। সমকালীন শিলালেখে এই শহরে বহু ধনী পণ্ডিত বাস করত বলা হচ্ছে এবং শহরটি ইন্দ্রপুরীর চেয়েও ঐশ্বর্যময় বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। পর্তুগিজরা যখন ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে গোয়া দখল করে, তখনও কয়েকটি বাড়ির অস্তিত্ব ছিল। পর্তুগিজরা একে পুরনো গোয়া বা গোয়া তেলহা বলে অভিহিত করেছেন।

কাদম্ব বংশের পর দেবগিরির যাদব বংশ কিছুদিন গোয়া দখলে রাখে। ১২৯৪

খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। একবার উনি গোয়া দখল করে লুঠ করেন ও মালিক তুবলিগাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গোয়ার স্থানীয় অধিবাসীরা বারবার আক্রমণ করে পরাজিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হনরের শাসনকর্তা জামালুদ্দিন গোয়া দখল করেন। ইবন বতুতা আক্রমণকারীদের সঙ্গে ছিলেন ও গোয়াকে সিন্দবাহারের দ্বীপ বলছেন। ১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর বিজয়নগরের সেনাপতি গোয়া দখল করতে সক্ষম হন। ফেরিস্তার মতে বাহমনি সুলতানের আক্রমণের আগে পর্যন্ত গোয়া বিজয়নগরের মধ্যে ছিল। কিন্তু পর্তুগিজ ঐতিহাসিকরা বলেন যে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা গোয়াকে বিজয়নগর থেকে মুক্ত করে এবং মাণ্ডভি নদীর বাঁ দিকে একটা নতুন শহরের পত্তন করে।

এলা গ্রামের উপর অবস্থিত পর্তুগিজ শহরটি কাদম্বদের শহর থেকে দুই মাইল উত্তরে ও পাঞ্জিম শহর থেকে ছয় মাইল পূর্বে। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত এবং কবে এর পত্তন হয়েছিল, সেটিও খুব পরিষ্কার নয়। ইবন বতুতার সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি শহর ছিল—একটা হিন্দু শাসনের ও অপরটি মুসলমান শাসনের সময়ে। বতুতা ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেশ মরক্কোতে ফিরে যান; সুতরাং এর আগেই তিনি এ দুটি শহর দেখেছিলেন। অতএব বিজয়নগরের হস্তগত হবার আগেই তিনি গোয়াতে গিয়েছিলেন বলা যায়। কোনও কোনও পর্তুগিজ লেখক অবশ্য বলছেন পর্তুগিজ বিজয়ের চল্লিশ বছর আগে হনরের মুসলমানরা একটি শহর এখানে পত্তন করেন। আবার কোনও কোনও পর্তুগিজ লেখক পর্তুগিজ শহরের পত্তনের সময় ধরেছেন ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ যখন পর্তুগিজ গোয়া স্বাধীন হয়। পুরনো পর্তুগিজ শহর ছেড়ে আসার কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন যে জুয়ারি নদীর জল ক্রমশ কমে গিয়ে মাণ্ডভি নদীর জল বেড়ে যাবার ফলে, পুরনো শহরের বন্দরে বড় জাহাজ আর যেতে পারছিল না। ফলে নতুন শহরের পত্তন হয় যেটা ক্রমশ ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে।

পর্তুগিজরা গোয়া জয় করার পরও হজ করতে যাওয়ার জন্য বহু মুসলমান গোয়াতে এসে জাহাজ ধরত। গোয়াতে যে বহু মুসলমান, বিদেশি ও অন্যান্য বণিকরা ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগিজ লেখক দুয়ার্ত বারবোসা। গোয়াতে প্রচুর হিন্দু বণিকেরও উনি উল্লেখ করেছেন। সুন্দর বন্দর বলে মক্কা, এডেন, হরমুজ, খাম্বাজ ও মালাবার থেকে প্রচুর জাহাজ আসে। শহরটি খুব বড়। এখানে অনেক সুন্দর রাস্তা আছে এবং পাঁচিল ও মিনার দিয়ে ঘেরা। অনেক চক আছে। অনেক মসজিদ ও হিন্দু মন্দিরও রয়েছে। চারপাশে প্রচুর গাছ এবং চাষআবাদ ভাল।

তবে সমকালীন শহর থেকে যে গোয়া বড় ছিল না এটা সহজেই বলা যায়। আর একজন ভ্রমণকারী, লিনসখোটেন, যিনি শহরের পাঁচিলগুলো দেখেছেন, বলছেন যে লম্বায় শহরটি এক মাইলের কম ও চওড়ায় এক মাইল। শহরের পাঁচিল খুব উঁচু নয় কিন্তু তার বাইরে জলে ভর্তি একটা পরিখা আছে। উত্তর দিকের দেওয়ালটি মাণ্ডভি থেকে অর্থাৎ শুল্কঘর থেকে (বর্তমান কনভেন্ট সেন্ট কাজেটানের পাশে) শেষ প্রান্তে অবস্থিত বারুদখানা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। শুল্কঘর ও বারুদখানার আলাদা দরজা

আছে। এ ছাড়া, মাঝখানে আর একটি বড় দরজা আছে। এখানেই ভাইসরয়ের খিলান তৈরি করা হয়েছিল। এই দরজা দিয়েই প্রাসাদ এলাকায় যাওয়া যায় যেখানে আদিল শাহ তাঁর সুন্দর প্রাসাদ করেছিলেন চমৎকার বাগান সমেত। পুব দিকে দেওয়ালটি পাহাড়ের নীচে পর্যন্ত চলে গিয়েছে যার নাম পর্তুগিজরা পরে দেন *নোসা সেনহরা দ্য মন্ত* । পশ্চিম দিকে দেওয়ালটি বারুদখানা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দক্ষিণ দিকে দেওয়ালটি একটি গির্জা (*নোসা সেনহরা দ্য সেরা*) পর্যন্ত গিয়েছে। এ জায়গাটা বর্তমানে গির্জার কবরখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালের বাইরে পবিত্র পাহাড় (*নোসা সেনহরা দ্য রোমারিও*) যার কাছে একটি কনভেন্ট আছে। গির্জার কাছে একটি দুপাল্লার দরজা যার মধ্য দিয়ে প্রাসাদ এলাকা থেকে শহরতলিতে যাতায়াত করা যেত।

শহরের প্রধান সৌধগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধান মসজিদ এবং আদিল শাহর বিখ্যাত প্রাসাদ। যার ভিতরে নানাধরনের ঘর ও কাঠের থাম। প্রাসাদের সামনে বিরাট চক। কাছেই পাথরে বাঁধানো পুকুর। সম্ভবত বিজাপুরি সুলতানদের চিত্তবিনোদনের জন্য তৈরি। ব্যক্তিগত বাড়িগুলি প্রধানত একতলা, যদিও ভিতরে অনেক জায়গা আছে। লোকেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য কয়েকটা বাড়ি ছিল এবং প্রচুর দোকান ছিল যার মধ্যে স্বর্ণকারদের দোকান বিখ্যাত ছিল। পর্তুগিজ ঐতিহাসিক ব্যারোস-এর মতে গোয়া শহর থেকেই আদিল শাহ বছরে পাঁচ হাজার পাউন্ড পেতেন ও চারপাশের জায়গা থেকে আসত প্রায় কুড়ি হাজার পাউন্ড। এই আয় প্রধানত ছিল শুল্ক থেকে। এর বড় একটা অংশ ছিল আরব উপকূল ও হরমুজ থেকে ঘোড়া আমদানির উপর শুল্ক থেকে পাওয়া। প্রতিটি ঘোড়ার জন্য শুল্ক ছিল দুই পাউন্ড। সরকার প্রতিদিনকার খাবার উপর একচেটিয়া ব্যবসা করতেন এবং এর থেকে বছরে লাভ ছিল ১৬৫০ পাউন্ড।

পর্তুগিজরা গোয়া দখল করার আগে এই ছিল অবস্থা। আলবুকার্ক গোয়া দখল করে তিন দিন তাঁর সৈন্যদের গোয়া লুঠ করতে দেন। ওই লুঠ ভাগ করলে রাজার বরাদ্দ হয় প্রায় বিশ হাজার পাউন্ড ও তিন হাজার ছোট-বড় কামান। বলা বাহুল্য লুঠের পরিমাণ ছিল আরও অনেক বেশি। আলবুকার্ক শহরটি সুরক্ষিত করার জন্য মন দিলেন। দেওয়াল সারিয়ে তিনি কামানের জন্য আলাদা বুরুজ বসান। টমাস ফারনান্দাসের উপর ভার পড়ে দুর্গ সুরক্ষিত করার। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য সমস্ত পর্তুগিজকে কাজে লাগানো হয়। এমনকী তিনি নিজেও সাধারণ শ্রমিকের কাজ করেন। এর পর পর্তুগিজ রাজার নামে দুর্গের নামকরণ হয় ডম ম্যানুয়েল ।

প্রজাদের সুখে রাখার জন্য আলবুকার্ক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করেন। কোনও রকম ধর্মবিশ্বাসে বাধা দেওয়া হত না এবং কর ছিল অতি কম। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহে তিনি নানারকম যৌতুক দিতেন এবং অধিকৃত জমি ও বাড়ি প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। তিনি একটি পৌরসভা তৈরি করেন যার বিষয় আমরা পরে দেখব। কিন্তু শাসনযন্ত্রের মধ্যে তিনি মুসলমানদের প্রতি কঠোর ছিলেন ও হিন্দুদের নানারকম সুবিধে দিতেন। একমাত্র সতী ছাড়া আর কোনও বিষয়ে তিনি কোনও বাধার সৃষ্টি করেননি। এক হিন্দু, টিমোজা ও তার পরে মাধবরাও, খাজনা সংগ্রহ

করার দায়িত্বে ছিলেন। শহরের ক্যাপ্টেন হলেন রডরিগো রেবেলো ও শহরের প্রধান কনস্টেবল হন ফ্রানসিসকো পান্তোজা। কিন্তু পর্তুগিজ কেন্দ্রস্থল কোচিন থেকে গোয়ায় আসতে আরও কুড়ি বছর লেগে যায়।

১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক-এর মৃত্যুর পরও শহরের বৃদ্ধি থামেনি। ফাঁকা জায়গাগুলিতে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি তৈরি হতে শুরু করে। পরবর্তী শাসনকর্তা লোপো সুয়ারেস কনভেন্ট তৈরি করার জন্য আর জায়গা দিতে রাজি ছিলেন না কারণ ততদিনে তিনটি গির্জা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এর ফলে শহরের প্রসার শুরু হয় এবং পরিখা বোজানো হতে থাকে। ১০ মার্চ ১৫৪০-এর রাজকীয় আদেশ ছিল নতুন বাড়ি তৈরির বিরুদ্ধে। কিন্তু সেটা উপেক্ষা করে বাড়ি তৈরি হতে থাকে। বাড়ি তৈরির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলে শহরের সব দিকেই প্রসার হতে থাকে। সমকালীন হিসেব অনুযায়ী তৎকালীন শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দু লক্ষের মতো। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার প্রথম এসে এই শহরের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

পরের বছর ভয়াবহ কলেরা শুরু হয় এবং প্রতিদিন অসংখ্য লোক, গবাদি পশু ইত্যাদি মারা যেতে থাকে। অধিবাসীদের মৃত্যুভয় কমানোর জন্য মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় গির্জার ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলেরা কমে গেলে শহরের বৃদ্ধি আবার শুরু হয়ে যায়। ১৫৪৮ সালে শহরে বড় ও ছোট গির্জার সংখ্যা দাঁড়ায় শহরতলিসুদ্ধ চৌদ্দ। ফরাসি পরিব্রাজক ভিনসেন্ট ল্য ব্লঁ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে শহরের প্রশংসা করে বলেছেন এই শহরের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা লিসবন শহরকেও ছাড়িয়ে যায়। শহরের আয়ও প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। শুধু শুল্ক ও নানারকমের কর থেকে বছরে পাওয়া যেত প্রায় তিন হাজার পাউন্ড। ততদিনে গোয়া পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের (পূর্ব দিকের) রাজধানী হয়েছে এবং এর পৌরসভা সরাসরি পর্তুগালের রাজার কাছে আর্জি পাঠাতে পারত। রাজদরবারে গোয়ার এক প্রতিনিধিও ছিলেন এ সব দেখাশোনা করার জন্য।

১৫৬৪ সাল নাগাদ রাজার আদেশ আসে শহরকে নতুন পাঁচিল দিয়ে সংরক্ষিত করার কারণ শহরটি পুরনো পাঁচিলের বাইরে চলে এসেছে। যখন এই পাঁচিল করা হচ্ছে, তখন (১৫৭০ সাল) আলি আদিল শাহ প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে গোয়া অবরোধ করেন। প্রায় দশ মাস অবরোধের পর, তিনি অবরোধ তুলে চলে যান। এর অব্যবহিত পরেই ভ্রমণকারী সিজার ফ্রেডারিক গোয়াতে আসেন। তিনি শহরটি সুন্দর ও বড় বলে বলেছেন—প্রচুর গাছ ও বাগান দিয়ে ভরা। কিন্তু এতকাল অবরোধের ফলে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে—একটা মুরগির দাম প্রায় সাড়ে ছয় শিলিঙের মতো। ফলে গোয়ায় থাকাকালীন তাঁর প্রচুর খরচ হয়। শহরে যে প্রায় দুর্ভিক্ষ চলছে এবং টাকা দিলেও খাবার পাওয়া যাচ্ছে না, এটা বলতে উনি ভোলেননি।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি শুধু দীর্ঘ অবরোধের জন্য হয়নি—এর মূল কারণ আরও গভীরে ছিল। শহরের চারপাশে ছিল বদ্ধ জলাভূমি। গোয়ার শাসনকর্তা শহরের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও রকম চিন্তা করেননি ও ব্যবস্থাও নেননি। শহরের বাইরে নদীর দুধার ছিল ময়লা এবং ভাঁটার সময় এগুলি পচে উঠত। সাধারণ লোকেরা

শাসনকর্তার মত নিয়ে নদীর দক্ষিণ দিকে তাদের প্রাতঃকৃত্য সমাপন করত। এ ছাড়া গরমের সময় শহরে পর্যাপ্ত খাবার জল ছিল না। সরকার নানাধরনের ঝরনার বিশুদ্ধ জল পাইপ বা নালির সাহায্যে শহরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেননি। ফলে কুয়োর জলের উপর শহরের লোক নির্ভরশীল ছিল—এ জল অত পরিশ্রুত নয়। শহরকে পরিষ্কার রাখার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি— যে কোনও লোক রাস্তায় ময়লা ফেলতে পারত। এর ফলে শহরের প্রধান রাজপথ ময়লায় ভর্তি ছিল। প্রায় তিরিশ বছর বাদে গোয়ার শাসনকর্তা রাস্তায় ময়লা ফেলা বন্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কোনও কোনও পর্তুগিজ লেখক অবশ্য বলেছেন যে পর্তুগিজ জয়ের আগে শহর অত্যন্ত ময়লা ছিল এবং পর্তুগিজরা শহরের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছে। গোয়া শহরের ইতিহাস অবশ্য সে কথা বলে না।

শহরের প্রথম মহামারী অল্প কিছুদিন স্থায়ী ছিল যদিও লোকসংখ্যা অনেক কমে যায়। কিন্তু ততদিনে শহর তার উচ্চতম শিখরে চলে গিয়েছে যার ফলে ওই মহামারীর ফলাফল অতটা লক্ষ্যণীয় হয়নি। এই অভাবনীয় উন্নতির মূলেই এর পতনের বীজ লুকিয়ে ছিল।

জন হিউগো লিনসখোটেন ১৫৮৩ সালে গোয়াতে আসেন। ১৬০৪ সালে আসেন ফ্রান্সিস পিরাদ। এ ছাড়া আমরা পাই আরও কয়েকজন ভ্রমণকারীদের বর্ণনা যার মধ্যে আছেন র‍্যালফ ফিচ, পিয়েত্রো দেলা ভেলা ও অ্যালবার্ট দ্য ম্যান্ডেলস্লো। এ ছাড়া আরও কিছু বর্ণনা সমকালীন পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে ও চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় যার থেকে শহরের চিত্র পরিষ্কার হয়ে আসে।

লিনসখোটেন বলেছেন যে লিসবন শহরের মতো গোয়া কিছুটা উঁচু জমিতে ও কিছুটা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। আর একজন পর্যটক একে রোম নগরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি কয়েকটি পাহাড়ের মধ্যে। তিন দিকেই তিনটি পাহাড় ছিল। পাহাড়ের উপরে এবং নীচে বহু সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও বাড়ি তৈরি হয়েছিল। পিরাদ বলেছেন যে এই শহরের অসংখ্য গির্জা, চক, ছোট বড় পথ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ততদিনে শহর ও শহরতলিতে গির্জা ও কনভেন্টের সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে চলে গিয়েছে।

শহরের নিজের কোনও দেওয়াল নেই। পুরনো দেওয়াল আছে কিন্তু তার কোনও দরজা পর্যটকরা দেখেননি। শহরের রক্ষার জন্য প্রধানত রয়েছে দুর্গ যেটি বন্দরকে সুরক্ষিত করার জন্য তৈরি। ততদিনে শহরের পূর্ব দিকে লম্বা দেওয়ালের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকের একটা দুর্গ থেকে শুরু হয় এবং এটা শেষ হয় সাও থিয়াগো দুর্গে। মধ্যে একটা পুরনো মুসলমানি দুর্গ পড়ে যেটি পর্তুগিজরা সারিয়ে নিয়েছিল। এ ছাড়াও দেওয়ালটি বেনাস্তারিম-এর দুর্গ ছুঁয়ে যায়। পিয়েত্রো দেলা ভেলা এই দুর্গের উল্লেখ করেছেন এবং দুর্গের মধ্যে একটা বাড়িতে যে কিল্লাদার তখনও আছেন তাও বলেছেন। দেওয়ালটি এর পর দক্ষিণ দিকে ঘুরে মঙ্গেইরাল-এর দুর্গ হয়ে সাও জাও বাতিস্তার দিকে যায়। এর পর পশ্চিমমুখী হয়ে দেওয়ালটি পানেলিম কাজা দ্য পলডোরাতে শেষ হয়। এই দেওয়ালের তিনটি দরজা ছিল যেখানে রক্ষীরা দিনরাত পাহারা দিত। এই দরজাগুলি দিয়েই প্রধান ভূখণ্ডে

লোকেরা যাতায়াত করতে পারত। বেনাস্তারিম-এর দরজাই ছিল প্রধান যেখান থেকে প্রধান ভূখণ্ড হয়ে খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারি নিয়ে লোকেরা শহরে আসত। এ ছাড়াও অন্য দরজা দিয়ে পর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চলে যাওয়া যেত। কোনও লোক দরজা পেরোতে গেলে একটা কর দিতে হত, যার জন্য তার হাতে একটা চিহ্ন দেওয়া হত। কোনও পর্তুগিজ প্রধান ভূখণ্ডে যেতে গেলে পরিবার রেখে যেতে হত যাতে সে বাইরে কোনও কাজ নিতে না পারে।

পর্যটক পিরাদ বলেছেন শহরটির ব্যাসার্ধ ছিল, শহরতলি বাদ দিয়ে, সাড়ে চার মাইল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গবেষণায় জানা যায় যে শহরটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে এক মাইলের কিছু বেশি এবং চওড়ায় নদীর ধার থেকে পাহাড়ের তলা পর্যন্ত প্রায় এক মাইল। সম্পূর্ণ ব্যাসার্ধ চার মাইলের কিছু কম। পূর্ব দিকে ছিল দওগিম-এর শহরতলি যেখানে বহুদূর পর্যন্ত বাড়ি ছিল সারিবদ্ধ ভাবে। পশ্চিম দিকে ছিল পানেলিম-এর শহরতলি যেটা প্রায় রিবন্দর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। দক্ষিণে পুরনো গোয়া পর্যন্ত বাড়ি পাওয়া যেত। সুতরাং চারপাশেই বাড়িঘরের কোনও অভাব ছিল না। পিয়েত্রো দেলা ভেলা বলছেন যে এই জায়গার সবটাই ভর্তি ছিল চমৎকার ভিলা দিয়ে। নদীর ধারে গাছের কুঞ্জের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বাড়ি আছে। আর একজন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীর মতে ওই সময় গোয়ায় সাড়ে তিন হাজার বাড়ি ছিল যার মধ্যে পর্তুগিজদের বাড়ি ছিল আটশো। এর মধ্যে অবশ্য গির্জা বা ধর্মীয় বাড়ি ধরা হয়নি। জনসংখ্যার বিষয়টি আমরা পরে দেখব। লিনসখোটেনের মতে বহু দেশের বণিক এখানে ছিল। পূর্ব দিকের বণিকদের মধ্যে চিনদেশ, বাংলা, খাম্বাজ ও পশ্চিম এশিয়ার বণিকদের তিনি উল্লেখ করেছেন। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে তিনি ভেনেসিয়ান, ইংরেজ, জার্মান ও ইহুদিদের কথা বলেছেন যাদের গির্জা ছিল। পর্তুগিজদের প্রথম অধিকারের পর মুসলমানদের ঢোকা বারণ ছিল; কিন্তু লিনসখোটেনের সময়ে এ বাধা চলে গিয়েছিল। হিন্দুরা ছিল, কিন্তু তাদের মন্দিরে উৎসব করা বারণ ছিল বলে উনি বলেছেন।

পর্যটকরা এই সময়ের গোয়াকে স্বর্ণময়ী গোয়া (গোয়া দুরাদো) বলেছেন। এমনকী প্রবাদ হয়ে গিয়েছিল যে গোয়া দেখেছে, তার আর লিসবন দেখার প্রয়োজন নেই। পিরাদ বলেছেন যে ভারতের পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের রাজধানী গোয়া। এখানকার ভাইসরয় রাজার মতই দরবার বসান। আর্চ বিশপ ছাড়াও এখানে এক জন বিশপ আছেন ফলে গোয়া ধর্ম ও বিচারের কেন্দ্রস্থল। সমস্ত ভারতীয় রাজারাই এখানে দূত রেখেছেন। পর্তুগিজরাও তাদের দরবারে দূত পাঠান। পূর্বের সমস্ত দেশের বণিকরাই এখানে আসে। অগণিত লোক ও জাহাজ প্রতিদিন আসছে ও যাচ্ছে। প্রতিদিনই মনে হয় মেলা বসেছে। প্রতি বছর মাল নিয়ে প্রায় হাজার জাহাজ আসে। সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এমন কোনও কিছু নেই যা এখানে পাওয়া যায় না।

শহরে বহু রাস্তা আছে যার অনেকগুলোই বাঁধানো। তবু বর্ষাকালে যাতায়াত করা শক্ত। কোনও গাড়ি নেই, লোকেরা পালকি করে যায়। রুয়া দিরেইটা রাস্তাই প্রধানত বণিকরা ব্যবহার করত। রাস্তাগুলো প্রধানত অধিবাসীদের শ্রেণীর ভিত্তিতে নামকরণ করা অথবা যে জিনিস পাওয়া যায়, তার নামে করা। লিনসখোটেন কয়েকটি রাস্তার

নাম করেছেন যেখানে অ-খ্রিস্টান বণিকরা থাকে, এরা খুব ধনী। কারুর কারুর কাছে বিশ হাজার পাউন্ডও পাওয়া যাবে। একটি রাস্তার নাম উনি করেছেন যেখানে তাঁত ও রেশমের কাপড় ছাড়াও পর্তুগালের কাপড় ও চিনামাটির পাত্র পাওয়া যায়। আর একটি রাস্তায় যারা থাকে তারা মহিলাদের জামাকাপড় বিক্রি করে। এরা গয়নাও বিক্রি করে। আর একটা রাস্তায় খাম্বাজের বানিয়াদের পাওয়া যাবে যারা ওখানকার তৈরি জিনিস ও মূল্যবান রত্ন বিক্রি করে। আর একটা রাস্তায় খাট, বিছানা, ভ্রমণের জিনিসপত্র এবং সোফার কাজকরা জিনিস বিক্রি করে যেগুলো দেখতে বড় সুন্দর। যারা ভাড়া ও কর আদায় করে এবং দালাল হিসেবে কাজ করে তাদের একটা চক আছে। এ ছাড়াও ওষুধ বিক্রেতাদের চক আলাদা। কতকগুলি রাস্তার চকে ফল ও তরকারি এবং খাদ্যদ্রব্য বিক্রি হয়। সেগুলি এত সস্তা যে পৃথিবীতে ওই দামে ওই জিনিস পাওয়া যাবে না। দু শিলিঙে একটা লোক এক মাস অনায়াসে থাকতে পারে। ভ্রমণকারী ফিচ এখানে বন্দি হয়েছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন যে সুযোগ পেলে তিনি আবার গোয়া যাবেন।

বড় রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলি বড় বড় এবং সুন্দর দেখতে। কিন্তু ছোটখাটো রাস্তার উপরে প্রাসাদ ছিল বাগান সমেত। সাধারণত দোতলার বেশি উঁচু বাড়ি ছিল না যদিও বাড়িগুলি পাথরে গাঁথা ও টালি দিয়ে ঢাকা। সাধারণ বাড়ির জন্যে পাথর ওই দ্বীপ থেকেই পাওয়া যেত। কিন্তু বড় বাড়ির জন্য বেসিন থেকে পাথর আমদানি করতে হত। বাড়িগুলির ভিতরে ও বাইরে সাধারণত লাল বা সাদা রং করা হত। চওড়া সিঁড়ি ছিল এবং জানালাতে খড়খড়ি ছিল। কাচের বদলে কাঠের উপর শাঁখচূর্ণ ঘসে দেওয়া হত। জাফরি কাটা জানালা দিয়ে মহিলারা বাইরের দৃশ্য দেখতে পারতেন। বড় বড় অভিজাতদের শহরে প্রাসাদ ছিল এবং শহরতলিতে ভিলা ছিল বাগানের মধ্যে যেখানে তাঁরা পরিবার সমেত চলে যেতেন। এখানে নানা ধরনের বাগিচার মধ্যে ফোয়ারা ছিল। অসংখ্য দাসদাসী তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্য নিযুক্ত ছিল।

শহরে কোনও সরাইখানা বা হোটেল ছিল না কিন্তু নানাধরনের থাকবার ব্যবস্থা ছিল যার ব্যবহারকারীরা ছিল নিচু শ্রেণীর লোক। লিনসখোটেন বলছেন যে খালাসিরা মস্ত বড় হলঘরে থাকতেন। নানাধরনের জুয়া খেলার জায়গা ছিল যেগুলি খুব সাজানো ও বিলাসবহুল। এগুলিকে অনুমতির জন্য কর দিতে হত। যারা দিনরাত জুয়া খেলে, তারা ওখানে থাকতে পারত। প্রধানত তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি খেলা হত। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েরা গান গাইত ও নাচত, ভাঁড়রা নানারকম মজা তৈরি করত। বাণিজ্যিক শহরে যা পাওয়া যায়, তা সবই পাওয়া যেত গোয়া শহরে।

পর্তুগিজরা নিজেদের ফিদালগো বা অভিজাত বলতেন। তাঁরা কোনও ব্যবসা বা কাজ করতেন না। তাঁদের দাসদাসীরা কাজ করে যা পেত, তাই দিয়েই তাঁদের চলত। অফুরন্ত সময় থাকায়, তাঁরা নানারকম খেলাধূলা করতেন— ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালানো ইত্যাদি। এঁদের মেয়েরা সাধারণত বাড়িতে থাকত। তবে বাইরে বেরোলে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা ছিল। গান, বাজনা, গল্পগুজব করে বাড়িতে দিন কাটাত। অভিজাতদের বাড়িতে খাবার ছিল বিরাট ব্যাপার যেখানে প্রচুর পরিমাণে

মদ, মাংস খাওয়া হত। ১৬৩৯ সালের একটি রাতের খাবারের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন পর্যটক ম্যান্ডেলস্লো। তাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলছেন যে সাধারণ লোক প্রচুর পরিমাণে মাছ খেত। গোয়ার অলিতে-গলিতে মেয়েরা মাছ ভেজে বিক্রি করত। অভিজাতরা অবশ্য খেতেন মুরগি, শুয়োরের ও গরুর মাংস। অভিজাতদের বাড়িতে অগণিত দাসদাসী ছিল যারা অনেকেই ছাতা ধরে গির্জায় পর্যন্ত সঙ্গে যেত। বড়লোকের মেয়েরা নানা রং-এর গাউন পরে পালকি চড়ে গির্জায় যেতেন। এঁদের সঙ্গে পালকিতে তাঁদের ছেলেমেয়েরা থাকত ও সঙ্গে থাকত অনেক দাসদাসী। পিরাদ এঁদের গির্জায় যাওয়ার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

গোয়া শহরের জনসংখ্যা কত ছিল, তার সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। পর্যটকদের লেখায় কিছু আভাস পাওয়া যায়, যার কিছু উল্লেখ আমরা আগে করেছি। ধর্মীয় সংস্থাগুলির প্রতিবেদন থেকেও কিছু পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বছরে আদেশ আসে হিন্দুদের উপর কর বসানোর জন্য। তখন জানা যায় যে শহরে হিন্দুদের সংখ্যা বিশ হাজার যা শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আমরা আগে দেখেছি যে প্রথমদিকের একটি প্রতিবেদনে পাওয়া যাচ্ছে যে গোয়াতে ও শহরতলিতে প্রায় পাঁচ হাজার বাড়ি আছে। দাসদাসী নিয়ে প্রতি বাড়িতে পনেরো জন লোক থাকলে জনসংখ্যা হয় ৭৫,০০০। এর মধ্যে পর্তুগিজদের সংখ্যা ১৫০০-র বেশি ধরা যায় না এবং বাকিরা খ্রিস্টান, হিন্দু ও আফ্রিকা থেকে আগত দাসদাসী। কুড়ি বছর পরে আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির সংখ্যা বেড়ে তিন হাজারে পৌঁছেছে। কিন্তু বলা হচ্ছে যে জনসংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছে এবং কয়েকটি এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। সপ্তদশ শতাব্দী ধরে জনসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। ১৬৫৮ সালে গোয়া সরকার যখন হিন্দুদের উপর কর বসানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তখন দেখা যায় যে হিন্দুদের সংখ্যা কমে দুশোতে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে বিত্তশালী গুজরাটি ছিল সাত-আট জন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র বিশ হাজারে, যার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ ছিল মুলাটো বা যাদের শরীরে নিগ্রো রক্ত আছে।

জনসংখ্যা কমে যাবার নানান কারণ আছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে যে পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব পালনের উপর নানান ধরনের নিষেধাজ্ঞা। এ ছাড়াও ওই ধর্মযাজকরা অন্যান্য হিন্দু ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতেন। ফলে বিত্তশালী হিন্দুরা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে গোয়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি এসে গেলে ও পর্তুগিজ জায়গাগুলি দখল করে নিলে হিন্দুরা গোয়া ছেড়ে এইসব নতুন জায়গায় চলে যেতে থাকে। ক্রমাগত মারাঠা আক্রমণ, কানাড়া যুদ্ধ, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ যুদ্ধের ফলে হিন্দুদের গোয়া ছেড়ে যাওয়াটা ত্বরান্বিত হয়ে যায়। এ ছাড়া মহামারী ও দুর্ভিক্ষর ফলেও গোয়ায় জনসংখ্যা কমতে থাকে। ১৬৪৮ সালের দুর্ভিক্ষের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে শহর ও শহরতলিতে লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়ে রাস্তায় পড়ে আছে।

শহরের জাতিগত জনসংখ্যার মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে হিন্দুরাই ছিল প্রধান গোষ্ঠী। এরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করত জিনিস আমদানি করে এবং সরকারি ইজারাদার

হিসেবে কাজ করত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই ধরনের ইজারা (পর্তুগির্জ ভাষায় রেন্ডাস) প্রায় ৯২ শতাংশই ছিল এদের হাতে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নরসু নায়েক যার আফিমের ইজারা ছিল। এর পরেই ছিলেন দামু সিনেই। ইনি কাপড়ের কর আদায়ের ইজারা নিয়েছিলেন। এর থেকেও বেশি ছিল তামাকের ইজারা। যিনি নিয়েছিলেন তিনিও হিন্দু। এর একটা কারণ হিসেবে বলা যায় যে হিন্দুদের সঙ্গে প্রধান ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিল যেটা পর্তুগিজদের বা স্থানীয় খ্রিস্টানদের ছিল না। প্রয়োজন পড়লে এরা সীমান্ত পার হয়ে চলে যেত যার ফলে পর্তুগিজ শাসকবর্গ এদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। পর্তুগিজ ধর্মযাজকরা নিষেধ সত্ত্বেও হিন্দু কারিগরের সাহায্যে গির্জা সাজাতেন। হিন্দু লৌহকার-এর প্রয়োজন ছিল ঘোড়ার খুরে নাল লাগানোর জন্য। এর ফলে হিন্দুদের নানাভাবে তুষ্ট রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট ছিল।

কালক্রমে হিন্দুরা গোয়ার আর্থিকব্যবস্থা নিজেদের কুক্ষিগত করে তুলেছিল। সরকার পর্তুগিজদের সাহায্যে হিন্দুদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা বা আর্থিকব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৬৩০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় হিন্দুরা যোগসাজস করে খাবারের দাম বাড়ালে, সরকার হিন্দু ইজারাদারকে বরখাস্ত করে। ফলে হিন্দু ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা গোয়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে। সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়।

শহরের আর একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল স্থানীয় খ্রিস্টানরা। সাধারণত এরা গরিব ঘর থেকে খ্রিস্টান হত বলে পর্তুগিজরা এদের তাচ্ছিল্য করে বলত *কানারিনস*। হিন্দুগোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এদের জীবনযাত্রা ছিল করুণ। হিন্দুগোষ্ঠীর প্রভাবের ফলে সরকার এদের প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখাতে পারতেন না। কারিগর বা ইজারাদার হিসেবে শহরের অর্থনৈতিক জীবনে এদের ভূমিকা ছিল সামান্য। কিন্তু সাধারণ শ্রমজীবীর কাজ, সরকারি বা বেসরকারি, এরা পেত। জাহাজে খালাসির কাজও এরা পেত। এদের মধ্যে যারা আগে ব্রাহ্মণ ছিল তারা ধর্মযাজকদের সুবিধে চেয়েছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হিন্দুদের ভয়ে সরকার এতে রাজি হয়নি। আশেপাশের এলাকা থেকে দলে দলে ওই খ্রিস্টানরা গোয়া শহরে এসেছিল এর কোনও প্রমাণ নেই।

শহরের শ্বেতকায় জনগোষ্ঠীকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে স্থায়ী পর্তুগিজ যারা বিয়ে করে বসবাস করছে। দ্বিতীয় উচ্চ সরকারি কর্মচারী যারা লিসবন থেকে এসেছে এবং কাজ শেষ হলে লিসবনে ফিরে যাবে। তৃতীয়, সৈন্যরা, যারা জাহাজে করে এসেছিল—এদের কেউ কেউ স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ, শ্বেতকায় ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও পঞ্চম, ব্যবসা উপলক্ষে যেসব পর্তুগিজ এসেছিল; এদের অধিকাংশই ইহুদি।

প্রথম দলের মধ্যে আবার দুটো ভাগ করা যায়—দুটো দলই অন্য দলকে সামাজিকভাবে নিচু হিসেবে গণ্য করত। এদের মধ্যে ছিল মিশ্র বিবাহের ছেলেমেয়েরা (বলা হত *মেস্টিকো*)। এই ধরনের বিবাহে আলবুকার্ক উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে আগেই বলা হয়েছে। আবহাওয়া বা জলবায়ুর সঙ্গে খাপ

খাওয়ানোর ব্যাপার ছাড়াও, উনি চেয়েছিলেন যে পতুর্গাল থেকে লোক আসা কমে যাক। অন্য দলটি ছিল পর্তুগিজ বাবা মায়ের সন্তান কিন্তু ভারতে জন্ম (বলা হয় *কাস্টিকো*)। এরা নিজেদেরকে মেস্টিকোর চেয়ে সামাজিকভাবে উঁচু বলে ধরত। আলবুকার্কের মিশ্রবিবাহ রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ উঠেছিল। বলা হয়েছিল যে সমাজের নিচু শ্রেণীর হাতেই পর্তুগিজ সাম্রাজ্য চলে গেলে তার পতন ঘটবে, কারণ নিচু শ্রেণীর লোকেরা ছাড়া এই ধরনের মিশ্র বিবাহে অন্য লোকেদের আপত্তি ছিল। ওই সময় থেকেই অনাথ পর্তুগিজ মেয়েদের ভারতে পাঠানো শুরু হয়ে যায়। যেসব পর্তুগিজ এইসব মেয়েদের বিবাহ করবে, তাদের কাজ দেওয়া হবে বলে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল।

গোয়াতে যে সব উঁচু সামন্ততান্ত্রিক কাজ ছিল, যেমন ভাইসরয় বা প্রধান সচিব ইত্যাদি, সেগুলি সবই বাঁধা ছিল *ফিদালগো* বা অভিজাতদের জন্য। এঁরা অবশ্য ভারতে আসতেন প্রধানত ধনদৌলত সঞ্চয় করার জন্য এবং থাকার জন্য কেউই আসেননি। পর্তুগিজ সাম্রাজ্যর যখন পতন হচ্ছে, তখন এইসব বড় কাজের জন্য ফিদালগো পাওয়া যেত না।

ভারতে পর্তুগিজ সৈন্য সংখ্যা ছিল খুব কম—খুব বেশি হলে কোনও এক সময়ে কয়েকশোর বেশি ছিল না। এদেরকে পাঠানো হত পর্তুগাল থেকে গোয়ায় আসার জাহাজে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল থেকে ভারতে আসা জাহাজের গড়পড়তা সংখ্যা বার্ষিক চার হয়ে যায়। ফলে সৈন্য আসাও কমে যায়। ইউরোপে ওলন্দাজদের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগালের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ফলে পর্তুগালে ভারতে আসার লোকসংখ্যা কমতে থাকে এবং ক্রমশ জেলখানার কয়েদিদের পাঠানো হতে থাকে।

লিসবন থেকে জাহাজে করে গোয়ায় এলে পথেই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যেত। বাকিদের কিছুদিনের জন্য হাসপাতালে রাখতে হত। জাহাজ যতদিন গোয়ায় থাকত ততদিন খালাসিদের থাকা খাওয়ার ভার সরকার নিত। কিন্তু সৈন্যদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হত। সরকার অবশ্য শীতকালের কিছুদিন তাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করত। ফলে অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের অধীনে চাকরি নেবার চেষ্টা করত। কেউ কেউ স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে তাদের খরচে থাকত—আবার কেউ কেউ গির্জায় ধর্মযাজকের কাছে কাজ নিত।

পর্তুগিজ সাম্রাজ্যে ধর্মযাজকদের ছিল অখণ্ড প্রতাপ। সরকারের অনুগ্রহে আশ্রিত ধর্মযাজকদের প্রধান কাজ ছিল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার। গোয়া ছিল এই প্রচার সংস্থার কেন্দ্রস্থল এবং এখানে ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষা দেওয়া হত। ষষ্ঠদশ শতককে ধর্মপ্রচারকদের স্বর্ণময় যুগ বলা যায়। কিন্তু সপ্তদশ শতকে সরকার বুঝতে পারছিল এই প্রচারের পদ্ধতির ফলে এরা ধনসম্পদ আহরণ করেছে এমন এক সময়ে যখন সরকার বা গোয়ার অধিবাসীদের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে গবেষণা করে চার্লস বোরজেস দেখাচ্ছেন যে কীভাবে গোয়ার জেসুইটরা মূলধন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে প্রচুর সম্পদ সৃষ্টি করেছে। সরকার অবশ্য নানাভাবে আইন করে ধর্মযাজকদের ব্যবসা বন্ধ করার বা ধর্মীয় সংস্থা আর যাতে না বাড়ে তার

চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নবাগত সৈন্যদের একটা অংশ এই সব ধর্মীয় সংস্থায় ঢুকে যেত। ১৬৩৬ সালের একটি সরকারি প্রতিবেদনে জানা যায় যে পর্তুগিজ ভারতে এসব ধর্মীয় সংস্থায় ১৭৩০ জন লোক আছে, কিন্তু সৈন্যর সংখ্যা এর থেকে অনেক কম।

ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন জাতের লোক ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে পর্তুগিজ ইহুদিদের সংখ্যা বেশি। স্পেন দেশ থেকে ইহুদিরা পর্তুগালে চলে আসার ফলে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু যখন স্পেন ও পর্তুগাল মিলিত শক্তির অধীনে চলে আসে তখন ইহুদিবিরোধী নীতি পর্তুগালেও অনুসরণ করা হয়েছিল। ফলে উত্তর ইউরোপীয়রা আসার আগেই, পর্তুগিজ বাণিজ্যের পতন শুরু হয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর গোয়াতে কত ইউরোপীয় বণিক ছিল বা কত পর্তুগিজ ইহুদি ছিল, সেটা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ১৬০৬ সালে পর্তুগিজ সরকার বিদেশিদের পর্তুগিজ সাম্রাজ্যে বসবাস করা বা এমনকী খাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে এজোরেস বা মাদেইরা অবশ্য পড়ে না। পিরাদ দ্য লাভাল বা আরও কয়েকজন পর্যটক এই আদেশের মধ্যে ধরা পড়েছিলেন। এর বৃত্তান্ত এঁরাই লিখে গিয়েছেন। কিন্তু এই আদেশ কতটা কার্যকর হয়েছিল এই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। ১৬২৫ সালে জেনোয়ার আটজন বণিক গোয়াতে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং লিসবনের জাহাজে মালের জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা ঋণ দিতে রাজি ছিলেন। গোয়ার সরকারি প্রতিবেদনে নালিশ করা হচ্ছে যে নব-খ্রিস্টানরা গোয়ায় বসবাস করে বাণিজ্য হস্তগত করছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যার ফলে পর্তুগিজরা তাদের মূলধন লগ্নি করতে পারছে না। গোয়ার অর্থনীতি থেকে পর্তুগিজ ইহুদিদের সরালে কী বিষময় ফল হবে সেটা ১৬৩৬ সালে গোয়ার প্রধান সচিব লিসবনে লিখে জানিয়েছিলেন। এই ইহুদিরা নবাগত সৈন্যদের আশ্রয় ও অর্থ দেয় যেটা গোয়ার পর্তুগিজরা করে না।

গোয়ার জনগোষ্ঠীর একটা অংশ ছিল দাস। এরা কায়িক শ্রমের কাজ করত। এদের একটা ছোট অংশ সরকারের অধীনে ছিল এবং এরা পর্তুগিজ জাহাজে বা বারুদ তৈরির কারখানায় কাজ করত। অধিকাংশরাই ছিল যেসব পর্তুগিজরা জাপানে বাণিজ্য করে বিত্তশালী হয়েছিল তাদের ব্যক্তিগত দান। ১৬৩৫ সালে পর্তুগিজ ঐতিহাসিক এন্টনিও বোকারো বলছেন যে প্রতি বাড়িতেই দশ জন করে দাস আছে। ১৬৯৫ সালে ইতালীয় পর্যটক গেমেলি কারেরি গোয়ায় দেখেছেন প্রচুর মুলাটো যারা পর্তুগিজ ও আফ্রিকার দাসদের বংশধর। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দাস ধরে নিয়ে আসা হত। প্রথম দিকে অধিকাংশ দাসই আসত জাপান, ম্যাকাও, বাংলা ও পূর্ব আফ্রিকা থেকে। কিন্তু জাপানের পর্তুগিজ দাসব্যবসা জেসুইটরা বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয় গোয়ার সরকারের উপর চাপ দিয়ে।১৬৩২ সালে হুগলি থেকে পর্তুগিজরা বিতাড়িত হলে বাংলা থেকে দাস আনাও অনেক কমে যায়। ফলে পূর্ব আফ্রিকার দাসব্যবসা জমে উঠতে থাকে যদিও সঠিক সংখ্যা পাওয়া শক্ত। ১৬৮৩ সালে মোজাম্বিক থেকে গোয়ায় আসা একটি ছোট জাহাজে ছিল ২০৭ জন নিগ্রো দাস। জাহাজের খালাসিরা বিনা শুল্কে দাস আনতে পারত নিজেদের

জন্য। বাকি দাসদের জন্য মাথা পিছু পাঁচ জেরাফিন কর দিতে হত। কখনও কখনও মুসলমান জাহাজ দখল করে দাস সংগ্রহ করা হত। পর্তুগিজ অনুমতিপত্র ছাড়া অন্য জাহাজ ধরা পড়লে, তাদেরকেও দাস হিসেবে বিক্রি করা হত গোয়ায়। শহরের বড় রাস্তা রুয়া দিরেইটা ছিল দাস বিক্রির প্রধান জায়গা। পর্তুগিজ আইন অনুযায়ী গোয়ার অধিবাসীদের দাস করা চলত না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে খুব নিচু জাতের গোয়ার অধিবাসীদের (যাদের কুনবি বলা হত) সিংহলে চাষআবাদের জন্য পাঠানো হচ্ছে। পর্তুগিজদের সম্পত্তির হিসেব ধরা হত কতজন দাসদাসী আছে তার উপরে। পুরুষ দাসরা সব রকম কায়িক শ্রমের কাজ করত—প্রধানত বাণগানি ঝরনা থেকে জল আনা বা পালকি বেহারার কাজ করা। কোনও কোনও পর্তুগিজ এদের দিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর শোধ তোলার চেষ্টা করেছে। এ ছাড়া দাসদের পালিয়ে যাওয়াটা বড় রকমের ব্যাপার ছিল। ফলে সরকার দাসদের সূর্যাস্তের পর রাস্তায় বেরোনো বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। ফিলিপ মাসকারেনহাস-এর শাসনের সময় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একদিন ২৫০ জন দাসকে আদেশ না মানার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দাসীরা সাধারণত ঘরের মেয়েদের ও তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করত। কেউ কেউ বাইরের পথে আচার বিক্রি করত বা সুতোর কাজ করত। অনেকে শহরে মদ বিক্রি করত ও বেশ্যাবৃত্তি করে রোজগার করত। পুরুষ কর্তারা এইসব দাসীদের দিয়ে নানান কাজ করাত যার মধ্যে শরীর বিনোদনও আছে। জেসুইটরা এই ধরনের কাজের বিপক্ষে ছিল ও প্রতিবাদও করেছিল। আদেশ অমান্য করলে দাসদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। এমনকী তারা মারাও যেত। এই দাসদের পক্ষে প্রধান ভূখণ্ডে পালানো কঠিন ছিল। ধর্মযাজকরা অবশ্য এদের শাস্তি কমানোর চেষ্টা করে এবং ১৬৪৮ সালে এই নিগ্রো দাসদের জন্য একটা সংস্থা তৈরি করে। এদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বা স্বাধীন করার চেষ্টা তারা অবশ্য করেনি।

জানুয়ারি ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা যাবার আগে আলবুকার্ক গোয়ায় প্রথম পৌরসভা বসান। পর্তুগিজ ঐতিহাসিক ব্যারোস লিখছেন যে শহরের শাসনের জন্য তিনি বাছাবাছা লোক নেন যার মধ্যে বাইরে থেকে আগত পর্তুগিজও যেমন আছে, গোয়াতে বিবাহ করে বসবাসকারী পর্তুগিজও আছে। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে আলবুকার্ক পর্তুগালের রাজাকে এ কথা লিখে জানান। এ সত্ত্বেও ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল এটা বলা যায় না।

পৌরসভার চেহারা কীরকম ছিল সেটা জানা যায় আলবুকার্কের দেওয়া 'চার্টার' থেকে যার কপি লিসবনে পাঠানো হয়েছিল ১৪১৫ সালে। এর পরে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যে আরও পৌরসভা করা হয় কিন্তু সেগুলি প্রধানত ইভোরার পৌরসভার নকলে করা। গোয়াকে পর্তুগাল রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়। চার্টার-এ বলা হচ্ছে যে অল্ডারম্যান ও বিচারকরা প্রতি বছর নির্বাচিত হবে এবং রাজার পরিদর্শকরা প্রতি মাসে। কারিগরদের একটা চব্বিশজনের সংস্থা থাকবে যারা তাদের নির্দেশ দেবে। চব্বিশজনের থেকে চারজন নির্বাচিত হবে যারা পৌরসভার শ্রমিকদের ভালমন্দ দেখবে। সব আমলারাই একটা ছোট লাঠি নেবে যাতে একদিকে দপ্তরের লাল রং দেওয়া রাজকীয় চিহ্ন থাকবে ও অন্য দিকে সেন্ট ক্যাথারিনের চিহ্ন

অঙ্কিত থাকবে।

রাজার পরিদর্শকদের মতামতের উপরে আরজি করা যাবে পৌরসভার সংসদে। বিবাহিত আমলাদের কাজের মধ্যে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করা যাবে না। আমলাদের বিচার ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে। সব লোকই বাইরে থেকে বিনা শুল্কে খাবারদাবার নিয়ে আসতে পারে। রাজার নিয়োগ ছাড়া বাকি আমলারা বিবাহিত পর্তুগিজদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে। সরকারের ঋণ হিসেবে যে কর বসানো হত বিবাহিত পর্তুগিজরা তার বাইরে ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া এই বিবাহিত পর্তুগিজরা যে কোনও সম্পত্তি বেচাকেনা করতে পারে।

১৫১৮ সালের দোসরা মার্চ লিসবন এটি অনুমোদন করে। তবে কয়েকটি নিয়ম তারা বদলে দেয়। বিবাহিত পর্তুগিজদের দিয়ে সরকারি কাজ বা সর্বসাধারণের কাজ করানো যেতে পারে বা তার জন্য তাদের উপর কর বসানো যেতে পারে। এ ছাড়া বিনা শুল্কে কিছু আমদানি করা যাবে না এবং সরকার ইচ্ছা করলে আমলাদের দপ্তর থেকে সরিয়ে দিতে পারে। তবে তাদের শাস্তি দিতে গেলে পর্তুগালে পাঠাতে হবে।

১৫৩০ সালে কোচিন থেকে গোয়ায় রাজধানী সরিয়ে আনার পর শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা বেড়ে যায়। শহরের জনসংখ্যা, আয়তন ও বাণিজ্য দ্রুত বাড়ে। এর ফলে পৌরসভার পৌরপিতাদের যে সুবিধেজনক অবস্থা ছিল, সেটাতে আঘাত পড়তে থাকে। গোয়ার পর্তুগিজ সরকার বিশাল পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের (পূর্ব আফ্রিকা থেকে দূর প্রাচ্য) কেন্দ্র হওয়ায়, অনেক বেশি দাপটের সঙ্গে পৌরসভার পৌরপিতাদের সুবিধে হ্রাস করতে থাকে। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে শহরের শাসনকর্তাদের লড়াইয়ের প্রচুর নিদর্শন আছে।

এই লড়াইয়ের ফলে গোয়ার পৌরসভার কাজ ও ক্ষমতা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৫৫৯ সালে রাজা সেবাস্টিয়ান একটি নতুন চার্টার দেন। কয়েদখানা থেকে অব্যাহতি দিলেও, পৌরসভার আমলাদের নিয়মিত বিচারালয়ের মাধ্যমে ছাড়া পেতে হত। পৌরসভা ঠিক করে দেবে কোন কোন রাস্তায় কারিগর ও বণিকরা থাকবে। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে জাহাজ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাম্রাজ্যের অন্য কোথাও পাঠানো চলবে না। সরকার যে জমি নেয়নি সেটা কাকে দেওয়া হবে সেটা ঠিক করবে পৌরসভা। শহরের মধ্যেকার ছোটখাটো অপরাধের বিচার করবে এই পৌরসভা। এদের কেরানি (clerks) নোটারির কাজ করবে যে কাজ অ্যাটর্নির কেরানিরাও করতে পারে।

লিসবনের পৌরসভার অনুকরণে গোয়ার পৌরসভা সাজানো হয় ১৫৭৭, ১৫৮২ এবং ১৬৪১ সালে। গোয়ার পৌরসভা যে ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল তা গোয়ার দলিল থেকে বোঝা যায়। পৌরসভায় শহর কাপ্তেনের দুটি ভোট আছে যদিও তিনি পদাধিকারবলে সদস্য। ওঁর উপস্থিতি বাকি পৌরপিতারা পছন্দ করতেন না এবং ১৬০২ সালের একটা চিঠিতে ওঁর উপস্থিতি যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অনাবশ্যক সেটা জানানো হয়েছে। আর একটা চিঠিতে দেখা যায় যে উনি বিভিন্নভাবে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি যে ভাইসরয়ের গুপ্তচর এটাও বলা হয়েছে। এ সবের ফলে লিসবন বলে দেয় যে শহর কাপ্তেন না থাকলেও

পৌরপিতারা আমলা নিয়োগ করতে পারবেন।

শহরের শাসন সম্পূর্ণভাবে শ্বেতকায় অধিবাসীদের হাতে ছিল। ১৫৪২ সালের একটি রাজকীয় আদেশে বলা হচ্ছে যে শহরের সব আমলাই নিযুক্ত হবে বিবাহিত পর্তুগিজদের মধ্য থেকে। এ ছাড়াও ওই আমলারা ইহুদি হতে পারবে না এবং পুরনো খ্রিস্টান হতে হবে। এসব সত্ত্বেও দেখা যায় ধর্মান্তরিত ইহুদিরা কয়েকটি জায়গায় আমলা নিযুক্ত হয়েছে। পৌরপরিচালকদের মধ্যে ফিদালগো (জন্মসূত্রে অভিজাত) ও যোদ্ধা অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় যার দৃষ্টান্ত ইউরোপের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তবে পৌরপিতা বা মনোনীত আমলা হিসেবে নিযুক্ত হলে, তাকে কাজ করতেই হত। রাজি না হলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। কতবার সভা হবে সেটা নির্ভর করত কাজের চাপের উপরে। তিন অল্ডারম্যানের একজন সভাপতি হতেন। কালক্রমে বাকি দুজনও হতেন। বাকি দুজন বাজার সংক্রান্ত বিচার দেখতেন। এখানে বিচারকরা তাদের সাহায্য করতেন। পৌরসভার অ্যাটর্নি সরকারের সঙ্গে পৌরসভার গোলমালের বিষয় দেখতেন। পৌরসভায় ওই অ্যাটর্নি উপস্থিত থেকে অংশ নিতেন। শহর পরিচালনা ও কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন বহু আমলা। তাদের নানা রকম স্তরভেদ ছিল। অন্তত তিরিশটা স্তরের কথা জানা যায়।

পৌরসভার প্রধান আয় ছিল শহরের দোকানের ভাড়া, জমির লিজ, নানা ধরনের অনুমতিপত্র, বাজারের আইনের বিচ্যুতির জন্য কর ইত্যাদি থেকে। ১৬০৬ সালের পৌরসভার একটি দলিল থেকে জানা যায় যে পৌরসভার আয় ছিল আট হাজার জেরাফিন মতন। তার প্রায় অর্ধেক খরচ হত মাইনে দিতে। ১৬৪৪ সালেও এই আয় মাত্র এক হাজার বেড়েছিল। ১৫৬৯ সালের পর থেকে পৌরসভাকে শুল্কর শতকরা এক ভাগ আয় দেওয়া হত। এটা প্রধানত শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সরকারি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও জাহাজ বানানোর জন্য। ১৬১৭ সালে বহুমূল্য রত্নের উপর কর বসানো হয় শতকরা দুই ভাগ। এটি প্রধানত ওলন্দাজদের যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হত। ১৬২৩ সাল থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানির উপর কর বসানো হয়। কেবল সালসেট ও বারদেজ থেকে আনা খাদ্য এর বাইরে থাকত।

বিপদের সময়ে গোয়া পৌরসভা সরকারকে ঋণ দিয়েছে যার প্রমাণ আমরা পাই ১৫৮৭ ও ১৬০৩ সালে। ১৬৫০-এর দশকে গোয়া পৌরসভা সরকারকে ঋণ দেয় সিংহলে যুদ্ধের জন্য। এখানে পর্তুগিজদের পতন হলে বহু পর্তুগিজ আশ্রয়হীন হয়ে গোয়ায় চলে আসে। কিন্তু ততদিনে গোয়ার পৌরসভার আয় কমে এসেছে । এর ফলে মারাঠা শম্ভুজির বিরুদ্ধে গোয়া সরকার যখন ঋণ চান, তখন পৌরসভা সব লোকের উপর কর বসায়। ডিসেম্বর ১৬৯৩ সালে পৌরসভা রাজাকে একটি করুণ চিঠি লেখে। এতে বলা হচ্ছে যে লোকেরা বাড়ি ভেঙে কাঠ বিক্রি করে খাবার কিনছে। এর ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে গোয়ার পৌরসভা তার অধিকার, আয় ইত্যাদি নিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়াই করছে যার নিদর্শন ইউরোপীয় ইতিহাসে পণ্ডিত হেনরি পিরেন দেখিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে গোয়ায় সামাজিক সমস্যা ভয়াবহ রূপে দেখা দেয়। ভিখারি, ভবঘুরে, বেশ্যা, অনাথ মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যায়। পৌরসভা ও ধর্মীয় সংস্থাগুলি এদের জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিলেও

সেগুলি ছিল অপ্রতুল। এমনকী দাবি ওঠে যে উচ্চ বর্ণের স্থানীয় খ্রিস্টানদের সঙ্গে পর্তুগিজদের বিবাহে বাধা থাকা উচিত নয়। সরকার প্রথমে উৎসাহ না দেখালেও ১৬৮৪ সালে আদেশ দেয় স্থানীয় খ্রিস্টানদের বিবাহ পর্তুগিজদের সঙ্গে হতে পারবে। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বাণিজ্য পতনের দিকে—এ অবস্থায় গোয়ার পৌরসভা তার আগেকার ঠাট ও গৌরব বজায় রাখতে চাইছে।

গোয়াতে সরকারের কয়েকটি শিল্প ছিল যার মধ্যে জাহাজ তৈরির কারখানা ছিল প্রধান। এর মধ্যে কাঠের কাজ, লোহার কাজ, দড়ি তৈরি ইত্যাদি সবই হত। এখান থেকেই একদিকে যেমন বিশাল বড় জাহাজ (*ক্যারাক*—প্রায় দু হাজার টনের) তৈরি হত, তেমনি হত ছোট জাহাজ ও বিভিন্ন ধরনের নৌকা। পিরাদ দ্য লাভাল এটির বর্ণনা দিয়েছেন এবং অসংখ্য শ্রমিক যে এখানে কাজ করে তার কথাও বলেছেন। উনি আরও বলেছেন যে প্রধান কর্তা ও বিভিন্ন বিভাগের মাথা ছাড়া সব দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নেওয়া হত স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে। এ ছাড়া ছিল বারুদ তৈরির কারখানা। এখান থেকেই তৈরি বারুদ সমগ্র পর্তুগিজ সাম্রাজ্যে পাঠানো হত, এমনকী জাহাজের ভারী মাল হিসেবে লিসবনেও যেত। ১৬৩০ সালে এখানে প্রতিদিন ৫০০ পাউন্ড বারুদ তৈরি হত। ১৬৩৪ সালে এটা বাড়িয়ে করা হয় দিনে ৭০০ পাউন্ড। দশ বছর পরে এটা বেড়ে হয়ে যায় দিনে ৮০০ পাউন্ড। এখানকার শ্রমিকদের খাদ্যদ্রব্যর সঙ্গে আফিম দেওয়া হত।

গোয়া শহরে কারিগরদের গিল্ড-এর কথা পাওয়া যায় গোয়া অধিকারের পর থেকেই জেসুইট প্রচারকদের প্রতিবেদনে। ১৫৪৫ সালে বলা হচ্ছে এমন এক স্থানীয় চিত্রকরের কথা যে অন্যান্য চিত্রকরদের মুকদ্দম ছিল। ১৫৫৯ সালের আর একটি প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কারিগর আছে এবং প্রতিটি পেশার জন্য একজন মুকদ্দম আছে। সকলেই তার নেতৃত্বর কথা স্বীকার করে নেয়। ১৫৬০ সালে রেশম বণিকদের এক মুকদ্দমকে তার তিনজন সঙ্গী-সহ খ্রিস্টান করে নেওয়া হয়। ওই রাস্তার সব রেশম বণিকদের দোকান এই উপলক্ষে সাজানো হয়।

গোয়া শহরে পর্তুগিজরা লিসবন শহরের গিল্ড-এর নিয়মাবলী স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর চাপায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে লিসবনে গিল্ডগুলি তাদের নিয়মাবলী রাজাকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়। ১৫৭২ সালে এগুলি পুস্তিকাকারে ছাপা হয়ে যায়। প্রতিটি গিল্ড সংস্থার দুজন সভাপতি থাকতেন যাঁরা ভোটে নির্বাচিত হতেন। এঁদের একটা অর্থ সংস্থা ছিল যেগুলি সভ্যদের পরিবারের জন্যও খরচ করা হত। এ ছাড়া পরীক্ষক থাকতেন যাঁরা কারিগরদের দক্ষতা পরীক্ষা করে দেখতেন। একটা শিক্ষানবীশের সময় ছিল ও পরে দিনমজুরের সময় ছিল। এইসব পরীক্ষা পাশ করলে তাকে নিজের কারখানা ও দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হত। এই সব গিল্ড অনেক সময় রাজনৈতিক ঘটনায় অংশ নিতেন। কাস্টিলের বিরুদ্ধে পর্তুগালের রাজা জন প্রথমকে এঁরা সাহায্য দেন ১৩৮৪ সালে। রাজা এর ফলে সুবিধে দেন। ১৭৫৫ সালের ভূমিকম্পে এই গিল্ডগুলি বিপদের সম্মুখীন হয়। বাইরের কারিগর ও শিল্পী আসার ফলে এদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

১৫৩৫-৩৭ সালে গোয়া পৌরসভার দলিলে এই ধরনের গিল্ড-এর যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে গোয়া শহরের অর্থনীতি বিশেষ উন্নতি লাভ করেনি। কিন্তু ১৬১৮ সালের নিয়মাবলী থেকে দেখা যায় অর্থনীতি অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। প্রায় সব ধরনের কারিগর ও পেশা এই নিয়মাবলীর মধ্যে আসছে। নতুন ধরনের কারিগরদের কথা পাওয়া যায় যেমন বই বাঁধাইওয়ালা, টুপি তৈরিওয়ালা ইত্যাদি। ওই নিয়মাবলীতে বলা হচ্ছে যে গোয়া শহরের মধ্যে কেউ পৌরসভার অনুমতি ছাড়া দোকান বা পেশায় নিযুক্ত হতে পারবে না। প্রত্যেক কারিগরকে পুরসভা একটা চিহ্ন দিয়ে দেবে। কারুকে জামিন দিতে হবে। কেউ দুটি পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারবে না। নিয়ম ভাঙলে নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গোয়ার অধিকাংশ কারিগরই ছিল অ-খ্রিস্টান। কিন্তু তা সত্ত্বেও পর্তুগিজরা লিসবনের নিয়মাবলী চাপাতে দ্বিধা করেননি। গিল্ডের সভ্যরা মুকদ্দমকে নির্বাচিত করতেন। একে অগ্রাহ্য করলে জরিমানা দিতে হত।

পণ্ডিত তিত্তনিয়া দ্য সুজা শ্রমিক ও অন্যান্য চাকুরিজীবীদের আয় নিয়ে গোয়ার মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে বলছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাইসরয় যেখানে পেতেন বছরে ২৪,০০০ জেরাফিন ও আর্চবিশপ বারো হাজার সেখানে প্রায় সব আমলারই আয় ছিল ৫০০-র নীচে। সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকের আয় ছিল ১৫-থেকে ২৫ জেরাফিন প্রতি বছরে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শতকরা দশ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি হলেও নিচু তলার আয় বৃদ্ধি হয়নি। ফলে দেখা যায় যে আয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চলে যাচ্ছে শ্বেতকায় আমলাদের পিছনে ও বড় একটা অংশ যাচ্ছে গির্জা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পিছনে। এতে সাধারণ আমলা বা কারিগর বিশেষ কিছু পাবে না, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ব্যক্তিগত কাজের মূল্য ঠিক করার পিছনে গিল্ডের ভূমিকা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কতকগুলি রাজকীয় আদেশ সে ভূমিকা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।

সমকালীন পর্যটকরা গোয়ার ঐশ্বর্যময় বাজারের কথা বলেছেন যার উল্লেখ আগে আমরা করেছি। ফরাসি পর্যটক পিরাদ গোয়ার বাজারে সুন্দরী দাসীদের পরীক্ষা করে কিনতে গিয়ে মোহিত হয়ে যান। কিন্তু গোয়ার বাজারের জটিলতা একটু জানা আবশ্যক। গোয়ার যে দুটি প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ছিল তাদের হাতে গোয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই নিয়ন্ত্রণ ছিল বিবাহিত পর্তুগিজ অধিবাসীদের মধ্যে যারা প্রধানত ক্রেতা। আমরা আগে দেখেছি যে স্থানীয় হিন্দু ও পর্তুগিজ ইহুদিরা গোয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছিল প্রধানত ব্যবসায়ী, বণিক, কর-ইজারাদার ও কারিগর হিসেবে। কিন্তু শহরের শাসনকর্তারা এক বিশেষ ক্রেতাগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। বাকিদের সম্বন্ধে খাদ্যাভাব বা অন্য কোনও অনটনের সময় উৎসাহ দেখাতেন। এর ফলে পৌরসভার সঙ্গে বারংবার সরকারের সংঘাত হয়েছে। যেমন বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারের হাতে। পৌরসভা বার বার তাদের দালাল দিয়ে এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার আবেদন করেছে। কিন্তু সরকার এতে কর্ণপাত করেনি। এমনকী ইহুদিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানাধরনের অভিযোগ পৌরসভা করলেও সরকার কোনও উৎসাহ দেখায়নি। এ ছাড়াও ভাইসরয়রা লোভের বশে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার চেষ্টা করেছেন খারাপ মুদ্রা চালিয়ে, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি

ঘটেছে।

পৌরসভা বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমদানি, উৎপাদন ও বিভাজনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চেষ্টা করেছে। রাজকীয় আদেশের মধ্যে পৌরসভা নিজেদের আইন ঢুকিয়ে এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। এর জন্য পৌরসভা আলাদা আমলাও নিয়োগ করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে গোয়ার পতন পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে জড়িত। কবে এবং কেন পতন হল এ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই গবেষণা হয়েছে। তার কিছু অংশ আমরা পরে দেখব। কিন্তু গোয়ার পতনের কয়েকটি চিহ্ন আমরা এখানে দেখতে পারি।

১৮৪৩ সালে পুরনো গোয়া ছেড়ে কয়েকমাইল দূরে পশ্চিমে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলে যে মধ্যযুগের গোয়া আমরা জানি তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার বহু আগেই গোয়ার পতন শুরু হয়েছে। ১৬৩৯ সালে পর্যটক ম্যান্ডেলস্লো গোয়ার প্রশংসা করেছেন। এখানকার ফিদালগোর অভিজাত মহিলারা মূল্যবান পোশাক পরে বহুমূল্য রত্নাদির সঙ্গে। কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই এই চেহারা বদলে যায়। ১৬৪৮ সালে ফরাসি রত্নব্যবসায়ী তাভারনিয়ার গোয়াতে ছিলেন। গোয়ার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছেন যে তাঁর প্রথম আগমনের সময় (১৬৪১ সাল) কয়েকটি পর্তুগিজ পরিবার ঐশ্বর্যশালী ছিল, আজকে তারা অত্যন্ত গরিব হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে আগে যাদের আয় ছিল বছরে পাঁচশো পর্যন্ত, আজ তারা গোপনে ভিক্ষা করছে। সম্ভ্রান্ত মহিলারা পালকি করে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের লোকেরা বিভিন্ন লোকের কাছে টাকা চাইছে ওই মহিলাদের হয়ে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে পরবর্তী পর্তুগিজ ঐতিহাসিকরা পর্তুগালকে স্পেনের মধ্যে চলে যাওয়া জন্য তার পতনের প্রধান কারণ বলে মনে করেছেন। ১৬৪০ সালে পর্তুগাল স্পেন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৬৬৮ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকে মানেন না কারণ স্পেনীয় সাম্রাজ্য পর্তুগাল সাম্রাজ্যর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি—উভয়েরই অস্তিত্ব ছিল আলাদা।

গোয়ার পতনের কারণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন ১৬৬৬ সালের ফরাসি পর্যটক থেভনো যিনি ওলন্দাজদের আক্রমণের ফলে পর্তুগিজ বাণিজ্যের ধ্বংসের যোগাযোগ দেখেছেন। গোয়াতে তখনও বড় বড় প্রাসাদ ও বাড়ি আছে কিন্তু পর্তুগিজরা যে গরিব হয়ে পড়েছে, এটা বলতে ভোলেননি। ১৬৭২ সাল নাগাদ ওলন্দাজ ফিলিপ বলডেয়াসের বক্তব্য দেখলে মনে হয় যে শহর তখনও চলছে। নানান দেশের বণিক রয়েছে। বড় বড় রাস্তার দোকানে রেশম, চিনামাটির জিনিস পাওয়া যায়। সমকালীন আরও একজন পর্যটক, ডেলন, পতনের ছবি পরিষ্কারভাবে দেননি। সুতরাং মনে হয় স্পেনের যুদ্ধে গোয়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি এবং পণ্ডিত পিয়ার্সনের মতে লিসবন-গোয়া বাণিজ্য কমে গেলেও পর্তুগিজদের ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য এই ক্ষতি ক্রমশ সামলে নিচ্ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পতন কখনই তরান্বিত হয়নি।

শহরের বাড়িগুলি ভেঙে যাচ্ছে এ কথা প্রথম বলেন ইংরেজ পর্যটক জন ফ্রায়ার

যিনি ১৬৭৫ সালে গোয়ায় এসেছিলেন। গোয়া তখন সুন্দর, অনেক দোকান, দাস দাসী—কয়েকটা বাড়ি ভেঙে গেলেও বড় বড় প্রাসাদ, গির্জা সবই ঠিক আছে। মেয়েদের গয়না ব্যবহার করাও তিনি লক্ষ করেছেন। ১৬৮৩ সালে মারাঠা নেতা শম্ভুজি কোঙ্কান দখল করে গোয়ার দরজায় এসে গিয়েছিলেন। যখন গোয়ার অধিবাসীরা হতাশ হয়ে পড়েছে এমন সময় বড় একদল মোগল সৈন্য পিছন থেকে মারাঠাদের আক্রমণ করলে গোয়া রক্ষা পায়। এর পরেই শুরু হয়ে যায় গোয়াতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যার ফলে ঐশ্বর্যশালী পরিবাররা গোয়া ছেড়ে আশেপাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়।

এর পরেই গোয়ার জনসংখ্যা কমতে থাকে। সাধারণ অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে ওঠে। বড়লোক পর্তুগিজ পরিবারগুলি গরিব হয়ে বাড়ি ভেঙে কাঠ বিক্রি করতে থাকে যার ফলে শহরের অনেক বড় বাড়ি ভেঙে যায়। ১৬৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসের একটি সরকারি প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে গোয়ার বড় একটা অংশ পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা আর বাড়ি সারাতে পারছে না। যেসব বড় বড় বাড়ি ছিল, সেগুলি এখন জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ওই সময়কার গোয়ার সিনেটসভার অধিবেশনে বলা হচ্ছে যে প্রতিদিনই সংস্কারের অভাবে বাড়ি ধসে পড়ছে। এর মূল কারণ গোয়ার অধিবাসীদের চরম দুর্দশা, তাদের জীবনধারণেরও কোনও অর্থ নেই। গোয়া যে পর্তুগিজদের কবরখানা হয়ে উঠেছে সে মন্তব্যও গোয়ার এক অধিবাসী করেছেন।

এই সময়ে ভাইসরয়, অলিভারের কাউন্ট, গোয়া পরিত্যাগ করে রাজধানী মারমাগোয়াতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। মারমাগোয়া ছিল আরও কয়েক মাইল দক্ষিণে। শাসকবর্গ অবশ্য এ ধরনের প্রস্তাব এর আগেও করেছে। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সেবার ওই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। ১২ জানুয়ারি ১৬৮৪ সালের সভায় রাজধানী সরানোর পক্ষে বহু লোক বলে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে শহরের সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ ও সৈন্য দরকার তা নেই। এ ছাড়া শহরটি অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ বলে যে শহরে কোনও অর্থ নেই যার ফলে অনেক সময় ধর্মীয় সম্পত্তি নিয়ে জনগণের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। অধিবাসীদের অর্থ নেই থাকার বাড়ি সংস্কার করার। নতুন শহর তৈরি করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ লাগবে, তার কোনও সংস্থান নেই। কিন্তু ভাইসরয় নতুন শহর করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং ১৮ জানুয়ারি ১৬৮৫ সালে নতুন শহর পত্তনের আদেশ দেন। কিন্তু পরের বছর ওঁর পরবর্তী ভাইসরয় সর্বসম্মতিক্রমে কাজ বন্ধ করে দেন। কিন্তু লিসবন চাইছিল যে নতুন শহর তৈরি হোক। সুতরাং তারা আদেশ দিল কাজ শুরু হবার এবং এই টাকা যে তামাকের শুল্ক থেকে আসবে সেটাও নির্দিষ্ট করে দিল। কাজ শুরু হলেও ১৬৯৩ সালেও কাজ শেষ হয়নি। নতুন ভাইসরয় গোয়ার শহরতলি পাঞ্জিমে রাজধানী করলেন কারণ মারমাগোয়ার কাজ প্রচুর বাকি ছিল। পাঞ্জিমে আর্চবিশপ ও অভিজাতরা গিয়েছিলেন। লিসবন আবার মারমাগোয়ার পক্ষে চাপ দেওয়ায় কাজ শুরু হল। লিসবনের আদেশে পনেরো বছর গোয়ার সরকারি বাড়ি ভেঙে সেই মালমশলা দিয়ে নতুন শহর তৈরি হতে লাগল। কিন্তু ভাইসরয়,

আমলা ও অন্যান্য অধিবাসীদের কোনও ইচ্ছা ছিল না মারমাগোয়া যাবার। ফলে কাজ ধীরে এগোতে লাগল। ১৭০৩ সাল নাগাদ প্রাসাদ ও হাসপাতাল তৈরি হয়ে গিয়েছিল বলে ভাইসরয় কয়েকমাস ওখানে ছিলেন। ৮ মার্চ ১৭১২ সালে রাজার আদেশে কাজ শেষবারের মতো বন্ধ হয়ে যায়। এর জন্য গোয়ার রাজকোষ থেকে ব্যয় হয়েছিল পঁচিশ হাজার পাউন্ড যা গোয়ার পতনকে তরান্বিত করে।

গোয়ার অধিবাসীদের চরম দুর্দশা হলে তারা বাড়ি ভাঙতে শুরু করে। গোয়ার পৌরসভা এর ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং বার বার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু যখন লিসবনের আদেশ এল বাড়ি ভেঙে সেই মালমশলায় মারমাগোয়াতে বাড়ি বানাতে, তখন অধিবাসীরা ওই সুযোগে বাড়ি ভেঙে মালমশলা, কাঠ বিক্রি করতে শুরু করে দিল। ১৬৯৯ সালের ডিসেম্বরে রাজাকে ভাইসরয় জানাচ্ছেন যে গোয়ার বাড়ি ভাঙা হয়েছে কিন্তু মারমাগোয়ার বাড়ি তৈরি হয়নি। এর ফলে রাজা আদেশ দেন যে গোয়ায় কেউ বাড়ি ভাঙতে পারে এই প্রতিশ্রুতিতে যে মারমাগোয়াতে বাড়ি করবে। অধিবাসীরা এবার বাড়ির ছাদ ভেঙে রাখল যাতে প্রকৃতিই এই ভাঙার কাজ করতে পারে।

পর্যটক কারেরি ১৬৯৫ সালে গোয়া এসেছিলেন। উনি বলছেন যে গোয়াতে এখন বিশ হাজারের বেশি অধিবাসী নেই। খুব কম সংখ্যায় পর্তুগিজ আছে। কিন্তু তাদের বংশধর মুলাটোদের সংখ্যা সম্পূর্ণ জনগণের এক-চতুর্থাংশ। অধিকাংশ বণিকই হিন্দু বা মুসলমান এবং তারা খ্রিস্টানদের থেকে আলাদা থাকে। অনেক স্থানীয় অধিবাসী পেশায় পুরোহিত, উকিল ইত্যাদি। পর্তুগিজরা চরম দুর্দশার মধ্যে পড়লেও পালকি করে দাসদের সামনে পিছনে নিয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গোয়ার পতন আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৭১০ সালে প্রকাশিত একটি বইতে একজন জেসুইট পাদরি লিখছেন যে গির্জা ও কনভেন্ট ছাড়া এই একদা ঐশ্বর্যময় শহরের আর কিছু দাঁড়িয়ে নেই। ১৭১৯ সালে ভাইসরয় চেষ্টা করেছিলেন পুরনো কিছু বাড়ি রক্ষা করা এবং রাস্তাগুলি ভেঙে পড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন এই সময়ে শুধু গির্জা ও কনভেন্টের কথা বলেছেন। কিন্তু বলেছেন যে নদীর ধারে শহরতলিতে এখনও কিছু বড় বাড়ি ও প্রাসাদ আছে। তিনি বলছেন যে বণিকদের রাস্তা রুয়া দিরেইটাতে এখনও কিছু দোকান আছে কিন্তু ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ পর্তুগিজরা ওখান থেকে ধারে জিনিস নেয়, কিন্তু টাকা চাইতে গেলে পায় বেত্রাঘাত। ইউরোপীয় সৈন্যরা কীরকম বাড়াবাড়ি করছে, তার কিছু উদাহরণ উনি দিয়েছেন।

১৭৩৯ সালে গোয়া আবার মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ধর্মীয় যাজকরা মারমাগোয়াতে পালিয়ে যায়। এ সময়ে নতুন এক ভাইসরয় প্রচুর সৈন্য নিয়ে এসে মারাঠাদের পরাজিত করেন। মারাঠা আক্রমণের ভয় চলতেই থাকে ১৭৫৯ সাল পর্যন্ত যখন মারাঠাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। দামান ও দিউ ও ওলন্দাজরা যে অংশগুলি নেয়নি সেগুলি ছাড়া, সবই মারাঠাদের হাতে চলে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসি পণ্ডিত আঙ্কতিল দু পেরন গোয়া শহর পরিত্যক্ত বলে বলেছেন। কেবল নদীর ধারে শহরতলিতে কতকগুলি সুন্দর বাড়ি

আছে। বাণিজ্য তখন জেসুইটদের হাতে এবং কেবলমাত্র মোজামবিকের সঙ্গে গোয়ার বাণিজ্য রয়েছে। গোয়া শহর রাখা এখন পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের বিরাট ভার হয়েছে—বছরে তিন লক্ষ পিয়াস্ত্রর ও দু হাজার ইউরোপীয় সৈন্যর প্রয়োজন হয়। এই সৈন্যদের মাইনে খুবই কম এবং পর্তুগিজ জাহাজের সংখ্যা এখন কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ মাত্র। এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন এডয়ার্ড ইভস যিনি ১৭৫৮ সালে এসেছিলেন। শহরে একটা বড় বাড়িও উনি দেখতে পাননি। এই সময়ে আসেন ওলন্দাজ জে. সি. ভিসকার। উনি বলেছেন উচ্চ শ্রেণীর পর্তুগিজরা নদীর ধারে শহরতলিতে খামার করে তার আয়ে দিন চালায়। ওরা ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু জানে না। কিন্তু তারা আগেকার মতোই পালকি করে যায় সঙ্গে দাস নিয়ে। ১৭৫৯ সালে সরকার গোয়া থেকে পশ্চিমে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে গোয়ার শহরতলিও জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই বছরই জেসুইটদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে তাদের বাড়িগুলিও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ১৭৭৫ সালে গোয়ার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৬০০ যার মধ্যে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল প্রায় বারোশো।

পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে গোয়ার পতন স্বভাবতই জড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রটেস্টান্ট ইংরেজ লেখকরা পর্তুগালের ধর্মীয় সংস্থায় যে পরিমান অর্থ লগ্নি হয়েছে তাকে কারণ বলে ধরেছেন। অনেকেই পর্তুগিজদের সাম্রাজ্যর অংশ ওলন্দাজদের কবলে চলে যাওয়াকে দায়ি করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত মাইকেল পিয়ার্সন সাম্প্রতিক আলোচনায় দেখাচ্ছেন যে গোয়া-লিসবনের বাণিজ্য পড়ে যাবার পরে পর্তুগিজদের উপকূলবর্তী বাণিজ্যে একটা জোয়ার এনেছিল। ফলে ওলন্দাজদের হাতে সাম্রাজ্য চলে গেলেও পতন দীর্ঘায়িত হয়েছিল। কিন্তু পর্তুগিজদের জাতিগত উচ্চ ধারণা থাকায় ও অ-খ্রিস্টান ও ইহুদির বিরুদ্ধে বিশেষ কড়াকড়ি করায় তারা গোয়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে যা আমরা আগেই দেখেছি। সুতরাং যতই গোয়া সমৃদ্ধ হচ্ছে ততই জাতিগত বিভেদ বেড়ে যাচ্ছে—যার ফলে যারা কাজ করে ও যারা ভোগ করে এদের মধ্যেকার বৈষম্য অনেক বেড়ে যায়। আলবুকার্কের মিশ্রজাতির নীতি তাঁর মৃত্যুর পরই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। হিন্দু ও ইহুদি গোষ্ঠী যারা গোয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, তারা চলে যেতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে গোয়ার পৌরসভা এই বৈষম্যনীতির বদল চায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশ্র-বিবাহ আইনসম্মতও করিয়ে নেয়। এমনকী হিন্দু বিবাহের উৎসবের উপর যে কড়াকড়ি ছিল, তাও তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা ফিদালগো শ্রেণী, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অপারগ ও শুধুই ভোগবিলাসী, ছাড়া স্থানীয় খ্রিস্টানরা ছিল, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা নেই। একদিকে বাণিজ্যর পতনের ফলে শহরের আয় কমে যাচ্ছে। অন্য দিকে মারাঠারা গোয়ার আশেপাশের জায়গা দখল করে গোয়ার খাদ্যসম্ভারে হাত দিয়েছে। বলা যায় যে এই অবস্থায় গোয়ার পতন প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল।

৬

বাংলা

আমরা আগে দেখেছি ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে নগরের অবক্ষয় নিয়ে শর্মা-যাদব তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না। এখানে আমরা সুলতানি যুগে বাংলার নগরায়ণ নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

পাল যুগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামাবতী বলে লোকপরিপূর্ণ এক শহরের কথা বলেছেন যেটি বারেন্দ্র ভূমিতে অর্থাৎ উত্তর বাংলায় অবস্থিত ছিল। শহরটির বিস্তৃত বিবরণ না থাকার ফলে এর স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। কিছু পরে সেন রাজবংশের সমসাময়িক কবি ধোয়ি ভাগীরথীর তীরে সেন রাজাদের রাজধানী বিজয়পুরার উল্লেখ করেছেন। কোনও কোনও পণ্ডিত ও রমেশচন্দ্র মজুমদার এটি নদীয়ার সমার্থক করেছেন যদিও কোনও কোনও পণ্ডিত বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বিজয়নগর বলে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বারেন্দ্র ও রাঢ় এলাকায় ভাগীরথীর তীরে আমরা কয়েকটি নগরের কথা পাই। মনে হয় এই নগরগুলির বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। বিভিন্ন ধরনের অধিবাসীরা সোনার ও বহুমূল্য রত্নের অলঙ্কার ব্যবহার করছে। লক্ষ্মণ সেনের বাবা বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রপত্রতে বলা হচ্ছে যে রাজ-পরিবারে লোকেরা বহুমূল্য মুক্তা পরে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এগুলি বাংলার বাইরে থেকে এসেছে। এর আগে *রামচরিতে* বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণালঙ্কারের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পায়ের অলঙ্কার এবং বহুমূল্য রত্নখচিত গলার হার। লক্ষ্মণ সেনের পরে বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালেখতে পাই যে রাজপরিবার ছাড়াও মন্দিরের মেয়েরা নানা ধরনের রত্নখচিত অলংকার ব্যবহার করছে। এ সবই এসেছে বাংলার বাইরে থেকে এমন একটা সময়ে যখন বলা হচ্ছে যে নগরায়ণের অবক্ষয়ের সময়ে কোনও বৈদেশিক বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল না। *রামচরিতে* আরও বলা হচ্ছে যে বারিন্দ্র থেকে হিমালয় পেরিয়ে স্থলপথে নেপাল, সিকিম ও চিন দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল যার মধ্যে ঘোড়ার ব্যবসা ছিল প্রধান।

এটাই একমাত্র এলাকা নয় যেখানে বাণিজ্য ও নগরায়ণ গড়ে উঠেছিল। গুপ্তদের অধীনে প্রত্যন্তদেশ, সমতটে নানারকম উন্নতি হয়েছিল যেটা সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক

পরিব্রাজক ই সিং বলেছেন। চট্টগ্রামের কাছে হরিকেলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের আভাস পাওয়া যায়। এর মধ্যে পড়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা ও সিলেটের কিছু অংশ। ত্রিপুরার একটি অংশও এর মধ্যে পড়ে। এই জায়গাগুলি হরিকেল নামে আরব ভৌগোলিকদের কাছে পরিচিত ছিল এবং ইসলামিক জগতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই হরিকেল বন্দর হিসেবে ও বিক্রমপুর সাময়িক রাজধানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রপত্রতে বাকলার নাম পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার দু জায়গায় নগরায়ণের চিহ্ন অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া যায়। একটি ভাগীরথীর তীরে ও অন্যটি পদ্মার মোহনায়। বক্তিয়ার খলজির আগমনের আগেই এগুলি গড়ে উঠেছিল।

৬.১ নদীয়া

ইখতিয়ার-উদ্দিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণ বাংলার ইতিহাসের এক নতুন সূত্র শুরু করে দেয়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা বাংলার নগরায়ণের একটি ছবি পাই যেটা অবশ্য ধারাবাহিক বা সম্পূর্ণ নয়।

আঠারোজন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণ অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই আক্রমণের তারিখ ধরা হয়। এ ছাড়াও শহরটি কোথায় ছিল তা নিয়েও নানারকম বিতর্ক আছে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তারিখ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যদিও সমসাময়িক মুদ্রার ভিত্তিতে মোটামুটি একটা তারিখ ঠিক করা যায়। চৈতন্যর সঙ্গে নদীয়া জড়িত থাকার ফলে প্রশ্নগুলি বড় আকার ধারণ করেছে।

ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ ১২৪৩ সালে লক্ষ্ণণাবতীতে আসেন এবং দিল্লিতে ফিরে গিয়ে ১২৬০ সালে *তবাকৎ-ই নাসিরি* লেখেন যার মধ্যে নদীয়া আক্রমণের কাহিনী রয়েছে। তিনি হুসামুদ্দিন ও হিসামুদ্দিন নামে দুজন সৈনিকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ইতিহাস লেখেন। এই দুই সৈনিক বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণের সময় সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তী ঐতিহাসিকরা কিছু অদলবদল করে মিনহাজের বক্তব্যই অনুসরণ করেছেন।

বখতিয়ারের আক্রমণের তারিখ নিয়ে বিতর্ক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ১৯৫৪ সালের এক পত্রিকায় পণ্ডিত এ. এইচ. দানি ১২০৪ সালের প্রথম দিক আক্রমণের তারিখ বলে ধরেছেন। ১৯৭৯-৮১ সালের একটি পত্রিকায় পণ্ডিত আবদুল করিম নানা দিক আলোচনা করে ও বখতিয়ারের গৌর থেকে ১২ মে ১২০৫ সালের প্রচারিত গৌড়বিজয় মুদ্রার উপর ভিত্তি করে আক্রমণের তারিখ ধরেছেন ১২০৪ সালের শীতে বা ১২০৫ সালের প্রথম দিকে। বখতিয়ারের আক্রমণ সময়কাল ও দুই

আক্রমণের তারিখের মধ্যকার সময় হিসেব করলে মনে হয় ১২০৪ সালের শীতে এই আক্রমণ ঘটেছিল।

মিনহাজের বক্তব্য অনুসরণ করলে বলা যায় যে ওই আক্রমণের প্রাক্কালে নদীয়া একটা বড় শহর ছিল। শহরের চারপাশে দেওয়াল ও দরজা ছিল। মিনহাজ বলছেন যে বখতিয়ার তার বিরাট সৈন্যদল পিছনে রেখে ঘোড়া ব্যবসায়ীর বেশে মাত্র কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে শহরে ঢোকেন। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ঘোড়ার বাণিজ্য তখন চলছিল বলে নদীয়ার লোকজন অশ্বারোহীদের শহরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়নি। দেওয়াল ও দরজা পেরিয়ে কিছুদুর যাবার পর বখতিয়ার ও তার সঙ্গীরা যখন প্রাসাদে পৌঁছায় তখন দূর থেকে কোলাহলের শব্দ ভেসে আসে। মনে হয় যে বখতিয়ারের সৈন্যদল এই সময় দরজার কাছে পৌঁছোলে রক্ষীরা বাধা দিতে শুরু করে। লক্ষণ সেন তখন সোনার থালায় ও রুপোর বাটিতে দুপুরের খাবার খেতে বসেছিলেন। তিনিও ওই শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে নদীতে (ভাগীরথী) যান ও সেখান থেকে নৌকা করে সমতট ও বঙ্গে পালিয়ে যান। বখতিয়ার রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবারের মেয়েদের, হাতি, ঘোড়া ও বিপুল ধনসম্পত্তি হস্তগত করেন। মিনহাজ বলছেন যে এর পরে তিনদিন ধরে শহর লুঠ করা হয়েছিল এবং এত ধনরত্ন বখতিয়ারের হাতে আসে যা বলা যায় না। বখতিয়ার এর পরে লক্ষণাবতী দখল করে ওখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

মিনহাজ এর আগে বলেছেন যে নদীয়াতে আগেই খবর এসেছিল যে বখতিয়ার বিহারশরিফ দখল করে বাংলা বিজয়ের তোড়জোড় করছেন। লক্ষণ সেনের জ্যোতিষীরাও এই আক্রমণ ও বখতিয়ারের বিজয়ের কথা বলেছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ ও বণিকরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বণিকরা তাঁদের জিনিসপত্র নিয়েই গিয়েছিলেন। এর থেকে পরিষ্কার যে নদীয়া ঐশ্বর্যশালী শহর ছিল যার শুরু সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই হয়েছিল। মিনহাজ পরিষ্কার বলেছেন যে নদীয়া লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল—সুতরাং এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক অমূলক। কিন্তু কেন লক্ষণ সেনের আগেকার রাজধানী লক্ষণাবতী ছেড়ে নদীয়াতে এসেছিলেন সেটা আমরা পরে দেখব। বখতিয়ার আক্রমণের ভয়ে তিনি শহর ত্যাগ করেছিলেন কিনা এটাও দেখা দরকার। মিনহাজ কিন্তু লক্ষণাবতী যে লক্ষণ সেনের আগেকার রাজধানী ছিল এবং লক্ষণ সেন ভয়ে পালিয়ে এসেছেন—এরকম ইঙ্গিত কোথাও দেননি। বিহারশরিফের উপর আক্রমণের বিবরণ এসেছিল যখন রাজা নদীয়াতে ছিলেন। অর্থাৎ যখন লক্ষণ সেন লক্ষণাবতী পরিত্যাগ করে নদীয়াতে আসেন, তখন তিনি বা তাঁর লোকজন কেউই বখতিয়ারের খবর পাননি। সুতরাং বখতিয়ারের আক্রমণের ভয়ে তিনি নদীয়াতে পালিয়ে এলেন, এ প্রশ্ন ওঠে না। এ ছাড়াও, লক্ষণ সেন ভিতু ছিলেন বলে মনে হয় না—মিনহাজও সে কথা বলেননি। ভিতু নন বলেই জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পর যখন সভার ব্রাহ্মণ ও বণিকরা শহর (নদীয়া) ছেড়ে চলে গিয়েছে, তখনও তিনি নদীয়াতে থেকে গিয়েছেন। ফলে মনে হয় লক্ষণাবতী ছেড়ে নদীয়াতে আসার অন্য কারণ আছে যা আমরা পরে বিবেচনা করব।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কয়েকজন পণ্ডিত

বলেছেন যে মিনহাজের *নৌদিয়া* এই নদীয়া নয়। লক্ষণ সেনের কোনও শিলালেখ নদীয়া থেকে পাওয়া যায়নি এবং নদীয়াতে কোনও প্রত্নতত্ত্বর সাক্ষ্য নেই বলে বলা হয়েছে। সব থেকে কাছে যে শিলালিপি পাওয়া যায় তা রাণাঘাটের আনুলিয়া থেকে। এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের এক প্রত্নতত্ত্ববিদ বলছেন যে নৌদিয়া রাজশাহি জেলায় গৌড় শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে। এর জন্য তিনি দুটি যুক্তি দিয়েছেন। একটি যে বাংলায় প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল পশ্চিম থেকে তেলিয়াগড়ির পুরনো পথ ধরে যেখান থেকে প্রথমে পড়বে রাজশাহির নৌদিয়া। দ্বিতীয়ত ওই নৌদিয়াতে প্রায় বিশ মাইল বিস্তৃত প্রাক-মুসলমান যুগের ধ্বংসস্তূপ আছে যা থেকে প্রমাণ হয় যে বখতিয়ারের আসার আগে এটা বড় শহর ছিল। অবশ্য এখান থেকেও কোনও শিলালেখ পাওয়া যায়নি। সুতরাং কোন পথ দিয়ে বখতিয়ার এসেছিলেন সে পথটির সঙ্গেও নদীয়ার স্থান নির্ধারণ জড়িয়ে আছে। বলা দরকার যে ইংরেজ অনুবাদক মিনহাজের নৌদিয়াকে নদীয়া (Nudiah) বলে ধরেছেন এবং পথ নিয়ে আশ্চর্যরকমভাবে মাথা ঘামাননি। ওঁর এই মত প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও কলিকারঞ্জন কানুনগো। এমনকী পণ্ডিত রমেশচন্দ্র মজুমদারও এটা মেনেছেন এবং নদীয়াই যে ধোয়ির উল্লিখিত বিজয়পুর সেটাও বলেছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে পশ্চিম থেকে বাংলায় ঢোকবার একমাত্র পথ তেলিয়াগড়ির পথ নয়। ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আসা যেত সৈন্যবাহিনীসমেত তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। ১৫৩৮ সালে গৌড় লুঠ করে শেরশাহ্ এই ঝাড়খণ্ডের পথ ধরে লুঠ করা বিশাল সম্পত্তি ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিহারে ফিরে গিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে সুজাকে তাড়া করে সেনাপতি মিরজুমলা ১৬৫৯ সালে এই পথ দিয়ে বিহার থেকে বাংলায় ঢুকেছিলেন। ১৭৪৩ সালে পেশোয়া বালাজি রাও এই পথ দিয়ে এসে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে চমকে দিয়েছিলেন। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীতে এই পথে জৈন বণিকরা যাতায়াত করত। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৬ সালে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ জে. ডি. বেগলার এ পথে গিয়ে অনুসন্ধান করে এই সময়কার প্রচুর জৈন মন্দিরের দেখা পান। সুতরাং বিহারশরিফ থেকে নদীয়া আসার যে এটাই সোজা পথ ছিল সেটা বোঝা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু নদীয়া শহরে যে পথেই যাওয়া যাক না কেন পশ্চিম থেকে এলে ভাগীরথী পার হবার কথা। কিন্তু মিনহাজ, যিনি বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের সময় কোন কোন নদী পার হতে হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, নদীয়াতে বখতিয়ারের যাবার সময় নদী পার হবার কথা বলেননি। বরঞ্চ বলেছেন যে নদী প্রাসাদের পিছনে ছিল, যার থেকে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নদীয়ার স্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হই।

বর্তমানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর নদীয়ার স্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। খলজির আক্রমণের পরে নদীয়া আমাদের সামনে আসে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বৈষ্ণব কবিদের লেখায়। ধর্মের ছোঁয়ায় শহর যে কত জীবন্ত হয়ে যায় তার প্রমাণ বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মামলার মধ্যে পাওয়া যায়, যেখানে

নদীর উভয় পারই আসল নদীয়া বলে দাবি জানাচ্ছে। সমস্যাটা বেড়ে গিয়েছে নদীর ঘন ঘন দিক পরিবর্তনের ফলে।

প্রাচীন কাল থেকেই গঙ্গার পূর্বপারকে বঙ্গ এবং পশ্চিমপারকে রাঢ় বলা হত। মিনহাজ নদীয়াকে রাঢ় দেশের অন্তর্গত করেছেন এবং গঙ্গা পার হয়ে লক্ষণ সেন যে বঙ্গে গিয়েছিলেন সে কথাও বলেছেন। মনে হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নদীয়ার গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে নদীয়া পূর্বপারে থাকলে বখতিয়ার যে পথ দিয়েই আসুন না কেন, তাঁকে নদী পেরোতে হত। কিন্তু মিনহাজ নদী পার হবার কথা বলেননি। তা ছাড়া নদীর পূর্ব দিকে নদীয়া হলে প্রাসাদের পিছনে নদী থাকত না—থাকত সামনে। অর্থাৎ লক্ষণ সেন প্রাসাদের পিছনের নদী দিয়ে পালাতে পারতেন না। পশ্চিম দিক থেকে আসার ফলে বখতিয়ার নদী না পেরিয়ে বড় সৈন্যদল সহজে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং চমক সৃষ্টি করেছিলেন যার কথা মিনহাজ বলেছেন। তখনকার জলঙ্গি নদীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমনকী ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিতাতেও জলঙ্গির উল্লেখ নেই। সুতরাং মনে হয় যে গঙ্গা জলঙ্গি নদীর খাত ধরে বইছিল নদীয়ার পূর্বে। পরবর্তী তিনশো বছরে নদী সরে আসতে থাকে প্রথমে পশ্চিমে ও পরে পূর্বে। নদীর এই ধরনের দিক পরিবর্তন আশ্চর্য নয়। কারণ পরে আমরা দেখব যে গৌড় শহরের কাছে কতটা নদী সরেছে।

এটা মেনে নিলে নদীয়ার প্রাসাদ ও পঞ্চরত্ন মন্দির, যেটি আগে বল্লাল ঢিপি বলে খ্যাত ছিল, সবই পশ্চিমে চলে যায়। নদীয়ার উত্তরে এই পঞ্চরত্ন মন্দির এবং এর উত্তরে গঙ্গার পুরনো খাত ১৯২২ ও ১৯৫৮ সালের সার্ভে মানচিত্রতে দেখানো হয়েছে। এই মন্দিরকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ সেন রাজাদের সময় ধরা হয়েছে। সেন রাজারা নদীয়াতে না থাকলে এত বড় মন্দির ওখানে তৈরি করবেন কেন সেটা বোঝা যায় না। বলা বাহুল্য এই মন্দিরের আশেপাশেই প্রাসাদ ছিল ও তার সামনে শহর ছিল। রামচন্দ্রপুর এলাকা, যেটা গঙ্গার পশ্চিমে, ওই শহরের মধ্যে ছিল বলা যায়। ওখান থেকে প্রচুর কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে যেগুলি নিঃসন্দেহে প্রাক্-সুলতানি যুগের। ওই শহরের বাকি অংশ নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে বলে মনে হয়। এই সব দিক বিবেচনা করলে নদীয়া বড় একটি শহর ছিল বলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। নদীয়ার পরবর্তী ইতিহাস আমরা পরে দেখব।

৬.২ লক্ষণাবতী

মিনহাজ বলেছেন যে নদীয়া লুঠ করার পরে বখতিয়ার লক্ষণাবতী জয় করেন ও রাজধানী বানান। এটিকেই পুরনো লক্ষণাবতী বলে ধরা হয়েছে, যদিও সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। বখতিয়ার দেবকোটে (মনে হয় দিনাজপুর জেলার বাণগড়) যান ও ওখানেই খুন হন। এর আগে তিনি লক্ষণাবতী থেকে দেবকোটে কেন রাজধানী

সরিয়েছিলেন তার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। মনে হয় যে কারণে লক্ষণ সেন লক্ষণাবতী পরিত্যাগ করেছিলেন ওই একই কারণে বখতিয়ার ওই শহর ত্যাগ করেন। তিব্বতে অভিযান চালানোর জন্য তিনি দেবকোটে এসেছিলেন এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ এতে মাত্র কয়েকমাইল এগিয়ে থাকা হবে। বখতিয়ার এর পরবর্তী সুযোগ্য শাসক গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ ফিরোজ লক্ষণাবতীতে রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। উনি যে কাজ করেছিলেন তার নিদর্শন আজও আছে এবং ওর থেকে বোঝা যায় যে কেন লক্ষণ সেন ও বখতিয়ার খলজি লক্ষণাবতী পরিত্যাগ করেছিলেন।

পণ্ডিত এম. এম. চক্রবর্তী বহুদিন আগে লিখেছিলেন যে লক্ষণাবতী শহর অন্তত বল্লাল সেনের সময় থেকেই মহানন্দার পশ্চিমে ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের অনন্য সাধারণ রচনায় লক্ষণাবতী যে গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল অন্তত প্রাক্-সপ্তদশ শতাব্দীতে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে কোনও প্রত্নতত্ত্বের কাজ না হওয়ায় পাথুরে প্রমাণ পাওয়া শক্ত। আবুল ফজল বল্লাল সেনের দুর্গের কথা বলেছেন কিন্তু বর্ণনা দেননি।

চক্রবর্তী অষ্টম শতাব্দীর জৈন পুঁথিতে লক্ষণাবতীর যে হদিস পেয়েছেন তাতে একে গৌড়ের সঙ্গে সমার্থক করা যায়। পরবর্তী উল্লেখ আমরা পাই মিনহাজের লেখায় যেখানে বখতিয়ারের রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে মিনহাজ বলেছেন উড়িষ্যার নরসিংহদেবের পাইকরা শহর আক্রমণের জন্য কাছে এসেছিল, কিন্তু নদী পার হবার উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় মানচিত্রকারগণ, যেমন লোপো হোমেন (১৫১৯), গাস্তালদি (১৫৪৮) ও জোয়াও দ্য ব্যারোস (ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ), গৌড়কে গঙ্গার পশ্চিম পারে দেখিয়েছেন। সুতরাং লক্ষণাবতী গৌড়ের সঙ্গে সমার্থক ও গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে ওই সময় গঙ্গা প্রথমে কালিন্দির খাত দিয়ে ও পরে মহানন্দার খাত দিয়ে প্রবাহিত হত। কিন্তু ক্রমশ নদী পশ্চিম দিকে সরতে থাকে যার ফলে শহরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এর ফলে লক্ষণ সেন ও বখতিয়ার শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। লক্ষণ সেন আরও দক্ষিণে নদীয়াতে চলে যান ও বখতিয়ার আরও উত্তরে যান। উল্লেখযোগ্য যে মিনহাজ যখন লক্ষণাবতী পৌঁছোন তখনও নদী শহরের একটা অংশের মধ্য দিয়ে চলছিল। সুলতান গিয়াসুদ্দিন নদীকে শহরের অন্য দিকে সরিয়ে দেবার জন্য খিলানের মতো করে উঁচু বাধ তৈরি করেন যা একদিকে দেবকোট ও অন্য দিকে লাখনোর পর্যন্ত গিয়েছিল। বর্ষার সময় এই বাঁধের উপর দিয়ে যাতায়াতের সুবিধে ছিল এবং বর্তমান গাড়ি চলার পথ এই বাঁধের উপরেই তৈরি হয়েছে। মিনহাজ ছাড়াও, আবুল ফজল এই বাঁধের উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজদের রেখাচিত্রে এই বাঁধের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায়। বাঁধের ফলে গঙ্গা শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে ও মহানন্দা পূর্ব দিক দিয়ে যেত। নদীয়ার লুঠের অর্থ দিয়ে বখতিয়ার লক্ষণাবতীতে মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন যা মিনহাজের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছিল। এখন অবশ্য এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

পুরনো শহর লক্ষণাবতীকে এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম গৌড় শহরের উত্তরে পুরনো শহর লক্ষণাবতীর স্থান নির্ণয় করেছেন। পিছলি-গঙ্গারামপুর এলাকার কাছ দিয়ে প্রচুর হিন্দুমূর্তির খণ্ড পাওয়া গিয়েছে। গৌড়ের উত্তরে অনেক হিন্দু নাম, যেমন ফুলবাড়ি, কমলাবাড়ি, পাতালচণ্ডী ইত্যাদি পাওয়া যায়। উত্তর দিকে বল্লালবাড়ি বলে এক বর্গমাইল এলাকা পাওয়া যায় যাকে কানিংহাম আবুল ফজলের উল্লিখিত বল্লাল রাজার দুর্গ বলে অভিহিত করেছেন যদিও এর মধ্যে কোনও ধ্বংসাবশেষ বা হিন্দু প্রত্নতত্ত্বর নিদর্শন কিছু মেলেনি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এ জায়গাটার পাঁচিলের উচ্চতা প্রায় বিশ ফুট। ভিতরে ও বাইরে পরিখার চিহ্ন পাওয়া যায়। ভিতরে কতকগুলি পথের চিহ্নও বিদ্যমান।

কানিংহাম বলেছেন যে পুরনো শহরে উত্তরের ফুলওয়ারি দরজা থেকে দক্ষিণে পাতালচণ্ডীর দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উনি এর মধ্যে প্রচুর হিন্দু নাম পেয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্মশান ছিল যাকে বলা হত গঙ্গাআস্নান। এ ছাড়া, বিলাসপুর, রামচন্দ্রপুর, ধরমপুর ইত্যাদি পাওয়া যায়। লোহাগড়ের এক মাইল দক্ষিণে দেগাঁওতে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এসব বিচার করে কানিংহাম শহরটিকে চার মাইল লম্বা ও দু মাইল চওড়া বলে ধরেছেন। সাগরদিঘি ও কমলাবাড়ি উত্তরের শহরতলি ও রামকেলি গ্রাম ছিল দক্ষিণের। কমলাবতী যে শহরতলি ছিল এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায় কারণ মাখদুম শাহ্ এখানে বসবাস করতেন। সাধুসন্তরা প্রধানত শহরের দেওয়ালের বাইরে শহরতলিতে থাকতেন।

সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বলেছেন যে গিয়াসুদ্দিন একটা দুর্গ তৈরি করেছিলেন। মনে হয় এটি ছিল ফুলবারি দুর্গের দু মাইল দক্ষিণে। বারানি আরও বলেছেন যে তুঘ্রিল-এর বিদ্রোহ দমন করে, বলবান বন্দিদের লাখনৌতিতে একটা দু মাইল লম্বা বাজারের দুপাশে শূলে চড়িয়েছিলেন। বারানি আরও বলেছেন যে বলবানের ছেলে বোগরা খান তখন বড় বাজারের সামনে পুরনো রাজাদের প্রাসাদে বাস করছিলেন। ফুলবারিকে যদি পুরনো প্রাসাদ বলে ধরা যায় তা হলে সেখান থেকে পাতালচণ্ডীর দূরত্ব দুই মাইল। ফুলবারি দুর্গের মধ্যে প্রাচীন সৌধের নিদর্শন আছে, যেগুলি প্রাক্-সুলতানি যুগের সময়কার কালো ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি। স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ ওখানে ছড়িয়ে আছে। পাতালচণ্ডী নাম ছাড়া অবশ্য ওখানে হিন্দুদের আর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ওখানে নদী কিছুটা ভিতরে ঢুকেছিল এবং পারে দুপাশে পাথরের মধ্যে গাঁথা লোহার আংটা ও শিকলের নিদর্শন আছে। কিন্তু পাথরগুলি সুলতানি যুগের তৈরি বলে মনে হয়—কালো ব্যাসাল্ট কিছু পাওয়া যায়নি। এর থেকে মনে হয় ফুলবারি দুর্গ থেকে শহরটা বিস্তৃত ছিল আরও দক্ষিণে, বর্তমান গৌড়ের দুর্গের মধ্যে। এর সমর্থনে কয়েকটা কারণ দেখানো যেতে পারে যদিও সবই অনুমানসাপেক্ষ কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এখানে কাজ করেনি।

আমরা আগেই দেখেছি যে নদী শহরের ভিতরে চলে আসার ফলে গৌড় শহরের উত্তরের একটা অংশ প্লাবিত হয়ে যায়। ওই অঞ্চলে মাটি খুঁড়লে প্রচুর বালু পাওয়া যায় যা ক্রমাগত বিক্রি করা হচ্ছে বর্তমানকালে। এই বালুকাময় মাটি উত্তরের বহুলাংশে পাওয়া যায় যা দক্ষিণ দিকে বিরল। অন্তত গৌড়ের দুর্গের মধ্যে ইট নেবার জন্য প্রায় দশ ফুট গর্ত করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে এই বালি ওঠেনি। এর

থেকে মনে হয় গঙ্গার সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজারা ক্রমশ দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। বর্তমান গৌড় দুর্গের মধ্যে গুমতি দরজার সামনে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কালো ব্যাসাল্টের স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদি মাটিতে পড়ে আছে। একপাশে কালো ব্যাসাল্টের স্তম্ভ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হলঘরের মতো। এখান থেকে ফুলবারি দুর্গের দূরত্ব সোজা পথে দুই মাইল মতন। সুতরাং এটা মনে করা অসম্ভব নয় যে বখতিয়ারের আগেই রাজপ্রাসাদ এই দিকে সরানো হয়েছিল অথবা আগে থেকেই ছিল। এ ছাড়া বারানির বর্ণনা থেকে দুটো প্রাসাদের কথা বোঝা যায়। পুরনো প্রাসাদে ছিলেন বোগরা খান ও অন্যটায় ছিলেন বলবান যেটি অপেক্ষাকৃত নতুন বা বখতিয়ার বিজয়ের পরে করা। একটা প্রাসাদ থাকলে বারানি বিশেষ করে পুরনো রাজাদের প্রাসাদ বলে উল্লেখ করতেন না। সুতরাং বলা যায় যে লক্ষণাবতীর প্রাসাদ ছিল ফুলবারি দুর্গে যেখান থেকে বর্তমান প্রাসাদ গৌড় দূর্গের মধ্যে সরানো হয়। অতএব ওই গৌড় দুর্গ অঞ্চল থেকে বল্লালবাড়ি পর্যন্ত সবটাই ছিল লক্ষণাবতী শহর, যা নদী সরে আসার পরে ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে ময়ূরভট্টর *ধর্মমঙ্গলে,* যার অংশবিশেষ দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা, *রামাবতী* বা *রামতির* উল্লেখ করেছেন। মনে হয় এটি গৌড়ের উত্তরে ছিল। পরবর্তীকালের লেখায় লক্ষণাবতীর আর কোনও উল্লেখ না থাকায় বলা যায় যে লক্ষণাবতী এর পরই পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

৬.৩ পাণ্ডুয়া

লক্ষণাবতী জয়ের পর বেশ কিছুদিন শহরের পরিবর্তনের হদিস আমরা পাই না। বখতিয়ারের হিমালয়ের বাণিজ্য দখলে আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মনে হয় জয়ের পরই নদীয়া জনশূন্য হয়ে পড়েছিল যদিও পরে দু-একটা মুদ্রা নদীয়ার খাজনা থেকে আসছে জানা যায়। প্রায় একশো বছর ধরে দিল্লির সঙ্গে বাংলার টানাপোড়েন ও বাংলার অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্কলহ লেগেই ছিল। নদীয়া জয়ের একশো বছর পরে ভাগীরথীর নীচের অংশ জাফর খান গাজি জয় করেন। এর ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের উপর দখল আসে। ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সপ্তগ্রামে টাঁকশাল তৈরি হয়ে দক্ষিণ-রাঢ় বা ভাগীরথীর নীচের দিকের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দিকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ ঢাকার কাছে সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। উনি চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পর্যটক ইবন বতুতা পরিষ্কার বলছেন যে সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম এর অধীনে ছিল। ১৩৪৩ সালে হাজি ইলিয়াস শাহ বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ করে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী করেন।

শামসুদ্দিন ফিরোজ পাণ্ডুয়াতে একটা টাঁকশাল তৈরি করেছিলেন আগেই। ইলিয়াস শাহ-র পাণ্ডুয়াকে রাজধানী করার কারণ বোধহয় ছিল যে নদীর দিক পরিবর্তনের জন্য লক্ষণাবতী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এটি অবশ্য বিতর্কিত

বিষয় কিন্তু লক্ষণাবতী যে তখনকার মতো পরিত্যাগ করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ইলিয়াস শাহর মুদ্রা সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁও থেকে বেরোনোর ফলে তাঁর বাংলা বিজয় নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পাণ্ডুয়ার উদ্ভব, বিশেষত লক্ষণাবতীর কাছে, নিয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর কাছেই নদীর খাত এখনও আছে, যদিও মনে হয় যে পুরনো মালদা, যেটি মহানন্দা ও কালিন্দির সঙ্গমস্থলে, এর বন্দরের কাজকর্ম চালাচ্ছিল। পাণ্ডুয়া পাঁচিল ঘেরা শহর ছিল এবং সে পাঁচিলের কিছু চিহ্ন এখনও আছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে পাণ্ডুয়া লক্ষণাবতী বা গৌড়ের থেকে ছোট শহর। এর কাছেই ছিল একডালা দুর্গ যার অবস্থিতি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। ফিরোজ শাহ তুঘলকের দুবার পাণ্ডুয়া আক্রমণের সময় বাংলার সুলতানরা পাণ্ডুয়া ছেড়ে একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পাণ্ডুয়ার উদ্ভব নিয়ে বলা হয় যে মহানন্দা নদী কাছে চলে এসেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরি মেজর রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে নদী শহরের এক মাইলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। বর্তমানে অবশ্য আরও বহুদূরে সরে গিয়েছে। নদীর খাত থেকে অবশ্য মনে করা সম্ভব যে একসময় নদী শহরের পাশ দিয়ে বইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি একটি মানচিত্র (কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত) থেকে দেখা যায় যে নদী তখনও বেশ কাছে রয়েছে।

পাণ্ডুয়া শহরের সঙ্গে ইলিয়াস শাহি ও রাজা গণেশের বংশের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গণেশের বংশ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়ে যায় যার ফলে পাণ্ডুয়া নিছকই ধর্মীয় শহর (হজরৎ পাণ্ডুয়া) হিসেবে টিকে থাকে।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার যোগও নিবিড় হতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির উপর কতটা ইসলামি প্রভাব পড়ে এই সংযোগ ঘটিয়েছিল সেটা বলা শক্ত। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় এই ধরনের সংযোগ হয়েছিল বলে মনে করতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই ভাগীরথীর নীচের অংশের উপর বাংলার সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ এলেও ওখানে কোনও বৈদেশিক বাণিজ্যের বন্দরে কথা আমরা পাই না। সপ্তগ্রামে টাঁকশাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তৈরি হলেও, এখানকার বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায় না। বরঞ্চ আমরা চট্টগ্রাম-সোনারগাঁও অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে (যা আগেই ছিল) দেখতে পাই। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই চিনা বণিকদের বাংলায় আগমনে। তারা বার বার চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করেছেন এবং রাজধানী পাণ্ডুয়াতে এসেছেন। এর থেকে মনে করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে ভাগীরথীর সপ্তগ্রাম বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের বন্দর হিসেবে তখনও বিকাশ লাভ করেনি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চিনা বণিক ইং ইয়াই শেং লান সুমাত্রা থেকে বড় জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। ওখান থেকে ছোট নৌকা করে সোনারগাঁও গিয়েছিলেন যার বর্ণনা আমরা পরে দেখব। ওখান থেকে পাণ্ডুয়া যান। পরবর্তী চিনা

বণিক শেং চে শেং লান ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে আসেন। ওখান থেকে সোনারগাঁও হয়ে পাণ্ডুয়া যান। যদিও অধ্যাপক হরপ্রসাদ রায় এদের যাত্রাপথের নকশা তৈরি করেছেন তবুও বর্ণনা থেকে পরিষ্কার নয় যে কীভাবে তিনি পাণ্ডুয়া গিয়েছিলেন। মনে হয় মহানন্দা দিয়ে এসে মালদার কাছে নেমে কিছুটা পথ হেঁটে গিয়েছিলেন যার বর্ণনা চিনা বণিক দিয়েছেন এবং যে বর্ণনার সঙ্গে প্রায় চারশো বছর পরে ইংরেজ পরিব্রাজক বুখানন হ্যামিলটনের বর্ণনার মিল আছে। এই পথই মালদা থেকে দেবীকোট পর্যন্ত চলে গিয়েছে শহর পাণ্ডুয়ার মধ্যে দিয়ে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাণ্ডুয়া ও গৌড়ে জনসমাগম হতে থাকে একথা বলেছেন *রিয়াজ-উল সালাতিন*-এর লেখক। এর উপরই ভিত্তি করে প্রয়াত অধ্যাপক এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ ওই সময়ে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা বলেছেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে চিনা বণিকরা, বিশেষত ১৪২০ খ্রিস্টাব্দের পর, রাজধানী গৌড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রিয়াজ রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা বলেননি—জনসমাগম হচ্ছে এ কথাই শুধু বলেছেন। অবশ্য মনে হয় যে পরবর্তীকালে পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী সরে থাকার এটাই হয়তো বড় কারণ ছিল।

চিনা বর্ণনায় পাণ্ডুয়ার একটা ছবি পাওয়া যায়। শহরে যাবার আগে যে পথ ধরে তাঁরা হাঁটছিলেন তার দুধারে ছিল বড় বড় বাড়ি ও দোকান। ওইসব দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায়, বিশেষত নানাধরনের কাপড়। চিনারা প্রায় সকলকেই ভেড়ার চামড়ার জুতো (সোনার জরি দেওয়া) পরতে দেখেছেন। এরা প্রায় সবাই ব্যবসা করে। মেয়েরা নানা ধরনের তাঁতের, রেশমের ও ব্রোকেডের কাপড় পরে। হাতে সোনার আংটি, গলায় সোনার হার—কোমরে ও পায়ে সোনার গহনা পরে। বলাবাহুল্য চিনারা বণিক সম্প্রদায়ের কথা বলছেন। অন্য এক জায়গায় বলেছেন যে কৃষকরা ক্ষেতে কাজ করছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে চিনারা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ করেননি। নানারকম চিনা রেশম, পোর্সেলিন ইত্যাদির বদলে চিনারা বাংলার মসলিন নিয়ে যান। বাংলার বহির্বাণিজ্য থেকে যে ওইসব সোনা আসছে, এটা খুব পরিষ্কার।

চিনাদের বর্ণনা থেকে পাণ্ডুয়ার প্রাসাদের একটা ছবি পাওয়া যায় যদিও ওই প্রাসাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রাসাদটি সাদা রং করা এবং ছাদটি সমতল। প্রধানত ইটের তৈরি। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদের প্রধান দরবারকক্ষে যাওয়া হয়। দরবারের ভিতরে দরজা আছে এবং চকচকে পিতল দিয়ে ঢাকা অনেক স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের গায়ে ফুল ও পশু-পাখির ছবি খোদাই করা। দরবারের সামনে একটা বড় বারান্দা আছে—যার ডাইনে ও বাঁয়ে সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের উঠোনে বহু সৈন্য জমায়েত হয়ে আছে। রাজা দরবারের মধ্যে একটা উঁচু সিংহাসনের উপর হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। সিংহাসনটি বহুমুল্য রত্নখচিত।

চিনাদের আসার কিছুকাল পরেই পাণ্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে সরে যায়। ফলে পাণ্ডুয়ার বিশদ বিবরণ আমরা আর পাই না। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বুখানন হ্যামিলটন পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন এবং একটি মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গিয়েছেন।

চিনারা যে পথ দিয়ে পাণ্ডুয়া শহরে গিয়েছিল, বুখাননও ওই পথ ধরেই যান।

পথটি শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে, যেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মানচিত্র ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আকাশ থেকে তোলা ছবির সাহায্যে সহজেই শনাক্ত করা যায়। এটি সোজা পথ নয় এবং বুখানন লক্ষ করেছেন যে পথের দুপাশে বাড়ির ধ্বংসাবশেষের সারি রয়েছে (বর্তমানে এর কিছু আর নেই)। শহরের মাঝখানে বুখানন একটি তিন খিলানযুক্ত সাঁকোর চিহ্ন পেয়েছেন। চিনারা অবশ্য এর কথা বলেনি এবং এখন এর কোনও চিহ্ন নেই। দেবকোটের দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে, বুখানন শহরের বাইরের পাঁচিলের চিহ্ন দেখেছিলেন। এখানে শহরের একটা দরজার ধ্বংসাবশেষও বুখানন দেখেছেন, যার চিহ্ন এখন আর নেই। দক্ষিণেও বুখানন ধ্বংসস্তূপ পেয়েছেন যার থেকে উনি মনে করছেন যে এদিকেও একটা দরজা ছিল। এর দক্ষিণে পাঁচিলের কিছু অংশ দেখা যায়। কাছাকাছি কয়েকটা দিঘি দেখেছেন এবং বুখাননের মতে এটি একটি ছোট শহর। পশ্চিম দিকে জঙ্গল ভেদ করে, বুখানন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়েছিলেন। মালদা থেকে পাণ্ডুয়া শহরতলি জনবসতিতে পরিপূর্ণ ছিল বলে বুখানন অনুমান করেছেন।

বুখানন হ্যামিলটন এর পরে বর্তমান পাণ্ডুয়াতে আদিনা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি উঁচু এলাকার উপর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। যদিও ঐতিহাসিকরা সুলতান ইলিয়াস শাহর সময় থেকে পাণ্ডুয়ার উৎপত্তি ধরেছেন অর্থাৎ ওই সময়ে প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল বলে ধরা হয়, কিন্তু ওই জায়গার আরও উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব দিকে হিন্দু স্থাপত্যশৈলীর চিহ্ন পাওয়া যায়।

বুখানন অবশ্য *সাতাশগড়* বা ষাটটি বুরুজের কথা শুনে জঙ্গল পরিষ্কার করে গিয়ে রাজপ্রাসাদ খুঁজে পাননি। পুকুরের পাড়ে একটা উঁচু পাঁচিল দেখেছিলেন যার মধ্যে কয়েকটি বাড়ির ধ্বাংসাবশেষ ছিল। উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ছোট বাড়ি দেখেছিলেন যার মাঝখানের ঘর খিলান দেওয়া। এর চারপাশে ছোট ছোট ঘর। উনি দেওয়ালে পাইপ দেখে স্থির করেছিলেন যে এটি একটি হাম্মাম বা স্নানঘর। পরবর্তীকালে এই ধারণা স্বীকৃত হয়েছে। এর কিছু দূরে আর একটি ওই রকম স্নানাগার দেখেছিলেন। উপর থেকে নীচে জল নিয়ে যাবার যে ব্যবস্থা ছিল তারও উল্লেখ বুখানন করেছিলেন। কয়েকটি ইটের গায়ে সবুজ এনামেল ছিল। বুখানন অবশ্য বলেছেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের মতে পাণ্ডুয়া নামটি পাণ্ডু রাজার থেকে এসেছে। পাণ্ডু রাজা এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন বলে বলা হয়।

আকাশ থেকে জরিপ করা ছবির সাহায্যে বলা যায় যে এই প্রাসাদ এলাকা ছিল পশ্চিম থেকে পুবে ১৪৩০ গজ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ১২১০ গজ। এর মধ্যে অবশ্য চতুষ্কোণ একটা বুরুজ পড়ছে না যার মাপ ছিল ৬০০ × ৬০০ গজ। আদিনা মসজিদ থেকে প্রাসাদ এলাকায় আসার পথে বড় একটা দিঘি পড়ে (বলা হয় *ধানুস দিঘি*) যার অনেকটাই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। এই দিঘিই প্রাসাদ এলাকার উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে আছে এবং মনে করা যেতে পারে যে এটি প্রাসাদের চারপাশের পরিখার জল সরবরাহ করার উৎস। এই দিঘির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা মিনার রয়েছে যেটি পশ্চিম দিকের দরজার একটা অংশ বলে মনে হয়। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ না করে বলা যাবে না যে মিনারটি দরজার না মসজিদের অংশ।

চারপাশের এলাকার চেহারা দেখে মনে হয় যে এটা প্রাসাদের পাঁচিলের একটা বড় দরজা।

ধানুস দিঘির প্রায় এক মাইল পূর্বে আর একটা বড় দিঘি দেখা যায় যাকে স্থানীয় লোকেরা *সাতাশঘড়া* দিঘি বলে। এটি ওই প্রাসাদ এলাকার পাশে। বুখানন এর পাশের যে বাড়িগুলি দেখেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম তাকেই হাম্মাম বা তুর্কি স্নানাগার বলেছেন। কানিংহাম বলেছেন যে নিঃসন্দেহে এটি প্রাসাদের মধ্যেকার হাম্মাম ছিল। দিঘির পাশে এর যে ভগ্নস্তূপ আছে তাতে দেখা যায় এর মধ্যেকার ঘরটি ছিল অষ্টকোণাকৃতি এবং মেঝে সাদা মার্বল পাথরের তৈরি। এর চারপাশে ঘরগুলিতে ঠাণ্ডা ও গরম জলের নালি এখনও দেখা যায়। দিঘি থেকে বলদ-শক্তির সাহায্যে এই বাড়ির দোতলা ছাদে জল তোলা হত এবং এর পরে এই জল ওইসব নালির সাহায্যে ঘরগুলিতে নেওয়া হত। পরে ফোয়ারার মাধ্যমে ওই অষ্টকোণাকৃতি ঘরে জল নেওয়া হত। মনে হয় যে তুঘলকদের সমকালীন হাম্মাম-এর সঙ্গে এর প্রচুর মিল আছে যার ফলে এগুলিকে চতুর্দশ শতাব্দীর সময়ে তৈরি বলে ধরে নেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিমের মতে সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লির শামসি হাম্মামের অনুকরণে এটি তৈরি করেছিলেন যার ফলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন। এটি যে নিতান্তই অষ্টাদশ শতাব্দীর জনরব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ ফিরোজ শাহ তুঘলক পাণ্ডুয়া আক্রমণ করলে ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া শহর ছেড়ে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। হাম্মামের জন্য আক্রমণ করলে ফিরোজ শাহ ওই হাম্মাম বিনষ্ট করে ফেলতেন।

এই হাম্মামের পাশেই আর একটি হাম্মামকে বুখানন স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী পাণ্ডু রাজার দালান নামে অভিহিত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে র‍্যাভেনশও একে ওই নামে অভিহিত করেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটিও আর একটি হাম্মাম। এর থেকে সম্পূর্ণ এলাকাটিকে প্রাসাদের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। প্রাসাদের পাঁচিলের কিছু অংশ ও দরজার চিহ্ন বিভিন্ন দিকে দেখা যায়। প্রাসাদ এলাকার বাইরে আরও কয়েকটি দিঘির সন্ধান পাওয়া যায় যার থেকে মনে হয় জনবসতিপূর্ণ হবার ফলে জলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছিল যেটা নদী থেকে মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। এটাও মনে করা যেতে পারে যে ক্রমশ নদী সরে যাবার ফলে জলের জোগানে টান পড়ে যার ফলে ওই দিঘিগুলি তৈরি করা হয়েছিল। পাঁচিল ঘেরা হবার ফলে ওই সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

মালদা থেকে পাণ্ডুয়া আসার পথের পাশে ও একলাখি সমাধির আগে কয়েকজন সাধুপুরুষের সমাধি ইত্যাদি পাওয়া যায় যার মধ্যে হজরত শাহ জালাল তাব্রেজি ও হজরত নূর কুতুব আলমের সমাধি উল্লেখযোগ্য। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে তৈরি জামা মসজিদ শাহ জালালের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তবে এগুলির অবস্থান থেকে মনে হয় যে পাণ্ডুয়ার প্রথম দিকের সঙ্গে এঁরা জড়িত ছিলেন। সাধারণত এই ধরনের সুফি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা শহরতলিতে অবস্থান করেন যেখানে ক্রমশ জনসমাগমের ফলে শহর এসে যায়। দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা ওই একই জিনিস দেখি। এর থেকে মনে হয় যে পাণ্ডুয়া শহরটি প্রাসাদ এলাকা থেকেই শুরু হয়ে ক্রমশ

ছড়িয়ে পড়েছিল। এর কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় গোলাম হোসেন সলিমের লেখায়। সলিম লিখছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা গণেশের ছেলে জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া ও গৌড় জনবহুল হয়ে পড়ে। অধ্যাপক হবিবুল্লাহ বলেছেন যে এরই সময়ে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল—কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোনও প্রমাণ নেই।

মালদা-দেবিকোট পথের ডান ধারে (বর্তমান পথটি পুরনো পথ নয়) এবং প্রাসাদের কাছেই সুলতান সিকান্দর শাহ সমকালীন বাংলার সবথেকে বড় মসজিদ (আদিনা মসজিদ) তৈরি করা শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ফলে মসজিদের প্রধান প্রবেশদ্বার এখনও পাওয়া যায়নি। তবে মসজিদটির অবস্থান ও আয়তন থেকে এটা খুব স্পষ্ট যে প্রাসাদকে কেন্দ্র করে প্রভূত জনসমাগম হচ্ছিল। অন্য দিকে জালালুদ্দিনের সমাধি (একলাখি) ও অন্যান্য মসজিদ ও সমাধি তৎকালীন পাণ্ডুয়ার শহরতলিতে তৈরি যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে বাড়তি লোক ক্রমশ দক্ষিণ দিকে মহানন্দার কাছে যাবার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ দিকে পাঁচিলের বাইরে অন্তত দুটো দিঘির অবস্থান থেকে এর সমর্থন মেলে।

কানিংহাম ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপ থেকে পাণ্ডুয়ার আয়তন লম্বায় সাড়ে চার মাইল ও চওড়ায় দুই মাইল ধরেছেন। এর একশো বছর আগে বুখানন বলেছেন যে পাণ্ডুয়ার শহরতলি মালদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সুলতান ইলিয়াস শাহর সময় থেকেই এটা পরিষ্কার হতে থাকে যে সুলতানি অভিজাতবর্গ হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে ছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ভাদুড়িয়ার পুরনো জমিদার বংশের অধস্তন পুরুষ রাজা গণেশ সুলতান হন। একে কোনও কোনও ঐতিহাসিক হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করলেও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেছেন যে বহু মুসলমান ওঁর পক্ষে ছিল। সুফি নূর কুতুব আলমের চিঠিতে এই ধরনের আক্ষেপ পাওয়া যায়। ওঁরই অনুরোধে জোনপুরের শর্কি সুলতান বাংলা আক্রমণ করলে গণেশের ছেলে যদু ধর্মান্তর গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর সময়ই বাংলার শাসন দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এসবের ফলে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কোনও গোলমাল হয়েছিল বলে মনে হয় না। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের চিনা প্রতিনিধিরা আভ্যন্তরীণ গোলমালের কথা বলেননি।

ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন যে ওই ধরনের গোলমালের ফলেই পাণ্ডুয়া শহর পরিত্যাগ করে সুলতানরা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন যে রাজধানী স্থানান্তরিত করার প্রধান কারণ ছিল যে মহানন্দা নদী পাণ্ডুয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আমরা আগে দেখেছি যে ফিরোজ শাহর দুটি আক্রমণ ও ইব্রাহিম শর্কির আক্রমণ ছাড়া পাণ্ডুয়ায় আর কোনও গোলমালের ইতিহাস নেই। বরঞ্চ ফিরোজ শাহর আক্রমণের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমিদার ও কৃষক যে সম্মিলিতভাবে বহির্শত্রুর মোকাবিলা করেছিল তার প্রমাণ আছে। অর্থাৎ এমন কোনও গোলযোগের কথা আমরা পাই না যার ফলে শহর পরিত্যাগ করা হয়েছিল। অন্য দিকে নদী সরে যাওয়ার কথা কতটা গ্রহণযোগ্য সেটাও বিবেচনার বিষয়। চিনা

প্রতিনিধিদের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে তারা মালদাতে নেমে সমস্ত পথটাই হেঁটেছিলেন—যে পথের দুধারের বাড়ি ও দোকানের বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে পাণ্ডুয়াতে যখন জনবসতি হচ্ছে তখন নদী খুব কাছে ছিল। আগের বর্ণনায় আমরা দিঘিগুলির অবস্থান থেকে এই ধরনের ইঙ্গিত পেয়েছি। উল্লেখযোগ্য যে চিনাদের বর্ণনায় নদীর কোনও উল্লেখ নেই। প্রাসাদের কাছে যে নদীর মরা খাত পাওয়া যায়, সেটি একটি বড় খাল বলেই মনে হয়, যেটিকে প্রাসাদের পরিখা ও ভিতরের পুকুরের জল সরবরাহ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্য দিকে এটা বলা যায় যে লোকসংখ্যা বেশ বেড়ে যাওয়ার ফলে ও পাঁচিল ঘেরা হবার ফলে ক্রমশ জায়গার অভাব দেখা দিতে থাকে। এর ফলে গৌড় শহরেও লোক বসতি বাড়তে থাকে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। পাণ্ডুয়া তখন ধর্মীয় শহর বা হজরত পাণ্ডুয়া হিসেবে চলতে থাকে, কিন্তু শহরের বাকি বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে।

৬.৪ গৌড়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে স্থানীয় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে গৌড় সম্পর্কে একটা অনুসন্ধিৎসা দেখা যায় যদিও গৌড়ের পতনের পরেও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের বিশালতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার আগে আমরা পাই তিন জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত। এঁদের মধ্যে বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন হেনরি ক্রেটন (১৭৮৬) ও বিখ্যাত ভৌগোলিক জেমস রেনেল (১৭৮৬ সালে প্রকাশিত)। এর পরে রুবেন বারো আসেন ১৭৮৭ সালে। ক্রেটনের তৈরি প্রাসাদের মানচিত্রসহ বর্ণনা ছাপা হয় ১৮০১ সালে এবং এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে র‍্যাভেনশর মানচিত্র ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহামের বর্ণনা তৈরি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বুখানন হ্যামিলটন (প্রকাশিত ১৮৩৩) ও মেজর উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেন। এর পরেও বহুকাল গৌড় অবহেলিত ছিল। ঊনবিংশ শত্যব্দীর শেষে মালদার ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাভেনশ জঙ্গল পরিষ্কার করে মানচিত্র তৈরি করেন যেটি প্রধানত ক্রেটনের মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি। গৌড়ের শিলালেখগুলিরও পাঠোদ্ধার করতে র‍্যাভেনশ সাহায্য করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহামের বর্ণনাই বলা যায় যে ইউরোপীয়দের গৌড়ের উপর প্রায় শেষ বর্ণনা। হেনরি বেভারিজ ফ্রাঙ্কলিনের বর্ণনা ছাপান (১৮৯৪)। কিন্তু তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখক সৈয়দ ইলাহিবক্স ও মুনশি শ্যামপরশাদের ফারসি ভাষায় লিখিত গৌড়ের বর্ণনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা গৌড়ের স্বর্ণময় যুগের কথা

লিখতে থাকেন, যদিও এগুলি প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের গরিমায় উজ্জ্বল। অক্ষয়কুমার মৈত্রের ও রমাপ্রসাদ চন্দের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গৌড় শহরের ভৌগোলিক অবস্থান, নদীর গতিপথ ও বিশেষত লক্ষণাবতী শহরের কথা, যা কানিংহাম আগে 'হিন্দু শহর' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, তা নিয়ে প্রথম বড় আকারের লেখা লেখেন মনমোহন চক্রবর্তী (১৯০৮)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বড়লাট কার্জনের মালদা আসা উপলক্ষে আবিদ আলি গৌড় শহরের ইতিহাস ও ধ্বংসাবশেষের উপর মনোজ্ঞ রচনা তৈরি করেন (প্রথম প্রকাশনা ১৯৩১) যেটি পরবর্তীকালে স্টেপলটনের সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত করা হয়। এদের লেখার পরেও নানা ধরনের দলিল পাওয়া গেছে যার থেকে আমরা গৌড় শহরের একটা ছবি পাই।

গঙ্গার পূর্ব দিকে অবস্থিত গৌড় শহর সমকালীন ভারতবর্ষে প্রথম সারির বড় শহরের মধ্যে অন্যতম। অধ্যাপক ডি. সি. সরকার বিশ্বাস করতেন রামাবতী শহর, যার বর্ণনা সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখায় পাওয়া যায়, গৌড় শহরের কাছেই ছিল। বখতিয়ার খলজির লক্ষণাবতী আক্রমণের ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে যার উল্লেখ আমরা আগে করেছি। প্রধান বিতর্কের বিষয় ছিল লক্ষণাবতী শহরেরঅবস্থান। আমরা দেখেছি যে প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম শুধুমাত্র নামের উপর ভিত্তি করে বর্তমান গৌড়ের উত্তর দিকে ছিল বলে বলেছেন। পাণ্ডুয়াতে রাজধানী চলে যাবার পর লক্ষণাবতী সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।

পাণ্ডুয়া থেকে কোন সময়ে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল এটা পরিষ্কার নয়। আমরা আগে দেখেছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের লেখক গোলাম হোসেন সলিম বলেছেন সুলতান জালালুদ্দিনের সময় (পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক) থেকেই পাণ্ডুয়া ও গৌড় জনবহুল হতে থাকে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ওই সময়ই গৌড় রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রধানত পাওয়া যায় ১৪৫০ সাল নাগাদ থেকে। প্রধান রাজপথের উপর প্রথম শিলালেখ পাওয়া যায় ১৪৫৭ সালের শেষ দিকে। সুতরাং বলা যায় যে ১৪৫০ সাল নাগাদ গৌড়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে সপ্তগ্রাম বন্দরের শিলালেখও ১৪৫৫ সাল থেকে পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তর পতনের পর চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্য-বন্দর হিসেবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আমরা দেখতে পাই যে সপ্তগ্রাম বন্দর এই কাজ করছে যদিও সপ্তগ্রাম শহর বাংলার প্রাচীন শহরের মধ্যে অন্যতম। এর থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে ভাগীরথী নদী এই বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাগীরথীর নাব্যতা বেড়ে গিয়েছিল কিনা ওই সময়ে সেটা বলা সহজ নয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে আরাকান, ত্রিপুরা ও বাংলার মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ফলে বিদেশি বণিকদের কাছে সপ্তগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে গৌড় শহরের প্রধান বন্দর হিসেবে সপ্তগ্রাম কাজ করছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের গোলমাল ১৬৬৬ সালের মোগল জয়ের আগে কমেনি। কিন্তু মোগলদের

চট্টগ্রাম জয় সুনিশ্চিত হবার পরই ঢাকা শহরের বিস্তার হতে শুরু হয়, যে কথায় আমরা পরে আসব।

গৌড় শহর বেশি দিন টেকেনি। ১৫৩০ সালের পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক আবর্তে গৌড় শহরের প্রসার বন্ধ হয়ে যায়। ১৫৬৪ সালে সুলতান সুলেমান কাররানি তাণ্ডা শহরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। ১৫৭৫ সালে মোগলদের বিজয় হলে মুনিম খান আবার গৌড়ে রাজধানী সরিয়ে আনেন। কিন্তু ভয়াবহ মহামারীতে গৌড়ে বহু লোকের মৃত্যু হয়—মুনিম খানও মারা যান। এর পরই রাজধানী গৌড় থেকে সরে যায় ও শহরটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুলতান শাহ সুজা ১৬৪০ সালের পর গৌড়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে প্রচুর মুদ্রা পান। সম্ভবত তিনিই গৌড় প্রাসাদ অঞ্চলের প্রধান দরজা তৈরি করেছিলেন, যেটি *লুকোচুরি দরজা* নামে এখনও আছে। ১৬৮৩ সালেও গৌড়ের প্রাসাদ প্রায় অভগ্ন অবস্থায় ছিল, যেটি দেখেছিলেন ইংরেজ বণিক উইলিয়াম হেজেস। উনি ওই প্রাসাদকে কনস্টান্টিনোপলের প্রাসাদের থেকেও বড় বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাসাদের পাঁচিলের একটা অংশ (বাইশগজি বলে খ্যাত) এখনও আছে যার থেকে প্রাসাদের সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

শহরের চারপাশে ক্রেটন সাহেব বড় পাঁচিল দেখেছিলেন যার অনেকখানি এখনও দেখা যায়। মিনহাজ-ই সিরাজ লিখছেন যে ওই বড় পাঁচিল ১২২৭ সালে তৈরি হয়েছিল। শহরটা দশ মাইল লম্বা ও দেড় মাইল চওড়া। যদিও ক্রেটন এ সীমানার বাইরেও ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন। পূর্ব দিকে ক্রেটন দুটো পাশাপাশি দেওয়াল দেখেছিলেন প্রধানত পূর্ব দিকের হ্রদের জল ঠেকানোর জন্য। পূর্ব দিকের এই হ্রদকে আবুল ফজল ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে *ছটিয়া পটিয়া* বলেছেন। এ হ্রদের অবশ্য এখন আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। ক্রেটন দুটো প্রধান দরজা দেখেছিলেন—একটি দক্ষিণে রয়েছে যাকে *কোতোয়ালি দরওয়াজা* বলে ও অন্যটি উত্তরে যাকে *দাখিল দরওয়াজা* বলা হয়। ক্রেটন শেষেরটির একটি ছবিও এঁকেছিলেন যেটি ছাপানো হয়েছে। ক্রেটন তাঁর মানচিত্রে *লুকোচুরি দরজার* নির্দেশ দিলেও ওই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। তাঁর মানচিত্রে এর পাশে *গোমতি দরজার* উল্লেখ পাওয়া যায়। কেন দুটো দরজা পাশাপাশি ছিল সে নিয়ে অবশ্য কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেননি। *লুকোচুরি* দরজাটি যে পরবর্তীকালে মোগল যুগে করা, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। শাহ সুজা এটি করেছেন বলে মনে হয় না—কারণ তত দিনে গৌড় বাসের অযোগ্য হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে এটি মুনিম খাঁর সময়ে করা বলে ধরা যেতে পারে। কারণ মুনিম খাঁ গৌড়ে কিছুদিন ছিলেন। ক্রেটনের প্রাসাদের মানচিত্রে আরও একটি দরজা পাওয়া যায় দক্ষিণ দিকে যার কোনও অস্তিত্ব এখন আর নেই।

শহরের চেহারা বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রেটন বলেছেন যে শহরের প্রধান দুটো রাজপথ উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গিয়েছে। এর অনেকাংশই ইট দিয়ে বাঁধানো ছিল যার সমর্থন সমকালীন সাক্ষ্যে মেলে। ষষ্ঠদশ শতকের গোড়ার দিকের পর্তুগিজ দলিল থেকে আমরা শহরের একটা ছবি দেব।

প্রাসাদ-দুর্গ সম্পর্কে ক্রেটন বলেছেন যে এক মাইল লম্বা ও আধমাইল চওড়া। এর চারপাশে দেওয়াল ছিল ও এর বাইরে পরিখা ছিল। এই এলাকার মধ্যে ছিল

প্রাসাদ—প্রায় সাতশো গজ লম্বা ও তিনশো গজ চওড়া— যেটি বাইশগজি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এই দুর্গের মধ্যে ক্রেটন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র সমাধি দেখেছিলেন— যেটি ছিল কালো মার্বল পাথরের। পরবর্তীকালে ইংরেজরা এটি সরিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যায়। অবশ্য কারুর কারুর মতে ওই সমাধি আলাউদ্দিন হোসেনের নয়—কারণ ক্রেটনের লেখার বিশ বছর আগে রবার্ট ওরমে ওই কালো পাথরকে কলকাতায় নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। ক্রেটন অবশ্য দেখেছিলেন যে গৌড়ের ইট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মালদা, রাজমহল ও মুর্শিদাবাদে বাড়ি বানানোর জন্য। ক্রেটনের সময়ই গঙ্গা প্রায় দশ মাইল দূরে সরে গিয়েছে।

ক্রেটনের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি প্রাসাদ এলাকাকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং ওই বিভাজনের যে দেওয়াল ছিল তারও কিছু অংশ দেখেছিলেন। বর্তমানে ওই দেওয়াল না থাকলেও, দেওয়ালের নীচের অংশ মাটির মধ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর দিকের দাখিল দরজা দিয়ে প্রায় সোজা পথ চলে এসেছে প্রাসাদের প্রথম বিভাজনের পাঁচিল পর্যন্ত। এই প্রথম অংশটি ছিল সুলতানের দরবার যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন পর্তুগিজদের লেখায় ও কবি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে। কবি দরজা থেকে দরবার পর্যন্ত ন'টি দরজার কথা বলেছেন কিন্তু মাত্র দুটি দরজার ধ্বংসাবশেষ এখন পাওয়া যায়।

ক্রেটন দ্বিতীয় অংশকে রাজার থাকার ঘর ও তৃতীয় অংশকে জেনানামহল বলেছেন যদিও এখনও পর্যন্ত প্রমাণ কিছু মেলেনি। কিছু সমর্থন মেলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের ফরাসি পরিব্রাজক ল্য ব্লঁ-এর লেখায়। উনি বলছেন যে প্রাসাদের শেষ প্রান্তে ছিল হারেম যেখানে মহিলারা নদীতীরে বেড়াতেন। এটা মেনে নিলে হারেমের অবস্থান নিয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যে সমীক্ষা গৌড়ে কয়েক বছর ধরে হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণ রং করা ইট, প্রাচীন বাংলা লিপি, খোদাই করা চিনামাটির পাত্রের ভগ্নাংশ, যা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পাওয়া গেল, মাটির পাইপ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষ রাজকীয় ব্যবহারের জন্যই ছিল। তৃতীয় কক্ষ বা হারেম থেকে কিছু পাওয়া যায়নি— ফলে সন্দেহের সম্পূর্ণ অবসান হয়নি।

প্রাসাদের মধ্যে প্রথম কক্ষের পূর্ব দিকে একটা বাড়ির কথা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকরা বলেছেন। কেউ কেউ একে, জনশ্রুতি অনুযায়ী, খাজাঞ্চিখানা বলেছেন। বর্তমানে অবশ্য এই সৌধটি আর নেই। তবে পুকুরের পাশে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের খিলানের ও স্তম্ভের অংশ পড়ে আছে, যেগুলি প্রাক্-সুলতানি যুগের সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়াও অবশ্য পাথরের টুকরো বেশি ও ইটের সংখ্যা কম, যার থেকে মনে হতে পারে যে এটি প্রাক্-সুলতানি যুগের এলাকার অংশ ছিল। এরই কাছে বাইশগজি দেওয়ালের ভাঙা অংশের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কোয়ার্টজ পাথর, যার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এটি প্রাসাদের কারখানার অংশ ছিল।

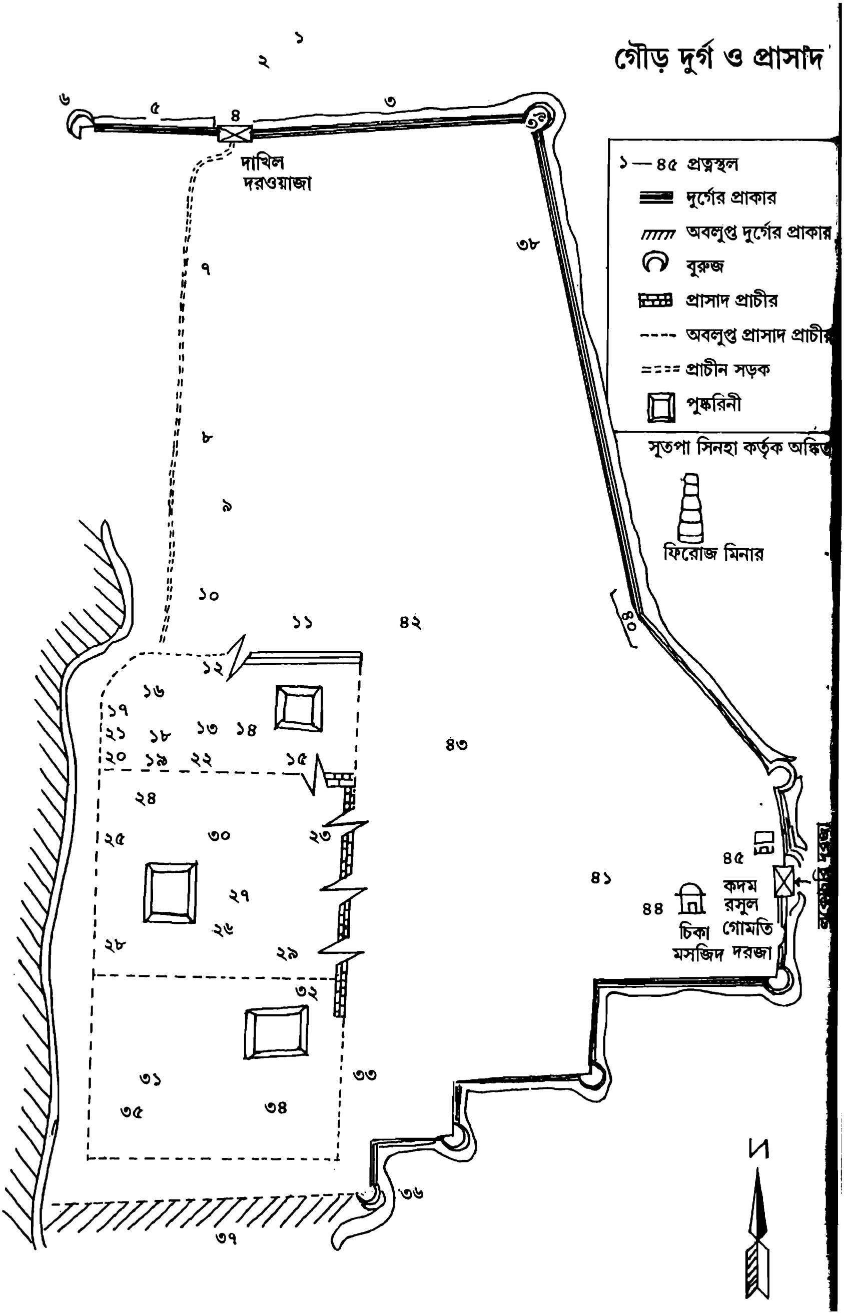
গৌড় দুর্গ ও প্রাসাদ
১ — ৪৫ প্রত্নস্থল
দুর্গের প্রাকার
অবলুপ্ত দুর্গের প্রাকার
বুরুজ
প্রাসাদ প্রাচীর
অবলুপ্ত প্রাসাদ প্রাচীর
প্রাচীন সড়ক
পুষ্করিনী
সূতপা সিনহা কর্তৃক অঙ্কিত
ফিরোজ মিনার
দাখিল দরওয়াজা
কদম রসুল
চিকা মসজিদ
গোমতি দরজা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
N

প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষ থেকে সিঁড়ির ধাপ নীচে নদীতে নেমে গিয়েছে, যেখানে একটি মাটির নীচের ঘরেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় কক্ষেই একটি উঁচু ঢিপি দেখা যায়, যেটা হাম্মাম হওয়া সম্ভব। এখানেই নানারকম রঙের নকশা করা মেঝে দেখা যায় যার থেকে মনে হয় যে এটা রাজকীয় ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। দাখিল দরজা থেকে দরবার-এর মধ্যে দুটো দরজার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পথের মাঝামাঝি জায়গায় যেটি ছিল, তাকে বলা হত নিম দরজা ও দরবারের মুখের দরজাটির নাম ছিল চাঁদ দরজা । এখান থেকে উচ্চমানের মাটির বাসন পাওয়া গেছে যার থেকে বোঝা যায় যে অভিজাতরা এ দরজাটি ব্যবহার করতেন। এরই পশ্চিম দিকে ও প্রাসাদের পাঁচিলের বাইরে একটি সৌধের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। মনে হয় দুই কক্ষবিশিষ্ট এই সৌধটি ওই দরজার প্রধান রক্ষীর বাসভবন ছিল। বলাবাহুল্য যে অভিজাতরাই ওই দরজার রক্ষী হতেন। নিম দরজার ফোয়ারা থেকে একটি মাটির নীচের নালির সাহায্যে প্রাসাদে জল নিয়ে যাওয়া হত, যেটি তৈরি হয়েছিল ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বারবক শাহর সময়। এর শিলালিপিটি ক্রেটন প্রথম পান বহু দূরে তাঁর বাসস্থানের কাছে।

প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে ও লুকোচুরি দরজার উত্তরে একটি মসজিদ ধরনের ও বাংলা চালা ধরনের ঘর দেখা যায়। মসজিদ ধরনের (মসজিদ নয়) ঘরটিকে কদম রসুল বলা হয়, যেখানে নবির পায়ের ছাপ রাখা হয়েছে। পাশের চালাঘরটিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দিলির খান-এর ছেলে ফৎ খান-এর সমাধি বলে নোটিসবোর্ডে টাঙিয়ে রেখেছেন, যদিও ইতিহাসে ফৎ খানের বাংলায় আসার কোনও প্রমাণ নেই। এর পরই আমরা পাই সুলতানদের ও পরিবারবর্গের সমাধি। এর কাছেই সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর সমাধি ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গোমতি দরজার দক্ষিণ-পশ্চিম ধারে, প্রাসাদের দুর্গের মধ্যে, অনেকগুলি সৌধের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, একটি সুন্দর গম্বুজওয়ালা সৌধ দেখা যায়। চারপাশে চারটে দরজা যার পূর্ব দিকের দরজা গোমতি দরজার সঙ্গে সরলরেখায় মেলানো। মনে হয় গোমতি দরজার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই সৌধ করা হয়েছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এটিকে চিকা মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আবিদ আলি ও অন্যান্যদের মতে এটি মসজিদ নয়। এটি কারওর সমাধিসৌধ নয় কারণ কোনও সমাধি এর ভিতরে পাওয়া যায়নি যদিও একলাখি সমাধিসৌধের সঙ্গে এর গঠনশৈলীর মিল আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি একে জেলখানা বলেছে। কিন্তু সনাতন (আলাউদ্দিন হোসেনের মন্ত্রী) এখানে বন্দি ছিলেন বলে মনে হয় না—কারণ তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী জেল থেকে পালিয়েই তিনি গঙ্গা পার হয়ে পালান। সেটি এখানে সম্ভব নয় কারণ গঙ্গা তখনই অনেক দূরে ছিল। ১৫২১ সালে পর্তুগিজ দোভাষীর যে লেখা পাওয়া যায় (নাম জানা যায় না) তার থেকে মনে হয় যে এটি ছিল দিওয়ান-ই মাজ্জালিম বা বিচারালয়। এখানেই ওর বিচার হয়েছিল বলে মনে হয়—কারণ সেটি ছিল প্রাসাদের খুব কাছে। ওই পর্তুগিজ-এর লেখা থেকে মনে হয় যে প্রাসাদের পূর্ব দিকে আর একটি দরজা ছিল। প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের পাঁচিল এখন ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছে। তবে ক্রেটনের মানচিত্র থেকে বোঝা যায় যে নদী পর্যন্ত

ওই পাঁচিল চলে গিয়েছে।

চিকা সৌধের পিছনে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের থামওয়ালা লম্বা ঘরের চেহারা পাওয়া যায়। মনে হয় এগুলি সরকারি দপ্তর ছিল। তবে চিকার সামনে ও দক্ষিণ পাশে ওই ধরনের প্রচুর পাথর পড়ে আছে। ওখানে মাটির নীচের ঘরেরও চেহারা দেখা যায়। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে প্রাক্-সুলতান যুগের প্রাসাদ বা ওই ধরনের কোনও সৌধ এখানে ছিল। এটাও মনে করা যেতে পারে লক্ষণাবতীর পুরনো প্রাসাদ এখানে ছিল যেটি সুলতানরা বদল করে ব্যবহার করেছে। এ ধরনের অনুমানের কারণ হচ্ছে যে প্রাসাদের দক্ষিণে প্রায় এক মাইল উঁচু জায়গা ঘিরে প্রচুর বাড়ি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উঁচু জায়গায় বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি ও মাটির বাসন পাওয়া গিয়েছে (কাছে মহদিপুর বিদ্যালয়ে রক্ষিত)। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই জায়গাটি ছিল গৌড়ের বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং একে বলা হত লাল বাজার (লাল অর্থে মূল্যবান)। এর একটি অংশকে বলা হত মহাজনটোলা এবং এখান থেকে প্রচুর সোনা ও রুপোর মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে যেগুলি মালদা কালেকটরিতে রক্ষিত আছে।

শহরের একটি উজ্জ্বল চিত্র আমরা পাই ১৫২১ সালের পর্তুগিজ দোভাষীর লেখা থেকে। ওই দোভাষী বলেছেন যে এটি একটি জনাকীর্ণ শহর এবং লোকের ভিড়ে পথ চলা মুশকিল। উনি দেখেছেন যে অভিজাতরা যখন পালকি করে দরবারে যাচ্ছেন তখন সামনে তাদের লোকেরা লাঠি দিয়ে লোক সরাচ্ছে। এর লোকসংখ্যা কত ছিল বলা সহজ নয়। শহরটির আয়তন আশি বর্গমাইল ধরা যায় (কুড়ি মাইল লম্বা ও চার মাইল চওড়া)। এর মধ্য থেকে পথঘাট, খাল, প্রাসাদ এলাকা, মসজিদ ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। অভিজাতদের বড় বাড়িগুলিও (বাগান সমেত) বাদ দেওয়া দরকার। এই শহরের লোকসংখ্যা পর্তুগিজ ঐতিহাসিক ফেরিয়া ই সুসা ১২ লাখ ধরেছেন, যেটি আবিদ আলি গ্রহণ করেছেন। ফরাসি পর্যটক ল্য ব্লঁ বলছেন চল্লিশ হাজার উনুন বা পরিবার। পাঁচ জনের এক পরিবার ধরলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লক্ষতে। তা হলে জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গমাইলে দুহাজার। কিন্তু পথঘাট ইত্যাদির জন্য ছাড় দিলে এটি আরও বেশি হবে, কিন্তু কোনওক্রমেই এ জনসংখ্যা বারো লক্ষ হতে পারে না। সমকালীন ফতেপুর সিক্রির জনসংখ্যার উপর ইরফান হাবিব ও শিরিন মুসভি যে কাজ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৫৮০ সাল নাগাদ ওই শহরের জনসংখ্যা ছিল দু লাখ বিশ হাজারের মতন। গৌড়ের থেকে আয়তনে প্রায় তিন গুণ বড় বিজয়নগর শহরের জনসংখ্যা আমরা দেখেছি পাঁচ/ছয় লাখের মতো। সুতরাং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, গৌড়ের পতনের আগে, আমরা এই শহরের জনসংখ্যাকে দু লাখ বলে ধরতে পারি।

পর্তুগিজ দোভাষী গৌড়ের ইটে বাঁধানো পথঘাট দেখেছেন অনেকটা লিসবন শহরের মতো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কানিংহাম ও র‍্যাভেনশ এই ধরনের বাঁধানো পথের কিছু অংশ দেখেছিলেন যার কিছু অংশ বর্তমান কালেও দেখতে পাওয়া যায়। র‍্যাভেনশ যে মানচিত্র তৈরি করেছেন (স্কেলে নয়), সেখানে আমরা প্রধান দুটি রাজপথ দেখতে পাই বর্তমান কোতোয়ালি দরজা থেকে উত্তর দিকের পাঁচিল পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই দুটি পথই গঙ্গা নদীর সমান্তরাল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর

মাঝামাঝি যে জরিপ করা হয়, তাতেও ওই পথ দুটি দেখানো আছে। নানা ধরনের গলি ও ছোট রাস্তা এই দুটি রাজপথকে ভাগ করে চলে গিয়েছে যার ফলে বিভিন্ন মহল্লা তৈরি হয়েছিল। পর্তুগিজ দোভাষী এই সব মহল্লার কথা বলেছেন। এর এক-একটায় বা একটা করে রাস্তায় একই ধরনের জিনিস বিক্রি হয়। যেমন কোনও রাস্তায় শুধু মিষ্টি, কোনও রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র বা কোনও রাস্তায় ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম।

পর্তুগিজ দোভাষী বাড়ির কোনও বর্ণনা দেননি যদিও তিনি একজন অভিজাতের বাড়িতে মাসাধিক কাল ছিলেন। কিন্তু অন্য এক পর্তুগিজ ঐতিহাসিকের লেখায় একটা চেহারা পাওয়া যায়। কাস্তেনহেদা দ্য লোপেজ গৌড়ে আসেননি—মনে হয় অন্যান্যদের কথা শুনে তিনি লিখেছেন। উনি লিখছেন যে এই বাড়িগুলি নিচু এবং সোনা ও নীল রঙের টালি দিয়ে ঢাকা। প্রতি বাড়িতেই উঠোন ও বাগান আছে। প্রায় সব বাড়ির মেঝে নানা রঙের টালি দিয়ে ঢাকা। এই বর্ণনা অন্য এক লেখকের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় যিনি হুমায়ুনের সঙ্গে গৌড়ে এসেছিলেন। উনি লিখছেন যে বাড়ির মেঝে চিনা টালি দিয়ে ঢাকা দেখে হুমায়ুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকী বাড়ির দেওয়ালও ওই ধরনের টালি দিয়ে ঢাকা। উল্লেখযোগ্য যে প্রাসাদ এলাকায় ওই ধরনের একটা মেঝে পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও নানা ধরনের টালির টুকরো পাওয়া গিয়েছে।

প্রাসাদ-দুর্গ এলাকা থেকে পূর্ব দিকের দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড় ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় যাকে *বেলবারি* মাদ্রাসা বলে অভিহিত করা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি অবশ্য একে চাঁদ সদাগরের ভিটা হিসেবে ধরে। এটাই শহরের পাঁচিলের মধ্যে প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলে ধরা যেতে পারে। পাঁচিলের বাইরে দক্ষিণ দিকে আর একটা মাদ্রাসা পাওয়া গিয়েছে যাকে *দরাসবারি* মাদ্রাসা বলে বলা হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা এটির পুনরুদ্ধার করেছেন।

গৌড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর খালগুলি। প্রাসাদ-দুর্গ এলাকা থেকে শুরু করে বহু খাল সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব দিক ভরে রেখেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই খালগুলি পূর্ব দিকের ছটিয়া পটিয়া থেকে এঁকেবেঁকে দক্ষিণে পাগলা নদীর খাল ও পশ্চিমে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। বর্ষার উদ্বৃত্ত জল এইভাবে ব্যবহার করে শহরের জলের চাহিদার জোগান দিচ্ছে। অনেক জায়গাতে দুটি খাল সমান্তরালভাবে চলে গিয়েছে—একটিতে পানীয় জল ও অন্যটিতে নিষ্কাশন জাতীয় পদার্থ বাইরে ফেলে দেবার জন্য। র‍্যাভেনশর মানচিত্রে এই খালগুলির চেহারা পরিষ্কার। খালগুলির নাব্যতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ও বিশেষত প্রধান পথের উপর সাঁকো বা পুল তৈরি করা হয়েছিল যার অনেকগুলি এখনও আছে। এদের কোনও কোনওটা এক খিলানের আবার কোনও কোনওটা সাত খিলান যুক্ত। এই পুলের নীচ দিয়ে নৌকা চলাচল করত। মনে হয় গঙ্গার উপর মালবোঝাই নৌকা এলে হয় সেই মাল অন্য ছোট ছোট নৌকা করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হত অথবা খালের মধ্য দিয়ে কোনও একটা কেন্দ্রস্থলে নেওয়া হত। এ পর্যন্ত এ ধরনের কোনও বাজার বা বন্দরের প্রমাণ পাওয়া যায়নি যদিও মালাক্কা থেকে লেখা একটি পর্তুগিজ লেখায় গৌড়কে বন্দর বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

এই খালগুলির নাব্যতা বজায় রাখতে গেলে খালগুলি পরিষ্কার ও মেরামত করা দরকার। এ ছাড়া পশ্চিম দিকের গঙ্গার নাব্যতাও ঠিক রাখা দরকার। ১৫৩০ সালের পর থেকে রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে খালগুলি ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়ে। অন্যদিকে গঙ্গাও আরও পশ্চিম দিকে সরে যেতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গঙ্গা বেশ দূরে চলে গিয়েছে বলে রেনেল বলেছেন যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গঙ্গা কাছেই ছিল এরকম প্রমাণ আছে। কিন্তু খালগুলি পরিষ্কার না হবার ফলে খালে জল জমতে থাকে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ফরাসি পরিব্রাজক শহরের বিভিন্ন জায়গায় জোয়ারের সময় জল জমছে বলেছেন।

বেলবারি মাদ্রাসা এলাকায় ভাল মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে, যার থেকে মনে হয় যে জায়গাটিতে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বাস করত। কোনও কোনও বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে বোঝা যায় যে কয়েকটা ঘর ও সামনে বাগান নিয়ে বাড়ি ছিল। এ ধরনের বাড়িগুলি ছিল উঁচু জায়গায়—অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উঁচু জায়গাগুলিতেই বাড়ি করেছিল। কিন্তু মনে হয় শ্রেণীভেদ এলাকা অনুযায়ী ছিল না অর্থাৎ প্রতিটি এলাকাই ছিল মিশ্র যেখানে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা থাকত। শুধু এলাকার উঁচু বা ভাল জায়গাগুলি ছিল উচ্চ শ্রেণীর দখলে।

বেলবারি মাদ্রাসা থেকে পূর্ব দিকের দেওয়ালে যাবার পথে পড়ে ছোট সাগর দিঘি। এখানে বসতবাড়ির চিহ্ন বিশেষ পাওয়া যায় না বা ভাল মাটির তৈজসপত্রর টুকরো পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয় যে এই এলাকাগুলিতে গরিব লোকেদের কুঁড়েঘর ছিল। মধ্যযুগের শহরের প্রান্তিক এলাকাগুলিতে অন্ত্যজ লোকেদের বাস ছিল এটা সমকালীন কবি মুকুন্দরামের রচনায় পাওয়া যায়।

দুর্গ-প্রাসাদ এলাকার কাছাকাছি এলে আমরা মসজিদগুলির দেখা পাই। দুর্গ-প্রাসাদের পূর্ব দিকের দরজা ও মাদ্রাসার দিকে বড় পথের উপর ছিল *চামকাঠি মসজিদ* যেটি ১৪৭৫ সালে তৈরি। নাম নিয়ে বিতর্ক আছে যদিও বলা হয় যে এটি চামড়ার কারিগরদের জন্য মসজিদ। পরবর্তী দুটো মসজিদের সঙ্গে—*লাটন* ও *তাঁতিপাড়া* মসজিদ (দুটোই ১৪৮০ সালে তৈরি)—সাধারণত নাচনেওয়ালি ও তাঁতিদের সঙ্গে যোগ ছিল। পর্তুগিজ দোভাষী চামড়ার কাজের তৈরি জিনিস ও কাপড়ের বিক্রির কথা বলেছেন। এই দুটি মসজিদই লাল বাজারের কাছাকাছি। ১৪৭৫ থেকে ১৪৮০ সালের মধ্যে তিনটি মসজিদ প্রায় তিন মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা যায় যে ১৪৭০ সালের পর শহরে লোকসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। এর পরও দেখা যায় যে শহরটি পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে বাড়ছিল। দরাসবারি মসজিদ তৈরি হয় ১৪৭৯ সালে—সুলতান ইয়ুসুফ শাহ এটি তৈরি করেন। মনে হয় ওই সময়ই ওই মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল। প্রাসাদ-দুর্গ এলাকার দক্ষিণে আমরা দেখতে পাই ১৪৮৪ সালে গুণমন্ত মসজিদ তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাসাদ-দুর্গ এলাকাটিকে কেন্দ্র করে দেখা যায় যে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বসতি হচ্ছে। পূর্ব দিকের বসতি দেওয়ালের ওপারে যায়নি ছটিয়া পটিয়া থাকার ফলে। দক্ষিণ দিকে পাঁচিলের বাইরে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর সময়ে তৈরি হয়েছিল *ছোট সোনা মসজিদ*। শিলালেখ থেকে এটি ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ সালের মধ্যে

তৈরি হয়েছিল বলে কানিংহাম ধারণা করেছেন যদিও শিলালেখটিতে বছরের অক্ষরটি ভাঙা। উত্তর দিকে আমরা একমাত্র *বড় সোনা মসজিদ* ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাই না। ক্রেটন ও অন্যান্যরা এটিকে ১৫২৬ সালে নসরৎ শাহর সময়ে তৈরি বলে ধরেছেন। কিন্তু পর্তুগিজ দোভাষী ১৫২১-এ এটিকে দেখেছেন ও বর্ণনা দিয়েছেন। মনে হয় যে এটি রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্য ছিল। উনি বলছেন যে এই মসজিদ থেকে কিছু দক্ষিণে দাখিল দরজা পর্যন্ত একটা শিকল বাঁধা ছিল এবং সাধারণ লোকেদের এই এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তবে শহরটি যে দক্ষিণ দিকে বাড়ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোতোয়ালি দরজার আশেপাশে আরও দুটি মসজিদ থেকে যাদের ধ্বংসাবশেষই শুধু পাওয়া যায়। শেষ মসজিদটি বোধহয় তৈরি করা হয় ১৫৩৫ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহর সময়ে। এর পরই শহরের পতন শুরু হতে থাকে। কিছুদিন পরে শের শাহ শহর *লুঠ* করেন ও তারপর হুমায়ুন শহর দখল করেন।

দিল্লির ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির লেখা থেকে একটা লম্বা বাজারের কথা পাওয়া যায়। এটি দুই মাইল লম্বা এবং এর দুপাশে দোকানঘর। এটি পুরনো প্রাসাদে গিয়ে শেষ হয়েছে, বলবানের ছেলে এই প্রাসাদটি ব্যবহার করছিলেন। গৌড় প্রাসাদের উত্তর দিকে সোজা দু মাইল দূরে আমরা ফুলবারি দুর্গর ধ্বংসাবশেষ পাই। এই দু মাইলের দুপাশে ছোট ছোট ঢিপি আছে। ফুলবারি দুর্গটির সামনেই (পশ্চিমে) নদীর খাত এবং দুর্গটির ইট ও পাথরের পাঁচিলের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণ ইট, পাথর ও কালো ব্যাসাল্ট পাথরের অলঙ্কারযুক্ত থাম পড়ে আছে, যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে এলাকাটি প্রাক্-সুলতানি যুগের সময়ও ব্যবহৃত হয়েছিল। এখান থেকে পালিশ ও রং করা ইটের টুকরো, পোর্সেলিন ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। কানিংহাম একে পুরনো হিন্দু দুর্গ বলে বলেছেন—কিন্তু কালো ব্যাসাল্ট পাথর ছাড়া হিন্দু যুগের নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়নি। একেই বারানির প্রাসাদ বলে ধরা যেতে পারে। সেটা মেনে নিলে গৌড় প্রাসাদও যে পুরনো সেটা ধরতে হয়, কারণ বারানি নতুন ও পুরনো প্রাসাদের কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা আমরা আগে করেছি।

গৌড় শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ না হবার ফলে পয়ঃপ্রণালীর কথা জানা যায় না। মনে হয় মাটির নীচের নালির সঙ্গে নালাগুলির যোগ ছিল যার সাহায্যে নদীতে ময়লা ফেলার ব্যবস্থা ছিল। তবে সেগুলি কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের জন্যই করা হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গৌড় প্রাসাদের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে ও বড় সোনা মসজিদ-এর বিপরীত দিকে এরকম একটি মাটির নীচেকার নালির সন্ধান পাওয়া যায়। যেটি আরও উত্তর থেকে পশ্চিমে নদীতে মিলেছে। উল্লেখ করা হয়েছে দরবারের নীচে এরকম মাটির নালির সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে।

কবি কৃত্তিবাস-এর রচনায় দরবারে যাবার পথ ও দরবারের বর্ণনাকে সাধারণত অতিরঞ্জিত বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ১৫২১ সালের পর্তুগিজ দোভাষীর বর্ণনায় এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। দোভাষী দাখিল দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। যে পথ ধরে দোভাষী দরবারের সামনে গিয়েছিলেন সে পথটি বর্তমানে

পাওয়া গিয়েছে। দরবারের সামনে এসে দোভাষী দেখেন যে সামনের মাঠে পোলো খেলা হচ্ছে এবং সুলতান বসে ওই খেলা দেখছেন। দরবারের বর্ণাঢ্যময় বর্ণনা দোভাষী দিয়েছেন। দরবারের নীচে মাটির তলার ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে খেলাৎ দেওয়া হয়। সুলতান তক্তপোশের উপর বসে ছিলেন এবং তার উপর দামি জাজিম পাতা ছিল। চারপাশে বহু অভিজাত ও সৈন্য ছিল অস্ত্র নিয়ে। দরবারের এই ছবি পাণ্ডুয়ার দরবারের ছবির থেকে বেশি আলাদা নয়। শুধু পাণ্ডুয়াতে বারান্দা ছিল যেখানে সারি দিয়ে সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল এখানে সেটা নেই। এ ছাড়া পাণ্ডুয়ার দরবারে থাম ছিল যার উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় না। গৌড়-এর দরজা ও দরবারের মধ্যে বহু ধরনের নিশান উড়তে দোভাষী দেখেছেন যার উল্লেখ পাণ্ডুয়ার দরবার সম্বন্ধে চিনারা বিশেষ করেনি। সুলতানি যুগে বাংলায় পোলো খেলার কথা আমরা আর কোথাও পাই না। বর্ণনায় মনে হয় খেলার রেওয়াজ বহুদিন আগেকার। দরবারের সামনে পোলো খেলার মাঠকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। হারেমের পিছনে দক্ষিণ দিকে উঁচু জায়গার উপর সারি সারি উনুনের মতো গর্ত এখনও দেখা যায়। মনে করা যায় যে ওগুলি থেকেই দরবার ও রাজার খাবার জোগান দেওয়া হত। তবে এটি এখনও অসমর্থিত।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে উত্তরে মালদার কাছে পাণ্ডুয়া থেকে অনেক দক্ষিণে গৌড়ে রাজধানী চলে এসেছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সপ্তগ্রাম বন্দরের উত্থান লক্ষ করি। পর্যটকদের লেখা থেকে খুব পরিষ্কার যে ওই বন্দর গৌড় শহরের প্রধান আমদানি ও রপ্তানির বন্দর। ১৫৩০ সালের পর থেকেই সপ্তগ্রামে বড় পর্তুগিজ জাহাজ না এলেও বন্দরের ক্ষতি হয়নি। ছোট নৌকা করে মাল সরবরাহ করা হত। ষষ্ঠদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেও সপ্তগ্রাম বন্দরে পঞ্চাশটির উপর ছোট জাহাজ পর্যটকরা লক্ষ করেছেন।

১৫৩০-এর পর থেকেই বাংলার আর্থ-রাজনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসতে শুরু করে। শের শাহ শহর লুঠ করে চলে গেলে হুমায়ুন আসেন। এর পর উড়িষ্যার রাজারা সপ্তগ্রাম পর্যন্ত একবার দখল করে নেয় এমন একটা সময়ে যখন চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার সুলতানদের প্রায় হাতছাড়া হয়ে গেছে। এর পরেই আসে মোগল-আফগানদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যার ফলে কাররানি বংশ বিলোপ পেয়ে মোগল রাজতন্ত্র শুরু হয়। ১৫৬৫ সালে সুলেমান কাররানি গৌড় ছেড়ে তাণ্ডা শহরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। ততদিনে খালগুলির সংস্কার না হওয়ায় শহরে জল জমতে থাকে ও শহর ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর হতে থাকে। ১৫৭৫ সালে মোগল সেনাপতি মুনিম খান গৌড়ে রাজধানী নিয়ে এলে ভয়াবহ মহামারী শুরু হয়। এর পরই রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাজমহলে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলার সুবাদার যুবরাজ সুজা গৌড়ে হয়তো কিছুদিন বসবাস করলেও গৌড় আর রাজধানীর মর্যাদা পায়নি। শহরটি ক্রমে পরিত্যক্ত হয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অভিজাত মির্জা নাথান গৌড়ে কদম রসুলে আসেন কিন্তু গৌড় শহরের কোনও উল্লেখ করেননি।

৬.৫ সপ্তগ্রাম

প্রাক্-সুলতানি বাংলার দুটি বন্দরের কথা পাওয়া যায়—একটি তাম্রলিপ্ত ও অন্যটি গাঙ্গেয়। শেষেরটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাম্রলিপ্ত সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত বিখ্যাত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এর পতন হয়। এটা বলা হয় যে সরস্বতী নদী রূপনারায়ণ নদীর খাতে বইত দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয়ে। এর মুখেই তাম্রলিপ্তর অবস্থান ছিল যদিও বন্দরের সঠিক জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ধরা হয় যে সরস্বতীর নতুন গতিপথ তৈরি হয়েছিল। ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে বেতোড়ের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কারুর কারুর মতে এটাই ভাগীরথীর গতিপথ, যার কিছু অংশকে বলা হচ্ছে সরস্বতী।

ত্রিবেণীর কিছু দূরে সরস্বতী নদীর উপরে ছিল সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও)। সাতটি গ্রাম নিয়ে গঠিত বলে সপ্তগ্রাম বলা হত, যদিও কোন কোন গ্রাম ছিল এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি মনোজ্ঞ লেখায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন যে সপ্তগ্রামে পাল-সেন যুগের বহু মূর্তি পাওয়া যায়। উনি বলছেন যে ১২৯৮ সালে জাফরখান গাজি সপ্তগ্রাম দখল করার আগে এটি একটি বড় শহর ছিল। ত্রিবেণীঘাট-এর কাছে জাফরখান গাজির সমাধিসৌধ আছে যেটি আগে হিন্দু মন্দির ছিল বলে অনেকে মনে করেছেন। এর বাইরের দেওয়ালে আদি-বাংলায় দশ লাইন লেখা দেখা যায়। পাশে মসজিদের মধ্যে বিষ্ণু মূর্তির ভগ্নাংশ রয়েছে।

১২০৪ সালের শেষে নদীয়া আক্রমণের বহু পরে সপ্তগ্রাম জয় করা হয়। শিলালেখ থেকে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম বিজয়ের কিছু পরেই জাফরখান গাজি মারা যান। ১৩১৩ সালে ফিরোজ শাহ এখানে একটি লিপি উৎকীর্ণ করে দেন। এটাই অবশ্য সপ্তগ্রামের উপর প্রথম আক্রমণ নয়। ১২৯১ সালে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব ভাগীরথী পর্যন্ত এসেছিলেন। বোধহয় উড়িষ্যার বিজয় অভিযান বন্ধ করার জন্য বাংলার সুলতান রুখনুদ্দিন কাউখাউস-এর সময়ে সপ্তগ্রাম বিজয় করেন জাফর খান। তবে এর ফলে বাংলা-উড়িষ্যার বিরোধ মেটেনি।

ঐতিহাসিক বারানি সপ্তগ্রামের শাসনব্যবস্থার কথা বলেছেন। ১৩২৪ সালে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা বিজয় করে ইয়াসুদ্দিন আজম শাহকে মালিক হিসেবে পাঠান। উনি ১৩৪০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। বারানি বলেছেন যে তুঘলক-এর বিজয়ের আগে বাংলায় তিনটি শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল ছিল—লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম)। মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে সপ্তগ্রামে টাঁকশাল শুরু হয়, যেখান থেকে প্রথম মুদ্রা পাওয়া যায় ১৩২৯ সালে ও শেষ মুদ্রা ১৫৫২ সালে।

রুখনুদ্দিন বারবাক শাহ থেকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পর্যন্ত সাতটি শিলালেখ পাওয়া যায়। প্রথমটি ১৫৪৫ সালের যেটি ত্রিবেণীতে মসজিদ তৈরি করার কথা বলছে। ১৪৬০ সালের একটি শিলালেখতে সপ্তগ্রামের সেনাপতি ও উজিরের কথা বলা হচ্ছে। ১৪৬১ সালে সপ্তগ্রাম থেকে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহর শিলালিপি

পাওয়া যায়। এর পরে ১৪৬২ সালেও আর একটি শিলালেখ পাওয়া যায়। এগুলিতে বলা হচ্ছে যে সজলা-মাখনাবাদ একটি শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রস্থল। ১৪৯২ ও ১৫০৫ সালের দুটি শিলালেখতেও ওই জায়গার নাম পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে সজলা-মাখনাবাদ সরকারের অংশ ছিল সপ্তগ্রাম। ১৫০৫ সালের শিলালেখ থেকে পরিষ্কার যে সজলা-মাখনাবাদের সেনাপতি ও উজিরের হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল।

১৫৯৫-৯৬ সালে লেখা আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরিতে* সপ্তগ্রামকে উনিশটি সরকারের মধ্যে একটি বলে বলা হয়েছে। সপ্তগ্রাম সরকারের মধ্যে ৫৩টি রাজস্ব মহাল ছিল যার অধিকাংশই ছিল গঙ্গার পূর্ব দিকে। এই মহালগুলি থেকে বলা যায় যে সপ্তগ্রাম সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ থেকে হাতিয়াগড় (বর্তমান ডায়মন্ডহারবার-এর নীচে) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার প্রায় সবটাই এই সরকারের মধ্যে ছিল। পূর্বে এটি ছিল যশোর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই সরকারের বার্ষিক আয় ছিল চার লক্ষ আঠারো হাজার একশো আঠারো টাকা (৪,১৮,১১৮) যার মধ্যে ছিল বন্দরের আয় ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) টাকা।

এটা খুব পরিষ্কার যে ১২৯৮-এর আগে সপ্তগ্রামে শহর শুরু হয়ে যায়। ত্রিবেণীকে যদি সপ্তগ্রামের অংশ হিসেবে দেখা যায়, তা হলে এটা প্রধানত তীর্থশহর হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু শুধু তীর্থশহরকে প্রকৃত অর্থে শহর বলা যায় না। টাঁকশাল হবার পর শহর হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বণিক ও ব্যাপারিরা বসবাস শুরু করেছিল। কিন্তু আমরা শিলালেখ পেতে শুরু করি পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, যখন থেকে সাহিত্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে সপ্তগ্রাম একটা বর্ধিষ্ণু শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নীহাররঞ্জন রায় ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দকে সপ্তগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে ধরেছেন। কিন্তু কেন পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই উত্থান? এর জন্য বোধহয় ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এর মধ্যে ভূগোলের গুরুত্ব রাজনৈতিক/সামাজিক গুরুত্বের থেকে কম বলে মনে হয়।

আমরা দেখেছি যে আরবরা অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হরিকেল ও সমন্দর-এর উল্লেখ করেছেন যেগুলি চট্টগ্রামের অন্য নাম বলে সাধারণত ধরা হয়। এরা কেউই ভাগীরথীর মোহানার কথা বলেননি। ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন রাজ্যগুলির সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়। চট্টগ্রাম ১৩৩৮-৩৯ সালে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহর অধীনে ছিল। ১৩৪২ সালের পর ইলিয়াস শাহর অধীনে আসে।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আরাকান মধ্য ও দক্ষিণ চট্টগ্রাম দখল করে নিলে বাংলার সুলতানদের সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। কিন্তু পাণ্ডুয়ায় রাজধানী থাকলেও চট্টগ্রামই ছিল প্রধান বৈদেশিক বন্দর। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিনা দূতরা চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পাণ্ডুয়াতে যান। সপ্তগ্রাম বন্দরের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় না। এটা পরিষ্কার যে বৈদেশিক বাণিজ্যের বন্দর হিসেবে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব ছিল না। গৌড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজধানী স্থানান্তরিত হলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে চট্টগ্রামে রাজনৈতিক গোলমাল বেড়ে যায় প্রধানত আরাকান ও ত্রিপুরার আক্রমণের ফলে। আরাকান আক্রমণের পরে পরেই ত্রিপুরার আক্রমণ হতে থাকে। বাংলা, আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চট্টগ্রামকে ঘিরে চলতে থাকে। এই গোলমালের ফলে ভাগীরথীর গুরুত্ব বাড়তে থাকে ও সপ্তগ্রাম প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্য বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। চট্টগ্রামের গুরুত্ব বাংলার কাছে আরও কমতে থাকে যখন ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম কিছু সময়ের জন্য দখল করে নেয়। সুতরাং রাজনৈতিক গোলযোগই সপ্তগ্রামের উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

কোনও কোনও পণ্ডিত বলেছেন যে এই সময়ে ভাগীরথীর জল বেড়ে গিয়েছিল যার ফলে পদ্মার থেকে ভাগীরথীর জল এই সময়ে বেশি হত। এর ফলে ভাগীরথী দিয়ে বড় জাহাজ সহজে যেতে পারত। এই ধরনের যুক্তি কার্য-কারণকে সরলীকরণ করে দেয়। এর কোনও প্রমাণ বা সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। প্রথম দিকের লোপো হোমেনের রেখাচিত্র (১৫১৯) ও কিছু পরের জোয়াও দ্য বারোসের রেখাচিত্র (ছাপা ১৬১৫) থেকে দেখা যায় দুটি নদীরই জল প্রায় সমান—বরঞ্চ পদ্মার জল কিছু বেশি।

সরস্বতী প্রথম দিকে রূপনারায়ণ বা দামোদরের খাতে বইত বলে বলা হচ্ছে। কবে থেকে অন্য খাতে বইতে শুরু করল, এটা জানা যায় না। সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম থেকে সরস্বতী সরে আসছে বলে ধরা যেতে পারে কারণ তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন ওই সময়ে শুরু হয়েছিল। এর পরের ছবিটা আমরা পাই যে সরস্বতী ত্রিবেণী মুখ থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীর সমান্তরাল হয়ে দক্ষিণে এসে বেতোড়ের কাছে মিলিত হয়েছে। এই চেহারা আমরা আজও দেখি।

প্রশ্ন এই যে যদি সরস্বতী ভাগীরথীর সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে, তা হলে ভাগীরথী নদী মাল চলাচলের জন্য ব্যবহার না করে সমান্তরাল সরস্বতী ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? একটা হতে পারে যে বন্দর বলতে যা বোঝায়, সেটি সরস্বতীর উপরে ছিল, ত্রিবেণী নয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের লেখা মুকুন্দরামের সওদাগর ত্রিবেণীতে নৌকো বাঁধলেও (সপ্তডিঙা) বাজার করতে সপ্তগ্রামে আসছে। সপ্তগ্রাম যে বড় বাজারের আড়ত ছিল, তার প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ফরাসি পরিব্রাজকের লেখায় পাওয়া যায়। ১৫০৫ সালের একটা শিলালেখ থেকে দেখা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর মধ্যে যাতায়াতের সুবিধের জন্য একটা সাঁকো করে দিয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষেই শহর সপ্তগ্রাম, বন্দর ও ত্রিবেণীর মধ্যে সংযোগ হয়ে গিয়েছিল—অর্থাৎ শহর সপ্তগ্রাম বর্তমান ভাগীরথী বলতে যা বোঝায় তার দিকে এগিয়ে চলেছিল। অন্য দিকে জনবসতির চাপে সরস্বতীর দক্ষিণ পাড় ধরে শহর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে বেড়ে যাচ্ছিল। সমসাময়িক বাংলা কাব্যে আমরা প্রথম গতির আভাস পাই। পুরনো ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা দ্বিতীয় গতির ধারণা করতে পারি।

বৈষ্ণবের মঠগুলি ছিল ভাগীরথীর পাড়ে যেখানে সরস্বতী বাঁক নিয়ে দক্ষিণে চলেছে। এখানে পাওয়া যায় উদ্ধারণ দত্তর মঠ ও কিছু পরে রঘুনাথ দাসের মঠ।

আরও দক্ষিণে গেলে সরস্বতীর পাড়ে পাওয়া যায় জাহাজের সাজসরঞ্জাম, এমনকী মুদ্রাও। এগুলি বর্তমানে আদি সপ্তগ্রাম (পুরনো ত্রিশবিঘা) রেল স্টেশনের কাছে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং সপ্তগ্রামের চেহারা অর্ধেক চাঁদের মতো—ভাগীরথী ও সরস্বতীর পূর্ব পাড় ধরে ছিল। কিন্তু এই শহরের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল বা জনবসতি কোনও পরিকল্পনামাফিক হয়েছিল বলে মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্বর কাজের অভাবের ফলে ভাগীরথীর পাড়ের ডিঙ্গালহাটের ধ্বংসাবশেষের কোনও আলোচনা হয়নি। ফলে সপ্তগ্রামের সম্যক চেহারা আজও আমাদের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে।

১৪৯৪ সালের বিপ্রদাস পিপলাই-এর লেখায় সপ্তগ্রাম শহরের প্রথম ছবি পাওয়া যায়। যদিও বিপ্রদাসের বেশ কিছুটা অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতরা মনে করছেন। নানান পতাকায় সজ্জিত সারি সারি বাড়ি—প্রায় প্রতিটি বাড়িই হিন্দুর, কারণ বাড়িগুলিতে মূর্তি আছে। এ সব বাড়ি থেকে পুজোর নানা রকম আওয়াজ আসছে। উল্লেখযোগ্য যে বিপ্রদাস এখানে বহু মুসলমান থাকে বলেছেন— মোগল, পাঠান ইত্যাদি। কিন্তু বিপ্রদাস বন্দরের কোনও উল্লেখ করেননি। মনে হয় যে সরস্বতী নদী যখন বাঁক নিয়ে দক্ষিণে আসছে সেখানকার কথাই তিনি বলছেন। সুতরাং সপ্তগ্রাম বন্দরের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর কাছে এটাই স্বাভাবিক বলে ধরা যেতে পারে কারণ এখানে বন্দর হলে ভাগীরথীর উত্তর দিকের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি হবার সম্ভাবনা।

বন্দরের কথা বলেছেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগিজ লেখক টোমে পিরেজ, যদিও উনি বাংলাতে আসেননি। উনি বলছেন যে এখানে ভাল বন্দর আছে এবং এর মুখ দিয়ে ঢোকাও সহজ—অর্থাৎ একটা খাঁড়ি আছে। একমাত্র ভাগীরথীর মুখেই এরকম খাঁড়ির চেহারা পাওয়া যায়। এখানে প্রায় দশ হাজার লোক বাস করে যার মধ্যে বহু ধনী বণিক আছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দর কবিতায় ওই একই ছবি পাওয়া যায়। যদিও ওঁরা বন্দরের কথা বলেননি, কিন্তু ধনী বণিকের কথা বলেছিলেন। এ সব ধনী বণিকের বাড়িতে চৈতন্য এসেছিলেন।

১৫৩০-এর দশকে পর্তুগিজরা বাংলায় ভাগীরথী দিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের বড় জাহাজ আর সরস্বতী নদী দিয়ে আসতে পারে না। জাহাজগুলি বেতোড়ে রেখে ছোট নৌকো করে মাল নিয়ে সপ্তগ্রামে আসতে হত। ১৫৩৫ সালে সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে কুঠি বানানোর অধিকার দেন। পরের বছর পর্তুগিজরা চলে গেলেও, ১৫৫৫ সাল নাগাদ তারা আবার ফিরে আসে।

১৫৬৭ সালে সিজার ফ্রেডারিকি সপ্তগ্রামে আসেন। তখনও তিনি দেখেছেন যে বড় পর্তুগিজ জাহাজ বেতোড়ে থামছে, যদিও তিনি সপ্তগ্রাম বন্দরে ৩০ থেকে ৩৫টা জাহাজ দেখেছেন। ১৫৭৯ সালে পর্তুগিজরা আকবরের ফরমান নিয়ে হুগলিতে কুঠি শুরু করে। কিন্তু এতেও সপ্তগ্রাম শহরের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ১৫৮৩ সালে পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ সপ্তগ্রামকে সমৃদ্ধশালী শহর বলেছেন— কোনও জিনিসের অভাব এখানে নেই। এই একই কথা বলেছেন ১৫৭৫ সালের ফরাসি ভ্রমণকারী ল্য ব্লাঁ। বহু মন্দিরে পুজো হতে দেখেছেন ও বাজারে জিনিসপত্র খুব সস্তা। অভিজাতদের অনেক বাড়িও তিনি দেখেছেন। কিন্তু এঁরা কেউই আর বন্দরের কথা

বলছেন না।

এটা খুব পরিষ্কার যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই সপ্তগ্রাম-এর কাছে সরস্বতী নদী মজে আসছিল। মনে হয় ভাগীরথীর সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ ছিন্ন হয় বেতোড়ের কাছে। পরবর্তী যে ইউরোপীয় রেখাচিত্র পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে এই সংযোগ আর নেই। কিন্তু ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ আরও কিছুকাল ছিল বলে মনে হয়। ১৬২০ সালে পাটনা থেকে লেখা ইংরেজ কুঠিয়ালদের দুটি চিঠি থেকে বোঝা যায় যে সপ্তগ্রামে পর্তুগিজরা তখনও ব্যবসা করছে। সুতরাং বলা হয় যে ১৫৭৯ সালের হুগলি কুঠি তৈরি হবার পর সপ্তগ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছিল, এটা মানা যায় না। ১৬৩২ সালে মোগলরা হুগলি দুর্গ দখল করে পর্তুগিজদের হঠিয়ে দিলে, সরকারি দপ্তর, শুল্ক বিভাগ ইত্যাদি সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে চলে আসে। এর পরই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সপ্তগ্রাম-এর ইতিহাসে ক্রান্তিকাল আগেও এসেছে। চৈতন্যর সমসাময়িক বাসুদেব ঘোষ তাঁর কড়চাতে সপ্তগ্রামের বণিকদের উপরে একটি অধ্যায় লিখেছেন। বহু ধরনের অধিবাসী সপ্তগ্রামে বাস করত যার মধ্যে ছিল কবিরাজ, তাঁতি, নাপিত, প্রায় সব ধরনের পেশার লোক, দোকানদার, বণিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। বণিকদের তিনটে জাতের কথা পাওয়া যায়—সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও কংসবণিক। এদের মধ্যে সুবর্ণবণিকদের কুলজি পাওয়া যায়; যদিও এই ধরনের কুলজি গ্রন্থ অনেক সময়ে পরবর্তীকালের রচনা। এই কুলজি গ্রন্থে আগেকার একটি সমাজের কথা পাওয়া যায়, যাকে কর্জনা সমাজ বলা হত। সমসাময়িক কবিদের লেখায় এই কর্জনা সমাজের উল্লেখ আছে। এই কুলজিতে বলা হচ্ছে—১৫১৪-১৫ সাল নাগাদ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এই সমাজের বণিকদের উপর অত্যাচার করছিলেন। এর কিছুটা সমর্থন মেলে টোমে পিরেজের লেখায়, যেখানে তিনি বণিকদের উপর আমলাদের জোরজবরদস্তি করে বেশি শুল্ক নেবার কথা বলেছেন। এই ধরনের অত্যাচারের একটা কারণ হতে পারে যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নিজে ছিলেন বণিক এবং নিজের জাহাজও ছিল, যেগুলি পর্তুগিজদের আক্রমণে মালাক্কাতে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সুলতান চাইবেন যে অন্যান্য বণিকদের আমদানি করা মালের উপর শুল্ক যেন বেশি হয়।

সুবর্ণবণিকরা ছিল কর্জনা সমাজের অঙ্গ এবং কিছুকাল পরে কর্জনা সমাজ ভেঙে দুটুকরো হয়ে যায়। এই সমাজ ভাঙা হয়েছিল বাংলায় পর্তুগিজদের প্রথম আসার সময়ে, যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে পর্তুগিজদের বাংলায় বাণিজ্যিক অধিকার পাবার বিষয়েই এই ভাঙন ধরে। এটা আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে সুবর্ণবণিকদের পরম্পরায় সমুদ্রযাত্রার কোনও নিদর্শন নেই। এক দিক থেকে এটা সমগ্র সপ্তগ্রাম বণিক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। মুকুন্দরাম পরিষ্কার লিখছেন যে সপ্তগ্রামের বণিকরা কোথাও না গিয়ে সপ্তগ্রামে বসেই ব্যবসা করছে—অর্থাৎ এরা বিদেশি বণিকের বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। সমকালীন পর্তুগিজ দলিল থেকেও দেখা যায় যে বিদেশি বাণিজ্য প্রধানত আরব, তুর্কি, পারসিক ও ভারতের অন্য জায়গার বণিকদের হাতে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল বাঙালি বণিকদের, যাদের

নামের তালিকা আমরা মুকুন্দরামের রচনায় পাই।

১৫৩০ সাল নাগাদ সপ্তগ্রামের পতন শুরু হচ্ছে বলে বলা যায়। পর্তুগিজ জলদস্যুরা ভাগীরথীর মোহানায় আক্রমণ করছে। বেতোড়ের উপর সরস্বতী দিয়ে বড় জাহাজ আসতে পারছে না। শের শাহ ও হুমায়ুনের গৌড় আক্রমণ করার পর রাজধানীর রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে। কিছু পরে উড়িষ্যার রাজার আক্রমণ ও মোগল-পাঠানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ভাগীরথীর উত্তর ভাগ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ফলে রাজধানীর প্রধান জোগানদার হিসেবে সপ্তগ্রামের ভূমিকার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীভূত রাজধানীর বদলে এখন ভাগীরথীর তীরে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠছে। এই টালমাটাল অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। সপ্তগ্রামের বণিকরা ততদিনে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ওই সব ছোট শহরে বসবাস করতে শুরু করেছে সপ্তগ্রাম ছেড়ে যার ফলে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ ইত্যাদি ছোট শহরগুলি বড় হতে শুরু করে। সপ্তগ্রামের পতনের সঙ্গে শুধু হুগলি নয়, এইসব ছোট শহরের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যেটি আমরা ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের ইতিহাসের মধ্যে দেখব।

৬.৬ ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ (নদীয়া)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর, নদীয়ার আর কোনও খবর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের মুদ্রায় একবার নদীয়ার খাজনা উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় শহরের কাজকর্ম আবার চালু হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিদের লেখায় আমরা আবার নদীয়াকে পাই। ওইসব লেখা থেকে আমরা শহরের ছবিটা পেতে পারি।

চৈতন্যর বাবা-মা যখন পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সিলেট থেকে আসেন তখন নদীয়া একটা ছোট বিশ্ববিদ্যালয় শহর। বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন যে সিলেটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যার জন্য ওঁরা গঙ্গাতীরে এই ছোট শহরকে বেছে নেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ওই সময়ে গৌড় ও সপ্তগ্রামেও জনবসতি বেড়ে যাচ্ছিল। বলা যায় যে পূর্ববঙ্গে সুলতানি শাসন শিথিল হয়ে যাবার ফলে নানা ধরনের অরাজকতা দেখা দেয়, যার মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে লড়াই উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই ভাগীরথীর বাণিজ্য গুরুত্ব বাড়তে থাকে সেটা আমরা আগে দেখেছি। নবদ্বীপকে ওঁদের বেছে নেওয়ার আর একটা কারণ হল যে সিলেট থেকে আগেই কিছু লোক নবদ্বীপে এসে বসতি করেছিল। সুতরাং শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষই ওঁদের চলে আসার একমাত্র কারণ নয়। বলা বাহুল্য যে ওঁরা এসে সিলেটের লোকেদের পাড়াতে বসতি স্থাপন করেন। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন শহরের লোকেরা এসে বিভিন্ন রাস্তায় বসতি করছিল। এর মধ্যে কটক থেকে আসা কিছু লোকও ছিল যাদের সঙ্গে চৈতন্যর

পরবর্তীকালে গোলমাল হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে যার পরিসমাপ্তি শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর হাইকোর্টের রায়ে শেষ হয়। আমরা আগে দেখেছি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর নদীয়া ছিল গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। কিন্তু গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে ওই সময়কার কিছুই আর নেই একটিমাত্র পঞ্চরত্ন মন্দির ছাড়া, যেটিকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ছিল গঙ্গার পূর্ব পারে। ১৬৬০ সালের ভ্যান ড্যান ব্রুক-এর রেখাচিত্রে নবদ্বীপকে গঙ্গার পূর্ব পারে দেখানো হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জেমস রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮৬ সাল) নবদ্বীপকে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে দেখানো হচ্ছে। বর্তমানে দুই পারেই নবদ্বীপ শহর। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ এখনকার অবস্থার থেকে ভিন্ন ছিল। ১৬৬০ সালের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে জলঙ্গি নদী আরও দক্ষিণে গিয়ে অম্বিকা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে— এখনকার মতো ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত নয়। সুতরাং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর নবদ্বীপে এলাকা অনেক বেশি ছিল এটা বলতে দ্বিধা নেই।

চৈতন্যর জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। ১৮৯৬ সালে হাইকোর্ট-এর রায়ে মায়াপুরই চৈতন্যর জন্মস্থান বলে বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ এ অবস্থানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালি নবদ্বীপ পুরনো গঙ্গার (আদি গঙ্গার) পূর্ব দিকের পারে আরও দক্ষিণে ছিল বলে বলেছেন। আদি গঙ্গাতে এখন জল না থাকলেও নবদ্বীপের অধিবাসীরা তাঁদের ধর্মীয় কাজকর্ম এর পাড়েই সম্পন্ন করেন। ক্রমশ পশ্চিম পাড়ে বসতি শুরু হলে পর মনে হয় যেন নদী শহরকে ভাগ করে চলেছে।

১৫৩০ দশকের লেখক চূড়ামণি দাস গঙ্গার দু কূলে প্লাবন হচ্ছে বলেছেন। ক্রমশ গঙ্গা পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে যেতে থাকে যার ফলে পুরনো শহরের অনেকটাই গঙ্গার গর্ভে চলে যায়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শীতলামঙ্গল-এর লেখক পূর্ব পারে নবদ্বীপকে রেখেছেন। মুকুন্দরাম শান্তিপুরকে গঙ্গার পূর্ব পারে রেখেছেন যার ফলে নবদ্বীপও, ওঁর মতে, পূর্ব পারে চলে যায়। মনে হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত নদী তার পুরনো খাতে অর্থাৎ আদি গঙ্গার খাতে বইছিল। মায়াপুরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিদের লেখায় জলঙ্গি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। বলা যায় যে জলঙ্গি নদী তখন অনেক দূরে ছিল। ১৭৬৫ সাল নাগাদ ইংরেজ হলওয়েলের বর্ণনা ও রেখাচিত্র থেকে বলা যায় যে জলঙ্গি আরও পশ্চিম দিকে সরে আসছিল। এর ফলে কিছু উত্তরে জলঙ্গি ও ভাগীরথীর মিলন হয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের চেহারা ছিল দ্বীপের মতন। উত্তরে ও পশ্চিমে ছিল ভাগীরথী ও দক্ষিণে কিছু দূরে ছিল জলঙ্গি নদী। সমকালীন লেখকদের লেখা থেকে মনে হয় যে শহরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দক্ষিণে, কুলিয়ার বিপরীত দিকে। ভাগীরথী ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে গেলে পশ্চিমে নতুন জমি বেরিয়ে আসে যেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শহরে পরিণত হয়। এর মধ্যে রামচন্দ্রপুর পড়ে, যেখানে বিভিন্ন

জায়গায় কালো ব্যাসাল্ট পাথরের থাম ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রাক্-সুলতানি যুগের।

সমকালীন সাহিত্য থেকে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর শহরের চেহারাটি পাই। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যের নগর পরিক্রমার বর্ণনা আছে। যদিও বিভিন্ন লেখকের মধ্যে কিছু তফাত আছে। এর থেকে শহরের কোন অংশে কী ছিল সেটা বলা যায়।

শহরের উত্তর দিকে সিমুলিয়া, যেখানে কাজির বাড়ি ছিল বাগান ও দেউড়ি সমেত। মনে হয় ওখানে কয়েক ঘর মুসলমান বাস করত যার জন্য কাজির প্রয়োজন হয়েছিল। উত্তর বা দক্ষিণে কোনও দেওয়াল ছিল না। কিন্তু উত্তর থেকে ভাগীরথী নদী বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গিয়েছে যার ফলে শহরের উত্তর ও পশ্চিম নদী দিয়ে ঘেরা। কুলিয়া ও নবদ্বীপের মাঝখান দিয়ে ভাগীরথী গিয়ে দক্ষিণে জলঙ্গির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তবে সেটা বোধহয় পরবর্তীকালের কথা।

পশ্চিম দিকে আমরা চারটে ঘাটের কথা পাই শহরের মধ্যে। একটির থেকে আর একটির দূরত্ব বেশি নয় এবং সবগুলোই ছিল বাঁধানো। এর মধ্যে একটিকে বলা হত চৈতন্যর ঘাট, যার কাছে ছিল চৈতন্যর বাড়ি। ছোটবেলায় চৈতন্য এই সব ঘাটেই সাঁতার কেটে স্নান করতেন অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে। নদী মনে হয় বিশেষ চওড়া ছিল না এবং চৈতন্য ও অন্যান্য ছেলেরা সাঁতার কেটে ওপারে যেতেন। নবদ্বীপ ছিল রাঢ়-এ এবং ওপারকে বঙ্গ বলা হত।

চৈতন্যর ঘাটকে পরবর্তীকালে বলা হত প্রভুর ঘাট। এখান থেকে প্রধান পথ ধরে শহরের অন্যান্য জায়গায় যাওয়া যেত। এটাই শহরের ভাল জায়গার অন্যতম এবং চৈতন্যর বাবা-মা এখানে বাড়ি কেনেন। ওঁদের বাড়ির চেহারা পাওয়া গিয়েছে যার থেকে মনে হয় যে ওঁরা বড়লোক ছিলেন। পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামের বণিকরা এলে জায়গাটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।

প্রধান পথ থেকে শহরের মধ্যে অনেক আঁকাবাঁকা গলি চলে গিয়েছিল। অর্থাৎ লোকেরা বসতি করার পর পথ তৈরি হয়েছে এবং কোনও পরিকল্পনামাফিক শহরটা তৈরি হয়নি। ছোটবেলায় চৈতন্য পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। নদীর ধারে অন্যদের বাড়ি ছিল। প্রথমে শুক্লাবর ব্রহ্মচারীর বাড়ি। এর পরে গদাধর পণ্ডিত বাস করতেন, যার পরে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাসা। এর সঙ্গে ছিল চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির। এই মণ্ডপে ছেলেদের পড়ানো হত। এর পরে ছিল বারকোনা ঘাট। এর থেকে কিছু ভিতরে ছিল কবিরাজ মুরারি দাসের বাড়ি। ইনি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর কবিরাজ ছিলেন। এর বাবা নারায়ণ দাস ছিলেন সুলতান বারবক শাহর কবিরাজ। চৈতন্যর বাড়ির পাশে অন্যান্য বৈষ্ণবদের বাসা ছিল। চৈতন্য এদের বৈষ্ণব করেন।

প্রধান পথ গঙ্গার ধার দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গিয়েছে। এর পরে পূর্ব দিকে গঙ্গার ধারার সঙ্গে ঘুরে সিমুলিয়াতে কাজির বাড়ির সামনে পৌঁছেছে। এর পরে আরও পূর্বে গিয়ে শ্রীধরের কুঁড়েঘরের সামনে দিয়ে আবার গঙ্গার কাছে চলে এসেছে। কাজির বাসা পেরোলে আমরা কারিগরদের এলাকা পাই। কাজির বাড়ির পরেই ছিল তাঁতিপাড়া ও এর পরে শ্রীধরের কুটির, যেটি প্রধান পথ থেকে একটু

ভিতরে ছিল। এর কাছেই ছিল মদের দোকান। আরও পূর্ব দিকে গেলে পরপর তিনটি গ্রামে যাওয়া যেত—গাধীগাছা, পারডাঙা ও মাজডাঙা। চৈতন্য প্রায়ই এই গ্রামগুলির মধ্যে যেতেন। বর্তমানে জলঙ্গি নবদ্বীপ ও এই গ্রামগুলির মধ্যে বইছে। কিন্তু চৈতন্য জলঙ্গি নদী পার হননি কারণ জলঙ্গি তখন আরও দূরে ছিল। প্রধান পথ দিয়ে গঙ্গার দিকে আরও এগোলে পাওয়া যায় ফুলওয়ালি, গোয়ালা, পানের কারিগর, গন্ধবণিক ইত্যাদিদের এলাকা। কারিগরদের এলাকা সাধারণত শহরের একপাশে থাকত—এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

শহরের বাড়িগুলির বড় দরজা ও পাঁচিল ছিল। কাজির বাড়িতে দেউড়ি ও বাগান ছিল। মুরারি গুপ্তর বাড়িও ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। চৈতন্যর বাড়ি ছিল বড় এবং তাতে উঠোন ও পাঁচিল ছিল। ১৫৬০-এর দশকে জয়ানন্দ নবদ্বীপের ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন। বাড়ির দরজাগুলিতে নানা ধরনের চিত্র আঁকা। অধিকাংশ বাড়িই ইটের এবং বড় দরজা আছে। সারা শহরে নানান জায়গায় মন্দির ও পুকুর আছে। শহরে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়—সারা ভারত থেকে এ সব জিনিস আসে।

জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ছোট বিশ্ববিদ্যালয় শহর বাণিজ্যিক শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং সারা ষোড়শ শতাব্দী ধরেই নবদ্বীপ বেড়ে চলছিল। আমরা আগে দেখেছি যে একদিকে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার ও অন্য দিকে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ভাগীরথীর নীচের অংশে শহর বাড়ছে। একই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই কাটোয়া, পানিহাটি, শান্তিপুর, খড়দহ, ফুলিয়া ইত্যাদি শহরে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজ বণিক মাস্টার নবদ্বীপের উল্লেখ করেছেন। ১৭১১ সালে ঘনারাম চক্রবর্তীও নবদ্বীপ বড় শহর বলে অভিহিত করেছেন। প্রধানত তাঁতের উৎপাদন ও তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে শহরগুলির বাজার বড় হতে থাকে। চৈতন্যর প্রচেষ্টায় উৎপাদনকারী ও বিক্রেতার মধ্যে জাতিগত ব্যবধান কমে গেলে শহর প্রসার লাভ করে বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য কারণে নবদ্বীপের বাণিজ্যিক চেহারা বদলে গিয়ে ক্রমশ ধর্মীয় চেহারা নিলে শহরের চেহারাও বদলে যায়।

৬.৭ যশোহর

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে গৌড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেশি বেড়ে যায় মোগলদের বাংলা বিজয় করার পর। মনে হয় পুরনো আফগান অভিজাত ও সরকারি কর্মচারীরা পূর্ববাংলায় চলে গিয়েছিলেন যার ফলে পূর্ববাংলায়, বিশেষত উপকূল অঞ্চলে জনবসতি বেড়ে যায়। এদের মধ্যে সবগুলি শহরে রূপান্তরিত হয়নি—অনেকগুলিই ছিল কসবা জাতীয়—বাজার-শহর। প্রধানত কাপড়, চাল, চিনি ও মোম ইত্যাদি উৎপাদন করে রপ্তানি করা হত যার জন্য পর্তুগিজ বণিক ও

অন্যান্য ভারতীয় বণিকরা আসতেন। এ সব শহর গৌড় শহরের মতো পাঁচিলঘেরা শহর নয়—গ্রাম ও শহরের পরিষ্কার কোনও বিভাজন নেই। কিন্তু ভাগীরথীর তীরের শহরগুলির সঙ্গে এই সব বাজার-শহরের বড় তফাত রয়েছে। পূর্ববাংলার এলাকাগুলিতে জনবসতির প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন ওখানকার জমিদাররা। এঁরাই লোক বসিয়ে জঙ্গল কেটে শহর বসাতেন—ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন। এই ধরনের জমিদারের কথা আমরা ভাগীরথীর তীরে উঠতি শহরগুলির মধ্যে পাই না। যদিও সেখানে উৎপাদন ও বিক্রিই ছিল শহর গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলার এই বাজার-শহরগুলির মধ্যে কোনও একটা ধর্মের প্রাধান্য পাই না—বহু ধর্ম এমনকী খ্রিস্টান ধর্মকেও অন্তত কিছু সময়ের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাকলা (পরবর্তীকালে বাখরগঞ্জ) ও যশোহর। আমরা প্রধানত যশোহর শহরের চেহারা দেখব—কারণ কালক্রমে বাজার-শহর থেকে যশোহর বড় শহরে রূপান্তরিত হয়েছিল যার ইতিহাসের আকর পাওয়া যায়।

নদীয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে সেন রাজবংশ পূর্ববাংলায় চলে আসেন বলে ধরা হয়। লক্ষ্মণসেনের পরবর্তীকালে কেশবসেন বাকলাতে বসবাস করতে থাকেন যদিও বাকলা তখন শহর হিসেবে ইতিহাসের পাতায় আসেনি। ১৪৮৪ সালে কবি বিজয় গুপ্ত বাকলার অধিবাসী ছিলেন ও বাকলার প্রশংসা করেছেন। আবুল ফজলের হিসেব অনুযায়ী বাকলা ছিল ফতিয়াবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত যার খাজনার পরিমাণ ১৫৯৪-৯৬ সালে ছিল দু লক্ষ দাম (চল্লিশ দামে সাধারণত এক রূপার টাকা ধরা হয়)। এটি সমকালীন যশোহরের খাজনার সমান ও গৌড় সরকারের এক-চতুর্থাংশ।

১৫৮৫ সালের আগে বাকলার অবস্থান ছিল তেঁতুলিয়া নদীর ধারে কচুয়াতে। আবুল ফজল লিখেছেন যে সমুদ্র খুব দূরে ছিল না। চন্দ্রদ্বীপের বিতর্কিত রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের রাজধানী কচুয়াতে ছিল বলা হয়। আবুল ফজল ১৫৮৫ সালের সমুদ্রের প্লাবনের কথা লিখেছেন। বাকলার জমিদার ছিলেন জগদানন্দ রায়ের ছেলে কন্দর্পনারায়ণ রায়। এই জলোচ্ছ্বাসের ফলে রাজধানী আট মাইল ভিতরে মাধবপাশাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৫৮৬ সালে পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ সম্ভবত মাধবপাশাতে আসেন। তাঁতের ও রেশমের কাপড় সারা দেশে হয় বলে বলেছেন। ওখানকার মেয়েরা সোনার ও হাতির দাঁতের গহনা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে বলেছেন, যেগুলি কেবল বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেই আসতে পারে। ফিচ বাকলার চওড়া রাজপথ ও দুপাশে বড় বড় বাড়ির কথা বলেছেন। ১৫৯৮-৯৯ সালে জেসুইট পাদরিরা যখন বাকলাতে আসেন কন্দর্পনারায়ণের আট বছরের ছেলে রামচন্দ্র রায় জমিদার। তাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের মেয়ের বিয়ে হবার কথা আছে। রামচন্দ্র রায় পাদরিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এমনকী গির্জা বানানোরও অনুমতি দেন। ওখানে একটা দুর্গ ছিল কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে মোগলরা আক্রমণ করলে রামচন্দ্র রায় পরাজিত হন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ছাপা জোয়াও দ্য ব্যারোসের মানচিত্রে দেখা যায় উপকূল এলাকায় পাঁচটি শহর ছিল, যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যশোহর।

ষষ্ঠদশ শতকের শেষ দিকে জেসুইট পাদরিরা বলেছেন যে যশোহর-এর রাজধানী ছিল চ্যান্ডিকান— যে নামে ওরা সারা দেশকেই অভিহিত করেছেন। এ নাম নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে, যদিও বলা হয় যে প্রাক্তন শাসক চাঁদ খান-এর জমিদারি থেকে এই নাম এসেছে। ১৬০০ সালের পেট্রিয়াস বারটিয়াস-এর মানচিত্রে দেখা যায় যে চ্যান্ডিকান-এর সীমানা ভাগীরথী নদী পর্যন্ত ছিল। পাদরিদের লেখা থেকে এর সমর্থন মেলে। পাদরিদের সময়ে প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোহর-এর জমিদার। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মোগল সাক্ষ্যে প্রতাপাদিত্যকে বাংলার প্রধান জমিদারদের অন্যতম বলে বলা হচ্ছে। উপকূল এলাকায় তিনি ছিলেন প্রধান জমিদার এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রতাপাদিত্যের বাবা শ্রীহরি ছিলেন সুলতান দাউদ কাররানির প্রধান অভিজাতদের অন্যতম ও তাঁর কোষাধ্যক্ষ। মোগল ইতিহাসে এঁর কথা পাওয়া যায়। দায়ুদের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ধনরত্ন নিয়ে যশোরে পালিয়ে এসেছিলেন বলে বলা হয়। কিন্তু ধনরত্ন নিতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ আছে। ভাগীরথী পর্যন্ত ওঁর জমিদারির সীমানা ছিল বলে ধরা যেতে পারে কারণ কলকাতার কালিঘাট মন্দিরের সঙ্গে শ্রীহরির ভাই বসন্ত রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে ধরা হয়। এমনকী বেহালার কিছু অংশও এই জমিদারির মধ্যে ছিল বলা হয়। ১৫৯৯ সালের আগেই শ্রীহরির মৃত্যু হয়েছিল কারণ ওই সময়ে পাদরিরা বলছেন যে প্রতাপাদিত্যই জমিদার।

ভাটি অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ববাংলার উপকূল অঞ্চলে যে তখন নতুন পত্তন হচ্ছে সেটা প্রত্যক্ষ করেছেন ১৬০০ সালে জেসুইট পাদরি ফনসেকা। তিনি জানুয়ারি মাসে বাকলা থেকে নৌকা করে সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যশোহর আসছিলেন। এক পাড়ে তিনি ধানের চাষ হতে দেখেছেন। অন্য পাড়ে বন্য জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বাঘ বহুক্ষণ নৌকোর পাশে পাশে আসছিল। এ ছাড়া পর্তুগিজ জলদস্যুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয় ছিল। এ সব থেকে বাঁচার জন্য উপকূলের জমিদাররা পর্তুগিজদের জায়গির দিয়ে নিজেদের জমিদারিতে বসিয়েছিলেন। যশোহরে প্রতাপাদিত্য একজন পর্তুগিজকে পুলিশের প্রধান করে বসালে পর্তুগিজ ও আফগানদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। এই পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এইসব জমিদাররা জেসুইট পাদরিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। যশোহরে তারা একটা গির্জা বানায় এবং প্রতাপ ওই গির্জাতে গিয়েছিলেন। পাদরিরা লিখছেন যে গির্জার আশেপাশের জমির খাজনা পাদরিদের দেবার জন্য প্রতাপ একটা পাট্টাও দিয়েছিলেন। প্রতাপ শুধু খ্রিস্টানদের প্রতি উদার ছিলেন তা নয়, তিনি বৈষ্ণবদের মন্দিরও করেছেন যার সঙ্গে বসন্ত রায়ের যোগাযোগ ছিল এ কথা মন্দিরের শিলালেখতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতাপের উত্থানের সঙ্গে কালীর যোগাযোগ সম্পর্কে পরম্পরা রয়েছে। কবি ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতাপকে ‘বরপুত্র ভবানীর’ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রতাপের রাজধানী কোথায় ছিল এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় সাগরদ্বীপকেই প্রতাপের রাজধানী বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু হেনরি বেভারিজ ও সতীশচন্দ্র মিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে অন্য মত দিয়েছেন। তাঁরা

যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাটকে রাজধানী বলে ধরেছেন যার সমর্থন মির্জা নাথান-এর *বাহারিস্তান ই ঘায়েবি*তে পাওয়া যায়।

মিত্র দেখাচ্ছেন যে শ্রীহরির রাজধানী ছিল ধুমঘাট থেকে কিছু দূরে মুকুন্দপুরে। এখানে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও কয়েকটা বাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়। এটি ধুমঘাট-এর দশ মাইল উত্তরে। ধুমঘাটে নতুন রাজধানী স্থাপন হবার পর এই দশ মাইল বসতিপূর্ণ হয়ে যায়। এই সব জায়গাই যশোহর নামে পরিচিত ছিল।

ধুমঘাটের দুর্গের পাঁচিলের ও বুরুজের ভগ্নাংশ সতীশচন্দ্র মিত্র দেখেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এর কাছে যশোরেশ্বরী কালীমূর্তির মন্দির। তিনি এই সব বুরুজের নীচে মাটিতে কামানের গোলা পেয়েছিলেন। দুর্গের উত্তরে যমুনা ও দক্ষিণে ইছামতী। অন্য দুটি দিকে পরিখা। পশ্চিম দিকের অঞ্চলকে কামারখালি বলা হত—লোহার কারিগরদের এলাকা। ওখান থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহার টুকরো পাওয়া গিয়েছে। প্রতাপের পতনের পর জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়—আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বসতি শুরু হয়।

দুর্গের পূর্ব দিককে রাজবাড়ি বলে। বাড়ির ধ্বংসাবশেষের চিহ্নস্বরূপ ইটের টুকরো প্রচুর ছড়িয়ে ছিল। ভিতরে পুকুর। এখান থেকে যশোরেশ্বরী মন্দিরে যাবার চিহ্ন রয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষের সামনে বারদুয়ারি যার সামনে একটা পুকুর আছে। সামনে যশোরেশ্বরী মন্দির—উত্তর দিকে প্রধান দরজা, দুপাশে বাড়ি। সামনে নাটমন্দির। মন্দিরের দক্ষিণের ধ্বংসাবশেষকে মিত্র হাবসিখানা বলেছেন। তখনও একটা অংশ দাঁড়িয়ে ছিল। এক দিকে কুয়ো। এর পাশে ঘর, যার দেওয়ালে নালি লাগানো রয়েছে। মিত্র একে হাম্মাম বা স্নানঘর বলেছেন। পরম্পরা এই যে প্রতাপের পতনের পর মোগল ফৌজদার এ বাড়িতে থাকতেন। এর পাশে কয়েকটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই বাড়িগুলির উত্তরে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে জাহাজখানা।

হাম্মামের দক্ষিণ-পশ্চিমে *টেঙ্গা* মসজিদ যা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। পূর্ব দিকে বড় উঠোন এবং চারপাশে কবর রয়েছে। মসজিদের উত্তর দিকে আটকোনা বাড়ি। হিন্দুদের মতে লক্ষ্মীর মন্দির, মুসলমানরা বলে *বিবির আস্তানা* অর্থাৎ মহিলাদের প্রার্থনা করার জায়গা। মিত্র দ্বিতীয় পরম্পরাই গ্রহণ করেছিলেন। ধুমঘাটের উত্তরে ইছামতীর তীরে একটি গির্জার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর কাছেই রয়েছে কবরখানা। একেই মিত্র ধুমঘাটের গির্জা বলে ধরেছেন যদিও এ সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন হয়নি।

ঈশ্বরীপুর ও ধুমঘাটের ধ্বংসাবশেষ দেখলে মনে হয় যে এটি সমকালীন শহরের মতো যার পাঁচিল চারপাশের জমি থেকে একে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এর ফলে রাজার যে চেহারাটা আমরা সমকালীন ইতিহাসে পাই তার সঙ্গে এর মিল আছে। অধিকাংশ দুর্গগুলি দক্ষিণে থাকায় মনে হয় যে যশোহরের প্রধান ভয় ছিল পর্তুগিজ ও আরাকান আক্রমণের। সমকালীন ইতিহাস *বাহারিস্তান* পড়লে মনে হয় যে প্রতাপ আরাকান আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন অনেক বেশি। ফলে উত্তরের দুর্গ তৈরি করা বিশেষ হয়নি যার জন্য মুঘল আক্রমণ সহজেই সাফল্য লাভ করেছিল। বাকলা এর তুলনায় অন্যরকম। ওখানে রাজধানী ও চারপাশের মধ্যে কোনও পাঁচিল সহজ

যাতায়াত বন্ধ করেনি। এই উত্তরণের ফলে যশোহরের পতনের পথ ত্বরান্বিত হয়েছিল কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়। এখানকার প্রজারা রাজার জন্য বিশেষ যুদ্ধ করেছিল এরকম প্রমাণ নেই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতাপের পতনের পর পূর্ববাংলায় মোগল নিয়ন্ত্রণ অনেক শক্ত হয়ে বসে যার সন্ধিক্ষণ থেকে ঢাকা শহরের উদ্ভব যা আমরা পরে দেখব।

৬.৮ সোনারগাঁ

সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের নামের উৎস পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। অধিকাংশ লেখকই জনশ্রুতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে মহাভারতের কালে রাজা জয়ধ্বজ-এর সময়ে এই নামের প্রথম সৃষ্টি। জনশ্রুতি আছে পঞ্চপাণ্ডব সোনারগাঁর অন্তর্গত লাঙলবন্ধু ও পঞ্চমীঘাটে এসেছিলেন। সোনারগাঁর লেখক স্বরূপচন্দ্র রায় এটা নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। এই অঞ্চলে যে সোনা পাওয়া যেত সেটি রমেশচন্দ্র মজুমদার গ্রিক সূত্র থেকে বলেছেন। কিন্তু কোথায় এই সোনারগাঁ ছিল সেটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর আগে নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। যদিও চতুর্দশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বারানির লেখায় সোনারগাঁওর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এঁরা কেউই সোনার খনির কথা বলেননি। এই নাম ছাড়া আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যার মধ্যে সুবর্ণবীথি উল্লেখ করা যায়। ফরিদপুর থেকে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর তামার ফলকে সুবর্ণবীথি কথাটি পাওয়া যায় যেটি শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রস্থল ছিল। কোনও কোনও লেখক বর্তমানে চট্টগ্রামের ধারে মগরাপাড়ার কাছে শহরটি ছিল বলে ধরেছেন। এখন অবশ্য এর কোনও অস্তিত্ব নেই। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচই একমাত্র লেখক যিনি সোনারগাঁওর অবস্থান ও বর্ণনা দিয়েছেন, যা আমরা পরে দেখব। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মুদ্রা থেকে বলা হয় যে ত্রিপুরার রাজা দেবমাণিক্য সোনারগাঁ জয় করেছিলেন, যদিও *রাজমালা*তে এর উল্লেখ নেই। বিজয়মাণিক্যের স্মারকমুদ্রাতেও সুবর্ণগ্রাম বিজয়ী বলে বলা হচ্ছে যে তিনি লক্ষ্যা নদীতে (শীতলক্ষ্যা নদী) স্নান করেছিলেন। চিনা পরিব্রাজকরা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসেছিলেন। এঁদের বর্ণনাতেও সোনারগাঁও-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আমরা পরে দেখব।

সুবর্ণগ্রাম একটা বিস্তৃত প্রাচীন ভূখণ্ডের সাধারণ সংজ্ঞা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সমকালীন রাজা প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি তৈরি করলে, সেই জায়গাই তখন সোনারগাঁ নামে পরিচিত হতে থাকে। মোটামুটি ধরা যেতে পারে যে পূর্বে মেঘনাদ নদী, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদী, উত্তর সীমায় এগারা সিন্দুর ও দক্ষিণে শীতলক্ষ্যার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রর সংমিশ্রণই সোনারগাঁর সীমানা। ব্রহ্মপুত্রের একটা ধারা ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে আর একটি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনাদ নাম ধারণ করেছে।

ব্রহ্মপুত্রের আর একটি ধারা একডালার (মালদা জেলার গৌড়-পাণ্ডুয়ার একডালার থেকে পৃথক) নীচে শীতলক্ষ্যা নাম নিয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভিন্ন ধারাগুলি ভিন্ন নামে পরিচিত। সোনারগাঁর মাঝখান দিয়ে ব্রহ্মপুত্র যাবার ফলে দুটি ভাগ দেখা যায়—পূর্ব সোনারগাঁ ও পশ্চিম সোনারগাঁ। ঐতিহাসিকদের মতে পশ্চিম সোনারগাঁ বেশি প্রাচীন এবং এটি অনেক উন্নত ও মাটি লাল রংয়ের। পূর্ব দিকের জমি বেশিরভাগই বালুময়। কালক্রমে মাঝের এই ধারা অনেক শুকনো হয়ে গিয়েছে।

বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে বা সোনারগাঁ থেকে পূর্ববঙ্গে শাসন চালাতে থাকেন। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে উনি ওঁর রাজধানীর নাম কোঙরসুন্দর দেন, যাকে আবুল ফজল কয়ারসুন্দর বলে অভিহিত করেছেন। নদীয়া বিজয়ের প্রায় একশো বছর এঁর বংশধররা এখানে রাজত্ব করতে থাকেন। ওখানকার জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রাসাদের পরিখাটি ছিল বল্লালসেনের, যার মাঝখানের জায়গাটিকে 'বল্লালবাড়ি' বলা হত। তবে কারওর কারওর মতে এই বল্লালসেন দ্বিতীয় ও সুবর্ণগ্রামের শেষ হিন্দুরাজা। প্রথম বল্লালসেন, যিনি কুলীনপ্রথা শুরু করেন বলে বিখ্যাত, রাজধানী করেছিলেন রামপালে বা বিক্রমপুরে।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী রামপালের এক মাইল দূরে পির আদমের সমাধি। এঁকেই দ্বিতীয় বল্লালসেন হত্যা করেন বলে জনশ্রুতি আছে। এই সমাধির পাশে জালালুদ্দিন ফৎ শাহর তৈরি মসজিদ (১৪৮৩ সালে তৈরি) দেখা যায়। এই বল্লালসেনকে দ্বিতীয় বল্লালসেন ধরলে ইতিহাসে সন-তারিখের গোলমাল অনেক কমে যায়।

১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে তুঘ্রিল সুলতান মুঘিসুদ্দিন নামে পূর্ববাংলার শাসনকর্তা ছিলেন এবং সোনারগাঁ তাঁর শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রস্থল ছিল। ওই সময়ে তিনি ত্রিপুরাতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন ও দিল্লিতে পাঠাতে অস্বীকার করেন। গিয়াসুদ্দিন বলবান নিজে সৈন্য নিয়ে সোনারগাঁওতে যান ও ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে তুঘ্রিলকে হত্যা করেন। সোনারগাওঁর জমিদার দনুজ রায় ওঁকে এই অভিযানে সাহায্য করেছিলেন। বলবানের ছেলে বোঘরা খান বা নাসিরুদ্দিন মাহমুদের হাতে শাসনভার দেওয়া হয়।

১৩১৮ সালে শিহাবুদ্দিন বোঘরাকে সরিয়ে দিয়ে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর রাজা হন। দিল্লি থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ১৩২৩ সালে সোনারগাঁ পর্যন্ত আসেন ও গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে বন্দি করে ফৎ খানকে সোনারগাঁর শাসনকর্তা করেন। সম্ভবত ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফৎ খান মারা যান। এর পরে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর বা বাহাদুর শাহ আবার রাজা হন। ১৩২৭ সালের মুদ্রায় উনি মুহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ বলে বলছেন। সোনারগাওঁতে এই মুদ্রা তৈরি করা হয়েছিল। এর পরে উনি আবার বিদ্রোহী হলে মুহম্মদ তুঘলক অভিযান চালিয়ে ওঁকে হত্যা করেন বলে পরিব্রাজক ইবন বতুতা বলেছেন। এর পরে সোনারগাঁওর শাসনকর্তা ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ লখনৌতির শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফকরুদ্দিন যুদ্ধে পরাজিত হলেও লখনৌতির শাসনকর্তা কাদির খানকে হত্যা করে ১৩৮৯ সাল পর্যন্ত সোনারগাঁওতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর সময়ের কয়েকটি মুদ্রায় সোনারগাঁও ও কয়েকটি মুদ্রায় মুয়াজ্জামাবাদ লেখা পাওয়া গিয়েছে। ব্লখম্যান মনে করেন যে মুয়াজ্জামাবাদ ব্রহ্মপুত্রের বিপরীত পারে সোনারগাঁওর প্রায় বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরকার সোনারগাঁওর একটা পরগনা। ১৩৬৭ সালে গিয়াসুদ্দিন বিদ্রোহ করেন তাঁর বাবার বিরুদ্ধে। যুদ্ধে বাবার মৃত্যু হলে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ উপাধি নিয়ে সোনারগাঁওতে বসেন। জনশ্রুতি যে ওঁর সমাধি সোনারগাঁওতে রয়েছে।

১৫৮২ সালে তোডরমল্লর *আসলজমা তুমার*-এর তালিকা আবুল ফজল *আইন-ই আকবরি*তে দিয়েছেন। যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত ওই গ্রন্থে দেখা যায় যে দ্বাদশ সরকারটি ছিল সোনারগাঁও। এর সীমানা ছিল ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমে, উত্তরে সিলেট ও পূর্বে স্বাধীন ত্রিপুরা। এই সরকারের মধ্যে ছিল বাহান্নটি মহাল এবং এর আয় ছিল এক লক্ষ দামের উপরে। এর বন্দরের আয় ছিল ৮২,৬৩২ দাম এবং সোনারগাঁ শহর ও আশপাশ থেকে পাওয়া যেত ৪,৫৯,৫৩২ দাম। আবুল ফজল এখানকার সাদা মসলিনের প্রশংসা করেছেন ও শহর এগারা সিন্দুরের উল্লেখ করেছেন।

১৪৩২ সালের প্রথম দিকে চিনা দূত মা হুয়ান চিন থেকে বাংলাতে আসেন ও চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁ হয়ে পাণ্ডুয়াতে যান। চট্টগ্রাম থেকে ছোট নৌকো করে সোনারগাঁতে পরিব্রাজকরা যেত তার কথা মা হুয়ান বলেছেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে নিকোলো কন্টি সারনোভেতে আসেন যাকে সাধারণত সোনারগাঁ বলে ধরা হয়। উনি বলেছেন যে এটি একটি বড় ও ধনী শহর এবং নদী এখানে এত বড় যে অপর পার দেখা যায় না। কোনও কোনও জায়গায়, এটা পনেরো মাইল পর্যন্ত চওড়া। নদীর দুপাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, বাগান ও বাগিচা আছে যেগুলিতে নানা ধরনের ফল হয়। এখান থেকে উনি বুফেতানিয়া বা চট্টগ্রামে যান ও সেখান থেকে আরাকান যান।

১৫৮৬ সালে ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ সোনারগাঁতে আসেন শ্রীপুর থেকে। শ্রীপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের উল্লেখ করেছেন। মেঘনা ও পদ্মার সংযোগস্থলে শ্রীপুর একটা দ্বীপ মতন ছিল রাজবাড়ির কাছে। পরবর্তীকালে দুটি নদী আরও কাছাকাছি চলে আসার ফলে শ্রীপুর ভেসে গিয়েছে। এর থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে সোনারগাঁ যাকে ফিচ একটা শহর বলছেন। এখানে তাঁতের কাপড় তৈরি হয় ও তাঁতের কাপড়ের আড়ত। এর জমিদার তখন ছিলেন ইশা খান। উনি যে অন্যান্য জমিদারদের প্রধান ছিলেন এবং খ্রিস্টানদের বন্ধু ছিলেন, সে কথাও ফিচ বলেছেন।

শহরের দেওয়াল ছিল না এ কথা ফিচ বলেছেন। বাড়িগুলি অন্যান্য ভারতীয় শহরের মতো মাটি ও খড় দিয়ে করা। দরজা করা আছে প্রধানত বাঘ ও শিয়ালকে *ঠেকানোর* জন্য। বহু ধনী ব্যক্তি এখানে আছে যারা নিরামিশাষী—প্রাণী হত্যা করে না বা মাংস খায় না। কোমরে একটা কাপড় ছাড়া, উর্ধ্বাঙ্গে কাপড় নেই। প্রচুর তাঁতের কাপড় এখান থেকে রপ্তানি হয় চালের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য বহু জায়গায়। উল্লেখযোগ্য যে ফিচ আবার শ্রীপুরে ফিরে

গিয়ে সেখান থেকে ১৫৮৬ সালের নভেম্বরে পেগু যান।

এটা খুব পরিষ্কার যে সুলতানি যুগের শেষ দিকের গোলমালের সুযোগে পূর্ব উপকূলের জমিদাররা বিদ্রোহী হয়েছিল এবং সহজে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে যায়নি। এই উপকূলবর্তী জায়গাগুলি প্রধানত ধনী হয়ে উঠেছিল চাল ও তাঁতের কাপড় রপ্তানি করে। এর কাছাকাছি বাকলাতে (বাখরগঞ্জ) ফিচ ওই সময়ে মেয়েদের হাঁতির দাঁতের আংটি ও রুপোর বালা পরতে দেখেছেন যেগুলি এসেছিল প্রধানত রপ্তানি থেকে। এই সব জায়গার জমিদাররা রাজকীয় মর্যাদা অনুসরণ করার চেষ্টা করেননি, প্রতাপাদিত্য ছাড়া। ফলে এদের শহরগুলির সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সম্পর্ক দেওয়ালের বাধায় ঢাকা পড়েনি এবং চারপাশের উৎপাদন জমা হচ্ছে এই সব শহরগুলিতে যেগুলিকে সহজেই বাজার-শহরের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সব শহরগুলির প্রধান কাজ ছিল প্রধানত আড়তের অর্থাৎ মাল জমা করা ও পরে সেগুলি বিভিন্ন বণিকের কাছে বিক্রি করা। তবে ফিচের বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে প্রধান বণিক সম্প্রদায় ছিল গুজরাতি বণিক যারা নিরামিষাশী। বিদেশি বণিক এখানে আছে এটা ফিচ বলেননি, যে ধরনের মন্তব্য উনি বাকলা বা যশোর (সমকালীন চ্যান্ডিকান) সম্বন্ধে বলেছেন।

ইশা খান-এর সোনারগাঁ কোথায় ছিল সেটা বলা শক্ত। স্থানীয় জনশ্রুতি একটা পুরনো বাড়িকে ইশা খান-এর বাড়ি বলে অভিহিত করে। *বাহারিস্তানে* মির্জা নাথান ইসলাম খান-এর সঙ্গে ইশা খান-এর বংশধর মুসা খান-এর লড়াইয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে বোঝা যায় যে ঢাকার কাছে এটি ছিল। আরও বোঝা যায় যে ইশা খান-এর জমিদারি ময়মনসিংহ পরগনার মধ্যে ছিল কারণ এগারা সিন্দুর, যার উল্লেখ আবুল ফজল সোনারগাঁ সরকারের মধ্যে দিয়েছেন, ছিল মুসা খানের দখলে। তবে কাত্রাভু ছিল ওঁর ভাই দায়ুদ খান-এর পরিবারের যদিও কেউ কেউ কাত্রাভু ইশা খান-এর দখলে ছিল বলেছেন। ১৬১১ সালে মুসা খান সোনারগাঁ ছেড়ে পালালে শহরটি মোগল সুবাদার ইসলাম খান-এর দখলে চলে আসে। কাত্রাভু যে সোনারগাঁ নয় সেটা বোঝা যায় পাদরি ফার্নান্ডেজের এপ্রিল ১৫৯৯-এর একটা চিঠি থেকে। উনি কাত্রাভুতে গিয়েছিলেন যেটা *মসনদ-ই আলার* (অর্থাৎ ইশা খান) রাজত্বের অংশ। এখানকার প্রায় সব অধিবাসীই মুসলমান। এ ছাড়াও এখানে বিদেশি কিছু আছে যারা আগ্রা ও লাহোরে মাল নিয়ে যায়।

১৭৮৫ সালে প্রকাশিত রেনেলের লেখা থেকে দেখা যায় যে উনি সোনারগাঁতে গিয়েছিলেন এবং দেখেছেন যে শহরটা একটা গ্রামে পরিণত হয়েছে। ঢাকার উত্থানের পর থেকে সোনারগাঁর উল্লেখ আর পাওয়া যায় না এবং মনে করা হয় যে ওই সময় থেকেই সোনারগাঁর পতন শুরু হয়েছিল। ১৮০৯ সালে বুখানন হ্যামিলটন সোনারগাঁ দেখতে গেলে স্থানীয় অধিবাসীরা বলে যে শহরটা কালাগাছি শুল্ক বিভাগের বাড়ির কিছু দক্ষিণে ছিল এবং ব্রহ্মপুত্রর জলে ভেসে গিয়েছে। মনে হয় হ্যামিলটন এখানে ভুল করেছেন। কালাগাছির দক্ষিণে ছিল শ্রীপুর শহর যেটি জলের তলায় চলে যায়।

সোনারগাঁর জঙ্গলে বহু স্তূপ ও মাটির নীচে ইটের চিহ্ন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জেমস ওয়াইজ ধারণা করেছেন যে শহরটি আগে ছিল নদীর জোয়ারের

জলের থেকে উঁচু জমিতে। শহরের মধ্যে প্রচুর খাল ছিল যার সাহায্যে নদীর জল শহরের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছিল। যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে। সোনারগাঁর মসলিন উৎপাদন যে ইংরেজদের সুতো আসার ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একথা উনি বলেছেন। তখন মাত্র পঞ্চাশটা তাঁত সোনারগাঁতে চলছে। সম্রাট ঔরংজেবের সময়ে সম্রাটের চাহিদা ছিল বছরে এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকার মতন কাপড়ের যাকে *মলবুস-ই খাস* বলা হত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রচুর পরিমাণে মসলিন কেনার ফলে এর চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সেকালের *তানজেব, আবরোয়া* বা *শবনম* যার বর্ণনা ঐতিহাসিক আবদুল করিমের লেখায় পাওয়া যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। জামদানিও আর তৈরি করা হয় না। কেবলমাত্র মখমল কাপড়ই তখন তৈরি হচ্ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মগরাপাড়া ও তার চারপাশের এলাকায় নানা মসজিদ ও সমাধি দেখা যায়। স্বরূপচন্দ্র রায় ওখানেই সোনারগাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল বলে বলেছেন। যদিও কোনও প্রমাণ কিছু নেই। বাজারের কাছে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দরবেশ পির খন্দকার মুহম্মদ ইউসুফের কবর আছে। এর কাছে তাঁর বাবারও সমাধি রয়েছে। যে মসজিদ আছে, সেটি জনশ্রুতি অনুযায়ী খন্দকার সাহেবের তৈরি। এখানে কাছাকাছি আরও বহু কবর দেখা যায়। একটি শিলালেখতে ১৪৭২ সালে জালালুদ্দিন ফৎ শাহর সময়ের বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ফৎ শাহর পরিচ্ছদরক্ষক মোকবর উদ্দৌলা এটি তৈরি করেন। এর কাছে পথের উপর ১৫০২ সালে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। খন্দকার-এর সমাধির পিছনে ভাঙা বাড়িকে নহবৎখানা ও কোষাখানা বলে ধরা হয়। এর উত্তরে গোহট্ট মহল্লায় পির সা আবদুল আলার কবরস্থান আছে। মহল্লা বাঘলপুরে পাঁচ পিরের দরগার চিহ্ন দেখা যায়। এর পাঁচশো গজ দক্ষিণ-পূর্বে মগ দিঘির পাড়ে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহর সমাধি রয়েছে। খুব সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত এই সমাধিসৌধ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। মগরাপাড়ার পূর্বে একটা ছোট মসজিদ আছে যাকে ইউসুফগঞ্জ মসজিদ বলা হয়। একটি গম্বুজ দিয়ে তৈরি। এর দেওয়াল প্রায় সাড়ে ছয় ফুট চওড়া হওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এর কাছে পানাম গ্রামে কয়েকটি পুরনো সৌধ পাওয়া গিয়েছে। এর কাছে রয়েছে দালালপুরের পুল যেটিকে পুরনো সময়ে তৈরি হয়েছে বলে ধরা হয়। এখানে কোম্পানির প্রথম দিকে তৈরি পুরনো একটি বাড়ি রয়েছে। চতুষ্কোণ দোতলা বাড়িটি ইটের তৈরি। ভিতরে একটা উঠোন আছে। কাছে আমিনপুরের একটা বাড়ি কারোরি বা কর সংগ্রাহকের বাড়ি ছিল বলে ধরা হয়। এর কাছে একটা পুরনো হিন্দু বাড়ি দেখা যায় যাকে ওখানে 'ঝিকোটি' বলে। ভিতরের ইটে কারুকার্য করা। গোয়ালদির মহল্লার অধিকাংশই জঙ্গলে ঢাকা। এর মধ্যে দুটি মসজিদের চেহারা পাওয়া যায়। প্রথমটি আবদুল হামিদের মসজিদ যার শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৭০৫ সালে এটি তৈরি হয়েছিল। এর একশো গজ দক্ষিণে সোনারগাঁর সব থেকে পুরনো মসজিদ— গোয়ালদি মসজিদ। শিলালেখ থেকে ১৫১৯ সালে তৈরি জানা যায়। লাল ইটের তৈরি একটি অষ্টকোণাকৃতি চেহারা। দরজার স্তম্ভগুলি হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া। এর কাছে সাদিপুরের স্তূপ থেকে নসরৎ শাহর একটি শিলালেখ (১৫২৩

সালের) পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া পানাম গ্রামের দক্ষিণে বিরাট পুকুর দেখা যায় যাকে খাসনগর বলে। পশ্চিম দিকের ঘাটটি ইটের বাঁধানো। সম্ভবত আবুল ফজল এই পুষ্করিণীর কথাই বলেছেন যার পাড়ে বহু তাঁতি থাকত। এর জলে মসলিন সাদা হয়ে যেত।

সোনারগাঁর পুরনো দুর্গ সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি আছে যে একটা দুর্গ ও একটা মসজিদ, যার গম্বুজ লাক্ষার তৈরি, বর্তমান গ্রাম বাইদ বাজারে ছিল। এর পাশ দিয়ে বইত মেঘনা নদী। এর অবশ্য কোনও চিহ্ন এখন আর নেই। তবে জায়গাটা নদীর পারে থাকাই সঙ্গত। তোডরমল্লর *আসলজমা তুমার*-এ দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র সোনারগাঁর পশ্চিমে ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই ধারা প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল। জেমস ওয়াইজ সোনারগাঁর উত্তর-পশ্চিমে নদীর একটা শুকনো খাত দেখেছেন যেটি ছিল প্রায় চার মাইল চওড়া। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মধ্যে সংযোগকারী নদী ছিল মিনাখালি নদী। এটাই বোধহয় আগে ছিল মেঘনা যেটি নারায়ণগঞ্জ-এর বিপরীত দিকে লাক্ষ্যাতে মিলিত হত। এখানে যে ত্রিবেণী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইসলাম খান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখানে দুর্গ তৈরি করেছিলেন। সেটি ছিল মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষ্যার সংযোগস্থলে। আর একটি দুর্গ করা হয়েছিল মুন্সীগঞ্জে যেখানে ব্রহ্মপুত্রের পুরনো খাত রয়েছে। এখানেই কার্তিক মাসে বারুনি মেলা বসত। জায়গাটি ছিল যেখানে ব্রহ্মপুত্র ও বুড়িগঙ্গা মিলিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা বা ঢাকা নদী ছিল গঙ্গার পুরনো পথ। সুতরাং সোনারগাঁ ছিল ভাল জায়গায়—পশ্চিমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও পূর্বে ছিল মেঘনা। ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্রর প্রধান ধারা ভৈরব বাজারের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে এটি একটি ছোট ধারা মাত্র। সোনারগাঁর মধ্য দিয়ে বালেশ্বর খাল দিয়ে সারা বছর যাতায়াত করা যেত। সোনারগাঁর জমি, যেখানে বসতি ছিল, অনেক উঁচু ছিল, সেটা আগেই বলা হয়েছে।

১৮৪০ সালে জেমস টেইলর সোনারগাঁওর অবস্থা বর্ণনা করেন। লাক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মধ্যে সোনারগাঁ পরগনার কথা বলে উল্লেখ করেছেন। পানামকে (বা পাইনাম) উনি পুরনো সোনারগাঁ শহর বলে ধরেছেন যাকে হাভেলি সোনারগাঁ বলে বলা হত। ব্রহ্মপুত্রর খাঁড়ি থেকে এটা ছিল দু মাইল ভিতরে যেটা বিভিন্ন ধরনের গাছের জঙ্গলে ঢেকে রেখেছে। সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত যে রাস্তা শের শাহ তৈরি করেছিলেন, তারও উল্লেখ করেছেন।

আলেকজান্দার কানিংহাম ১৮৭৯-৮০ সালে সোনারগাঁও এসেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন যে মেঘনা নদীর পুরনো খাতের তিন কি.মি. উত্তরে ও বর্তমান নদীর ৫ কি.মি. পশ্চিমে, বর্তমান মেঘনা ও লাক্ষ্যা নদীর মাঝে এটি ছিল। অর্থাৎ দুটি নদীর সংযোগস্থলে থাকার ফলে এটি উত্তরের সমস্ত বাণিজ্যপথই নিয়ন্ত্রণ করত। উনিও পানামকে পুরনো সোনারগাঁ শহর বলে ধরেছেন এবং হাতিতে চড়ে গেলেও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে প্রচুর অসুবিধে হয়েছিল। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে শহর সোনারগাঁ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে জঙ্গলে ঢেকে যায়। বর্তমানে অবশ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি হবার ফলে পুরনো সোনারগাঁর চেহারা দেখা যায়।

চট্টগ্রাম সড়কে মগরাপাড়ার মোড় থেকে কিছু উত্তরে গেলে খাসনগর দিঘি পাওয়া যায়। এর কিছু পরে ইশাপুর গ্রাম যেখানে স্থানীয় জমিদারের ঔপনিবেশিক সময়কালের বাড়ি দেখা যায়। একে সর্দারবাড়ি বলা হয়। সর্দারবাড়িটি পরিখা দিয়ে ঘেরা এবং স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এর পাশে যে ভাঙা পুরনো বাড়ি আছে, সেটিকে ইশা খান-এর বাড়ি বলে ধরা হয়। খাসনগর দিঘিই তাঁতিদের মসলিন কাপড় জলে ধুয়ে সাদা করার পুকুর। আগে এই এলাকার নাম ছিল *কয়রাসুন্দর,* যেটিকে আবুল ফজল *আইন-ই আকবরিতে* উল্লেখ করেছেন। বল্লালসেন দ্বিতীয়র রথ এই দিঘির পাশেই ছিল বলে কেউ কেউ বলেছেন। এর আশেপাশেই তাঁতিদের বসতি ছিল বলে অনুমান করা হয়।

সর্দারবাড়ির আধমাইল উত্তরে পানাম শহরের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। প্রধান সড়ক থেকে এক খিলানের একটা ছোট পুল বেরিয়ে আসতে হয়। এর পরে পানাম-এর প্রধান সড়ক পশ্চিম থেকে পূর্বে গিয়েছে উত্তর দিকে একটা বাঁক নিয়ে। এর পর রাস্তাটা সোজা পূর্বে চলে গিয়েছে। এই রাস্তার দুপাশে বাড়িগুলি প্রধানত দোতলা; তবে কয়েকটা একতলা বাড়িও রয়েছে। এই রাস্তাটি গিয়ে পানাম বাজারে পড়েছে। পুল থেকে বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি আধমাইল লম্বা। যে কয়েকটি বাড়ি রয়েছে সেগুলি সবই প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর। ওয়াইজ একটা শিবমন্দির ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখেছিলেন যার অস্তিত্ব এখন আর পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকেদের মতে পূর্ব দিকের প্রান্তের কাছে এই মন্দিরটি ছিল।

পানাম শহরের চারপাশ খাল দিয়ে ভরা। রাস্তার দুধারে সমান্তরাল দুটি খাল চলে গিয়েছে। পুলের নীচে আর একটা খাল পশ্চিম দিক থেকে এসে মিলেছে। পানাম বাজারের পাশ দিয়ে পূর্ব দিকের খালটি উত্তর-দক্ষিণ পথটি ভাগ করে চলে গিয়েছে। উত্তর দিকের খালকে বলে *পঙ্খীরাজ খাল*। এটি ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখা নদী থেকে জল নিয়ে মেঘনা নদীতে পড়েছে। এই খালগুলি থেকে মনে হয় যে এগুলি শহরের সুরক্ষার জন্য করা হয়েছিল এবং শহরের জলের সমস্যাও মেটাত। এগুলি থাকার জন্যই হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এখানে আবার জনবসতি গড়ে ওঠে যেটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত ছিল।

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক দিয়ে মগরাপাড়ার মোড়ের আধমাইল আগে খালের উপর ছোট একটা পুল পাওয়া যায়। এই পুলের বাঁ দিকে একটা ছোট মসজিদ দেখা যায়। এটি বারি মজলিস গ্রামের ভিতর। এর দরজার শিলালেখ থেকে জেমস ওয়াইজ এটি ১৭৬৮ সালে তৈরি বলে ধরেছেন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এটির পুনর্মূল্যায়ন করে ১৭৩৮ সালে তৈরি বলে স্থির করেছেন। ইংরেজ কোম্পানির কাপড় পরীক্ষক শেখ গরিবুল্লা এটি তৈরি করেছিলেন।

মগরাপাড়ার মোড়ের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনটি গ্রাম দেখা যায়—নগর সাদিপুর, গোহাট্টা ও দমদমা। মেনিয়াখালি নদী এর দক্ষিণে বয়ে চলেছিল। এর থেকে একটা খাল উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়েছে, যাকে বলা হত *বরাশরের খাল*। এটি দমদমার পশ্চিম দিকে গিয়ে সাদিপুরের দরগাবাড়ি এলাকা ছেড়ে বারি মজলিসে গিয়েছে। এই খালটি পাইনাম ও মগরাপাড়ার মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে।

দমদমাকে সাধারণত দুর্গ বলে স্থানীয় লোকেরা অভিহিত করে এবং বলে একটা দেওয়াল দিয়ে এটা ঘেরা ছিল। এর অবশ্য কোনও চিহ্ন বর্তমানে নেই। এর উত্তর ও দক্ষিণে পরিখা দেখা যায়। দমদমার মধ্য দিয়ে একটা খাল রয়েছে। এর পূর্ব দিকে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটা বাড়ি দেখা যায়। দমদমার উত্তর দিকের খালটি বরাশরের খাল থেকে বেরিয়ে দরগাবাড়ি এলাকায় শেষ হয়েছে। কানিংহাম দমদমার উঁচু স্তূপকে পাহারাদারি মিনার বলে ধরেছেন।

দমদমার উত্তর দিকে সাদিপুর গ্রামে দরগাবাড়ি নামে কয়েকটি ধর্মীয় সৌধ রয়েছে। মগরাপাড়া বাজার থেকে এলে ছোট গলির মধ্যে মুন্না শাহ্-র কবর রয়েছে। এটি পেরিয়ে গেলে দরগাবাড়ির নহবতখানায় আসা যায়। এক দিকে সমাধি ও অন্য দিকে মসজিদ নিয়ে এই সৌধটি ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। বিপরীত দিকে দুজনের সমাধি পাশাপাশি দেখা যায়। মসজিদের পিছনে, কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে, একটা দোতলা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই বাড়ির মাটির নীচে কতকগুলি ঘর ছিল। এর পশ্চিম দিকে মাটির উপরে কতকগুলি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। আহমদ হাসান দানি এটিকে খন্দকারদের বাড়ি বলে ধরেছেন যার সঙ্গে ছিল মাদ্রাসা। এটির অবশ্য কোনও চিহ্ন এখন নেই। জেমস ওয়াইজ এর সংলগ্ন একটা কোষাখানার কথা বলেছেন যার চিহ্ন এখন আর পাওয়া যায় না। দরগাবাড়ির মধ্যের পুকুরে জল আসত একটা খাল দিয়ে যেটি বরাশরের খাল থেকে বেরিয়ে গোহাট্টা হয়ে এসেছে। এর উত্তর দিকে একটা মসজিদ আছে যার শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৭০০ সাল নাগাদ এটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মসজিদের ভিতরের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে এটি ১৫২২ সালে সুলতান নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহর আমলে তৈরি হয়েছিল। সুতরাং মনে করা হয় যে পুরনো মসজিদের উপরই নতুন মসজিদ করা হয়েছিল। এর পূর্ব দিকে কতকগুলি সমাধির পাঁচিলে একটা শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে যার থেকে বোঝা যায় যে সুলতান জালালুদ্দিন ফৎ শাহর সময়ে ১৪৮৪ সালে একটি মসজিদ করা হয়েছিল। সুতরাং এ জায়গাটির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দরগাবাড়ির উত্তর-পশ্চিমে গোহাট্টা গ্রাম যেখানে জেমস ওয়াইজ বড় একটা মসজিদ দেখেছিলেন। এখন আর এ মসজিদটির কোনও চিহ্ন নেই।

শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে হাজিগঞ্জ-এর বিপরীত দিকে বন্দর থানা। এখানেই হজরৎ নবির পদচিহ্ন রয়েছে বলে একে কদম রসুল বলা হয়। বাহারিস্তান-ই *ঘায়েবি*তে বলা হচ্ছে যে মাসুম খান কাবুলি এই পাথরটি বণিকদের কাছ থেকে কিনেছিলেন। বণিকরা এটি আরব দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কাবুলি এখানেই ওটি লাগিয়েছিলেন কি না, কারণ কদম রসুল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এ জায়গাটি আগে একটা দুর্গর মতন ছিল বলে মনে করা হয়। এর এক মাইল দূরে দুটি মসজিদ কাছাকাছি রয়েছে। প্রথমটি ১৪৮১ সালে ও দ্বিতীয়টি ১৫০৫ সালে তৈরি হয়েছিল। এগুলির এক মাইল দক্ষিণে শীতলক্ষ্যা খাল যাকে ত্রিবেণী খাল বলা হয়। এই খালটি গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে। ত্রিবেণী খাল ও শীতলক্ষ্যা নদীর মুখে সোনাকান্দা দুর্গ যেটি মোগলরা তৈরি করেছিল নদী দিয়ে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের ঠেকানোর জন্য। এর দু মাইল দূরে হিন্দুদের

আখড়াবাড়ি রয়েছে।

বন্দর থানা ছিল সোনারগাঁর বন্দর শহর। এই বন্দরে আসতে পারা যেত শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সঙ্গম থেকে। কিন্তু বন্দরের কোনও নিদর্শন এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধ্বংসস্তূপ থেকে মনে করা যেতে পারে যে মধ্যযুগে এটি আমলাদের দপ্তর ছিল। ১৪৮১ সালের শিলালেখ থেকে মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই জায়গাটির গুরুত্ব বাড়তে থাকে যেটি চলতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত। মসজিদগুলির অবস্থান থেকে মনে করা যায় যে জনবসতি ঘন হতে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে।

সোনারগাঁর বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছিল টাঁকশাল শহর মোয়াজ্জামাবাদ (বর্তমান মোঝিমপুর) যেটি ছিল সরকার সোনারগাঁর একটা পরগনা। এখানে যে পুরনো মসজিদ আছে সেটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সামসুদ্দিন আহমদ শাহ-র সময়ে তৈরি হয়েছিল বলে স্থানীয় বিশ্বাস। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল শাহ লঙ্গর বা শাহ আলমের দরগা। মসজিদের দক্ষিণ দিকে বাবরখানা।

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের দু মাইল দূরে দেওয়ানবাগ, যেটির নামকরণ হয়েছিল দেওয়ান মানওয়ার খান-এর নাম অনুযায়ী। ইনি ছিলেন ঈশা খান-এর নাতির ছেলে। এখানে এক গম্বুজের একটি মসজিদ আছে যদিও কার তৈরি তার কোনও প্রমাণ নেই। স্থানীয় বিশ্বাস যে এটি ঈশা খান-এর তৈরি। এর পশ্চিম দিকে কিছু দূরে উঁচু ঢিপির উপর একটা কবর আছে। এটি কার সেটি জানা যায় না। এর নীচে একটা সৌধ থাকার কথা কেউ কেউ বলেছেন। বলা হয় যে এখান থেকে ঈশা খান-এর নামাঙ্কিত একটা কামান পাওয়া গিয়েছিল যদিও তার কোনও হদিস এখন পাওয়া যায় না। মনে করা যায় যে ঈশা খান-এর সময়ে দেওয়ানবাগের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

এই সব মধ্যযুগীয় নিদর্শন থেকে বলা যায় যে মধ্যযুগে সোনারগাঁ শহর ও শহরতলি তিনটি নদীর মধ্যেকার জমির উপর ছিল। পূর্ব দিকে ছিল মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে ছিল মেনিয়াখালি নদী। উত্তর দিকে শহরটি বাড়ছিল অন্তত পঙ্খীরাজ খাল পর্যন্ত। কিন্তু ওই খালের উপর পোল থাকার ফলে মনে করা যেতে পারে যে উত্তরে শহর অগ্রসর হচ্ছিল। এমনকী মোয়াজ্জামাবাদ পর্যন্ত সোনারগাঁ বিস্তৃত ছিল এটা বলা যেতে পারে।

মধ্যযুগের শহরটি ঠিক কোথায় ছিল এটা খুব পরিষ্কারভাবে বলা বোধহয় সম্ভব নয়। জেমস টেইলর ও উইলিয়াম হান্টার বলেছেন যে পানামই মধ্যযুগীয় শহর। কিন্তু এখানে মধ্যযুগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি—যা পাওয়া গিয়েছে সবই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। এমনকী ঊনবিংশ শতাব্দীর বাড়িগুলির নীচেও মধ্যযুগীয় কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

আমরা আগে দেখেছি যে দমদমাতে আজম শাহর সমাধির কাছে দুর্গ ছিল বলে ধরা হয়েছিল। এটাও মনে করা হয়েছিল যে দুর্গর মধ্যে রাজপ্রাসাদও ছিল। উঁচু জায়গার উপর এটি ছিল বলে এরকম মনে করা হচ্ছে যদিও পাঁচিলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। জেমস ওয়াইজ মনে করেছেন যে বৈদ্যর বাজারের কাছে মেঘনা নদীর ধারে এই দুর্গ ছিল যার কোনও নিদর্শন এখন আর নেই। যদি এটা মেনে নেওয়া

হয়, তা হলে বলা যেতে পারে যে সবটাই মেঘনা নদীর জলের তলায় চলে গিয়েছে। যা নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার থেকে বলা যেতে পারে যে অধিকাংশ লোকই, এমনকী কিছু অভিজাত ও বণিকরা, মগরাপাড়া ও গোয়ালদি অঞ্চলে বাস করত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র মোয়াজ্জামাবাদে সরে যেতে থাকে, যার ফলে মনে করা যেতে পারে যে অন্তত অভিজাত, বণিক ও কাজের লোকেরা ওই অঞ্চলে চলে যেতে থাকে। বন্দর এলাকার মধ্যে বন্দরের কাজকর্মের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আবুল ফজল বন্দরের নাম না করে সোনারগাঁর বন্দরকে একটা আলাদা সরকার বলে ধরেছেন। এর আয় উনি ধরেছেন ৮২,৬৩২ দাম বা ২২২২ তঙ্কা। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইবন বতুতা এখানে এসেছিলেন বলে ধরা হয়। উনি এখানে সোনা ও রূপার টাকা চলছে বলেছেন। এখান থেকেই উনি চিনা জাহাজে করে যান। এখনকার মসজিদ ও শিলালেখ থেকে বোঝা যায় যে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এখানে বহু ধনী বণিক ও অন্যান্য লোকের বাস ছিল। *বাহারিস্তান* ও অন্যান্য লেখা থেকে অনুমান করা যায় যে সোনারগাঁ ও তার বন্দর এলাকা পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।

সামসুদ্দিন ফিরুজ-এর সময় থেকে সোনারগাঁর টাঁকশাল কাজ শুরু করেছিল। এর প্রথম মুদ্রা পাওয়া যায় ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে। ওঁর ছেলে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর সোনারগাঁ টাঁকশাল থেকে সোনা ও রূপার মুদ্রা তৈরি করেন। ১৩২৮ সালের সোনার মুদ্রায় উনি *হজরত সোনারগাঁ* বলে অভিহিত হন। ১৩৩৯ সালের সোনার মুদ্রায় ওই একই নাম পাওয়া যায়। ওঁর রূপার মুদ্রাতেও ওই একই নাম দেখা যায় যার থেকে বলা যায় যে সোনারগাঁ ওঁর রাজধানী ছিল। সিকান্দার শাহ ও তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান ইলিয়াস শাহর মুদ্রাতেও ওই একই নাম দেখা যায়, যদিও অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে ওঁদের রাজধানী ছিল গৌড়ের কাছে পাণ্ডুয়াতে। জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহর সময় থেকে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে সোনারগাঁর মুদ্রাতে *হজরত* শব্দটি আর পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে সোনারগাঁর গুরুত্ব কমে যায়।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহর সময় (১৩৯০-১৪১০) থেকেই সোনারগাঁর টাঁকশাল বন্ধ হয়ে যায়। সিকান্দার শাহর সময় থেকেই সোনারগাঁর বারো মাইল দূরে মোয়াজ্জামাবাদে নতুন টাঁকশাল তৈরি করা হয়। ওখানে শামসুদ্দিন আজম শাহর (১৪৩৩-১৪৩৬) একটি মসজিদ ছিল যার কথা আগে বলা হয়েছে। কেন টাঁকশাল সরানো হল সেটা পরিষ্কার নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে সোনারগাঁর কাছে নদী শুকিয়ে আসছিল। যদিও এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে সোনারগাঁর ভাগ্য পরিবর্তন হতে শুরু করে এটা বোঝা যায়। মোয়াজ্জামাবাদ টাঁকশালও কিছুকাল পরে থেমে যায়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আবার এর কাজ শুরু করেন ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়ায়। এই টাঁকশাল থেকে শেষ মুদ্রা বের হয় ১৫৩২ সালে আলাউদ্দিন ফিরোজ-এর রাজত্বকালে। এই টাঁকশাল-এর মুদ্রায় *আল-বালাদ, হজরৎ, ইকলিম* ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায় যার থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন যে এ শহরটি প্রাদেশিক রাজধানী হয়েছিল। এটি ছিল একজন

শাসনকর্তার অধীনে যাকে *ওয়াজির* এবং *সর-ই লস্কর* বলে বলা হত। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে ইকলিম মোয়াজ্জামাবাদ দক্ষিণ-পশ্চিমে সমস্ত সোনারগাঁ এলাকা নিয়ে ত্রিপুরা ও সিলেটের সীমানা পর্যন্ত ছিল। এই শহরকে ভিত্তি করে বাংলার সুলতানরা ত্রিপুরা পর্যন্ত শাসনসীমা বাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন।

মধ্যযুগে কোথায় সোনারগাঁ শহর শুরু হয়েছিল নির্ধারণ করা শক্ত। কেউ কেউ মনে করছেন যে বর্তমান দরগাবাড়ি এলাকাতেই প্রথম পত্তন হয়েছিল। এঁদের মতে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা-র, যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারত থেকে এসেছিলেন এবং যাঁর সমাধি এখানে পাওয়া গিয়েছে, আগমন থেকেই সোনারগাঁর সূচনা ধরা যেতে পারে। উনি এখানে মাদ্রাসা ও খানকা তৈরি করেছিলেন। ওঁর সমাধির পাশে একটা বড় জায়গা দেখানো হয় ওঁর মাদ্রাসার জায়গা বলে যদিও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এখানে দুটি শিবলিঙ্গর নিম্নাংশ পাওয়া গিয়েছে যার থেকে মনে করা হচ্ছে যে ওঁর খানকা এখানেই ছিল। এখানে একটি মসজিদ আছে যেটি মোগল যুগে সারানো হয়েছিল। এর পাশের কয়েকটা সৌধের নামের পরম্পরা থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন যে শাসনতান্ত্রিক অঞ্চলটি এখানেই ছিল। এটি অবশ্য সম্পূর্ণ অনুমানমূলক এবং মনে হয় না যে শরফুদ্দিন শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রের লাগোয়া জায়গাতে ওঁর মাদ্রাসা ও খানকা করবেন বা ওই কেন্দ্র ওঁর জায়গার সঙ্গে লাগানো হবে।

পূর্ববঙ্গের প্রথম সুলতানি মুদ্রা পাওয়া যায় রুখনুদ্দিন কাইখুস-এর, ১২৮১ সালে। নতুন বিজিত এলাকার *খারাজ* (ভূমিরাজস্ব) থেকে ওই মুদ্রা করা হয়েছিল বলা হয়। সুতরাং শরফুদ্দিন ও অন্যান্য ধর্মপ্রচারকরা সুলতানি আক্রমণের সময়েই এসেছিলেন বলা যায় ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই সুলতানি সোনারগাঁর গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তী প্রায় একশো বছর সোনারগাঁর ইতিহাস অস্পষ্ট। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে চিনাদের উল্লেখে সোনারগাঁকে আবার দেখা যায় যার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ইবন বতুতার লেখায় আছে। সোনারগাঁর ইতিহাসের উচ্চতম শিখর দেখা যায় ঈশা খান-এর সময়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ পাদে। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম শের শাহর তৈরি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের কিছু অংশ সোনারগাঁতে চিহ্নিত করলেও, শের শাহর দখল কতটা ছিল এটা বলা শক্ত। ঈশা খান-এর ছেলে মুসা খান এর আশেপাশে, বিশেষত ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, সুরক্ষিত করে মোগলদের বিরুদ্ধে কিছুদিন লড়াই চালিয়েছিলেন, যার ফলে শহরের উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ১৬১১ সালে ইসলাম খান এটি দখল করেন।

১৫৮২-৮৩ সাল নাগাদ তোডরমল্ল-র *বন্দোবস্তে* দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সুবার একটা সরকার সোনারগাঁ। এর ৫২টি মহাল এবং এর আয় ১০,৩৩১,৩৩৩ দাম (তামার মুদ্রা)। এর মধ্যে ছিল বিক্রমপুর, খিজিরপুর, চাঁদপুর (ঢাকার কাছে) ও জুগদিয়া (নোয়াখালি)। এ ছাড়াও কতকগুলি শহর এর মধ্যে পড়ছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই বন্দোবস্ত এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন সোনারগাঁ বা পূর্ববাংলার বড় একটা অংশ মোগলদের হাতে নেই। সুতরাং মনে হয় যে তোডরমল্ল প্রাক্-মোগল যুগের বা কাররানি বংশের কাগজপত্র থেকে এগুলি করেছেন।

এই *বন্দোবস্ত* থেকে ও পরবর্তী ইতিহাস থেকে মনে করা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকে অন্তত ষষ্ঠদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সোনারগাঁ-চট্টগ্রাম যে সম্পর্কের মধ্যে ছিল, সেটি আলগা হয়ে গিয়েছে। এর একটা কারণ হয়তো চট্টগ্রাম-এর অধিকার নিয়ে বিভিন্ন শক্তির লড়াই। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পশ্চাদভূমি হিসেবে যে সোনারগাঁ গড়ে উঠছিল, সেটি ব্যাহত হয়ে যায়। সোনারগাঁর নিজের বন্দর তৈরি হলেও সেটি চট্টগ্রামের জায়গা নিতে পারেনি। ১৫৭৫ সালের পর থেকে মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে প্রথম দিকে পূর্ববাংলার কিছুটা উন্নতি হলেও, ওই উন্নতির ধারা বেশিদিন চলেনি। বহিঃশত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্য মোগলরা ঢাকা সুরক্ষিত করতে থাকে যার ফলে সোনারগাঁ ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ পরিবর্তন হয়তো এর জন্য কিছুটা দায়ি।

ইউরোপীয় বাণিজ্যের আনুকূল্যে যে শহরটা গড়ে উঠতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সেটি সোনারগাঁর শহরতলি পানাম। কোঠিবাড়ির সড়কের উপর পানাম যাবার মুখে যে পোল করেছিল মোগলরা, সেটিই পানাম-এর শুরু বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি যে পানাম শহর মধ্যযুগের সোনারগাঁ থেকে প্রকৃতিতে পৃথক। সুতরাং মধ্যযুগের সোনারগাঁ মোগল আক্রমণের অবসানেই শেষ হয়েছিল বলা যায় যদিও এর মসলিন মোগল যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে। শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র ঢাকায় চলে গেলে পর শহর সোনারগাঁ পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

মোগলদের আসার সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভারতভূখণ্ডে বিভিন্ন ধরনের শহর দেখি যেগুলি প্রধানত চতুর্দশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে বন্দর শহর যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে নতুন বংশের তৈরি রাজধানী যেগুলি সমুদ্রের উপর নয়। এগুলির সবই যে মোগল যুগের প্রাক্কালে শেষ হয়েছে এরকম নয়— কোনও কোনওটা আরও কিছুকাল চলেছিল। এ ছাড়াও সুলতানি যুগের মধ্যেও কোনও কোনও শহর থেমে গিয়েছে, কিন্তু নানা কারণে আবার কিছুকাল পরে চলতে শুরু করেছে। এমনকী একই এলাকাতে প্রায় একশো-দেড়শো বছর এক জায়গায় শহর বেড়ে উঠবার পর, সেটি পরিত্যক্ত হয়ে কিছু দূরে আবার শহর তৈরি হয়েছে। নানাধরনের কার্যকারণের ফলে শহরের ও শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়, যার মধ্যে একদিকে যেমন ভৌগোলিক কারণগুলি রয়েছে, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে দরবারি উৎসাহ। এই উৎসাহ থাকার ফলে অভিজাতরা দরবারি প্রাসাদ এলাকার কাছাকাছি গেলে, সাধারণ লোকও সঙ্গে আসে, যার ফলে শহরের উত্থান খুব চমকপ্রদ ও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শহর পরিত্যাগ ত্বরান্বিত করেছে বিশেষ কোনও যুদ্ধ বা মহামারী। কিন্তু সেগুলির পিছনেও প্রায় অদৃশ্য শক্তি কাজ করছিল, যা এই সাধারণ ও স্বল্পপরিসরে ধরা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শহরের উত্থান তাড়াতাড়ি হলেও, পতনের সময় দীর্ঘায়িত হয়েছে। সুতরাং শহরের জীবনের পিছনে যে চালিকা শক্তি আছে, সেটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা দরকার। শুধু হিন্দু বা মুসলমান জাতীয়তাবাদ-এর দোহাই পেড়ে এ সত্য নিষ্কাশন করা যাবে না। এক দিক থেকে দেখতে গেলে প্রতিটি শহরই একক, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চলমানতা আছে—কখনও বিলম্বিত লয়ে, কখনও বা দ্রুত।

সাধারণত দ্রুত উত্থানের সঙ্গেই দ্রুত পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতি দ্রুত লয়ে যেন সময় বয়ে চলেছে। কিন্তু এর সাধারণ সূত্র বর্তমান গবেষণার স্বল্প অভিজ্ঞতায় বের করা কঠিন। ইতিহাসের ঘটনা পুনরাবৃত্তি করে কিনা বা অবশ্যম্ভাবী কিনা, এমনকী প্রতিশোধ নেয় কিনা, এটা আপেক্ষিক মানসিকতার বিষয় যেটা কেবলমাত্র ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয় পর্ব

৭

আগ্রা

আগ্রার পুরনো ইতিহাস খুব পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না। নামকরণ নিয়েও নানা মত প্রচলিত আছে। আগ, আগরা, অগ্র, আগর, আগভান, আগরওয়া ইত্যাদি নানা মত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সাধারণত বলা হয় যে কৃষ্ণর পূর্বপুরুষ উগ্রসেন এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে পরশুরামের অধীনে বিষ্ণুর এখানে পুনর্জন্ম হয়। ইতিহাসের পাতায় আমরা আগ্রার প্রথম নাম পাই ১১৩৪ সালে এক মুসলমান লেখকের লেখায়। খাজা মাসুদ বলেছেন যে রাজা কংসের মথুরা শাসনকালে আগ্রা একটি শক্তিশালী জায়গা ছিল এরকম প্রবাদবাক্য আছে। পরবর্তীকালে কংস এটিকে সরকারি জেলখানায় রূপান্তরিত করেন।

১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকন্দর লোদি আগ্রার পত্তন করেন। এর আগে এটি ছিল বিয়ানা সরকারের অন্তর্ভুক্ত। সিকান্দার যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে এই শহর বসান যার পিছনে সামরিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল। সিকান্দার একটি দুর্গও তৈরি করে দেন ও এটিকে তাঁর রাজধানী বলে স্বীকৃতি দেন। উনিই এর নাম দেন আগ্রা, যেটি ক্রমশ বসতিপূর্ণ হয়ে উঠে।

সিকান্দার অনেকগুলি বাড়ি বানালেও, সিকান্দ্রার কাছে কেবলমাত্র *বারদ্বারী* ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এটিই সিকান্দারের টাঁকশাল বলে ধরা হয়।

১৫২৬ সালে আগ্রা রাজধানী হিসেবে চলতে থাকে। পানিপথ যুদ্ধের পরে বাবর হুমায়ুনকে পাঠান আগ্রার প্রাসাদ দখল নেবার জন্য। এর পর বাবর আগ্রায় এসে রাজধানী বানান। উনি শহরটিকে আরও বাড়িয়েছিলেন। প্রাসাদ ও বাগানও তৈরি করেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৫৩০ সালে হুমায়ুন আগ্রার জামা মসজিদে সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৫৩০ সালের দুটি ফারসি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে হুমায়ুন নতুন মসজিদ তৈরি করেছিলেন। ১৫৪০ সালে শের শাহ্ আগ্রা দখল করে রাজধানী করেন, আগ্রার বাদলগড় দুর্গের সংস্কার করেন ও টাঁকশাল বসান। ইসলাম শাহ্ সুরির সময়েও এটি রাজধানী ছিল।

৩০ অক্টোবর ১৫৫৮ সালে আকবর আগ্রায় আসেন। এখানে রাজধানী বসিয়ে এর নামকরণ করেন *আকবরাবাদ* ও *দারুল* খলিফা। পুরনো দুর্গ ভেঙে ফেলে উনি নতুন দুর্গ তৈরি করেন। এটিই আগ্রার বর্তমান দুর্গ। ১৫৬৫ সালে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা

খরচ করে এটি তৈরি করা হয়। নদীর সমান্তরাল আধমাইল ধরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি এর চেহারা। ব্যাসার্ধ প্রায় দেড় মাইল। শহরটি এর বাইরে গড়ে ওঠে।

আকবর পাঁচিলঘেরা শহর ছক অনুযায়ী তৈরি করেন। এই শহরের মধ্যে ছিল শহরবাসীদের বাসস্থানের আলাদা জায়গা, বাজার, সরাই ও পরিষ্কার পথঘাট। বিভিন্ন জায়গা থেকে বণিকরা আসতে থাকায় শহরের আয়তন বাড়তে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আগ্রা লন্ডন শহরের থেকে লোকসংখ্যায় বেশি ছিল।

শহরের পরিকল্পনা অনেক বেশি নির্ভরশীল এর জায়গার উপরে। যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে একটা বাঁকের মুখে থাকার জন্য এর চেহারা ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি। দুর্গ ছিল শহরের শহরতলিতে। পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ ছিল এর সুরক্ষা। বাণিজ্যিক চাহিদা ও শাসনযন্ত্রের দাবি ছিল এর পর।

জামা মসজিদ ছিল শহর ও দুর্গের মধ্যে। বিভিন্ন মহল্লায় ছিল বিভিন্ন মসজিদ। মুঘল রীতি অনুযায়ী ছিল বড় বড় বাগান। এ ছাড়াও ছিল সরাই ও সমাধিসৌধ। বিদেশিরা সাধারণত থাকতেন পাদরিটোলাতে যেটি ছিল শহরের বাইরে। ১৫৯৯ সালে একটি গির্জা ও খ্রিস্টানদের বিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সরকারি কারখানাও ছিল ওখানে।

শহরটিকে বিভিন্ন কাজের জন্য ভাগ করা হয়েছিল। রাজকীয় এলাকাতে ছিল দুর্গ, রাজকীয় চক, মনোরঞ্জনের জন্য খোলা জায়গা, বাগান, হাতির লড়াইয়ের জন্য খোলা জায়গা, ঝরোকা-ই দর্শনের জন্য খোলা জায়গা ইত্যাদি।

দুর্গ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে উঁচু জায়গার উপর এই দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই দুর্গে ছিল বিরাট দরজা ও বুরুজ। জলে ভর্তি পরিখা দিয়ে এটি ঘেরা ছিল। দুর্গের মধ্যে ছিল প্রাসাদ, হারেম, বাগান, মসজিদ, ফোয়ারা ও চক। এ ছাড়াও ছিল আমলাদের বাসস্থানের জায়গা ও দুর্গরক্ষীদের থাকার জায়গা। একাধিক বাজারও ছিল দুর্গের মধ্যে। পাদরি মনসারেট এই দুর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে এটি শহরের মধ্যে আর একটি শহর।

দুর্গের মধ্যে রাজকীয় চককে বলা হত *ময়দান-ই-শাহ*। এটি ছিল প্রধানত সরকারি ব্যবহারের জন্যে। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও পরিদর্শন এখানেই করা হত। এর একটা অংশে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন আমলারা যারা পালা করে দুর্গ পাহারার দায়িত্বে থাকতেন। যমুনার পূর্ব পারে নির্দিষ্ট ছিল জায়গা হাতির লড়াইয়ের জন্য। উৎসবে এখানেই আতসবাজি পোড়ানো হত রাজপরিবারের জন্যে। অভিজাতরা অবশ্য তাদের নিজেদের বাড়ি ও বাগান নিয়ে থাকতেন দুর্গের বাইরে যমুনার পশ্চিম পারে। দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অংশে ছিল এদের মনোমুগ্ধকর বাড়ি। আবুল ফজল শহরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে এ শহরটির চেহারা সুলতানি শহরের মতো। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এ শহরে কয়েকটি বড় বড় দরজা ছিল। কিন্তু এর স্থাপত্য শিল্প মুঘল যুগের—সুলতানি স্থাপত্য থেকে ভিন্ন।

আকবরের সময় থেকে শহরের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। পাঁচিলে ঘেরা থাকার ফলে লোকেদের জায়গার অকুলান হতে থাকে যার ফলে কয়েক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে লোক বসবাস করতে শুরু করে। আকবর শহরের পাঁচটি দরজা তৈরি

করেছিলেন যার মধ্যে *মাদার, চহরশুনিম,* ও *নূরি* উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে তিনটি দরজা ছিল শহরের তিনটি প্রধান পথের উপরে।

শহরটি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল যার মধ্যে দুর্গকে প্রথম অঞ্চল বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঞ্চল ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন ছোট ছোট চক ও রাস্তা। এটিও ছিল শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রভূমি। বণিক, দোকানদার ও কারিগররা এখানে বসবাস করত। এ ছাড়া ছিল মসজিদ ও হাম্মাম। সব মিলিয়ে শহরের এটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। চকগুলি ছিল দুরাস্তা বা চৌরাস্তার মোড়ে। এখান থেকে গলি ও ছোট রাস্তা এঁকেবেঁকে শহরের বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল। বাজারগুলি ছিল প্রধানত রাস্তার দুধারে ও চকের চারপাশ ঘিরে। দুর্গের বিপরীত দিকের চকে ছিল বড় বাজার। এ ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিমদিকের বাজারও ছিল বড়। দাসদাসী ও পশুপাখির জন্য বড় বাজার ছিল যার কথা পরিব্রাজক হকিন্স বলেছেন। আর একজন পরিব্রাজক উইলিয়াম ফিঞ্চ বলছেন যে দুর্গের দরজার সামনেই ছিল এই বাজার। ত্রিকোনিয়া বা ত্রিপলিয়া বাজার ছিল বিখ্যাত। আগেই বলা হয়েছে যে বড় মসজিদ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কালি মসজিদের পূর্ব দিকে ছিল আকবরি মসজিদ। এই মসজিদের কিছু পূর্বে ছিল পুরনো হাম্মাম। কবরখানা ছিল শহরের বাইরে ফতেপুর সিক্রি যাবার পথে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, প্রায় একশো বছর ধরে আগ্রা শহর বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে আকবরের পরিকল্পনা মাফিক হওয়ার দরুন শহরের গড়ন পরিষ্কার ছিল। উচ্চবিত্তরা প্রধানত দুর্গের উত্তর দিক ও দক্ষিণ দিকে যমুনার পাড় ঘেঁষে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময়েও একই প্রসারণ দেখা যায়। জাহাঙ্গিরের সময়ের পরিব্রাজক পেলসার্ট-এর বর্ণনায় এটা দেখা যায়।

পেলসার্ট বলছেন যে শহরটি আকবর আসার আগে ছিল একটি গ্রাম। এর পরেই শহর হঠাৎ বেড়ে যাবার ফলে শহরটি এলোমেলো ভাবে বাড়তে থাকে। বড় বড় অভিজাতদের অনেকের বাড়ি যমুনার পাড়ে জায়গা না পেয়ে শহরের ভিতরের ছোট গলির মধ্যে ছিল। এ সব পথ বা বাড়ি পরিকল্পনামাফিক হয়নি। অর্থাৎ আকবরের মৃত্যুর আগেই শহরের পরিকল্পনামাফিক গড়ন শেষ হয়ে গিয়ে শহর বাড়তে থাকে। পেলসার্ট বলছেন যে শহরটি বিরাট এবং খোলা অর্থাৎ পাঁচিলবিহীন। বাজারগুলিও জনবসতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ফলে পেলসার্ট আহমদাবাদ বা লাহোরের মতন বাজার পাননি। দুর্গের পাশে যে প্রাসাদগুলি ছিল তার উল্লেখও পেলসার্ট করেছেন। এদের মধ্যে বাহাদুর খানের প্রাসাদ, ইতিমদউদ্দৌলার প্রাসাদ, খাজা আবুল হাসানের প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য।

দুর্গের মধ্যে পেলসার্ট গোসলখানা, নূরজাহান বেগমের প্রাসাদ, মরিয়াম মাকানির প্রাসাদ ও রাজার তিনটি প্রাসাদের কথা বলেছেন। এর মধ্যে ছিল হারেম যার একটিকে বলা হত বাঙালি মহল। যেখানে বিভিন্ন দেশের মহিলারা থাকতেন। দুর্গ পার হলে দাসদাসী ও পশুপাখিদের বাজার যাকে বলা হত নাখখাস, যার কথা আগে বলা হয়েছে। এটি পেরোলে বড় বড় অভিজাতদের প্রাসাদ যাদের মধ্যে ছিল মির্জা

খুরম ও রাজা মানসিংহের প্রাসাদ।

যমুনা নদীর অপর পাড়ে ছিল সিকান্দ্রা। পেলসার্ট বলছেন যে এখানে বহু লোক বাস করত যাদের মধ্যে প্রধান ছিল বানিয়ারা। এরা পূর্ব দিকের মাল ও ভুটানের জিনিস নিয়ে আসত যার মধ্যে ছিল বাংলার তাঁতের কাপড়, পাটনা থেকে রেশম ও অন্যান্য জিনিস। এখানে নূরজাহানের আমলারা সরাই তৈরি করেছিল এইসব বণিকদের থাকার জন্য এবং এখানেই শুল্ক সংগ্রহ করা হত আমদানি করা মালের উপর। এ সব ছাড়াও প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আসত এখানে। এসব জিনিস পরে নদী পার করে শহরে নিয়ে যাওয়া হত। আগ্রা শহরে খাবার ছিল এই জায়গার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সিকান্দ্রা দুই মাইল লম্বা কিন্তু ততটা চওড়া নয়। এর মধ্যে বহু বাগান ও ভাল ভাল বাড়ি ছিল যার মধ্যে উল্লেখ করা যায় সুলতান পারভিজ, নূরজাহান বেগমের প্রাসাদ ও পরলোকগত ইতিমদউদৌলার সমাধিসৌধ। পেলসার্টের সময় পর্যন্ত এটি শেষ হয়নি এবং ততদিনে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও সম্রাটের দুটি বাগান ছিল—একটি চহরবাগ ও অন্যটি মোতি মহল। বাবরের মাটির নীচের প্রাসাদ ও উপরে বাগান, যাকে রামবাগ বলে, এর কাছেই ছিল। সর্বভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থার উদ্যোগে এটি এখন দেখা যায়। ততদিনে জাহাঙ্গির আকবরের সমাধি সিকান্দ্রায় শুরু করেছেন যার উল্লেখ পেলসার্ট করেননি কিন্তু পরবর্তী সালের পরিব্রাজক থেভনোর লেখায় পাওয়া যায়।

পেলসার্টের সময়ে আগ্রা শহর লম্বায় ছিল ছয় ক্রোশ (প্রায় সাড়ে তিন মাইল) এবং চওড়ায় অতটা বড় নয়। কিন্তু শাহজাহানের সময়েও শহর বাড়তে থাকে। দুর্গের উত্তর দিকে ছিল শাহজাদা দারাশুকোর প্রাসাদ। এর কিছু উত্তরে ছিল শাহজাদা ঔরংজেবের হাভেলি। দারাকে হারানোর পর সম্রাট ঔরংজেব *মুবারক মঞ্জিল* বলে একটি বাড়ি ও একটি মসজিদ তৈরি করেন। এর উত্তরে ছিল জাফর খানের সমাধিসৌধ ও বত্রিশটি স্তম্ভযুক্ত একটি সৌধ। এর কাছে ছিল *বুলন্দবাগ* বলে একটি বাগান। এরই পশ্চিমে এবং এর কাছে ছিল রাজা যশবন্ত সিংহর ছত্রি। এর পরে যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে হিন্দু রাজারা তাদের সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাতেন। সমকালীন পরিব্রাজক নিকোলাই মানুচ্চি ও থেভনো এই সব প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন। থেভনো বলেছেন যে নদীর ধার ঘেঁষে ছিল ত্রিশটা প্রাসাদ বড় বড় অভিজাতদের। এ ছাড়াও ছোট প্রাসাদ ও বাড়ি ওই একই ভাবে পাশাপাশি ছিল। সংখ্যাটি পেলসার্ট-এর বর্ণনা থেকে বেশি : সুতরাং জাহাঙ্গির এর পরেও নদীর পাশ ধরে দুর্গের দুধারে প্রাসাদ ও বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। থেভনো বলেছেন যে শহরটি বড় কিন্তু সরু। রাস্তার কোনও পরিকল্পনা তিনি পাননি। দুর্গের সামনের চকে তখন আশিটা সরাই দেখেছেন। এদের মধ্যে কয়েকটির অন্তত ছটা করে উঠোন ও বারান্দা রয়েছে। ভিতরের ঘরগুলি বড়। শহরের মধ্যে অন্তত আশিটা হাম্মাম থেভনো লক্ষ করেছেন। এ ছাড়া সারা শহর জুড়ে সমজিদ ও সমাধিসৌধ। থেভনো দুর্গের মধ্যেকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। অন্তত তিনটে উঠোন বারান্দা ও ঘর সমেত দেখেছেন। কোনও কোনও জায়গায় সোনার পাত দিয়ে মোড়া। প্রথম উঠোনে রক্ষীদের ঘর। দ্বিতীয়টিতে আমলা বা সৈন্যাধ্যক্ষদের ঘর এবং তৃতীয়টি ছিল

রাজপ্রাসাদ ও হারেম। থেভনো বলছেন যে প্রচণ্ড গরমের জন্য শাহজাহান আগ্রা ছেড়ে দিল্লি চলে যান। কিন্তু তাঁর শেষ জীবন আগ্রায় বন্দি হিসেবে কাটে।

থেভনো দেখেছেন যে প্রাসাদ আর বাগানই শহরের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে। সাধারণ বাড়িগুলো নিচু। গরিব লোকেরা কুঁড়েঘরে থাকে, খড় দিয়ে ছাওয়া। আগ্রায় যখন দরবার বসে তখন বহু লোক আসে, রাস্তাঘাট জনসমুদ্র হয়ে যায়। থেভনো বলছেন যে আগ্রার মতো বড় শহরে যত লোক থাকা উচিত তা আছে কিন্তু কারওর কারওর মতে এ শহর থেকে দু লক্ষ লোক যুদ্ধে যেতে পারে এটা ঠিক নয়। থেভনো আরও বলছেন যে কোনও কোনও লোক লিখেছেন যে আগ্রায় পঁচিশ হাজার খ্রিস্টান পরিবার আছে। কিন্তু থেভনো এর সঙ্গে একমত নন। এখানে কিছু হিন্দু ও পারসিকরা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা ও ক্ষমতা দুইই বেশি। ওলন্দাজদের একটা কুঠি আছে যার কথা ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার বলেছেন।

বার্নিয়ার আগ্রা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উনি বলেছেন যে আগ্রা দিল্লির থেকে বড় এবং ওমরাহ ও রাজাদের প্রাসাদও দিল্লির প্রাসাদগুলির থেকে সংখ্যায় বেশি। আগ্রার সরাইখানার সংখ্যাও দিল্লির থেকে বেশি, কিন্তু উনি বলছেন যে শহরের পাঁচিল নেই (এ কথা এর আগে পেলসার্টও বলেছেন) এবং যেহেতু পরিকল্পনামাফিক গড়ে ওঠেনি সুতরাং অন্য রাজধানী শহরের থেকে নিকৃষ্ট। বিশেষত দিল্লিতে যেখানে সোজা ও চওড়া রাস্তা আছে, আগ্রাতে সেরকম কিছু দেখা যায় না। শহরে চার-পাঁচটা বড় রাস্তা আছে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রধান। এই পথগুলির বাড়িগুলি মোটামুটি ভাল। অন্যান্য সব রাস্তাই সরু, ছোট এবং আঁকাবাঁকা। এর ফলে যখন আগ্রায় দরবার বসে তখন নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। দিল্লির সঙ্গে তুলনা করে বার্নিয়ার বলেছেন যে আগ্রা অনেক বেশি গ্রামীণ শহরের মতো। কারণ বড়লোকেরা এখানে প্রচুর গাছ লাগিয়ে বাগান করেছে। এমনকী হিন্দুদের বা বানিয়াদের বড় বড় পাথরের বাড়িগুলিও মনে হয় যেন ঘন বনের মধ্যে রয়েছে।

আগ্রাতে জেসুইট পাদরিদের একটা গির্জা আছে। এর সঙ্গে রয়েছে একটা বাড়ি যেটাকে ওরা 'কলেজ' বলে। এখানে খ্রিস্টান ধর্ম শেখানো হয় এবং পঁচিশ-ত্রিশটা খ্রিস্টিয়ান পরিবার রয়েছে (থেভনো এই বক্তব্য সম্বন্ধে আপত্তি করেছেন যা আগে উল্লিখিত হয়েছে)। আকবর জেসুইটদের এখানে নিমন্ত্রণ করে আনেন যখন ভারতে পর্তুগিজদের ক্ষমতা ছিল তুঙ্গে। আকবর একটা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আগ্রা ও লাহোরে গির্জা বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গিরও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন কিন্তু শাহজাহান এই বার্ষিক আয় বন্ধ করে দেন ও লাহোরের গির্জা ধ্বংস করেন। আগ্রার গির্জার চূড়ায় একটা ঘড়ি ছিল যার শব্দ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শোনা যেত। শাহজাহান এটিও ভেঙে দেন।

আগ্রাতে ওলন্দাজদের একটা কুঠি আছে যেখানে চার-পাঁচ জন কাজ করে। এর আগে ওলন্দাজরা আগ্রার কাছে বিয়ানা থেকে নীল কিনত ও আগ্রা শহরে মোটা কাপড়, আয়না, লাক্ষা, লোহার যন্ত্র, সোনা ও রূপার জরি বিক্রি করত। এই আগ্রার কুঠি থেকেই ওলন্দাজরা লখনউতে যেত প্রচুর কাপড় কেনার জন্য। বর্তমানে ওদের

ব্যবসা আর তত লাভজনক নেই প্রধানত আর্মেনিয়ান বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। এ ছাড়াও সুরাটের পথও বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছে বিশেষত গোয়ালিয়র ও বুরহানপুরে যেখানে তাদের পণ্যগুলি লুঠ হয়ে গিয়েছে অন্তত কয়েকবার।

বার্নিয়ার এরপর তাজমহল ও সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধের বর্ণনা দিয়েছেন। বার্নিয়ারের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে তাজমহল ছাড়িয়ে কিছু দূরে নুতন প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে আসফ খান ও ইসলাম খান রুমির হাভেলি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অন্যান্য বাড়ি ও মসজিদ তৈরি করা হয়। নতুন বাগানও করা হয়। তাজমহল ছাড়ালে নবাব খান-ই দৌরান-এর হাভেলি ও শাহ আহমদ বুখারির সমাধিসৌধ দেখা যায়। ফলে এ সবের চারপাশ দিয়ে দোকান-বাজার গড়ে উঠতে থাকে।

অধিকাংশ পরিব্রাজকই বলেছেন যে আগ্রা শহরের কোনও পাঁচিল ছিল না। একমাত্র এডওয়ার্ড কারলিয়নই বলেছেন যে পাঁচিল ছিল। কিন্তু তিনি দুর্গের পাঁচিলকে শহরের পাঁচিল বলে ভুল করেছেন। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে যে পাঁচিল ছিল তার প্রমাণ আছে। এই পাঁচিলের মধ্যেকার জায়গা প্রায় এগারো মাইল বিস্তৃত ও ষোলোটা দরজার উল্লেখ পাওয়া যায়। পেলসার্ট চারটি দরজার কথা বলেছেন। মানুচ্চি আরও কয়েকটার কথা বলেন। ১৮৭১-৭২ সালের সর্বভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বলা যায় যে একটি পাঁচিল ছিল যার ষোলোটা দরজা ছিল। ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত আজমিরি দরজা অটুট অবস্থায় ছিল তারপর এটি ভেঙে শাহগঞ্জ রাস্তা হয়েছে। তবে এটা মনে করা যেতে পারে যে অধিকাংশ দরজাই তৈরি করা হয়েছিল আকবরের মৃত্যুর পরে যখন শহর দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে। যে দুর্গ একসময় ছিল শহরের বাইরে, কালক্রমে সেটি শহরের মধ্যে চলে আসে। ১৬২০ সালে পেলসার্ট লিখছেন যে আকবর যে দরজা তৈরি করেছিলেন শহরের সীমানায়, এখন সেটি শহরের মধ্যে চলে এসেছে। শহরটি আকবরের সময়ের থেকে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

শহরের বিস্তার ক্রমশ উত্তর দিকে হতে থাকে। একসময়ে উত্তরের কাশ্মীরি দরজার কাছে জনবসতি পৌঁছে যায়। দরজার অস্তিত্ব এখনও দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমে শহরটি বিলোচপুর পর্যন্ত চলে যায়। পশ্চিম দিকে শহরের সীমানা হয়ে যায় আজমিরি দরজা পর্যন্ত। দক্ষিণ-পশ্চিমে এটি চলে যায় তাজমহল পর্যন্ত প্রথমে ও পরে সেটা ছাড়িয়ে তাজগঞ্জ পর্যন্ত। দুর্গ থেকে গোয়ালিয়ার দরজা পর্যন্ত ছিল দোকান, বাজার, ব্যবসায়ীদের আবাস, সমাধিসৌধ, মসজিদ, বাগান এবং সরাই-এ পরিপূর্ণ। কয়েকটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ রয়েছে এখনও, অন্তত অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়।

খ্রিস্টানদের এলাকার কাছে ওদের কবরখানা যেখানে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগিজ ও আর্মেনিয়ানদের সমাধি রয়েছে। জাহাঙ্গিরের সময়ে পাদরিটোলার পূর্বে ছিল আরেকটা কবরখানা। সব থেকে পুরনো কবরের তারিখ হচ্ছে একজন ইংরেজের—১৮ এপ্রিল ১৬২৭। এর কাছ দিয়ে *কারবালা* গড়ে ওঠে যেখানে ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কবর ও সমাধি রয়েছে। ক্রমশ পাদরিটোলা

শহরের মধ্যে চলে আসে। ১৬৬৪ সালে একজন ইউরোপীয় এটিকে শহরের প্রায় লাগোয়া বলেছেন।

মসজিদ ক্রমাগত তৈরি করা হয়েছিল যার থেকে শহরের বিস্তারের ছবি পাওয়া যায়। জামা মসজিদ ছিল দুর্গের উত্তর-পশ্চিমে। জাহানারা বেগম ১৬৪৮ সালে এটি তৈরি করেন যার পাথরের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। কাশ্মীরি বাজার এলাকায় ছিল আকবরি মসজিদ। দুর্গের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিভিন্ন মসজিদ তৈরি করেন জাহাঙ্গির, নবাব লস্কর খান ও ঔরংজেব। আজমিরি দরজার দক্ষিণ-পশ্চিমে জাহাঙ্গিরের দাস হাজি সুলেমান ১৬২১-২২ সালে মসজিদ তৈরি করেন।

সারা শহর জুড়েই সরাইখানা ও হাম্মাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পাদরি মানরিক সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ৯০টি সরাইর উল্লেখ করছেন ; থেভনো বলেছেন আশিটা। এগুলি ছিল বিভিন্ন দিক থেকে আগ্রায় আসার বিভিন্ন পথের ধারে। ফরাসি পরিব্রাজক তাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাজমহলের কাছে *তাজ-ই মোকাম* বলে একটি সরাই এর উল্লেখ করেছেন। তাজমহলের বাইরের চত্বরে ছিল আর একটি সরাইখানা যেটি এখনও বর্তমান। পাদরি মানরিক আর্মেনিয়ান বণিকদের জন্য সরাইখানার উল্লেখ করেছেন। *সরাই খাজা* ছিল শহরের পশ্চিমে।

হাম্মামের সংখ্যা থেভনো দিয়েছেন আশি। এর কয়েকটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল আলিবর্দি খানের হাম্মাম। এর শিলালেখ থেকে দেখা যায় যে এটি জাহাঙ্গিরের সময়ে তৈরি হয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সম্পূর্ণ অবস্থায় বা অভগ্ন অবস্থায় কোনও হাম্মাম এখন আর পাওয়া যায় না আগ্রায়। সরাইখানায় যেমন উচ্চবিত্তর জন্য বড় ঘর ও ভিন্ন ব্যবস্থা, হাম্মামে সেরকম কিছু জানা যায় না।

আগ্রা শহরকে সহজেই মোঘল ভারতের বাগান-শহর হিসেবে অভিহিত করা যায়। অন্তত বার্নিয়ারের বর্ণনা থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায়। আগ্রা দুর্গের মধ্যে বাগান ছিল। রাজা মানসিংহের বাগানের মধ্যে ছিল তাজমহল। ইতিমদউদৌলা ও সিকান্দ্রার সমাধিসৌধেও বাগান ছিল। ১৮৭১-৭২ এর সর্বভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে জাহাঙ্গির একটা বড় বাগানের মধ্যে প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রাসাদের উল্লেখ আছে। শাহজাহান এখানে নিয়মিত থাকতেন। এর কাছাকাছি ছিল সমাধিসৌধ ও সরাইখানা যেগুলি পরে শহরের মধ্যে চলে আসে।

আকবরের সময়েই প্রধান রাজপথ ধরে শহরের প্রসার হতে শুরু হয়। সিকান্দ্রা বা মথুরা-দিল্লি পথ ধরে শহর এগোতে থাকে। আমরা আগে দেখেছি যে আগ্রা ক্রমশ জনবসতিপূর্ণ হয়ে যায় ও সিকান্দ্রা পথের পাঁচ মাইল আগ্রা শহরের মধ্যে চলে আসে। দিল্লি দরজা থেকে সিকান্দ্রা পর্যন্ত ক্রমশ সুন্দর প্রাসাদ ও অন্যান্য সৌধে পরিপূর্ণ হতে থাকে। এর মধ্যে চৌসাঘ ঘর (ষাটটি স্তম্ভযুক্ত) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও শিসমহলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এগুলি যে আকবরের সময়েই তৈরি হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানকার শিলালেখ থেকে।

এরকম আর একটি পথ ছিল ফতেপুর সিক্রির পথ। আকবরের সময়েই এটা আগ্রার একাংশ হয়ে যায়। পথের কয়েকটা পুরনো সৌধের কিছু অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

র‍্যালফ ফিচ দেখেছেন পথ জুড়ে নানাধরনের দোকান। শাহগঞ্জে শিয়ারা বসতি স্থাপন করেছিল। এ ছাড়াও পারসিক সম্প্রদায়ও ওখানে ছিল। আকবরের সময়ে এই পথ জুড়ে ছিল গ্রাম, সরাই, বাজার ইত্যাদি। দক্ষিণে গোয়ালিয়ারের পথে পুরনো সৌধ ও সমাধির অস্তিত্ব দেখা যায়। এর মধ্যে ছিল দারা শুকো ও সুলেমান শুকোর বাসস্থান।

সুতরাং শহরের বিস্তার দেখা যায় প্রধানত সম্রাটের আগ্রহে। দরবার বসলে অভিজাতরা, বণিক ও ব্যাপারিরা বসবাস শুরু করতে থাকে। অন্যান্য দিকের তুলনায় পূর্ব দিকের বিস্তার খুব সামান্য। জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময়ে রাজপরিবার ও অভিজাতরা এ দিকে প্রাসাদ তৈরি করেন। পেলসার্টের বর্ণনায় এদিকের উন্নতির স্পষ্ট ছবি মেলে।

প্রধানত দুটি পথ ধরে খাবার শহরে নিয়ে আসা হত। একটি ছিল পূর্ব দিক থেকে পাটনা-এলাহাবাদ রাস্তা ও অন্যটি দিল্লি থেকে আলিগড় হয়ে। পূর্ব পারের সঙ্গে আগ্রা শহরের যোগাযোগ ছিল একটা পনটুন সাঁকোর মাধ্যমে। এই দিকের সৌধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতিমদউদৌল্লার সমাধিসৌধ, যেটি নূরজাহান তাঁর বাবার স্মৃতিতে তৈরি করেছিলেন। তৈরি হতে দেখেছিলেন পেলসার্ট যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। তাজমহলের বিপরীত দিকে ছিল *মেহতাব* বাগ যেখানে শাহজাহানের সমাধিসৌধ হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ইতিমদউদৌলার দক্ষিণে ছিল *মোতি বাগ* । এর মধ্যে ছিল *মোতি মসজিদ* এবং *মোতি মহল,* যেটি তৈরি করেছিলেন শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মোতি বেগমের উদ্দেশ্যে। এর উত্তরে ছিল ওয়াজির খানের কাটরা ও একটি বাগান। পনটুন সাঁকোর কাছে ছিল সরাই, বাগান ও সমাধি যেগুলি তৈরি করেছিলেন শাহজাহানের অভিজাতরা।

শহরের আয়তন কতটা ছিল এটা নির্ধারণ করা শক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচ বলেছেন যে আগ্রা লন্ডন শহরের থেকে বড়। পাদরি মনসারেট বলেছেন যে শহরটা চার মাইল লম্বা ও দুই মাইল চওড়া। আবুল ফজল লিখছেন যে যমুনার পাড় দিয়ে শহর দশ মাইল পর্যন্ত চলে গিয়েছে। জাহাঙ্গির আত্মজীবনীতে বলছেন যে শহরের ব্যাসার্ধ সাত ক্রোশ ও নদীর পূর্ব দিকে এক ক্রোশ চওড়া। ১৬১১ সালে পরিব্রাজক ফিচ শহর ও শহরতলিকে সাত মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া বলেছেন। ১৬২০ সালে পেলসার্ট লম্বায় শহরটা ছয় ক্রোশ বলেছেন। শাহজাহানের সময়ে ভ্রমণকারী পিটার মুন্ডি শহর অন্তত ১৫ মাইল জায়গা নিয়ে আছে লিখেছেন। মানুচ্চি বলেছেন বারো লিগ। সুতরাং এটা খুব পরিষ্কার যে শহরটা এক জায়গায় থেমে থাকেনি। ক্রমাগতই বেড়ে চলছিল। ফলে কোনও একসময়ে শহরের আয়তন কত ছিল বলা শক্ত। শুধু বলা যায় যে একশো বছরের মধ্যে শহরের আয়তন প্রায় চারগুণ বেড়ে ছিল। যেখানে সর্বভারতীয় লোকসংখ্যা বাড়ার হার অত্যন্ত কম, সেখানে এই বৃদ্ধি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে ধরা যেতে পারে।

লোকসংখ্যার আনুমানিক হিসেব করাও সহজ নয়। ফিচ এর লোকসংখ্যা লন্ডন শহরের থেকে বেশি বলেছেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এর লোকসংখ্যা দু লক্ষ থেকে বেশি হবে। ১৬৪০ সালে পাদরি

মানরিক আগ্রার জনসংখ্যা (বহিরাগত ও ভ্রমণকারীদের নিয়ে) ধরেছেন ছয় লক্ষ ষাট হাজার যদিও সেটা অতিরঞ্জিত বলে ধরা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন পরিব্রাজক জুরদাঁ বলেছেন যে আগ্রা পৃথিবীর সব থেকে বড় শহর এবং কায়রোর থেকে বড়। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ গুপ্ত ধরেছেন যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ছিল দু লক্ষ যেটা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রায় সাত লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। উনি এই শহরের ব্যাসার্ধ ধরেছেন বিশ মাইল থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে। এই জনসংখ্যার হিসেব অবশ্য সবটাই আনুমানিক। আমরা পরে ফতেপুর সিক্রির জনসংখ্যার হিসেব দেখব যেখানে জনসংখ্যা এর থেকে অনেক কম ধরা হচ্ছে। শুধু এটা বলা যায় যে আগ্রার আয়তন ও জনসংখ্যা মোগল সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ছিল।

তবে এই জনসংখ্যা সৈন্য রাখার জন্য অন্তত বাড়ছিল না। যদিও এটি ছিল রাজধানী, কিন্তু আবুল ফজলের মতে শহরতলিতে ছিল তিন হাজার ঘোড়সওয়ার ও পনেরো হাজার পদাতিক। আগ্রা সরকারের মধ্যে ছিল অনেক বেশি সৈন্য। মানুচ্চি বলেছেন যে আগ্রার মধ্যে সৈন্য ছিল পনেরো হাজার। এ ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক ঘোড়সওয়ার ও হাতি ছিল। কোষাখানা দুর্গের মধ্যে থাকার ফলে দুর্গ রক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। রাজধানী দিল্লিতে চলে গেলেও কোষাখানা আগ্রায় থেকে গিয়েছিল।

সমূগড় যুদ্ধের পরে ঔরংজেব আগ্রা দুর্গ অবরোধ করলে শাহজাহান দুর্গ বন্ধ করে দেন। দুর্গের প্রধান অধ্যক্ষ ঔরংজেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুর্গের জল সরবরাহ বন্ধ করে দিতে সমর্থ হন। এই লড়াইতে শহরবাসীরা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ঔরংজেব শহর দখল করতে গেলে শহরের কোতোয়াল সিদি মাসুদ বাধা দেন। উনি মারা গেলে পর শহর দখল হয় এবং ঔরংজেব রুস্তম খান তাতারকে কোতোয়াল নিযুক্ত করেন।

আগ্রা শহরের জল প্রধানত নেওয়া হত যমুনা নদী থেকে। বিভিন্ন আমলা ও ধনী ব্যক্তিরা খাল কেটে এই জল শহরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। আবুল ফজল লিখছেন যে শহরে *হালালখোর* (জমাদার) থাকত যারা বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করে শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসত। এ ছাড়া পয়ঃপ্রণালীর অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়। এগুলি দিয়ে ময়লা জল নদীতে ফেলা হত। কসাইখানা ছিল শহরের বাইরে। দুর্গের মধ্যে সরকারি বাড়িতে ও ব্যক্তিগত বাড়িতে আলো জালানোর ব্যবস্থা ছিল। শহরের বাইরে আকবর তিনটি সম্প্রদায়ের জন্য *লঙ্গরখানা* বা বিনাপয়সায় খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৬৬০-৬১ সালে দাম বেড়ে গেলে ঔরংজেব আরও কয়েকটি লঙ্গরখানা খুলে ছিলেন। শস্যর উপর করও উনি কমিয়ে দেন।

অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যাওয়ার ফলে শহরের মধ্যে সম্প্রদায় অনুযায়ী মহল্লা ছিল না। পেলসার্ট বলেছেন যে বিভিন্ন মহল্লার মধ্যে যেমন বড়লোক-গরিব পাশাপাশি রয়েছে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানও পাশাপাশি ছিল। কয়েকটি সরাইখানা কেবল নির্দিষ্ট ছিল খ্রিস্টান ও আর্মেনিয়ানদের জন্য। সামান্য কিছু মূল্য দিতে হত ওখানে থাকার জন্য। কোনও কোনও সরাই ছিল দোতলা। এগুলি নির্দিষ্ট ছিল বিদেশি দূত বা বিদেশের বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। সরাইখানার মধ্যে জিনিসপত্র ও খাবারদাবার বিক্রি করা হত। এ ছাড়াও তাঁবু ভাড়া করা যেত। হাম্মামে সাধারণত মূল্য লাগত না। কিন্তু

ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা বলছেন যে এই সব স্নানাগারেও স্বল্প মূল্য দিতে হত।

তাজমহল তৈরি করা নিয়ে কোনও কোনও লেখায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এখানে আগে একটি মন্দির ছিল, যেটি ভেঙে তাজমহল তৈরি করা হয়েছিল। এখানে সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

তাজমহল শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধিসৌধ। মমতাজ মহলের জন্ম হয় ৬ এপ্রিল ১৫৯৩ সালে। বিবাহের আগে নাম ছিল আরজুমন্দ বানু বেগম। বাবার নাম খাজা আবুল হাসান। আরজুমন্দের বিবাহ হয় ৩০ এপ্রিল ১৬১২ সালে এবং বুরহানপুরে মারা যান ৭ জুন ১৬৩১ সালে। প্রবাদ আছে যে মৃত্যুর আগে মমতাজ মহল তাঁর সমাধিসৌধ তৈরি করার জন্য অনুরোধ জানান। মৃতদেহ প্রথমে রাখা হয়েছিল তাপ্তি নদীর অপর পারে বুরহানপুরের বিপরীত দিকে জৈনাবাদ বাগানের মধ্যে একটা বড় পুকুরের ধারে। পয়লা ডিসেম্বর ১৬৩১ সালে মৃতদেহ আগ্রায় নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে ছিলেন যুবরাজ সুজা, নবাব ওয়াজির খান ও অন্যান্যরা।

আগ্রা শহরের দক্ষিণে যমুনার পারে একটা জায়গা ঠিক করা হয়। জমিটি ছিল রাজা মানসিংহের ও ওই জমিতে তাঁর একটা বাড়ি ছিল। তখন জমি ও বাড়ির মালিক ছিলেন মানসিংহের নাতি রাজা জয়সিংহ। সম্রাট জয়সিংহের কাছ থেকে বাড়িসুদ্ধ জমি কিনে নেন এবং পরিবর্তে শহরে চারটি বাড়ি দেন। এ ধরনের জমি কেনা তখন খুবই প্রচলিত ছিল। এমনকী বিদেশিরাও জমি কিনতে পারত। ৮ এপ্রিল ১৬২৬ সালের জাহাঙ্গিরের ফরমান থেকে দেখা যায় যে ইউরোপীয়ান পাদরিদের বারো বিঘা জমি কেনার অনুমতি দিয়েছেন।

১৬৩১ সালের ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয়। পরিব্রাজক তাভারনিয়ার এর সাক্ষী ছিলেন এবং শেষ হওয়াও দেখেছিলেন। শাহজাহানের ফরমান থেকে দেখা যায় যে মাকড়ানা (রাজস্থান) থেকে মার্বল পাথর আনা হয়েছিল। মৃতদেহ আগ্রায় আসে ২১ ডিসেম্বর ১৬৩১ এবং বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ছোট সৌধের মধ্যে সাময়িকভাবে রাখা হয়। তাজমহল তৈরি শেষ হয় ফেব্রুয়ারি ১৬৪৩ সালে। সমাধির কাছে যাবার আগে জ্যাসপার পাথরের একটা দরজা ছিল যেটি এখন আর পাওয়া যায় না। সমাধির উপরে আগে মুক্তা বসানো চাদর বিছানো হত প্রতি শুক্রবার ও মৃত্যুর দিনে। সেটিও আর পাওয়া যায়নি।

এটাও আগে বলা হয় যে তাজমহলের পরিকল্পনা করেছিলেন ভেনিসবাসী স্বর্ণকার জেরোনিমো ভেরোনিও। এ তথ্য প্রথম পরিবেশন করেন পাদরি মানরিক, কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে এর কোনও ভিত্তি নেই। এখন বলা যায় যে তাজমহলের প্রধান বাস্তুকার ছিলেন ওস্তাদ হামিদ, যিনি দিল্লির লালকেল্লারও বাস্তুকার ছিলেন। ওঁর ছেলের একটি কবিতায় এই তথ্য পাওয়া যায়।

আগ্রা শহরের শেষ অবস্থার সাক্ষী ছিলেন ফরাসি অভিজাত কাউন্ট অভ মোদাভ। ১৭৭৫ সালের ১০ মার্চ উনি আগ্রায় আসেন এবং এর একটা বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। এর থেকে আগ্রার দৈন্যদশার একটা ছবি পাওয়া যায়।

মোদাভ বলছেন যে যদিও এ শহরের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এখনও

তার পুরনো গরিমার স্পর্শ পাওয়া যায়। এর গঠন আঁকাবাঁকা কারণ একদিকে এটা যেমন উঁচু ঢিপির উপরে আবার অন্যদিকে এটা তেমনি খাদের মধ্যে রয়েছে। এর ফলে পথগুলি সোজা নয়, এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। পথগুলি অবশ্য পাথর ও ইট দিয়ে বাঁধানো। তিনটি পথ সারা শহর অতিক্রম করে চলে গিয়েছে এবং শহরটা যমুনার পার দিয়ে প্রায় দুই মাইল চলেছে। অন্যান্য রাস্তাগুলি সরু এবং এতই আঁকাবাঁকা যে পালকি করে যেতে অসুবিধে হয়। শহরের বহু জায়গায় পাঁচিল নেই। কোনও কোনও জায়গায় খুব খারাপভাবে ইটের পাঁচিল রয়েছে যেগুলি মনে হয় সম্প্রতি ধরা।

শহরের মধ্যে মোদাভ বহু প্রাচীন প্রাসাদ, বিধ্বস্ত সরাইখানা ও অন্যান্য বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখেছেন যেগুলি একসময়ে শক্তিমান দরবারের সাক্ষী ছিল। কিন্তু এইসব ধ্বংসস্তূপ এমনভাবে মিশে রয়েছে যে একটার থেকে অন্যটা আলাদা করা সহজ নয়। কিন্তু কেন্দ্র থেকে দু মাইল বৃত্ত টানলে এই ধ্বংসস্তূপ প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ বাড়িই, বিশেষত ব্যাপারিদের, দোতলা। এগুলির প্রায় সবগুলিরই বারান্দা আছে যদিও সব বারান্দা ঢাকা নয়। অভিজাতদের প্রাচীন প্রাসাদগুলি হয় ভেঙে গিয়েছে নয়তো অন্য কোনও ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাসিক সাত বা আট টাকায় খুব সুন্দর বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। জামা মসজিদ ছাড়া প্রায় আর কোনও সৌধই চোখে পড়ে না। এটি শহরের এক প্রান্তে ও দুর্গের পাশে। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি মসজিদ দেখা যায়, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে।

এই মসজিদ ও দুর্গের মাঝে একটা চক আছে। এই চকে প্রধান পথ এসে শেষ হয়েছে। এখানে দেওয়ালের গায়ে দোকান থাকলেও চকের মাটিতে দোকানের জিনিসপত্র সাজানো হয়েছে। প্রধান পথটা প্রায় সরু হয়ে গিয়েছে উত্তরে কিন্তু যখন পথটা দক্ষিণে আসছে তখন চওড়া হয়ে আসছে। পথটা একেবারে সোজা নয়, দু তিনটে ছোট বাঁক আছে। কিন্তু এটা বিশাল লম্বা এবং বলতে গেলে এটাই এই বিশাল শহরের প্রায় একটাই পথ।

প্রায় ১৬০ বছর ধরে জেসুইটরা আগ্রায় একটা বাড়ি রেখেছে যার নাম তারা রেখেছে ‘কলেজ’। এরা পঁচিশ/ত্রিশটা খ্রিস্টান পরিবারকে জড়ো করতে পেরেছিল এই শহরে। এই পরিবারের উত্তরাধিকারীরা কিছু এখনও আছে। জেসুইটদের এই বাড়ি বেশ বড়। দুর্গের মতো এই বাড়ির চারপাশে উঁচু পাঁচিল আছে। এ ছাড়া ছোট বাগান, চার/পাঁচটা ঘর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে। বহু পর্তুগিজ বই ওখানে আছে। এদের গির্জার একটা বড় ঘণ্টা ছিল যার শব্দ সারা শহরে শোনা যেত। শাহজাহান গির্জাটি ধ্বংস করলে (১৬৩৫ সাল) জেসুইটরা পরবর্তীকালে আর একটি ছোট গির্জা তৈরি করে। ঘণ্টাটিতে পর্তুগিজ ও ফরাসি ভাষায় ১৬২৪ সাল লেখা ছিল। জাঠরা ঘণ্টা নিয়ে গেলে, রেনে মাদেক ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করে আগ্রায় দিয়ে আসেন। ওলন্দাজরা আগ্রা ছেড়ে চলে গেলেও জেসুইটরা থেকে গিয়েছে। কিছু দূরে একটা কবরখানা আছে যেখানে ৩৫টি জেসুইটের সমাধি রয়েছে।

মোদাভকে দুর্গের ভিতরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আগ্রা তখন নাজাফ

খান এর দখলে এবং এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন জর্জিয়ার অধিবাসী। দুর্গটা প্রায় একটা শহরের মতন যার পাশে ৩৫/৪০ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পরিখা দিয়ে দুর্গ ঘেরা, পরিখার জল আসে যমুনার থেকে। পাঁচিলটি যথেষ্ট চওড়া যার উপরে ছোট কামান বসানো যায়। একমাত্র কোণের দিকে একটা মিনার ছাড়া আর বাকি অংশ ভাল আছে। মিনারটি ভেঙে নীচে পড়ে গিয়েছে। নাজাফ খান-এর সেনাপতি মেজর পলিয়ার যখন আগ্রা দুর্গ থেকে জাঠদের হটিয়ে দিচ্ছিলেন তখন গোলার আঘাতে এই মিনারটি ভেঙে যায়।

সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধির ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না হবার ফলে তার অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়ছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে মোদাভ মনে করছেন যে এক শতাব্দী পরে এর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে না হলেও এর অবস্থা সিকান্দ্রার থেকে ভাল।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে আগ্রার পতনের যোগ আছে। শাহজাহান ১৬৩৭ সালের পর দিল্লি চলে গেলে আগ্রা একটা প্রাদেশিক শহরে পরিণত হয়। আমির-ওমরাহরা ও ব্যাপারিরাও দিল্লি চলে যায়। ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসে আহমদ শাহর এক সেনাপতি শহর লুঠ করে অধিবাসীদের উপর অত্যাচার চালায়। ১৭৬১ সালে জাঠরা শহর লুঠ করে কোষাখানার ধনরত্ন নিয়ে যায়। সমরু এই কাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন এবং জাঠরা তাজমহলের রূপার পাতও খুলে নিয়ে যায়। ওরা সিকান্দ্রাও লুঠ করে। দুর্গের চারপাশের বহু প্রাসাদও তারা ভেঙে দেয়। মোদাভের সমসাময়িক পরিব্রাজক হজেস ১৭৮৩ সালে আগ্রার ধ্বংসস্তূপ লক্ষ করে যা লিখেছেন তার পুনরুক্তি এখানে অপ্রয়োজনীয়।

আগ্রার উত্থানের পিছনে দরবার-এর প্রত্যক্ষ মদত ছাড়াও ছিল পূর্ব দেশের সঙ্গে, বিশেষত, পাটনা ও বাংলার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। কালক্রমে ওই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং চারপাশের শহর, যেমন গোয়ালিয়র ও রাজস্থানের শহরগুলি থেকে আগ্রা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, তার বাণিজ্যিক পটভূমিও নষ্ট হয়ে যায়। দিল্লির উত্থানের ফলেও আগ্রার গরিমা অনেকখানি চলে যায়। মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে আগ্রার অবক্ষয় অনেকখানি জড়িত। সম্রাট শাহজাহান আশেপাশের গ্রামগুলির খাজনা থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা তাজমহল ও সিকান্দ্রার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। জাঠদের অভ্যুত্থানের ফলে ওই টাকা আসাও বন্ধ হয়ে যায়, ফলে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সৌধগুলি ভেঙে পড়তে থাকে। মোদাভের ও অন্যান্যদের লেখা থেকে এই অবক্ষয়ের পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়।

৮

ফতেপুর সিক্রি

আগ্রা থেকে ৩৭ কিলোমিটার পশ্চিমে বিন্ধ্য পর্বতমালার উঁচু টিলার উপরে ফতেপুর সিক্রি অবস্থিত। আকবরের আগে এই উঁচু টিলায় কেউ বাস করত বলে জানা যায় না। নীচে সিক্রি গ্রাম বহুদিনের পুরনো। দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি সিকরাওয়ার রাজপুতদের দখলে ছিল। ১১৯৬ সালে কাছের বিয়ানা শহর দখলের পর এটি তুর্কিদের হাতে চলে যায়। গ্রামের দুটি মসজিদ থেকে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর তারিখ পাওয়া যায়। এগুলিতে হিন্দু মন্দিরের মালমশলা ব্যবহার করা ছাড়াও হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়।

ক্রমে সিক্রি গ্রাম সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। আগ্রা তখনও তৈরি না হবার ফলে এর গুরুত্ব ছিল। তৈমুর-এর আক্রমণের পর এটি দিল্লির দখল থেকে হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৪২৭ সালে মুবারক শাহ্ আবার দখল নেন এবং এক পরগনার আমলাকে সিক্রিতে পাঠান। প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে গোয়ালিয়র দুর্গ রাজপুতদের হাতে থাকার ফলে সিক্রি এলাকা হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকে অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। সুলতান বাহলুল লোদি উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে মুসলমানদের এখানে বসানোর জন্য উৎসাহ দিতেন এটা জানা যায়। নবাগতদের মধ্যে ছিলেন শেখ বাহাউদ্দিন চিস্তি যিনি তাঁর ছেলে শেখ সলিম চিস্তি ও পরিবারবর্গের অন্যান্যদের নিয়ে দিল্লি থেকে এসেছিলেন।

দক্ষিণ দিকের অংশ ভাল করে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুলতান সিকান্দার লোদি ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়াতে আগ্রাতে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু বিয়ানা ও সিক্রি সামরিক দিক থেকে সমান গুরুত্ব পেতে থাকে। পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর আগ্রায় আসেন ১০ মে ১৫২৬ সালে। মহারাণা সঙ্গ বিয়ানা অবধি এগোলে কিছু আফগান তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। বাবর সিক্রির সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করলেও যুদ্ধ হয় কানওয়ার প্রান্তরে (বিয়ানা ১৬ কি.মি. দূরে) ১৭ মার্চ ১৫২৭। যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর সিক্রি গ্রামের নুতন নামকরণ করেন শুক্রি (আরবি শব্দ শুকর থেকে)। ১৫২৭ ও ১৫২৮ সালে কয়েকবার তিনি এ গ্রামে আসেন এবং একটি পাঁচিল যুক্ত বাগান তৈরি করান যার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বোধহয় এটি হাতিপোলের পশ্চিমে ইন্দারওয়ালি নামে একটি জায়গায় ছিল। বাবরের একটি শিলালেখ এখান থেকে

পাওয়া গিয়েছে।

হুমায়ুন সিক্রিতে কিছু করেননি। কিন্তু আকবর সিংহাসনে আরোহণ করার পর সিক্রির আশেপাশে শিকার করতে আসতেন। ১৫৬৪ সালে আগ্রার এগারো কি. মি. দক্ষিণে কাক্রালি গ্রামে একটি মনোরঞ্জনের আবাস তৈরি করান। এর কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ১৫৬৫ সালে আগ্রার দুর্গের কাজ শুরু হলে ফতেপুর সিক্রির পাথর কেটে নিয়ে আসা হতে থাকে। অনেক পাথর কাটার শ্রমিক সলিম চিস্তির বাসস্থানের আশেপাশে বসবাস শুরু করে। শেখ সলিম তাঁর খানকা বানাতে শুরু করেন ১৫৬৩-৬৪ সালে এবং ওই সব কারিগরের সাহায্যে একটা পাথরের মসজিদ বানান যার নামকরণ করা হয়েছিল পাথর কাটার কারিগরের মসজিদ। ইতিমধ্যে আকবরের কোনও পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি ১৫৬৮-৬৯ সালে শেখ সলিম চিস্তির আশীর্বাদ নেবার জন্য যান। শেখের খানকার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয় (রংমহল বলা হয়) যেখানে ১৫৬৯ সালে সলিমের জন্ম হয়। এই বাড়িটির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। আকবর ওখানে একটা মসজিদ তৈরি করান। ১৫৭১ সালে আকবর সিক্রিতে আসেন এবং ওঁর থাকার জন্য বিরাট প্রাসাদ বানানো হয়। ফলে অভিজাতরাও তাদের বসতবাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। সম্রাটের তত্ত্বাবধানেই এক বছরের মধ্যে সিক্রির প্রধান বাড়িগুলি তৈরি হয়ে যায়।

পূর্ব দিকে যেখানে উঁচু জায়গা ঢালু হয়ে গিয়েছে, ওখানেই রাজপ্রাসাদ তৈরি করা হয়। প্রাসাদের নীচের জমিতে শহর তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়। আবুল ফজলের *আইন*-এ রাজকীয় তাঁবু ফেলার যে ছক দেওয়া হয়েছে, এখানেও ওই একই ছক গ্রহণ করা হয়েছিল।

সিক্রির পাহাড়ের গভীর লাল পাথরের সঙ্গে রূপবাস-এর হালকা লাল মেশানো হয়েছিল। মনসারেট বলেছেন যে সম্রাট নিজে সাধারণ শ্রমিকের মতো পাথর কেটেছিলেন। সৌধগুলির বিভিন্ন অংশ তৈরি করে জোড়া লাগানো হয়েছিল যার ফলে কাজটা তাড়াতাড়ি এগোতে থাকে। ১৫৭২ সালে সিক্রি থেকে আকবর গুজরাট জয়ে বেরোন এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে এর নাম রাখেন ফতেয়াবাদ। কিন্তু ক্রমশ এর নাম হয়ে যায় ফতেপুর যদিও দুটো নামই বোঝায় বিজয়ের শহর।

আকবর ওখানে দরবার বসালেও কাজ চলতে থাকে। বারো বছর ধরে আকবর এখানে থাকেন এবং তাঁর বহু সংস্কার এই শহর থেকেই বের করা হয়েছিল। ১৫৮৫ সালে আকবর লাহোরে যান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। ১৫৯৮ অবধি উনি ওদিকে থাকেন যার ফলে ফতেপুরের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখা যায়। আগ্রার শাসনকর্তা শেখ ইব্রাহিম (শেখ সলিমের ভাইপো) অবশ্য রাজকীয় বাড়িগুলির তত্ত্বাবধান করেছিলেন। অভিজাতদের খালি বাড়িগুলিই সহজে ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। ১৫৯১ সালে ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর ফৈজি লক্ষ করেন যে ফতেপুরের অনেক পাথরের বাড়ির ছাদ পড়ে গিয়েছে এবং ইটের তৈরি বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে। ১৫৯৮ সালে আকবর আগ্রায় ফিরে আসেন কিন্তু তিনি ফতেপুরে আসেন কয়েকদিনের জন্য ১৬০১ সালে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরার পর। বুলন্দ দরওয়াজার শিলালেখ থেকে এটা জানা যায়।

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬১৯ সালে জাহাঙ্গির গুজরাট ও মালব থেকে ফিরে তিন মাস ফতেপুরে থাকেন প্রধানত আগ্রাতে প্লেগ থাকার জন্য। যুবরাজ খুরমের ২৮তম জন্মদিন ওখানেই পালন করা হয়। এপ্রিল মাসে জাহাঙ্গির আগ্রায় ফিরে যান। কিন্তু ওই কদিনের মধ্যে ফতেপুরের বহু বাড়ি ও প্রাসাদ সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া হয়েছিল।

১৬৮১ সালে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে জাঠরা নানা গোলমাল করতে শুরু করে যার ফলে ফতেপুরের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখা যায়। মহম্মদ শাহ রঙ্গিলা কিছুদিনের জন্য ফতেপুরে থাকলে বাড়িগুলির আবার সংস্কার করা হয়। কিন্তু এটা ছিল প্রায় তাৎক্ষণিক। মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ ও বাড়িগুলির অবস্থা খারাপ হতে থাকে যদিও মারাঠা শাসক মাধোরাও সিন্ধিয়া সলিম চিস্তির উত্তরাধিকারীদের সাহায্য করেছিলেন।

১৮০৩ সালে ইংরেজরা আগ্রা দখল করে। এর পরে তারা ফতেপুরে একটা শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র স্থাপন করে যেটা ১৮৫০ সাল অবধি ওখানে ছিল। ১৮৫৭-তে সলিম চিস্তির উত্তরাধিকারীরা সংলগ্ন গ্রামের কৃষকদের জড়ো করে ইংরেজদের আক্রমণ করলে তারা আগ্রা দুর্গের মধ্যে চলে যায়। এর ফলে পরবর্তীকালে ওই পরিবার ও কৃষকরা নানারকম শাস্তি ভোগ করেছিল।

প্রায় দশ কি.মি. ব্যাসার্ধ নিয়ে ফতেপুর সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বিন্দু হয়েছিল। এর উঁচু পাঁচিল প্রায় ছয় কি.মি. এবং শহরকে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘিরে রেখেছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় হ্রদ কাটা হয়েছিল যেটা শহরকে ওই দিক থেকে সুরক্ষিত করেছে। পাঁচিলের মধ্যে তীরধনুক বা বন্দুক চালানোর মতো ফাঁক ছিল। পাঁচিলের উপর দিয়ে এরা চলাফেরা করতে পারে এরকম ব্যবস্থাও ছিল।

সিক্রি গ্রামের প্রথম দরজাটিকে বলে দিল্লি দরওয়াজা। পূর্ব দিকে, উত্তর দিকে, দক্ষিণে, আরও কয়েকটি দরওয়াজা পাওয়া যায়। আরও পশ্চিমে আজমিরি দরওয়াজার সঙ্গে ছিল ছোট একটি দরজা যাকে বলা হয় *চোর খিড়কি*। বিভিন্ন শহরের নামে দরজা ছিল এবং ওই সব দরজা দিয়ে ওই সব শহরে যাবার পথ ছিল। দরওয়াজাগুলি ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি বুরুজ দিয়ে দুপাশে ঘেরা। প্রত্যেকটারই চেহারা একই ধরনের এবং এই চেহারাগুলির সঙ্গে শের শাহর পুরনো কেল্লার দরওয়াজার মিল পাওয়া যায়।

আগ্রা থেকে আগ্রা দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতে হয়। ঢোকার পর দক্ষিণে পাঁচকোনা ঘর দেখা যায় যেটি ছিল সরাইখানা। এটিকে ভুল করে কোতোয়ালি বলা হচ্ছে। উইলিয়াম ফিঞ্চ ১৬১০ সালে এটির উল্লেখ করেছেন রাজার সরাই বলে যদিও তখন এটা ভেঙে পড়ছে। এর দক্ষিণে ফতেপুরের টিলা উঠে গিয়েছে যার উপরে ছিল অভিজাতদের প্রাসাদ। এর একটি লাল পাথরে গড়া বাড়িকে সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের *বরাদরি* বলা হয়, যদিও তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর পরে পথ দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকে গেলে বিয়ানা শহরে যাওয়া যায়। দক্ষিণের পথটি প্রাসাদ চত্বরে চলে গিয়েছে মোগল বাজারের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে। এর কাছে ছিল *চাহার সুক*, যেখানে মোগল ব্যান্ড বাজানো হত।

চাহার সুক একটা ঘেরা জায়গা যাকে নহবতখানা বলা যায়। কখনও কখনও নক্কর খানাও বলা হত। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ও সম্রাট যখন দিওয়ান-ই-আমে আসতেন তখন এখান থেকেই ড্রাম বাজানো হত। কিন্তু আকবর সাধারণত ফতেপুরে আসতেন হাতি পোলের সামনে দিয়ে (টিলার উত্তর-পশ্চিমে) এবং নক্করখানা তখন ওখানে থাকত। একে চাহার সুক বলা হত কারণ পূর্ব-পশ্চিম পথ এখানে তিনটি খিলানের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফলে এর চেহারাটা অনেকটা চকের মতো দাঁড়িয়েছিল।

পথটি আরও এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নেবার আগে একটা বড় বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। বাড়িটি নিয়ে বিতর্ক আছে—কেউ বলে টাঁকশাল, কেউ বলে আস্তাবল। অধ্যাপক রিজভি একে কারখানা বলেছেন যার মধ্যে ছিল টাঁকশাল। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য অন্য জায়গায় টাঁকশাল ছিল বলে একটি প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানাচ্ছে। আবুল ফজল মুদ্রা তৈরি করার যে প্রক্রিয়া বলেছেন তাতে মনে হয় অন্য জায়গায় টাঁকশাল হওয়াই স্বাভাবিক। কারখানার পাশে কিন্তু কিছুদুরে এখন যেখানে টিকিটঘর হয়েছে, ওর পিছনে ছিল রান্নাঘর। দিওয়ান-ই-আম-এর দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো ছিল। এর সঙ্গে রয়েছে একটা বড় পুকুর যার ধারে নীচে নামার সিঁড়ি রয়েছে। প্রধানত বর্ষার জল এখানে ধরা হত এবং আবুল ফজল বলছেন যে এর সঙ্গে একটু গঙ্গাজল মিলিয়ে রান্না করা হত। এর জন্য এই পুকুরকে বলা হয় *হাউস-ই-শিরিন* বা মিষ্টি জলের পুকুর। সাধারণ লোকে অবশ্য একে বলে *সুখতাল* যদিও আর একটা বড় সুখতাল অন্য জায়গায় রয়েছে।

কারখানার পশ্চিম দিকে ছিল *ইয়াতিশখানা* বা মুহম্মদ বকির-এর বাড়ি। উনি ছিলেন রাজার খাবারের দারোগা এবং রাজার খাবারের সময় হাজির থাকতেন। এর বাড়ির সঙ্গে রয়েছে এর স্নানাগার। বড় ঘরের দেওয়ালে সুন্দর কাজ এখনও রয়েছে। এ বাড়িকে অনেক সময় *ইবাদৎখানা* বলা হয়েছে কিন্তু এ বাড়িতে একটা শিলালেখ থেকে কার বাড়ি জানা যায়। শিলালেখটি অবশ্য এখন বিলুপ্ত। শব্দের দিক থেকে দেখলে ইয়াতিশখানা মানে রক্ষীদের বাড়ি। কিন্তু সমকালীন ফারসি সাহিত্যে এ শব্দটি যে কোনও ব্যক্তিগত বাড়ি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পাদরি মনসারেট বাড়িটিকে আকবরের দপ্তর বলে বলেছেন এবং এখানে আমলারা কাজের ফাঁকে বিশ্রাম করে থাকে। শিলালেখতে সরফরাচি মুহম্মদ বকিরের বাড়ি বলায় এ তথ্য মেনে নেওয়া যায় না। পরে আমরা অভিজাত ও আমলাদের দপ্তরখানা আলোচনা করব।

পথের বিপরীত দিকে কারখানার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা লাল পাথরের ছোট বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সাধারণভাবে একে বলা হয় কোষাগার (*খাজানা*)। বাড়ির চেহারা দেখে রিজভি এটি কোনও বাস্তুকার বা দার্শনিকের বাড়ি বলে ধরেছেন। উনি অনুমান করছেন সিরাজের ফথউল্লা ১৫৮২ সালে এখানে এলে এই বাড়িতে থাকতেন কারণ এর কাছে ছিল ওঁর দেশের লোক হাকিম জিলানি ভাইদের বাড়ি।

দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও এগোলে জমি ক্রমশ নিচু হতে থাকে। এখানেই ছিল হাকিম ভাইদের বাড়ি। এঁরা কাস্পিয়ান উপসাগরের পারে জিলান থেকে ১৫৭৫ সালে এখানে আসেন। কিন্তু এঁরাই যে এ বাড়িতে ছিলেন এরকম কোনও প্রমাণ নেই।

আগ্রা দরওয়াজা দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোলে প্রায় সব বাড়িগুলিতেই পূর্ব দিক দিয়ে ঢোকা যায়। ওই মুখগুলি বাদশাহি দরওয়াজার সঙ্গে সমান্তরাল। এটি জামা মসজিদের পূর্ব দিকের দরজার দিক করা। এর পরে আসে *দিওয়ানখানা-ই-আম*। দরজা দিয়ে ঢুকে বাগান পেরিয়ে ১১১টা বারান্দা মতন চারপাশ ঘিরে রয়েছে—কেবল পশ্চিমে সম্রাটের বসার জায়গা।

ডান দিকের দরজা (এখন বন্ধ) দিয়ে গেলে হাউস-ই-শিরিন। এর বাঁ দিকে আর একটা দরজা দিয়ে গেলে *দৌলতখানাতে* যাওয়া যায়। এর পরেই একটা বারান্দা ঝুঁকে বেরিয়ে আছে যেখানে আকবর প্রতি সকালে তিনঘণ্টা ধরে বিচার করতেন। এর বর্ণনা পাদরি মনসারেটের লেখায় পাওয়া যায়। পাশে ঘাতক দাঁড়িয়ে থাকত, অবশ্য মনসারেট বলছেন যে কেবল মাত্র ভয় দেখানোর জন্য। এখানেই বিকেলে আকবর এসে আস্তাবলের পশুদের দেখতেন এবং কারখানারও অন্যান্য কাজ দেখাশোনা করতেন।

সিংহাসনের উপরে কার্পেট ও কুশন থাকত যার উপর আকবর বসতেন। একটা ছোট দরজার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ঘর বা দৌলতখানায় যাওয়া যেত। উত্তর দিকে একটা বড় দরজাও ছিল। দিওয়ানখানা-ই-আম-এ সিংহাসনের বিপরীত দিকে একটা বড় লোহার আংটা মাটিতে পোঁতা আছে। লোকে বলে ওখানে হাতি বাঁধা থাকত পায়ের তলায় অপরাধীদের পিষে মেরে ফেলার জন্য। এর প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়নি।

আকবর পারসিক দরবারের অংশবিশেষ গ্রহণ করেছিলেন। ওঁর পূর্বসুরীরা, তৈমুর ও শাহরুখ, ভারত থেকে প্রচুর বাস্তুকার নিয়ে গিয়ে সমরখন্দে পারসিক ও ভারতীয় স্থাপত্যর মিশ্রণ ঘটান। পুরনো ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যর পটভূমিকায়, আকবর পারসিক রীতিনীতি গ্রহণ করলেও ভারতীয় প্রথায় অলংকৃত করেন। ফলে অলংকার শাস্ত্রের নতুন ধরন ও ছন্দের উদ্ভব হয় যা প্রায় অনন্যসাধারণ।

পাদরি মনসারেট দৌলতখানা, হারাম সারা ও অন্যান্য সৌধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এগুলি বর্তমানে আলাদা সৌধ হিসেবে দেখা গেলেও, আকবরের সময়ে সংলগ্ন ছিল। সব মিলিয়ে এগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত হলেও এগুলি ছিল পরিকল্পনামাফিক একটাই বড় অংশ। সব মিলিয়ে এরা একটি প্রাসাদ-দুর্গের চেহারা নিয়েছিল যার দরজা ছিল হাতিপোলে। হারাম সারা (মহিলাদের বাসস্থান) দৌলতখানার সঙ্গে যুক্ত ছিল একটা লম্বা বারান্দার মাধ্যমে যেটি ছিল প্রায় পরদা দিয়ে ঢাকার মতো। হারাম সারার সঙ্গে অবশ্য কোষাখানা বা দপ্তরখানার কোনও যোগ ছিল না। একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে দৌলতখানা ও হাতিপোলের সংযোগ ছিল।

দিওয়ানখানা-ই আম এর পশ্চিমে ছিল দৌলতখানা যেটিকে রাজপ্রাসাদ বলা যায়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতীয় অলংকার। সম্রাট না থাকলেও প্রতিটি অভিজাতকে এর চৌকাঠের প্রতি সালাম জানাতে হত। দিওয়ানখানা-ই-আম-এর পিছন দিকে একটা ছাদ ছিল। এর ডান দিকে ছিল পাঁচমহল ও সামনে বড় উঠোন (পচিশি উঠোন)। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে প্রথমে একটা দোতলা বাড়ি পাওয়া যায় যাকে ভুল করে মেয়েদের বিদ্যালয় বলে বলা হয়।

দৌলতখানার মধ্যে ছিল একতলায় বড় ঘরের মতন একটা জায়গা, দু কামরার *দিওয়ানখানা-ই খাস,* দোতলায় একটা সুন্দর ঘর, মাঝখানে একটা চৌকো চৌবাচ্চা, উত্তর-পূর্ব দিকের কোনায় সুন্দর ভাবে অলংকৃত করা একটা বাড়ি যাকে তুর্কি সুলতানার বাড়ি বলা হত এবং স্তম্ভযুক্ত দোতলা সৌধ।

দিওয়ানখানা-ই খাস-এর প্রচুর ইতিহাস আছে। একতলায় দুটো ঘর। পূর্ব দিকের ঘর একসময়ে চিত্রিত ছিল। এটিই সম্রাটের থাকার ঘর বলে মনে করা হয়। এর পিছনের ঘরটি বড় এবং একটা ঝোলানো বারান্দা আছে অনেকটা জানালার মতো। সম্রাট এখানে কার্পেট ও কুশনের উপর হাঁটু মুড়ে বসতেন। নীচে আমলা ও ওমরাহরা দাঁড়িয়ে থাকত।

এই ঘরের পূর্ব দিকে একটা স্নানাগার ছিল যেখানে মাটির নীচের পাইপের সাহায্যে জল নিয়ে আসা হত। পশ্চিম দিকের দরজা (এখন বন্ধ) দিয়ে দপ্তরখানার সামনের উঠোনে যাওয়া যেত। এর ফলে দপ্তরখানা থেকে এই ঘরগুলিতে সরাসরি আসা যেত।

বদাওনি একে বলেছেন অনুপ তালাওর দৌলতখানা। এখানেই আকবর ১৫৭৫ সালে তাঁর আত্মীয় বাদাকাস্তানের শাসক মির্জা সুলেমানকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। জেসুইট পাদরিদের আকবর প্রথমবার অভ্যর্থনা করেন দিওয়ানখানা-ই আম-এ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আকবর ভিতরের ঘরে চলে গিয়ে পাদরিদের ডেকে পাঠান। বড় ঘরের দক্ষিণ দিকে উঠোনের দিকের জানালা দিয়ে আকবর সকালে প্রজাদের দেখা দিতেন। এটাই *ঝরোখা-ই দর্শন* নামে পরিচিত। আবুল ফজল বলছেন যে প্রজারা সম্রাটকে না দেখে অন্ন গ্রহণ করত না। ১৫৭৭-৭৮ সালে এর সামনে ক্যানভাসের সাময়িক মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল যেখানে আকবর প্রার্থনা করতেন।

সম্রাটের ব্যক্তিগত ঘর (খোয়াবগাহ) ছিল দোতলায় যেখানে হারাম সারা থেকে মহিলারা সহজেই যাতায়াত করতে পারতেন। এখানেই আকবর অনেক সময়ে দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য ঘুমোতে আসতেন। দিওয়ানখানা-ই-খাস-এ বহু রাত পর্যন্ত আলোচনা করে রাতে ঘুমোনোর জন্য এই ঘরেই আসতেন। এখানে নাবিব খান বই পড়ে শোনাত—কোনও কোনও সময়ে আবুল ফজল বা রাজা বীরবল আসতেন নেহাত খোশগল্প করার জন্য। এই ঘরে অনেক সময়ে কবি, দার্শনিক ইত্যাদি লোককে ডাকা হত। এই ঘরের দেওয়ালের ছবিগুলির অল্পই অবশিষ্ট আছে। ফারসি ভাষায় এই বাড়ির প্রশংসা করে একটা কবিতা লেখা ছিল।

বদাওনির মতে অনুপ তালাও শেষ হয় ১৫৭৫ সালে ইবাদৎখানার সঙ্গে। এটি দেওয়ানখানা-ই খাস-এর উত্তর-পূর্ব দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে জলের কাছে যাওয়া যায়। এর উদ্বৃত্ত জল নলের সাহায্যে হাউস-ই শিরিন-এ ফেলা হত। পাদরি মনসারেট ও জাহাঙ্গির একে বলেছেন কপূর তালাও। এর উত্তর-পূর্ব কোণে একটা ছোট সৌধ দেখা যায়। অষ্টকোণ বিশিষ্ট এই সৌধটিতে নানা ধরনের অলংকার করা আছে। দেওয়ালে তিনটি লোহার আংটা লাগানো আছে যার সাহায্যে পরদা ঝোলানো যেত। এর অলংকার এমন সুন্দর যে এটিকে কাশ্মীরি কাঠের কাজ করা মনে হয়।

বাড়িটিকে তুর্কি সুলতানার বাড়ি বলে সাধারণত বলা হয়। কেউ কেউ এর মধ্যে স্নানাগারও ছিল বলে বলেছেন। এর পিছনে ছিল একটা ধারণা যে অনুপ তালাও ও দৌলতখানা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সমসাময়িক ইতিহাসে এর প্রমাণ মেলে না। যেহেতু এটি অনুপ তালাওর সংলগ্ন অতএব এটিকে বিশ্রামের ঘর বলে বলা যায়। বদাওনি বলছেন যে ১৫৭৫ সালের এক রাত্রে অনুপ তালাওর সংলগ্ন ঘরে ধর্মীয় আলোচনা হয়েছিল। এটাই সেই ঘর বলে ধরা যেতে পারে।

অনুপ তালাওর উত্তর দিকে একটা দোতলা বাড়ি দেখা যায় যাকে ভুল করে মেয়েদের বিদ্যালয় বলা হয়। এটি আসলে *আবদারখানা* (আতরের ঘর বা জলের ঘর) ও ফলের ঘর। এটি মেয়েদের বিদ্যালয় নয় কারণ এটি সম্রাটের দরবারের প্রায় মাঝখানে। এর ঘরের মধ্যে তাক করা আছে। আকবর দিনে একবার খেতেন এবং এই ঘরেই বোধহয় তাঁর খাবার পরীক্ষা করা হত।

পচিশি খেলার ছক কাটা উঠোনে আকবর দাসীদের ঘুঁটি করে খেলতেন বলে বলা হয়। আবুল ফজল আকবরের পচিশি খেলার উল্লেখ করেছেন—খেলাও বোধহয় এখানে হত। কিন্তু কোনও সমকালীন লেখক দাসীদের ঘুঁটি করে খেলার উল্লেখ করেননি। পারসিক প্রাসাদগুলিতে বড় উঠোন একটা আছে। দৌলতখানাতে যাবার আগে এটি ছিল ওই ধরণের। পাদরি মনসারেট বলছেন যে বছরে চারবার সম্রাট চার হাজার মুদ্রা ভর্তি করে বস্তা উঠোনে রাখতেন। এখানেই ওই মুদ্রা গোনা হত এবং দাস দাসীদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হত।

দৌলতখানার উত্তর দিকে আকবর বিশেষভাবে কোষাখানা তৈরি করেছিলেন। দৌলতখানার উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা বাড়িকে *আঁখ মিচোলি* (অন্ধজনের বাড়ি) বলা হয় যেখানে আকবর চোখ বেঁধে হারেমের মহিলাদের সঙ্গে খেলতেন। আকবর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও অসামান্য কাজের মধ্যে এই ধরনের খেলা খেলবেন বলে মনে হয় না। কোষাখানার দরজায় ভারতীয় প্রথায় ভয়ানক জন্তুর হাঁ করা মুখ রাখা যেগুলি কোষাখানা রক্ষা করে বলে প্রবাদ আছে। দরজাগুলিও ছিল পাথরের এবং ঘরের ভিতরে ফাঁকা গর্ত পাথরের চাড় দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব দিক দিয়ে ছাদে যাবার সিঁড়ি ছিল।

কোষাখানার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ছোট উঁচু জায়গা আছে। এটি কোষাখানার থেকে একটু উঁচু এবং এক সময়ে বোধহয় ছোট পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। ছত্রি ধরনের এরকম জায়গা মাউন্ট আবুর বিমলা শাহর মন্দিরে ও অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়। হিন্দুদের দরজাতেও এরকম দেখা যায় যাকে বলে *তোরণা*। সাধারণত বলা হয় যে এখানে জ্যোতিষী বা যোগী বসতেন। মোঘল সম্রাটরা এই ধরণের জ্যোতিষীতে বিশ্বাস করতেন। জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনীতে হিন্দু জ্যোতিষীর কথা বারবার লিখেছেন। এমনকী ঔরংজেবও বিশ্বাস করতেন। আকবর বহু ধরনের হিন্দু বা মুসলমান জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং প্রত্যেকেরই মত নিতেন। সুতরাং এটা কোনও বিশেষ একজনের আসন ছিল এটা মনে হয় না। অন্যদিকে বলা যায় যে এটি বোধহয় কোষাগারের দারোগা বা আধিকারিকের আসন ছিল যখন উঠোনে মুদ্রা গোনা ও পাওনা মেটানো হত।

সেক্ষেত্রে আফগান সুরসুলতানদের পুরনো ভৃত্য ফুল মালিকের কথা বলা যায়। আকবর এঁকে ওমরাহ্ করে নাম দেন খাজাসারা ইতিমাদ খান যিনি প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এটি ওঁরই জায়গা ছিল বলে ধরা যেতে পারে।

কোষাখানা থেকে উঠোন পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে গেলে একটা সুন্দর বাড়ির চার দরজার একটার সামনে দাঁড়ানো যায়। বাইরে থেকে দোতলার মতো দেখা গেলেও, এটি একটি বড় হলঘর যার একটা বিরাট বড় স্তম্ভর উপর গোলাকার বারান্দা রয়েছে। বাড়ির প্রতিটি কোনা থেকে ভিতরে আসার জন্য সাঁকোর মতো করা আছে। এটিকে সাধারণত সম্রাটের দিওয়ান-ই-খাস অথবা ইবাদৎখানা বলে দেখানো হয়। বলা হয় যে আকবর এখানেই ১৫৭৫ সালে ধর্মীয় আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এর গঠন দেখে মনে হয় যে সর্বসাধারণের কাজ করার মতো বাড়ি এটা নয়। এটি সম্ভবত সম্রাটের হিরা, মুক্তা ইত্যাদি রাখবার ঘর। মাঝখানে বসে নীচে তাকালে এগুলি তিনি দেখতে পেতেন। আবুল ফজল বলছেন যে তিনটি কোষাখানা ছিল—একটি তামার, দ্বিতীয়টি সোনা ও রূপোর ও অন্যটি মণিমুক্তোর। কোষাখানার কাছেই মণিমুক্তোর ঘর থাকাই স্বাভাবিক।

এই বাড়িটির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা দোতলা বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এটিই দপ্তরখানা যেখানে সম্রাট ও অভিজাতরা দিওয়ানখানা-ই-খাস-এর দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে যেতেন। এটি অবশ্য এখন বন্ধ থাকে।

প্রাসাদ এলাকার দক্ষিণে জমি যেখানে নিচু হয়ে যাচ্ছে, ওখানেই ছিল দপ্তরখানা যেটি অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে ১৫৭৪-৭৫ সালে তৈরি হয়েছিল। এর উত্তর দিকে বারোটা স্তম্ভের সারি রয়েছে মোগলদের প্রথম দিকের চৌকো পাথরের উপর । এর মধ্যে একটা বড় ঘর রয়েছে যেখানে বসে কেরানি ও হিসাবরক্ষকরা কাজ করতেন। এর সঙ্গেই ছিল *মকতবখানা* (অনুবাদের ঘর) ও *কাছেরি* (গোনার জায়গা)। এই মকতবখানাতেই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ফারসি ভাষার অনুবাদ করা হত যার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়।

ফতেপুর সিক্রির ঐতিহাসিক স্মৃতি সমৃদ্ধ বাড়ি হচ্ছে ইবাদৎখানা। একে এখনও পরিষ্কারভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং মনে করা হয় যে বাড়িটা ভেঙে গিয়েছে। ইবাদৎখানা তৈরি হয় ১৫৭৫ সালে এবং এখানেই আকবর তাঁর ধর্মালোচনা করতেন ও শুনতেন। সমসাময়িক লেখা থেকে পরিষ্কার যে এই বাড়ি রাজপ্রাসাদ থেকে বেশি দূরে নয়। এ ছাড়া শেখ সলিম চিস্তির খানকার কাছে এটা ছিল।

প্রধান হারাম সারার প্রাসাদের পিছনে একটা বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। জামা মসজিদের পূর্ব দিকের দরজা থেকেও এই দৃশ্য চোখে পড়ে। এর কাছে একটা স্তম্ভযুক্ত লাল পাথরের বাড়ি আছে। এই বাড়ির দক্ষিণে ইবাদৎখানা ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এটি এখন এক বড় বাঁধানো জায়গা এবং এর উপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাঁধানো জায়গার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুমান করা হচ্ছে যে এটিই ছিল ইবাদৎখানার জমি যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি।

দৌলতখানার চারপাশ ধরে বহু বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর মধ্যে কারখানা ও দপ্তরখানার কথা বলা হয়েছে। কারখানার দক্ষিণে কতকগুলি বাড়ির

চেহারা দেখা যায় যেখানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ করেছে। যদিও সমকালীন আকরে এসব বাড়ির উল্লেখ নেই, কিন্তু মনে করা হচ্ছে যে অন্তত একটা বাড়ি ছিল ফর্দখানা (অভ্যাগতদের বিশ্রামস্থল)। দরবারে যে সব অভ্যাগতরা আসতেন তাঁরা এই বাড়িতে থাকতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এর দরজা বা ঢোকবার রাস্তা পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভাবা হচ্ছে যে উত্তর-পশ্চিম কোণে ঢোকবার দরজা ছিল। দুটো দেউড়ির কিছু অংশ শনাক্ত করা গিয়েছে।

পশ্চিমের দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা বড় উঠোন পাওয়া যায়। তার উত্তরে চারটি লাগোয়া ঘর আছে। পশ্চিমের শেষের ঘরটি সব থেকে বড়। পুবের দিকের ঘরটি সবথেকে ছোট। উঠোনের উত্তর-পশ্চিম দিকে আর একটি ঘর পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকে এবং উঠোনের মধ্যে এগিয়ে থাকা একটা বড় শৌচাগার ও সেপটিক ট্যাঙ্ক দেখা যায়। উঠোনের দক্ষিণে কিন্তু সংলগ্ন নয় এরকম পাঁচটি ঘর পাশাপাশি রয়েছে। এ সব ঘরগুলিই উঠোনের দিকে মুখ করা। পশ্চিম দিকে হাম্মাম ও দেউড়ি ছিল। হাম্মামটি দুটি ভাগে বিভক্ত—একটা স্নানাগার ও অন্যটি জল গরম করার ঘর। মাটির নীচে ইট দিয়ে জল গরম করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জল গরম করার পাত্র বসানোর জায়গাও ছিল। পাশের ঘরে একটা ছোট চৌবাচ্চা ছিল জলের জন্য।

দেউড়ি থেকে দ্বিতীয় উঠোনে যাওয়া যায়। এর উত্তর ও দক্ষিণে দুটো পরদার মতো দেওয়াল পাওয়া যায়। দক্ষিণে একটা উঁচু বাঁধানো চত্বর রয়েছে এবং বাগানের মধ্যে শোবার ব্যবস্থাও ছিল। পশ্চিমে আরও কয়েকটি ঘরের চিহ্ন পাওয়া যায়।

ফর্দখানার পশ্চিমে আর একটা বড় বাড়ির অনেকখানিই অবশিষ্ট আছে। এখানে তিনটি ঘর, হাম্মাম ও স্নানাগার দেখা যায়।এই হাম্মামটিও দুটি ভাগে বিভক্ত—একটি স্নানাগার ও অন্যটি জল গরম করার জায়গা যার মাঝখানে জল গরম করার ব্যবস্থা ছিল। পাশেরটি শৌচকৃত্য করার জায়গা। মাটির নীচে জলের চৌবাচ্চা ও ময়লা নিষ্কাশনের নালি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে লাখৌরি ইট ও ছোটখাটো পাথরের টুকরো দিয়ে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। জল গরম করার ঘরের মেঝেতে লাল পাথর থাকলেও শৌচাগারের মেঝে চুন-সুরকি দিয়ে করা।

কারখানা ও ফর্দখানা ছাড়াও আরও এক ধরনের সৌধ এই চত্বরে ছিল যার কথা পাদরি মনসারেট উল্লেখ করেছেন। উনি বলছেন যে আমলারা যাতে ভালভাবে তাদের কর্তব্য করতে পারে, সেজন্য রাজা প্রাসাদ চত্বরের মধ্যে তাদের জন্য ছোট ছোট অফিসঘর করে দিয়েছিলেন। এগুলিকেই ইয়াতিশখানা বলা হত। বদাওনি আবুল ফজলের ইয়াতিশখানা ও সংলগ্ন বাসস্থান যে প্রাসাদের মধ্যে ছিল বলেছেন। মুহম্মদ বকিরের ইয়াতিশখানার কথা আগেই বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণে রান্নাঘরে চারটি রান্না করার জায়গাও পাওয়া গিয়েছে। এর পাশে সাতটা ছোট ছোট ঘর আছ, যার মাঝখানে একটা উঠোন দেখা যায়। এই উঠোনের উত্তর দিকে একটা বারান্দা ছিল। এর পশ্চিমে বাঁধানো চত্বর। উত্তর-পশ্চিম কোণে প্লাস্টার করা হাম্মাম, যেটি হাউস-ই শিরিন-এর দিকে মুখ করা। ইয়াতিশখানার সঙ্গে এর যোগ ছিল বলে মনে হয় না। হাউস-ই শিরিনের উত্তর-পশ্চিমে আর একটি শৌচাগার দেখা যায়। এর পশ্চিমে চারটি ঘর এবং এগুলির সামনে বাঁকানো দেউড়ি। এখান

থেকে ছোট পথ দিয়ে পশ্চিম দিকের আর একটি হাম্মামে যাওয়া যায় যার সামনে একটা ছোট উঠোন রয়েছে। এই হাম্মামের তিনটি চৌকো ঘর এবং একটি কেন্দ্রীয় স্নানাগার রয়েছে যেটি অষ্টকোণ। এই হাম্মামের গম্বুজ দেওয়া ছাদ রয়েছে।

প্রথম চত্বরের উত্তরে পর পর দুটি বাঁধানো চত্বর রয়েছে। এর পশ্চিমে তিনটি ঘর পাশাপাশি। তৃতীয় ঘরটির দুটো দরজা—উত্তরমুখী ও পশ্চিমমুখী। তৃতীয় দরজাটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ঘরগুলির পশ্চিমে একটা বাঁধানো চত্বর। এর উত্তরে দেউড়ির সিঁড়ি যেটা বড় একটা উঠোনে মিলেছে। এখান থেকে হ্রদটা দেখা যায়। পশ্চিমে কিছুদুরে একটা বাঁধানো চত্বর যার দক্ষিণে একটা বড় ঘর রয়েছে। এর সঙ্গে লাগোয়া হাম্মাম ও শৌচাগার। আলিগড়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ আর. সি. গৌড় মনে করছেন যে এই ইয়াতিশখানাটি পশুবিভাগের দারোগার। এরকম মনে করার কারণ হচ্ছে যে এটি আস্তাবল ও চিতাখানার কাছে। কোনও পরিষ্কার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

মোগল শাসনতন্ত্রে হারেমের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল কারণ সম্রাটের হারেমের বয়জ্যেষ্ঠা মহিলার কাছে দুটি রাজকীয় সিলমোহর গচ্ছিত থাকত যেগুলি ছাড়া সম্রাটের ফরমানের কোনও গুরুত্ব ছিল না। আকবরের মা হামিদ বানু বেগমকে দরবারে মরিয়াম মাকানি বলে অভিহিত করা হত। তিনিই ছিলেন বয়জ্যেষ্ঠা। ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্লখমান আকবরের সাতটি স্ত্রীর কথা বলেছেন যদিও আসলে এর থেকে বেশি সংখ্যা ছিল। এ ছাড়াও আকবরের প্রধান ওমরাহর মহিলারা হারেমে মাসখানেক থাকতে পারত। এটি নিয়ে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকলেও আকবর ওইসব মহিলাদের সম্মানহানি করেছেন এরকম উল্লেখ কোথাও পাওয়া না। আবুল ফজল বলেছেন যে আকবর তাঁর পাঁচ হাজার স্ত্রীকে আলাদা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাদরি মনসারেট বলছেন যে আকবরের তিনশো স্ত্রী বড় প্রাসাদে আলাদা ঘরে থাকত। বর্তমান হারেমের অবস্থা দেখে এই দুটোই অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

হারেমের মধ্যে সব থেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বাড়িকে সাধারণত বলা হয় *যোধা বাঈ*-এর প্রাসাদ। দক্ষিণের দিকে স্নানাগার ও শৌচাগার। উত্তরে ঝোলানো বারান্দা ও নিচু রাস্তা, জিনিস রাখার ঘর ও ছোট হারেম ছিল পশ্চিমে। এর ঢোকার পথ ছিল একটাই পুবের দিকে একটা বড় চত্বর পেরিয়ে। এর বাঁ দিকে ছিল একটা পাথরের ছোট রক্ষীঘর, যেখানে বিশ্বাসী রাজপুতরা পাহারারত থাকত। বর্তমানে নিচু পথটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটির মধ্যে দিয়ে দৌলতখানায় যাতায়াত করা যেত। পরদার মতো দেওয়াল দিয়ে ঢাকা এ পথ দিয়ে সম্রাট খোয়াবগাহ থেকে হারেমের যে কোনও জায়গায় যেতে পারতেন।

এটি একটি বিরাট বড় বাড়ি। এর প্রধান ঢুকবার পথটি ছিল দোতলা, যেখানে খোজারা পাহারা দিত। অন্ধকার পথ দিয়ে ভিতরে গেলে পথটি প্রথমে দক্ষিণে ও পরে বাঁ দিকে বেঁকে দিয়েছে যাতে লোকেরা এর চৌকোনো উঠোন ও তার মাঝের ফোয়ারা দেখতে না পায়। বাড়িটির জমি, স্তম্ভ ইত্যাদি হিন্দু স্থাপত্যের আদলে গড়া—ঘণ্টা-শিকল, পদ্ম ইত্যাদি অলংকারে ভূষিত। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ছাদে ঘননীল রঙের টালি দিয়ে ঢাকা। স্নানাগার ও শৌচাগারটি ভাল অবস্থায় রয়েছে।

উত্তর দিকে এর সঙ্গে লাগানো *হাওয়া মহল*। দোতলা বাড়ির দোতলায় পাথরের পরদা দিয়ে ঢাকা। উত্তর দিকের প্রধান ঘর দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি আছে। এখানেই সম্রাট এসে বিশ্রাম করতেন বলে প্রবাদ আছে। হাওয়া মহল পারস্য দেশের উঁচু মিনারের মতন যার সঙ্গে ইটালির ঘণ্টা-মিনারের সাদৃশ্য আছে। হাওয়া মহল থেকে ঢাকা পথ দিয়ে মহিলাদের বাগানে ও এর পরে হাতিপোলে যাবার ব্যবস্থা ছিল।

পণ্ডিতদের মধ্যে এ বাড়িটি যোধা বাঈয়ের জন্য তৈরি হয়েছিল কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ১৫৮৫ সালে সলিমের দ্বিতীয় বিবাহ হয় যোধপুরের রাজা উদয় সিংহের মেয়ের সঙ্গে। তার জন্য এটি তৈরি হয়নি এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। আবুল ফজল একটি বাড়ির কথা বলেছেন যেখানে আকবর রাতে ঘুমোতে যেতেন। ওই বাড়িকে এই বাড়ি বলে মনে করা যেতে পারে। বদাওনির লেখা থেকে দেখা যায় যে আকবরের রাজপুত মহিলারা এখানে থাকতেন এবং আকবর এখানে হোম করতেন। বদাওনি তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেছেন।

দিওয়ানখানা-ই আম থেকে পাঁচমহল-এ সহজেই আসা যায়। স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে চারতলা উঁচু সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে। জমিতে চুরাশিটি স্তম্ভ রয়েছে। প্রথম তলায় ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ। দ্বিতীয়টিতে বিশটি, তৃতীয়তে বারোটি ও উপরের চারটি স্তম্ভকে একটা গম্বুজওয়ালা ছত্রি ধরে রেখেছে। সব মিলিয়ে ১৭৬টি স্তম্ভ ও দক্ষিণের দিকে তলাগুলি ছোট হয়ে আসছে। সাধারণত ভারতে মাটির নীচে ঘর থাকে গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য যাকে *তাহখানা* বলা হয়। পারসিকরা উঁচু বাড়ি তৈরি করে গরমের হাত এড়ানোর চেষ্টা করেছিল যাকে *বাদগির* বলা হত। ফতেপুরে শক্ত পাথুরে জমিতে মাটির নীচে ঘর করা শক্ত বলে বাদগির ধরনের বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। যোধা বাঈ-এর বাড়িটিও অনেকটা এই ধরনের এ কথা বলা হয়েছে। অবশ্য বাদগির-এর সঙ্গে এ বাড়িগুলির তফাত আছে। বাদগিরের মতন মিনার নয় যদিও ক্রমশ উপরে উঠতে উঠতে ছোট হয়ে আসছে। সাধারণত বাড়িগুলি তিনতলা হত, এখানে পাঁচতলা, সম্ভবত গরমের দিনে *খাস টাট্টি* ব্যবহার করা হত। উল্লেখযোগ্য যে প্রথম তলার কোনও স্তম্ভের সঙ্গে আরেকটার মিল নেই। অলংকারের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে—হিন্দু ঘণ্টা-শিকলও দেখা যায়।

প্রধান হারেমের চত্বরে উত্তর-পশ্চিম দিকে যে বাড়িটি আছে তাকে *সুনহারা মাকান* (সোনার বাড়ি) বা মরিয়াম কা কোঠি বলা হয়। ভিতরের দেওয়াল চিত্রণের বর্ণাঢ্য সম্ভার থেকে এরকম বলা হয়। উত্তর দিকে রাম ও হনুমানের চেহারা দেখা যায়—পরিষ্কার হিন্দু ছাপ এখানকার বৈশিষ্ট্য। সোনার জলে সারা বাড়ি চিত্রিত করা হয়েছিল। কবি ফৈজির লেখা কবিতার অংশবিশেষও রয়েছে।

সাধারণ লোকে এ বাড়িটিকে আকবরের পর্তুগিজ স্ত্রী মারিয়ামের বাড়ি বলে ধরে। এটি আকবরের সময়কার দুই মহিলার মারিয়াস নাম থেকে ভুল করে আসতে পারে। পর্তুগিজ স্ত্রীর কোনও উল্লেখ ইতিহাসে নেই। বরং হিন্দু ভাস্কর্যের ছাপ থাকায় মনে করা যেতে পারে যে এটি আকবরের প্রথম রাজপুত স্ত্রী মরিয়াম জামানির (বিবাহ ১৫৬২) বাড়ি। কিন্তু মরিয়াম জামানি এখানে থাকেননি বা মূর্তি পুজোও করেননি।

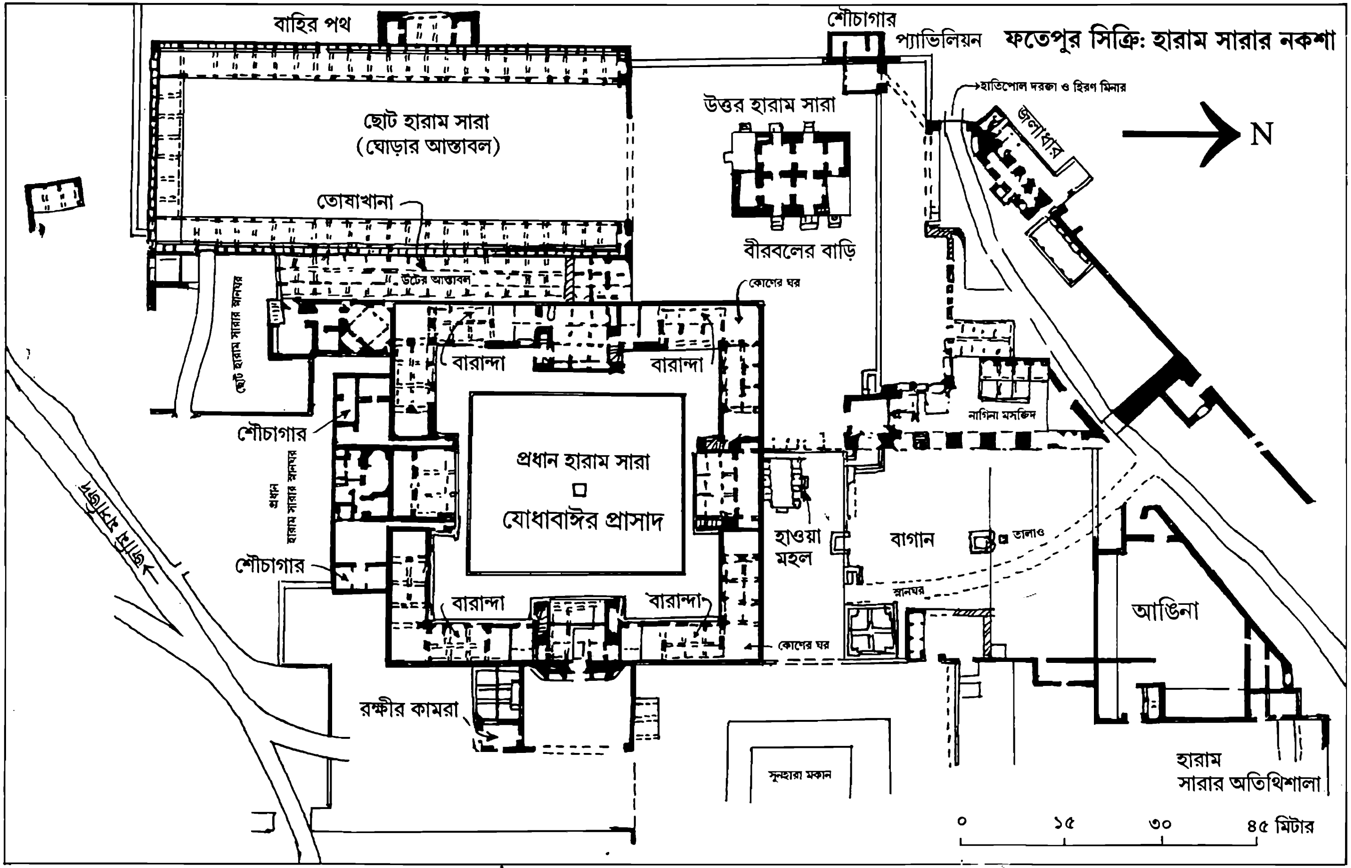
ফতেপুর সিক্রি: হারাম সারার নকশা
N
শৌচাগার
প্যাভিলিয়ন
হাতিপোল দরজা ও হিরণ মিনার
জলাধার
বাহির পথ
ছোট হারাম সারা
(ঘোড়ার আস্তাবল)
তোষাখানা
উটের আস্তাবল
উত্তর হারাম সারা
বীরবলের বাড়ি
কোণের ঘর
ছোট হারাম সারার স্নানঘর
বারান্দা
বারান্দা
শৌচাগার
প্রধান হারাম সারা
যোধাবাঈর প্রাসাদ
প্রধান হারাম সারার স্নানঘর
শৌচাগার
বারান্দা
বারান্দা
কোণের ঘর
নাগিনা মসজিদ
হাওয়া মহল
বাগান
তালাও
স্নানঘর
আঙিনা
জামা মসজিদ
রক্ষীর কামরা
সুনহারা মকান
হারাম সারার অতিথিশালা
০
১৫
৩০
৪৫ মিটার

সৌজন্য: ফতেপুর সিক্রি; আর্কিওলজিকাল সারভে অভ ইন্ডিয়া

উনি হারেমের অন্যান্য রাজপুত মহিলাদের সঙ্গে থাকতেন।

এ বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোলে ছিল পাঁচিল ঘেরা বাগান। একটা ছোট দরজা দিয়ে এখানে ঢুকতে হত যার পাশে ছিল রক্ষীদের ঘর। অন্যান্য মোগল বাগানের মতোই এটি চাহার বাগের ধাঁচে গড়া। সোজা পথ গিয়ে আরেকটি পথকে ছেদ করে চলে গিয়েছে। পথগুলির মধ্যে ছিল নল যেখানে জল আসত উত্তর দিকে জলের জায়গা থেকে। বাগানের মাঝখানে ছিল মাছের পুকুর যার জল আসত মধ্যবর্তী নল থেকে। উত্তর দিকের দেওয়ালে, যার উপর দিয়ে জল আসত, ছোট ছোট চোদ্দটি খাপ ছিল যেখানে আলো জ্বালানো হত। এর উপর দিয়েই জল বয়ে যেত কিন্তু প্রদীপে জল লাগত না। বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল স্নানাগার। মাটির কিছুটা নীচে ছিল বলে এর অনেকখানি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বাগানের মধ্য দিয়ে ছোট দরজা দিয়ে নাগিনা মসজিদে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয়। মোগল ভাষায় নাগিনা মানে ছোট যেটা হারেমের মহিলাদের জন্য পৃথক করে রাখা হয়েছিল।

হারেমের মধ্যে একটা বাড়িকে হাসপাতাল বলা হয়। বাড়িটি কোষাখানার দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। এটা হাসপাতাল বলে কোনও সমকালীন লেখক বর্ণনা করেননি—এমনকী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও কোনও উল্লেখ নেই। মনে হয় এটা উচ্চবিত্ত মহিলাদের বিশ্রামের জন্য যাঁরা হারেমে মাসখানেকের জন্য আসতেন। এটা মনে করার কারণ এই যে এর সঙ্গে সরাইখানার গঠনের মিল দেখা যায়। এখান থেকে উঠোনে সুনহারা মাকানের সামনে এলে লাল পাথরের একটা বাড়ি দেখা যায় যাকে যোধা বাঈ-এর রান্নাঘর বলে বলা হয়। কিন্তু এটি আসলে হারেমের দপ্তরখানা। এর একটা ঢালু ছাদ ছিল যেটা ভেঙে সমতল ছাদ করা হয়েছে কোন কারণে সেটা জানা যায় না। বাড়ির বাইরের অসাধারণ ভাস্কর্যর কাজ রয়ে গিয়েছে যা ফতেপুরের অন্যান্য বাড়ির থেকে কিছু পরিমাণে পৃথক।

হারেমের উত্তর দিকের বাড়িকে রাজা বীরবলের বাড়ি বলা হয়। কিন্তু এটি বীরবলের বাড়ি নয় বা কোনও পুরুষের বাড়িও নয় কেননা এটি হারেমের অন্তর্গত। বোধহয় এ বাড়িতে আকবরের দুই স্ত্রী—রুকেইয়া বেগম এবং সলিমা সুলতানা বেগম থাকতেন। বাড়িটি দোতলা। মাঝখানে চারটি চতুষ্কোণ ঘর। উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্বের ঘরগুলির উপরে ঘর আছে যেগুলির থেকে বারান্দায় যাওয়া যায়। উত্তর-পূর্বে ও দক্ষিণ-পশ্চিমের কোনাতে উপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে বীরবল এখানে থাকতেন না যদিও সাধারণ লোকের এটাই বিশ্বাস। বীরবলকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথার জন্য আকবরের সভার নবরত্নর একজন বলে ধরা হয়। এই বাড়িটির নীচের তলাটি হিন্দু আদর্শে গড়া যদিও দোতলাটি মুসলমানি ধরনের। ফলে এটি হিন্দুর বাড়ি বলে ধরে নেওয়া হয়। ১৫৭২ সালে যখন বাড়িটি তৈরি হয়, তখন বীরবল আকবরের নেকনজরে পড়েননি। অতএব এ বাড়িতে তিনি থাকতেন এটা মানতে বাধা আছে। আকবর বীরবলের জন্য আলাদা বাড়ি তৈরি করান এবং সেটি তৈরি করা হয় ১৫৮২ সালে। জানুয়ারি ১৫৮৩ সালে বীরবলের আমন্ত্রণে সম্রাট ওই বাড়িতে যান। এটি পাথরের তৈরি এবং সুরজ পোলের কাছে ছিল। প্রাসাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বীরবলের বাড়ি ছিল বলে মনে হয় না।

যোধা বাঈ-এর বাড়ির পিছনের বাড়িটাকে কেউ কেউ বলেছেন উটের আস্তাবল, কেউ বলেছেন *ফিলখানা* বা হাতির আস্তাবল। এর কোনওটিই এটি নয়। কারণ প্রাসাদের অত কাছে আস্তাবল থাকতে পারে না। হারেমের অনেক দেওয়াল ভেঙে গেলেও বোঝা যায় যে হারেমকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার সব ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য লোহার আংটা ইত্যাদি থাকায় পশুদের বাঁধার ব্যবস্থা ছিল বলে বলা যায়। কিন্তু হারেমের এত কাছে আস্তাবলের মতো একটা জায়গা ছিল এটা বিশ্বাস করা যায় না। বরং বলা যায় যে এ জায়গাটা হারেমের মহিলাদের দাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এর পূর্ব দিকে একটা হাম্মাম ও শৌচাগার এটাই নির্দেশ করে। উঠোন থেকে হাতিপোল পর্যন্ত পথের দুধারে ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। এগুলি সম্ভবত রক্ষীদের ঘর ছিল।

একটা বড় প্লাস্টার করা বাড়িকেই বলা যেতে পারে *কবুতরখানা* বা পায়রার বাড়ি। ইংরেজ ঐতিহাসিক ই. বি. স্মিথ একে বারুদখানা বলেছেন যেটা অসম্ভব নয়। নিচু জায়গার বিপরীত দিকে ফিলখানা বা হাতির আস্তাবল বলে বলা হয়। যদিও লোহার আংটা এখানে আছে তবুও একে হাতির আস্তাবল বলে বলা শক্ত। মনে হয় রক্ষীদের ঘর ছিল।

এরই অদূরে বিখ্যাত হাতিপোল দরজা যাকে পাদরি মনসারেট বলেছেন 'সার্কাস দরজা'। এর মধ্য দিয়ে সম্রাট নীচে পোলো খেলার মাঠে যেতেন। মাঝখানের খিলানটি একটু বাঁকা—দেওয়াল লাল পাথরের। দুপাশে রক্ষীদের জায়গা ও দুটো হাতির মূর্তি দুদিকে বিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এ দুটি মূর্তি ভাস্কর্য নয়—পাথরের টুকরো থেকে কেটে বের করা। এর অদূরে *সঙ্গীন বুরজ* যেটা ফতেপুরের প্রধান নক্করখানা। এখান থেকে প্রতি ঘণ্টায় ড্রাম বাজানো হত ও সম্রাটের যাতায়াতের সময় জানিয়ে দেওয়া হত।

আমরা এর আগে দেখেছি যে আকবর কাবুল যাবার পরেই যে এই শহর পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে বলা হয় এটা ঠিক নয়। সম্প্রতি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও সর্বভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে একটা বিরাট প্রাসাদ চত্বর বের করেছেন। এটি হাতিপোল সরাইর ঠিক পিছনে। এই সরাই অঞ্চলে অনেকগুলি ধ্বংসস্তূপ আছে যেগুলি দপ্তর বা ইয়াতিশখানা বলে ধরা যায়। এর পূর্ব দিকের দেওয়ালটি *সমোশা মহল*-এর গায়ে লাগা। দক্ষিণ দিকে ছিল জামা মসজিদ ও কয়েকটি বাড়ি যার একটিকে আবুল ফজল ও ফৈজির বাড়ি বলে বলা হয়। এর কিছু দূরে পশ্চিমে ছিল পুরনো চিস্তিদের থাকার এলাকা, শেখপুরা এবং রংমহল যেখানে জাহাঙ্গিরের জন্ম হয়েছিল।

এই প্রাসাদ চত্বরটিতে আছে আটাশটা ঘর, একটা হাম্মাম, গোসলখানা, শৌচাগার, তিন কামরা বিশিষ্ট ছত্রি হ্রদের উপর, বিশাল জল রাখার চৌবাচ্চা, সুন্দর সুন্দর জলের নালি, ফোয়ারা, বিশাল দরজা ও মাটির নীচের ঘর। পুরো প্রাসাদ চত্বরটি তিনটি ভাগে বিভক্ত—সব থেকে বড় অংশ ছিল উত্তর-পশ্চিম দিকে যেদিকটা আর দুটো অংশ থেকে পাঁচিল দিয়ে আলাদা করা। দেওয়ালটি বাগানের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে গিয়েছে। বাগানটি মোগল যুগের চাহারবাগ ধাঁচের বাগান যার

মধ্যে দিয়ে বাঁধানো নালি দিয়ে জল আসত। মাঝখানে একটা জলের জায়গা ছিল যার মধ্যে হয়তো আগে একটা ফোয়ারা ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে এই প্রাসাদ চত্বরে আসার মুখে বিরাট দরজা রয়েছে। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার কিছু অদলবদল করা হয় এবং দরজাটি ঘরে পরিণত করা হয়। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে সারি দিয়ে ছটা অসংলগ্ন ঘরও তৈরি করা হয়েছিল। এই ঘরগুলিতে তাক রয়েছে যদিও প্রথম দিকের তৈরি ঘরগুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই।

চাহারবাগ ছাড়িয়ে উত্তরের দিকে সমোশা মহলের কাছে আছে গম্বুজ দেওয়া বড় একটা হাম্মাম। এখানেই উঁচু জমি নিচু হতে শুরু করেছে। হাম্মামের তিনটি ঘর রয়েছে স্নানের তিনটি ঘর ছাড়া। পোড়ামাটির নালি ও বাঁধানো চৌবাচ্চাও আছে। খুব সুন্দর এই বাড়িটার দেওয়ালে নানারকম ফলফুল খোদাই করা। দরজার পশ্চিম দিকে একটা বড় ঢাকা জলাধার যার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে শৌচাগার। আরও পশ্চিমে জলাধার যার সঙ্গে এই চত্বরের জলের নালির যোগ আছে। এই জলাধারগুলির তলায় মাটির নীচে কতকগুলি ঘর আছে যাদের মধ্যে সংযোগ রয়েছে। মনে করা যায় যে এই সমগ্র চত্বরটিই দৌলতখানা।

এগুলি পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে গেলে চত্বরের দ্বিতীয় অংশ দেখা যায়। চারপাশে ঘেরা এই অংশের মধ্যে সাতটি ঘর আছে। এ ছাড়া রয়েছে বাঁধানো নিচু চবুতরা এবং একটা বড় উঠোন। মনে হয় এটি ছিল চত্বরের গুদাম। তৃতীয় এবং ছোট অংশটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে। অন্য দুটি অংশের থেকে এটি নিচু জমিতে করা। এর মধ্যে একই ধরনের আটটি চতুষ্কোণ ঘর এবং হ্রদের উপরে একটা বড় ছত্রি আছে। এখান থেকে হ্রদের কাছে যাবার সিঁড়ি আছে। হ্রদ এবং অন্যান্য অংশের দৃশ্য এই ছত্রি থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। পুরো এলাকাটাই পালিশ করা পাথর দিয়ে তৈরি।

এই বিরাট প্রাসাদ চত্বরটি কার ছিল এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। আলিগড়ের প্রাক্তন প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি এই অনুসন্ধানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মনে করেছেন যে এ চত্বরটি আকবরের হারেমের অংশ। কিন্তু চত্বরটির অবস্থানের ফলে এই মত মেনে নেওয়া শক্ত। চত্বরটির চারপাশের রয়েছে সমোশা মহল, জামা মসজিদ, হাতিপোল সরাইয়ের দারোগার বাড়ি এবং চিস্তিদের থাকার জায়গা। এ ছাড়া শেখপুরার সঙ্গে হাতিপোল দরজার পথ এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। আমলাদের বাড়ি ও অন্যান্য ইয়াতিশখানাগুলিও কাছেই। হারেমের মহিলাদের জন্য এই জায়গা মোটেও ঠিক নয়। কিন্তু চত্বরটি এত বিশাল যে একে আমলাদের বাড়ি বা দপ্তরও বলা যায় না। সাধারণত আমলাদের বাড়ি বা দপ্তর সমানভাবে কাটা নয় এমন পাথরের টুকরো দিয়ে করা। কিন্তু এই চত্বরে পরিষ্কারভাবে কাটা পাথর লাগানো হয়েছে।

এ ছাড়াও দেয়ালচিত্র, ভিতরের ভাস্কর্য ও দেওয়ালের কাজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিতরের দেওয়ালচিত্রগুলি তাজমহলের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। এমনকী মাটির নীচের ঘরগুলিও সাদা জমির উপর লাল রং করা। এই ধরনের কাজ প্রধানত শাহজাহানের আমলের। এর থেকে মনে হয় যে শাহজাহানের সময়েই এটি তৈরি হয়েছিল। শাহজাহানের সময়কার মুহম্মদ ওয়ারিশ ১৬৫২-৫৩ সালে লিখছেন

যে তেসরা জানুয়ারি ১৬৫২ সালে শাহজাহান রূপবাস থেকে ফতেপুর এসে দৌলতখানায় যান যেটি ফতেপুরের তালাওর কাছে তৈরি করা হয়েছিল। শাহজাহান আবার ফতেপুরে আসেন ২৪ ডিসেম্বর ১৬৫৩ সালে এবং ফতেপুরের তালাওর কাছে *দৌলতখানা-ই মুয়াল্লায়* যান। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ১৬৫২ সালের (নাদিম রেজাভি ভুল করে ১৬৫৩ বলেছেন) আগেই প্রাসাদ চত্বরটি তৈরি করা হয়েছিল যেটি ছিল হ্রদের ধারে। এটাই ওই দৌলতখানা সেটি পরিষ্কার। এমন হতে পারে যে আকবরের সময়ে এখানে একটি বাড়ি ছিল যেটির অদলবদল ও সাজানোগুছানো শাহজাহানের সময়ে হয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মোগল যুগের ফতেপুরে এটাই ছিল শেষ বাড়ি যেটি তৈরি করা হয়েছিল।

টিলার সব থেকে উঁচু জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল জামা মসজিদ। বদাওনি বলছেন যে এটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর এবং এটা শেষ হয় ১৫৭১-৭২ সালে। মসজিদে ঢোকার আগে পড়ে *বাদশাহি দরওয়াজা* । আকবর প্রাসাদ থেকে এই দরজা দিয়ে প্রার্থনা করতে আসতেন। এর পরে উঠোন ও সলিম চিস্তির মার্বল পাথরের সমাধি। এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বৃষ্টির জল ধরে রাখার কুয়ো যাকে *বিরকা* বলা হয়। শেখ সলিমের সমাধির পূর্ব কোণে একটা বড় লাল বাড়ি আছে যাকে *জামাতখানা* বলা হয়। এখানে শিষ্যরা ধর্মীয় কাজ করেন। এর চারপাশে অনেকের কবর আছে যার মধ্যে ইসলাম খানের কবর উল্লেখযোগ্য। জামা মসজিদের উঠোন থেকে *বুলন্দ দরওয়াজায়* আসা যায়। ১৫৭৩ সালে গুজরাট বিজয়ের পর ফতেপুরে ফিরে এসে আকবর সিক্রির নামকরণ করেন ফতেপুর ও সম্ভবত তার পরই এই দরজা তৈরি করান। এর শিলালেখ তৈরি করার সময় দেখা যাচ্ছে ১৫৭৫-৭৬। এর সামনে বিরাট জলাধার আছে যাকে হিন্দিতে *কালরি* বলে। বুলন্দ দরজার সামনে একটা হাম্মাম আছে, যেটা সম্ভবত নবাব ইসলাম খান সর্বসাধারণের জন্য তৈরি করেছিলেন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে লঙ্গরখানা ছিল বলে মনে করা হয়। মসজিদের পিছনে একটা কবরখানা আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কবরখানাকে ডান দিকে রেখে এগোলে একটা পুরনো লাল বাড়ি দেখা যায়। এর ডান দিকে পাথর কাটার কারিগরদের মসজিদ। মনে করা হয় যে ১৫৬৫ সালে আগ্রা তৈরি করার সময় পাথর কাটার কারিগররা এখানে থাকতেন ও তাঁরাই এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের বিপরীতে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা দরজা দেখা যায় যার মধ্যে দিয়ে এগোলে শেখ সলিম চিস্তির বাড়ি ও উঠোনের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৮১০ সালে এই বাড়িটার অদলবদল করা হয়। মসজিদের পাশের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে রংমহলের দক্ষিণ দিকের দরজায় যাওয়া যায়।

১৫৬৯ সালে যুবরাজ সলিমের মার জন্য আকবর রংমহল তৈরি করেন। ভাস্কর্যের দিক দিয়ে এটি ফতেপুরের উল্লেখযোগ্য বাড়ি। বর্তমানে এখানে তাঁতের কারখানা চালানো হয়। এর উত্তর দিকের অংশটি এই শতাব্দীতেই ভেঙে পড়েছে। বহু স্তম্ভ নিয়ে গিয়েছে এবং এখন এটা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ দিকের দরজায় শৌচাগার করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিকের অংশে সাদা চুন লাগানোর ফলে ভিতরের রং চাপা পড়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের

অংশটাই ঠিক আছে। উপরের তলায় দক্ষিণ দিকের ছত্রিটি আছে। দক্ষিণ-পূর্ব থেকে মসজিদের দেওয়াল ও বুলন্দ দরওয়াজা দেখা যায়। শেখ সলিম চিস্তির বাড়ির দিকে মুখ করা ছত্রিটি ভেঙে গিয়েছে।

অভিজাতদের বাড়িগুলির কিছু অংশ আছে। সমকালীন ঐতিহাসিক আরিফ কান্দাহারি লিখছেন যে আকবর মোগল অভিজাতদের আদেশ দিয়েছিলেন টিলার উপরে বাড়ি বানাতে। এ ছাড়াও তারা শহরের অন্যান্য জায়গায় বাগান সমেত বাড়ি বানাতে পারত। পাদরি মনসারেট মুসলমান অভিজাতদের বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে ওদের বাড়ি অনেক ধরনের চিত্রবিচিত্র ও ভাস্কর্যের কাজ করা। ওদের সাজানো বাগানের মধ্যে মাছের চৌবাচ্চা আছে। তার চারপাশে রঙিন টালি দিয়ে ঢাকা। উঠোন রয়েছে যার পথগুলি ইটের বা মার্বল পাথরের যদিও ওই বাড়ির বাইরের অংশটি সাধারণ ও আকর্ষণীয় নয়।

তানসেনের বরাদরি ও টিলার উপরে খান-ই খানানের হাভেলির মধ্যে তিনটি বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। দূর থেকে এগুলিকে একটা বাড়ির অংশ মনে হলেও, আসলে আলাদা। পূর্ব দিকের বাড়িটি উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করা কিন্তু পাশের বাড়িগুলি এর গায়ে এসে ভেঙে পড়েছে বলে এর দরজা কোথায় ছিল সেটা পরিষ্কার নয়। এ বাড়ির সামনের পথটি টিলার নীচের দোকানগুলির সামনের পথে মিলেছে। ধ্বংসস্তূপ সরানোর পর এই পুরনো পথটি পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে প্রধান প্রবেশ পথটি এই পথের ধারেই ছিল। এর থেকে কিছু উপরে তিনটে ছোট ছোট ঘর একটা বারান্দা সমেত পাওয়া যায়। এগুলি সম্ভবত দাসদের বা রক্ষীদের ঘর ছিল। এর মুখের পূর্ব দিকে একটা হাম্মাম দেখা যায়। এর একটা ঘর এবং এটি টিলার বাড়ির থেকে নিচুতে যেখানে যাবার জন্য কয়েকটি সিঁড়ি রয়েছে। প্রধান পথ থেকে ছোট একটা পথ দিয়ে ওই হাম্মামে যেতে হয় দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে। এই দরজা থেকে উঠোনে যাওয়া যায় যার সঙ্গে হাম্মামের সংযোগ রয়েছে। হাম্মামের প্রধান ঘরটি চতুষ্কোণ—খিলান দেওয়া ছাদ যার মাঝখানে ফাঁক রয়েছে। ভিতরের দেওয়ালে তাক রয়েছে। ছাদের উপরে একটা গম্বুজ রয়েছে যেটা ঠিক মাঝখানে নেই। এই হাম্মামের পাশে, পথের ধারে আরও দুটো ছোট ঘর আছে।

বাড়িটির ভিতরে ঢুকলে প্রথমে পাওয়া যায় দেউড়ি। এর পর আছে উঠোন। এর উত্তর দিকটা লাল পাথর দিয়ে বাঁধানো। এই উঠোনের মাঝখানে একটা কিছুর ধ্বংসাবশেষ আছে যার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। দেউড়ি থেকে একটা অষ্টকোণাকৃতি ঘরে যাওয়া যায়। এটি পশ্চিমে এবং সম্ভবত জল রাখার জায়গা। ঘরে মাঝখানে একটু উঁচু একটা বাঁধানো চত্বর। দক্ষিণ-পশ্চিমের দরজা দিয়ে শৌচাগারে যাওয়া যায় যেখানে নালি দেখা যায়। ঘরের চারকোণে জলের ঘড়া রাখার জন্য পাথরের জায়গা আছে। এই শৌচাগারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে একটা বারান্দায় যাওয়া যায়, যার সঙ্গে রয়েছে লাগোয়া তিনটি ঘর।

দেউড়ি থেকে উঠোনে গিয়ে পশ্চিমে গেলে একটা অষ্টকোণাকৃতি ঘর পাওয়া যায়। এর সঙ্গে লাগোয়া ও উত্তর দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আর একটা ঘর আছে। এটিকে রান্নাঘর ও আবদারখানা বলে মনে করা যেতে পারে। আগে ঘরগুলির মধ্য

দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল এখন ধ্বংসস্তূপের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই বড় শৌচাগারের বিপরীত দিকে এবং হাম্মামের সঙ্গে লাগানো আর একটা ঘর ও একটি ছোট শৌচাগার দেখা যায়। একটা নালি এর মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। এর উত্তর দিক দিয়ে একটা সরু করিডর চলে গিয়েছে দেউড়ির দিকে। আরও পূর্ব দিকে একটা বাঁধানো চত্বর, ছোট ঘর ও আর একটি বাঁধানো চত্বর। এর উত্তর দিকে চারটি ঘর পাওয়া যায় যার প্রত্যেকটির সঙ্গে অন্যটির যোগ ছিল। এদের দরজা দিয়ে উঠোনে যাওয়া যায়। দরজা ও উঠোনের মধ্যে ঢাকা পথ ছিল লাল পাথর দিয়ে করা। আর একটি দেউড়ি দেখা যায় বাড়িটির উত্তর-পূর্ব কোণে। এর দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া যেত। উঠোনের চারপাশ ঘিরে আরও ঘর ও শৌচাগার আছে। সমস্ত বাড়িটাই পাথরের টুকরো দিয়ে করা। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম দেউড়ির পাশের দুটি ঘর লাখৌরি ইটের তৈরি। অন্যান্য কোনও কোনও জায়গাতেও এই ধরনের ইটের ব্যবহার দেখা যায়। মনে করা হচ্ছে পরে কোনও সময়ে বাড়িটির সংস্কার করা হলে ইটের ব্যবহার করা হয়েছিল। চুন সুরকির কাজ মেঝে ও দেওয়ালে পাওয়া যায়। প্লাস্টার ব্যবহার করা হয়েছিল বহু ক্ষেত্রে। এমনকী নালিতেও করা হয়েছিল। নালি দিয়ে জল যেত ছোট ছোট চৌবাচ্চায়। প্রধান দেউড়ির কোনায় যে চৌবাচ্চা ছিল তার মধ্যে দিয়েই জল বাইরে বেরিয়ে যেত।

হাতিপোল থেকে ডাইনে গেলে নিচু গম্বুজ দেওয়া ভাঙাচোরা বাড়ির সারি দেখা যায়। এগুলির থেকে নীচের কুয়ো থেকে ওপরে জল তোলা হত। একটা বড় কুয়োর সঙ্গে লাগানো দুটো ঘর রয়েছে যেখানে লোকেরা হাতল ঘুরিয়ে জল তুলত। কুয়োটি ডান দিকে একটু দূরে। বাইরের থেকে দেখলে অষ্টকোণ এবং ভিতরে নীচে নামার সিঁড়ি আছে। ওপরে উত্তর ও দক্ষিণের ঘরের ছাদে বড় কাঠের বিমের সঙ্গে পুলি লাগানো আছে। হাতল ঘুরিয়ে পুলির সাহায্যে জল তোলা হত। বালতি জলে ভর্তি হয়ে উপরে উঠলে লোকেরা খালি করে দিত এবং ঢালু ছাদ দিয়ে জল নীচে গড়িয়ে প্রথম জলের মিনারে যেত। ওখান থেকে আবার একই পদ্ধতির সাহায্যে জল ওপরে তোলা হত যেখান থেকে জল নালির দেওয়ালে পড়ত। আবার একই পদ্ধতিতে দেওয়ালের নালি থেকে জল তোলা হত। এর পরে চতুর্থ ও পঞ্চম বার জল তোলা হত ওপরে। জল অনেকগুলি নালিতে পড়ত। অনুপ তালাও-র জলও এখান থেকে যেত। তার জল উদ্বৃত্ত হলে হাউস-ই শিরিন-এ পড়ত।

দৌলতখানা-ই খাস-এর পূর্ব দিকে একটা পাথরের চৌবাচ্চা আছে যার ওপর আগে ছিল পাথর দিয়ে ঢাকা। এর নীচের একটা গর্ত দিয়ে জলের নালি আছে যেখান থেকে জল নিয়ে সম্রাটের বাঁধানো হাম্মামে পড়ত। এই জলে সুগন্ধি মেশানো হত বলে প্রবাদ আছে। হাতিপোলের নীচে উঁচু হিরণ মিনার। জনশ্রুতি আছে যে জাহাঙ্গির এখানে হরিণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাদরি মনসারেটের মতে এটা পথের দূরত্ব নির্ধারণ করার জন্য করা। মনে হয় এটি ছিল আকাশদীপ—ওপরে আলো লাগানো হয়েছিল যাতে পথ চেনা যায়।

টিলার নীচে ছিল হাড়া মহল। সাধারণত বলা হয় যে বুঁদির রাজা সুর্জন সিং এখানে থাকতেন। এটি আসলে রাজার বিশ্রামের বাড়ি। এটি অষ্টকোণাকৃতি দোতলা

বাড়ি চারপাশে স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা। এর পাশেই লাল পাথরের অষ্টকোণাকৃতি ছোট বাড়ি আছে যাকে ভুল করে কুশখানা বা পায়রার বাড়ি বলা হয়। এটি আসলে হ্রদের জলের মধ্যে ছত্রি। এর উপরের অংশটি ভেঙে গিয়েছে। হাতিপোলের উপর থেকে সরাইখানা দেখা যায়। দরজাটি ঠিক আছে এবং ভিতরের প্লাস্টারও ভাল আছে। মধ্যেকার উঠোনের চারপাশে ঘর। পশ্চিম দিকে লাল পাথরের বাড়িটি দারোগার বাড়ি। এর পশ্চিমে ঢালু জমিতে ত্রিকোণ একটি বাড়িকে সমোশা মহল বলে। আসল নাম বা কী উদ্দেশে করা জানা যায় না। এর ভিতরের উঠোনটিও ত্রিকোণাকৃতি এবং স্তম্ভ দিয়ে সাজানো।

অনুপ তালাওর পূর্ব দিকে ছিল সম্রাটের ব্যক্তিগত স্নানাগার যাকে তুর্কি সুলতানার স্নানাগার বলা হয়। উত্তর দিকের জলের জায়গা থেকে সুগন্ধী জল আসার ব্যবস্থা ছিল যদিও প্রধানত জল আসত দক্ষিণ দিক থেকে। ভিতরে প্লাস্টার করা ও সাদা জমির উপর লাল, হলুদ ও কালো রঙের চিহ্ন দেখা যায়। মেঝে সারানো হয়েছে।

টিলার দক্ষিণ দিকে দপ্তরখানার নীচে সুখতালের দক্ষিণের স্নানাগারকে হাকিমের স্নানাগার বলা হয়। এর উপরে গম্বুজ ছিল। অনেকগুলি স্নানাগার এখানে তৈরি করেছিলেন জিলানের হাকিম ভাইরা যাঁদের বাড়ি কাছেই ছিল। এগুলি উচ্চ আমলা ও সম্রাটের জন্য। স্নানাগারগুলির মধ্যে কাপড় বদলানোর ঘর, গরম ও ঠাণ্ডা জলের ঘর, মালিশ করার জন্য দুটি বড় ঘর এবং শৌচাগার ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা কুয়ো ছিল যেখান থেকে লোকেরা দড়ির সাহায্যে জল তুলত। এই জল বাড়ির মধ্যে একটা বড় বাঁধানো চৌবাচ্চায় পড়ত। দক্ষিণ দিকের জলের জায়গা থেকেও জল আসত বলে বোঝা যায়।

দক্ষিণ দিকের জল প্রধানত আসত একটা গভীর অষ্টকোণ কুয়ো থেকে। এর সঙ্গে তিনতলা একটা সৌধ যার ঘরগুলি থেকে পুলির সাহায্যে জল তোলা হত। এর বিপরীত দিকের প্রাসাদকে শাহকুলির প্রাসাদ বলা হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনিই এই কুয়ো তৈরি করেছিলেন। উত্তর দিকের মতোই এখানেও পাঁচটি ধাপে জল তোলা হত। নালিগুলি এখন আর নেই। মনে করা যেতে পারে যে দরবারের স্নানাগার ইত্যাদিতে এখান থেকেই জল যেত।

দপ্তরখানার নীচে যে বিরাট হ্রদ রয়েছে সেটিই ফতেপুরের সব থেকে বড় হ্রদ। এর নাম সুখতাল। দক্ষিণ দিকের জলের জায়গা থেকে জল তোলার সঙ্গে এর যোগ আছে। উত্তর দিক দিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি আছে। এখন শুধু বর্ষার জল রয়েছে। সাধারণত বলা হয় যে আকবর এখানেই পয়সা ফেলতেন যার থেকে এই নামকরণ হয়েছে। দিওয়ানখানা-ই আম-এর উত্তর দিকে হাউস-ই শিরিনের সঙ্গে একে মেলানো উচিত নয়। জল না থাকার ফলে বর্তমানে একে সুখা তালাও বা শুকনো পুকুর বলা হয়।

বর্তমান শহর থেকে পুরনো শহরের দেওয়াল জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে যার মধ্যে ছিল অগণিত বাড়ি, আস্তাবল, বাজার, সরাই ইত্যাদি। বর্তমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি মাত্র বাড়ি রয়েছে। এটি আছে বিয়ানার পথ এবং গোয়ালিয়র দরজার মধ্যে। অষ্টকোণাকৃতি এই বাড়ির সঙ্গে রাজার বিশ্রামকক্ষের সাদৃশ্য আছে।

একে সাধারণত বলা হয় রাজা তোডরমলের বরাদরি যদিও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ফতেপুরের দেওয়ালের বাইরেও শহর বাড়ছিল বেশ আগে থেকেই। বিয়ানা যাবার পথের তেরহা দরওয়াজার দক্ষিণ পাশে বাহাউদ্দিন-এর সমাধি ও মসজিদ আছে। নিচু একটা দেওয়াল ঘিরে রেখেছে এবং সমাধির সামনে যে ফাঁক আছে সেখানে কাঠের দরজা ছিল মনে করা যেতে পারে। কিন্তু দেওয়ালটা মসজিদকে সম্পূর্ণ ঘিরে থাকেনি এবং মসজিদের প্রায় তৃতীয়-চতুর্থাংশ নিয়ে বর্তমান রাস্তা হয়েছে।

বাহাউদ্দিনের মৃত্যু হয় ১৬১০-১১ সালের মার্চ মাসে। ওই একই বছরে মসজিদটি শেষ করা হয়। বাহাউদ্দিন ফতেপুর তৈরি করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং দরবার ও শহরের অধিকাংশ লোক চলে গেলেও তিনি ফতেপুরে থাকতেন। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে তিনি ছিলেন ওই নির্মাণ কার্যের ওভারসিয়ার! কিন্তু তাঁর কোনও উপাধি বা মর্যাদা ইতিহাসের পাতায় নেই। উনি নিজেকে সম্রাট জাহাঙ্গিরে *চুণা পাজ* বা চুন পোড়ানোর লোক বলে বলেছেন। মনে হয় তাঁর টাকা পয়সা ভালই ছিল। দুটি সৌধই লাল পাথরের এবং একদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফতেপুরের স্থাপত্যর যে পরিবর্তন আসছিল তার একটা ধাপ বলে ধরা যায়। ফতেপুরের বাড়িগুলির থেকে এই সৌধ দুটি পৃথক।

আগ্রা যাবার পথে মিধকুরে সুলতানা সলিমা বেগম একটা বাগান করেছিলেন যেখানে তাঁকে ১৬১৩ সালে সমাধিস্থ করা হয়। এখন বাগানটি আর নেই। এর পাশে মির মুহম্মদ মাসুম নামির মসজিদ রয়েছে ওঁর শিলালেখ করা। নামি বুলন্দ দরওয়াজার উপর ১৬০১ সালে শিলালেখ তৈরি করেছিলেন। ভরতপুর পথের ধারে আকবরের তেহরা মরি বাঁধ আছে। এর ডান দিকে প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া বাঁধানো চত্বরের উপরে রয়েছে লাল পাথরের তৈরি শেখ মুসার সমাধি। শেখ মুসা ছিলেন শেখ সলিমের ভাই। এর বাঁ দিকে দেড় কিলোমিটার দুরে রয়েছে ওঁর ছেলে শেখ ইব্রাহিমের গম্বুজওয়ালা সমাধি যা দেখবার মতো।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ ফতেপুরে এসেছিলেন। আগ্রা থেকে ফতেপুরে যান যেখানে রাজা তাঁর দরবার বসান। এই শহরটি আগ্রার থেকে বড় কিন্তু এর বাড়ি ও পথগুলি আগ্রার মতন সুন্দর নয়। এখানে বহু লোক থাকে— হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই। এই দুই শহরের যে কোনও একটাই লন্ডনের চাইতে বড় এবং লোকসংখ্যা খুব বেশি। এই দুই শহরের দূরত্ব হচ্ছে বারো মাইল, কিন্তু সমস্ত পথটাই বাজার ও জিনিস দিয়ে ভরা। মনে হয় যেন একই শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শহর পরিত্যক্ত হবার পরই নিকোলাস ওরথিংটন এসেছিলেন ১৬২২ সালের পর। পাথরের উপর তৈরি করা এ শহরকে উনি বলেছেন বিচিত্র। উনি বলেছেন যে আগ্রার দুর্গ তৈরি হবার পর ফতেপুরের ভাঙন শুরু হয় এবং তখন ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল। এর মসজিদের প্রশংসা করেছেন।

ফতেপুরের সৌধ, হাম্মাম, হ্রদ ও বাঁধ একটা বিরাট পরিকল্পনার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ ছাড়াও এর পিছনে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় ছিল যার আলোচনা

অধ্যাপক ইরফান হাবিব করেছেন। আমরা এর থেকে একটা সারাংশ নীচে দিচ্ছি।

ফতেপুর সিক্রি তৈরি হয়েছিল প্রায় ষোলো বছর ধরে ১৫৬৯ থেকে ১৫৮৫ সাল পর্যন্ত। ১৫৬৮-৬৯ সালে সিক্রি টিলার উপর এর ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথা থেকে ১৫৭৯ সাল পর্যন্ত অবিরাম কাজ চলতে থাকে। জাহাঙ্গির বলছেন যে জামা মসজিদ (সম্ভবত বুলন্দ দরওয়াজা সমেত) বানাতে পাঁচ লক্ষ টাকা লেগেছিল। এর মধ্যে মার্বল পাথরের হিসেব নেই কারণ ওগুলি পরে লাগানো হয়। পেলসার্ট বলছেন যে এখানকার রাজপ্রাসাদ, অন্যান্য সৌধ ও পাঁচিল তৈরি করতে পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এর মধ্যে জামা মসজিদের হিসেব ধরা না থাকলে, মোট খরচ পড়েছিল বিশ লক্ষ টাকা। অন্যান্য জায়গায় আকবরের বাড়ি তৈরি করতেও কাছাকাছি খরচ হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের মতে আগ্রা দুর্গ ও অন্যান্য বাড়ি তৈরি করতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। পেলসার্ট এই খরচকে পঁচিশ লক্ষ বলেছেন। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি তৈরি করতেও খরচ পড়েছিল পনেরো লক্ষ টাকা বলে জাহাঙ্গিরের কাছে হিসেব দাখিল করা হয়েছিল। এলাহাবাদের দুর্গ তৈরি করতে খরচ পড়েছিল বারো লক্ষ টাকা। এসব দেখে বলা যায় যে বিশ লক্ষ টাকা ফতেপুরের জন্য খরচ অস্বাভাবিক নয়।

মনে করা হয় যে আরও বেশি খরচ হয়েছিল। কারণ পেলসার্টের হিসেবে হ্রদ, বাঁধ, জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি ধরা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। ফতেপুরের কাছে জাহাঙ্গির যখন পাঁচিল দেওয়া ও জলের ব্যবস্থা করা বাড়ি সমেত বাগান বানান, তখন খরচ পড়েছিল প্রায় দু লক্ষ টাকার কাছাকাছি। সুতরাং ফতেপুরের জলের ব্যবস্থা, হ্রদ কাটা, বাঁধ বানানো ইত্যাদি ধরলে মোট খরচ দাঁড়াবে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা। এই খরচ করা হয়েছিল ষোলো বছরের মধ্যে যা বাৎসরিক গড়পড়তা দাঁড়াবে দেড় লক্ষ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু যেহেতু এই সময়ের অর্ধেকের আগেই বেশির ভাগ কাজ করা হয়েছিল, সুতরাং টাকার বেশির ভাগ খরচই আগে হয়ে গিয়েছিল যার ফলে বাৎসরিক গড়পড়তার অঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছিল। এরই সঙ্গে আগ্রা দুর্গ তৈরি হয়েছিল। অতএব ওই সময়ে বাৎসরিক খরচও ছিল অনেক বেশি।

প্রশ্ন হতে পারে যে মোগল সাম্রাজ্যের তখন কতটা আয় ছিল যার থেকে এই পরিমাণ ব্যয় শুধু বাড়ি ও থাকার জায়গা ইত্যাদিতে খরচ করা যায়। ১৫৮০ সালে মোগল সাম্রাজ্যের খাজনা পাওয়ার কথা ছিল (*জমা-দমি-দহসালা*) ৩,৬২৯,৭৫৫,২৪৬ দাম (তামার মুদ্রা সাধারণত চল্লিশ দামে এক তঙ্কা)। কিন্তু এই খাজনার অধিকাংশই জাগির হিসেবে অভিজাতদের ও আমলাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৫৯৫-৯৬-এ এই ধরনের লোকেরা, যাদের *মনসবদার* বলা হত, সমগ্র সাম্রাজ্যের খাজনার শতকরা ৮২.১৩ ভাগ নিয়ে নিয়েছিলেন যার হিসেব দিয়েছেন অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি। এই ধরনের সিংহভাগ ছিল মনসবদারদের ধরে নিলে এটা দেখা যায় যে খাজনার মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ রয়েছে সম্রাটের হাতে থাকে। এর ফলে ১৫৮০ সালে সম্রাটের হাতে ছিল দেড় কোটি টাকার মতন। যেহেতু এই হিসেব খাজনা পাওয়ার (*হাসিল*) নয়, শুধু কতটা পাওয়া যেতে পারে (*জমা*) তার হিসেব, সুতরাং বলা যায় যে সম্রাটের হাতে আরও অনেক কম ছিল। তা সত্ত্বেও শুধু

ফতেপুরের বাড়ি বানানোর জন্য সম্রাটের অসুবিধে হবার কথা নয়। সম্রাটের অন্যান্য খরচের যা হিসেব আবুল ফজল দিয়েছেন তার থেকে দেখা যায় যে সম্রাট অন্য দিকে ব্যয় সংকোচ করেননি। ১৫৭৮ সালে যে পরিমাণ মুদ্রা তিনি অনুপ তালাওর জলে ফেলেছেন বা দাক্ষিণ্য করেছেন তার পরিমাণ পনেরো লক্ষ টাকার উপরে হবে। এ সত্ত্বেও কোষাখানায় টাকা জমছিল। ১৫৯৩-৯৪ সালে প্রাসাদের ও রাজধানীর মনসবদারদের মাহিনা দিতে খরচ হয়েছিল তাঁর এক বছরের আয়ের অর্ধেক। সুতরাং মৃত্যুর সময় আকবর প্রচুর পরিমাণে অলংকার, মণিমুক্তা ও মুদ্রা রেখে যেতে পেরেছিলেন। ফতেপুরের খরচ যাই হোক না কেন, এত তাড়াতাড়ি যে আকবর এ জায়গা পরিত্যাগ করে গেলেন, এর থেকেই বোঝা যায় যে ওই ধরনের রাজধানী তিনি অন্য জায়গাতেও বসাতে পারতেন।

ফতেপুরের বিশালতা যাই হোক না কেন এটা মনে রাখা দরকার যে এটাই যে একমাত্র রাজধানী এটা কখনই ঠিক করা হয়নি। বিশাল হারেম ও অন্যান্য আমলা, দাস, দাসী ইত্যাদি সবাইকে ফতেপুরে জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এমনকী তাঁবু খাটালেও যে হত না তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবুল ফজলের দেওয়া হিসেব থেকে। ১৫৯৫-৯৬ সালে আবুল ফজল লিখছেন যে সম্রাট একশো বড় বড় বাড়ি, যার এক একটাই প্রায় শহরের সমান, তৈরি করেছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এগুলি সব ফতেপুরে করা হয়নি, সম্ভবও ছিল না। পরিব্রাজকদের লেখা থেকে দেখা যায় যে ফতেপুরে যখন দরবার রয়েছে, আগ্রা তখনও পরিত্যক্ত হয়নি। আগেই বলা হয়েছে যে প্রধান কোষাখানা ছিল আগ্রায় যেখান থেকে ওটা সরানো হয়নি। ১৫৭৭-৭৮ সালে ফতেপুর থেকে আমলাদের আগ্রায় পাঠানো হয়েছিল ওখানকার কোষাখানার গোলমাল মেটাতে। পরিব্রাজক ফিচও বলেছেন যে এই দুই শহরেই আমলা ও আস্তাবল প্রায় সমান সমান ছিল। এর থেকে অধ্যাপক হাবিব মন্তব্য করছেন যে দুটি শহরই ছিল যুগ্মভাবে রাজধানী।

ফতেপুরে বড় বড় অভিজাতরা বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আবুল ফজল ও ফৈজির বাড়ি এখনও ভুল করে দেখানো হয় যদিও সাম্প্রতিক কালে নাহিদ খান আবুল ফজলের বাড়ি সঠিকভাবে শনাক্ত করেছেন। এটি ছিল দোতলা ও অনেক ঘর সম্বলিত। মহিলাদের ঘরগুলি ছিল দোতলায় যেখান থেকে নীচে হাম্মাম ও শৌচাগারে যাওয়া যেত। কিন্তু পেলসার্ট আগ্রার অভিজাতদের বাড়ির যা বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে বোঝা যায় যে কেন অভিজাতদের বাড়িগুলি শহর পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়েছিল। পেলসার্ট বলছেন যে অভিজাতদের তিন-চারটি স্ত্রী থাকলেও সকলেই একটা বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়িতে থাকে। স্ত্রীদের আলাদা ঘর ও দশ-বিশজন দাসী থাকে। দোতলা বলতে প্রায় একটা ছাদ। বাড়ির মধ্যে বাগান ও পুকুর আছে। প্রতিদিনই বলদের সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তোলা হয়। এইসব বাড়ি কয়েক বছরের বেশি টেকে না কারণ এর দেওয়ালগুলি মাটির যার উপর সাদা রং চুনকাম করে লাগানো। বাইরে বসার ঘর (*দেওয়ানখানা*) আছে যার উপর সুন্দর গালিচা বিছানো।

এই ধরনের বাড়ি যদি ফতেপুরেও তৈরি হয়ে থাকে তা হলে বোঝা যায় যে

প্রাসাদ এলাকা ছাড়া বাকি বাড়িগুলি কেন ভেঙে পড়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে প্রাসাদ এলাকার বাড়িগুলি প্রধানত পাথরের টুকরো দিয়ে করা ফলে সেগুলি টিকে গিয়েছে।

১৫৬৯ সালে যুবরাজ সলিমের জন্ম হবার আগে সিক্রি ছিল একটা ছোট শহর। টিলার নীচে ছিল হ্রদ যাতে বর্ষায় জল জমা হত এবং যেখানে থেকে শহরের জল সরবরাহ হত। ১৫৬৩-৬৪ সালে মক্কা থেকে ফিরে শেখ সলিম তাঁর খানকা বসালে ধীরে ধীরে লোকবসতি শুরু হতে থাকে। ১৫৬০-এর দশকে আগা দুর্গ তৈরি করা শুরু হলে এখানকার পাথর কেটে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হত। ফতেপুর আগ্রা-আজমির পথের উপরে হলেও নীলের উৎপাদনের জন্য বিয়ানা শহর তখন অনেক বড় ছিল। একমাত্র টিলার উপরে ছাড়া ফতেপুরের আর কোনও প্রাকৃতিক সুবিধে ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে জাঠরা নাজফখানকে আগ্রা থেকে তাড়ালে তিনি সৈন্য নিয়ে ফতেপুরে আসেন কিন্তু কয়েকদিন পরেই চলে যান। সামরিক দিক থেকে এর গুরুত্ব বিশেষ কিছু ছিল না।

কিন্তু ১৫৭১-৭২ সাল থেকে সম্রাটের দরবার এখানে বসলে পর পরিবর্তন শুরু হয়। সম্রাট ও অভিজাতদের জন্য প্রতিদিনই বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ক্রমবর্ধমান শহরের অধিবাসীদের খাওয়াদাওয়া ও জামাকাপড় সরবরাহ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফতেপুরে যে একটিই শিল্প শুরু হয়েছিল প্রধানত উচ্চবিত্তদের তাগিদে, সেটি হচ্ছে উলের গালিচা শিল্প। পেলসার্ট এই শিল্প যে আগ্রা ও ফতেপুরে ছিল তার কথা বলেছেন। এটি প্রধানত ইরানি গালিচা-কারিগরদের এনে শুরু করা হয়েছিল যার কথা আবুল ফজল বলেছেন। শহর পরিত্যক্ত হলেও এ শিল্পটি চলে যায়নি।

আকবর নিজেই বাজার তৈরি করার আদেশ দিয়েছিলেন ১৫৭৬-৭৭ সালে। ওঁর আদেশ ছিল যে *দরবার-ই-বাদশাহি* থেকে আগ্রার দরজা পর্যন্ত একটা বাজার বসানো হোক। রাস্তার দুপাশে থাকবে লাল পাথর ও চুন দিয়ে করা ছোট ছোট দোকান। এ ছাড়াও দরবারের কাছে একটা চতুষ্কোণ বাজার চক (চাহার-সুক), যার চারপাশে দোকান থাকবে, করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পরিব্রাজক ফিঞ্চ এইসব বাজার দোকানের ভগ্নাবশেষ দেখেছেন। বর্তমান কালে আলিগড়ের অধ্যাপক গৌড়ের নেতৃত্বে এগুলি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ফতেপুর যে ক্রমশ বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় টাঁকশাল তৈরি করা থেকে। আগ্রায় একটি টাঁকশাল আগেই ছিল। যেহেতু যে কোনও লোক মোগল টাঁকশাল থেকে খরচ দিয়ে টাকা করাতে পারত, সুতরাং ওই টাঁকশালে তৈরি মুদ্রার পরিমাণ থেকে জানা যায় যে কী ধরনের চাহিদা ছিল। ১৬৭৭-৭৮ সালে ফতেপুরে টাঁকশালের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সমকালীন আকরে। এই টাঁকশালটি ছিল বিখ্যাত চিত্রকর খাজা আবদুস সামাদের অধীনে। ১৫৮৫ সালে ঐতিহাসিক বায়াজিদ বায়াৎ এর দারোগা নিযুক্ত হন। এর পরে আর কোনও অধ্যক্ষর কথা না জানলেও, এই টাঁকশালে ১৫৯৫-৯৬ সালের আগে পর্যন্ত মুদ্রা করা হত বলে মনে হয়। আবুল ফজল *আইনে* যে মুদ্রার তালিকা দিয়েছেন, সেখানে এখানকার কোনও

মুদ্রার উল্লেখ নেই।

১৫৭১-৭২ সাল থেকে ফতেপুর টাঁকশাল থেকে তামার মুদ্রা বেরোতে থাকে যার সংখ্যা আগ্রার থেকে বেশি ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সোনা ও রূপার মুদ্রা ১৫৭৭-৭৮ সাল থেকে ১৫৮১-৮২ সাল পর্যন্ত ছিল অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। কিন্তু এই সময়ে এর উৎপাদন আগ্রার থেকে বেশি ছিল। আগ্রার রূপা ও তামার মুদ্রার উৎপাদন ফতেপুরের থেকে কম ছিল বলে দেখা যায়। মনে হয় আগ্রা থেকে ফতেপুরে দরবার সরে এলে আগ্রার ব্যবসার একটা বিরাট অংশ ফতেপুরে চলে আসে। এটা অবশ্য খুব পরিষ্কার নয় যে ফতেপুরের টাঁকশালে উৎপাদন ১৫৮৫ সাল পর্যন্ত হলেও, ১৫৮১-৮২-র পর সোনা বা রূপার মুদ্রা আর পাওয়া যায় না। এটাও উল্লেখযোগ্য যে আগ্রার টাঁকশালের উৎপাদনের একটা ফাঁক দেখা যায় ১৫৮০-৮১ সালের পর এবং ১৫৯৫-৯৬ সালের পর আবার এখানকার উৎপাদন দেখা যায়। সুতরাং ১৫৮৫ সালে ফতেপুর রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হবার আগেই ১৫৮০-৮১ সালে টাঁকশালের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কেন আগ্রা ও ফতেপুরের টাঁকশাল একই সময়ে বন্ধ হয়েছিল এক কারণ জানা যায়নি। দরবার ফতেপুরে আসার আগেই সাধারণ ও গরিব লোকেরা ফতেপুরে এসেছিল। প্রাসাদ ও মসজিদ তৈরি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিক ও কিছু দক্ষ কারিগররা এসেছিল। এদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়নি। কারণ কোনও হিসেব নেই। কিন্তু আকবরের অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা আনুমানিক হিসেব পাওয়া যায়।

১৫৬৪-৬৫ সাল থেকে ১৫৭১-৭২ সাল পর্যন্ত আগ্রার দুর্গ তৈরি হবার সময় প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজার দক্ষ বাস্তুকার ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল। অন্তত আবুল ফজল এই হিসেবই দিয়েছেন। কিন্তু আরও আগের একটি আকরে আমরা আর একটা তথ্য পাই, যেটি এই তথ্য থেকে ভিন্ন। সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রতিদিন দু হাজার পাথর কাটার কারিগর, দু হাজার প্লাস্টার করার কারিগর এবং আট হাজার অদক্ষ শ্রমিক যারা পাথর বয়ে নিয়ে আসত, কাজ করত। পরিব্রাজক হকিন্স বলেছেন যে ১৬১১ সালে সিকান্দ্রা তৈরির সময় তিন হাজার শ্রমিক কাজ করেছিল। উইলিয়াম ফিঞ্চ বলেছেন যে বিশ বছর ধরে এলাহাবাদ দুর্গ তৈরি হবার সময় অন্তত তিন হাজার লোক কাজ করছিল ও পরবর্তীকালে পাঁচ হাজার লোক কাজ করত। এসব হিসেব করে অধ্যাপক হাবিব ধরেছেন যে ফতেপুর সিক্রিতে প্রাসাদ, মসজিদ, শহরের পাঁচিল ইত্যাদিতে পাঁচ থেকে আট হাজার লোক কাজ করত। এ ছাড়াও অভিজাতদের বাড়ি তৈরি করার জন্যও একই সময়ে লোক লাগত। সুতরাং ১৫৭০ সালে ফতেপুরে প্রায় দশ হাজার লোক কাজ করত এটা মেনে নেওয়া যায়। এর পরে অবশ্য এ সংখ্যা তাড়াতাড়ি কমে যায়।

আকবরের সঙ্গেই আগ্রা থেকে ফতেপুরে তাঁর দাসদাসী, অনুচর ও রক্ষীরা চলে যায়। আবুল ফজলের দেওয়া তথ্যর উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক হাবিব এ সংখ্যা ধরেছেন আট হাজার, যার মধ্যে ছিল দ্বাররক্ষক, আহাদি (সম্রাটের ঘোড়সওয়ার) ও বন্দুকধারীরা। এ সংখ্যা মোট ছত্রিশ হাজারের(হকিন্সের তথ্য) এক-চতুর্থাংশের কাছে। হকিন্সের এই লোকগুলি অবশ্য সরকারি কোষাখানা থেকে মাহিনা পেত যার

মধ্যে সাধারণ কাজের ও কিছু উচ্চপদস্থ লোকও আছে। এ প্রসঙ্গে পাদরি মনসারেট ফতেপুরে এদের মুদ্রায় মাহিনা দেবার কথা বলেছেন, সেটি উল্লেখযোগ্য।

অভিজাতদেরও অনুচর ছিল যার সংখ্যা নিয়ে পেলসার্ট মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক হাবিব এদের সংখ্যা ধরেছেন ষোলো হাজার যদিও এটি সম্পূর্ণ আনুমানিক। এত সংখ্যায় লোকের চাহিদা মেটানোর জন্য বহু দোকারদার, বিক্রেতা, কারিগর ইত্যাদির উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। জাহাঙ্গিরের সময়কার আগ্রায় অন্তত দুজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এই ধরনের বহু সংখ্যক লোকের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। হকিন্স বলেছেন যে এখানে একজন ইংরেজের কাজ তিনজন লোক করে। পেলসার্ট বলেছেন যে হল্যান্ডে যে কাজ একজন করে এখানে সেটি চারজন লোক করে। সরকারি লোক বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত লোকেদের সংখ্যা কত এটা জানা যায় না। অধ্যাপক হাবিব এদের সংখ্যাও ধরেছেন ষোলো হাজার।

১৫৭২-৮৫ সালের মধ্যে ফতেপুরে সব ধরনের শ্রমিক ও দাসদাসী, ঠেলাওয়ালা ও অন্যান্য কাজের লোক, দোকানদার, মালবিক্রেতা ইত্যাদির সংখ্যা মেলালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদের মধ্যে মহিলা শ্রমিক ও অন্যান্য মহিলার সংখ্যা অনেক কম। যদি এই ধরনের পুরুষদের সংখ্যা ধরা যায়, তা হলে বলা যায় যে তার সংখ্যা দাঁড়াবে পঁয়তাল্লিশ হাজার। সাড়ে চারজনকে নিয়ে, একটি পরিবার ধরলে, সম্পূর্ণ সংখ্যা দাঁড়াবে দু লাখে। এর সঙ্গে অভিজাত, আমলা, পণ্ডিত, বণিক ইত্যাদির পরিবার যোগ দিলে এই সংখ্যা হবে আরও বিশ হাজার অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা, সম্রাটের পরিবার বাদে, দাঁড়াবে দুই লক্ষ বিশ হাজার। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় লণ্ডনের জনসংখ্যা ধরা হয় দু লাখ। ফতেপুরের জনসংখ্যা এর থেকে বেশি ছিল বলে বলা যায়।

এর মধ্যে দুই লক্ষ লোকই গরিব এবং তাদের বাসস্থানের কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এমনকী কোন এলাকায় তারা থাকত, সেটাও সহজে বলা যায় না। বর্তমান দুটি গ্রাম, সিক্রি ও নগর, এদের খুব অল্প একটা অংশই ধরে রেখেছিল। আগ্রায় আমরা দেখেছি যে অভিজাতরা যমুনা নদীর পার দখল করেছিলেন এবং গরিবরা ছিল এদের পিছনের সারিতে। এখানে গরিবরা হ্রদের থেকে বেশি দুরে ছিল বলে মনে হয় না। তাদের মাটির কুটিরের চিহ্ন এখন আর পাওয়া যায় না তবে পেলসার্ট আগ্রাতে এদের বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন। উনি বলছেন, যে এরা থাকত খড়ে ছাওয়া মাটির দেওয়ালের বাসায়। আসবাব কিছুই ছিল না কেবল মাটির কিছু হাঁড়িকুঁড়ি ছাড়া। দুটি বিছানা যার উপর একটাই চাদর। কিন্তু শীতকালে এদের অবস্থা খুব খারাপ হত ঠাণ্ডায় যার জন্য ঘুঁটে দিয়ে এরা আগুন জ্বালাত দরজার বাইরে। ঘরে কোনও চিমনি নেই বা আগুন জ্বালানোর জায়গা নেই। বাইরের আগুনের ধোঁয়া সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ত যার ফলে চোখে জল এসে যেত ও গলা বন্ধ হয়ে যেত।

১৬০৮ সালের পর উইলিয়াম ফিঞ্চ ফতেপুরে এসে শহরের দুর্দশা লক্ষ করেছেন। তাঁর কথা দিয়ে আমরা এই অধ্যায় শেষ করি।

ফিঞ্চ যখন এসেছিলেন তখনও শহরের দেওয়াল অটুট রয়েছে। তিন মাইল অন্তর অন্তর একটা করে দরজা আছে। এরকম চারটি সুন্দর ও শক্ত দরজা আছে। কিন্তু এর

মাঝখানের সবই ধ্বংস্তূপ—প্রায় মরুভূমির মতো। এর মধ্য দিয়ে রাত্রে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। ভিতরের অনেকখানি জায়গাকে বাগান করা হয়েছে। অন্য জায়গায় নীল ও অন্যান্য শস্যর চাষ হচ্ছে। মনে হয় না যে এটা শহরের মধ্যে। আগ্রার দিকে দরজার পর জমিটা কিছু উঁচুতে উঠে গিয়েছে যার উপর শহরতলির ধ্বংসস্তূপ পড়ে রয়েছে। এই একই অবস্থা দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেখানে ভাল ভাল বাড়ি ভেঙে পড়ে আছে। শহরের বাঁ দিকে প্রায় তিন মাইল জুড়ে বাইরে পাঁচিলঘেরা বাগান রয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিকে ঢুকলেই একটা বড় পাথরের বাজার, প্রায় আধমাইল লম্বা, দেখা যায়। এর রাস্তাটি চওড়া ও বাঁধানো এবং এর দুপাশে ভাল বাড়ি রয়েছে। দরজার কাছেই রাজার সরাই পাথরের তৈরি, কিন্তু এখন অনেকটা ভগ্নদশা। রাস্তার মাথায় রয়েছে রাজার বাড়ি, মহল ও অন্যান্য বিচিত্র বাড়ি। আরও দূরে উঁচু জমির উপর পূর্বজগতের সব থেকে ভাল মসজিদ। প্রায় চব্বিশটা কি তিরিশটা সিঁড়ি ভেঙে উঠলে পাওয়া যায় বড় দরজা যেটা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে উঁচু ও সুন্দর। এর চূড়া দেখা যায় প্রায় আট দশ মাইল দূর থেকে। এর ভিতরে বড় একটা সুন্দর উঠোন পাথরে বাঁধানো যেটা লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের থেকে ছয় গুণ বড়। এর পাশ দিয়ে চওড়া হেঁটে যাবার রাস্তা আছে যার স্তম্ভগুলি পাথরের তৈরি। লন্ডনের রাজকীয় এক্সচেঞ্জের চেয়ে এটা চওড়া ও উচ্চতায় দ্বিগুণ। ভিতরে ঢুকবার দরজার পাশে অনেকগুলি ভাল ঘর আছে। এই দরজার বিপরীত দিকে কিছু দূরে একটা বড় সমাধি আছে নানা মণিমুক্তাখচিত। এর ছাদে নানা রকম রঙের চিত্র করা আছে। এখানে শায়িত আছেন এক বড় কালান্দার যার খরচেই এই বড় মসজিদ হয়েছে। উঠোনের নীচের দিকে একটা জলভর্তি বড় জলাধার আছে। শহরের অন্য জায়গার জল খারাপ এবং ওই জল খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে আকবর এ শহর তৈরি শেষ হবার আগেই আগ্রায় চলে যান। সুতরাং এই সুন্দর শহর অল্প দিন পরেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

৯

শাহজাহানাবাদ (দিল্লি)

মোগল শাসকদের মধ্যে শাহজাহানের স্থাপত্য সম্পর্কে অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তাঁর দরবারে যুবরাজ ও অভিজাতরা বিভিন্ন ধরনের বাড়ি ও শহর তৈরির পরিকল্পনা পেশ করতেন। বাড়ি তৈরি হলে নিমন্ত্রিত শাহজাহান এগুলি দেখতে যেতেন যেমন গিয়েছিলেন দারা শুকোর বাসায়। সম্রাট হবার পর তিনি প্রাসাদগুলির কিছু পরিবর্তন করেন। আগ্রাতে আকবরের প্রাসাদ-দুর্গের অনেক জায়গায় তিনি লাল পাথর তুলে মার্বল পাথর লাগিয়েছিলেন। লাহোরে জাহাঙ্গিরের *দেওয়ানখানা-ই খাস*-এর কিছু পরিবর্তন ঘটান। ঝরোখা দর্শনের পাশে, আগ্রা এবং লাহোরে, তিনি *শাহবুরুজ* তৈরি করান এবং *দেওয়ানখানা-ই আম*-এর সামনে চল্লিশ স্তম্ভযুক্ত বড় হল তৈরি করেন।

১৬৩৯ সালে শাহজাহান নতুন রাজধানী তৈরি করা মনস্থ করেন। নিজেকে পূর্ববর্তী সম্রাটদের থেকে পৃথক করে ইতিহাসের পাতায় ছাপ রেখে যাওয়া হয়তো একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বড় কারণ বোধহয় এই যে রাজধানী হিসেবে আগ্রাতে আর কাজ করা যাচ্ছিল না। যমুনা নদী ক্রমাগত পাড় খেয়ে ফেলায় গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং জলের ধারের বহু সৌধ ভেঙে পড়েছিল। দুর্গ-প্রাসাদের প্রধান দরজা লোকজন আসার পক্ষে ছোট হয়ে যাচ্ছিল যার ফলে উৎসবের দিনে বা বিশেষ বিশেষ দিনে ভিড়ে লোক মারাও যেত। বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য সৌধ ক্রমাগত পথের জায়গা নিয়ে নিলে পথগুলিও সরু হয়ে যেতে থাকে।

প্রথমে ভাবা গিয়েছিল যে রাজধানী লাহোরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। লাহোরে লোকসংখ্যা বেশি এবং দেখতে অতটা সুন্দর নয়। শহরটির গড়নও কোনও পরিকল্পনামাফিক হয়নি। সুতরাং লাহোরের প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৬৩৯ সালে শাহজাহান বাস্তুকার ও জ্যোতিষীদের আগ্রা ও লাহোরের মধ্যে রাজধানীর স্থান নির্বাচন করতে আদেশ দেন। এরা যমুনা নদীর পারে একটা উঁচু জায়গায় এই স্থান নির্বাচন করে। প্রায় দেড়শো বছর ধরে দিল্লি রাজধানী না থাকলেও, এটি ভারতের দীর্ঘকালের রাজধানী হিসেবে মুসলমান শাসকবর্গের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। জাহাঙ্গিরের সমকালীন পরিব্রাজকরা বলেছেন যে দিল্লি রাজধানী না থাকলেও সম্রাট শহরকে ভেঙে যেতে দেননি কারণ এটা ছিল পূর্বসূরীদের জন্মস্থান। কিন্তু মুসলমানদের কাছে দিল্লির গুরুত্ব ছিল ধর্মীয় স্থান হিসেবে। এখানে বহু সন্ত ও

ফকিরের সমাধি রয়েছে যার জন্য আকবর ও শাহজাহান এখানে এসেছিলেন। এই কারণে এর নামই ছিল *হজরত দিল্লি*।

১৬৩৯ সালে জ্যোতিষীরা দিল্লির প্রস্তর লাগানোর দিনক্ষণ ঠিক করে দেন। এর জন্য শহরের একটা কুণ্ডলিনীও তৈরি করা হয়েছিল। শহর তৈরি হবার আগে কয়েকজন অপরাধীকে মেরে তাদের মৃতদেহ ওখানে ফেলে দেওয়া হয়। ১৬৩৯ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লির সুবাদার খয়রাত খান ওস্তাদ আহমদ ও ওস্তাদ হামিদকে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করতে আদেশ দেন। ১২ মে ১৬৩৯-এর মধ্যে প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে যায়। যুবরাজ ও উচ্চপদস্থ অভিজাতদের জমি দিয়ে দেওয়া হয় এবং তারাও তাদের বাড়ির কাজ শুরু করে। তিনজন সুবাদারের অধীনে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য সৌধর কাজ চলতে থাকে। চার মাসের মধ্যে খয়রাত খান বাড়ি তৈরির মালমশলা জোগাড় করে ফেলেন ও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ করে রাখেন। আরেকজন সুবাদার আলিবর্দি খানের নেতৃত্বে নদীর দিকের দেওয়াল তোলা শেষ হয়। এর পরের সুবাদার মক্রামত খান দেওয়ালের কাজ, বাগান ও অন্যান্য বাড়ি শেষ করেন।

প্রাসাদ-দুর্গ শেষ হলে শাহজাহানকে জানানো হয়। প্রাসাদের জ্যোতিষীরা ১৯ এপ্রিল ১৬৪৮ সালের দিনকেই পুণ্যদিন বলে স্থির করেন এবং ওই দিনে শাহজাহান *দৌলতখানা-ই খাস*-এ প্রবেশ করেন। উনি নদীর দিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন। এই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসব করা হয় যার জন্য হিন্দুস্থান, কাশ্মীর ও ইরানের সঙ্গীতজ্ঞদের আনানো হয়েছিল। সাদাউল্লা খান পেশকার হিসেবে এই ঘরটিকে চমৎকার আসবাব ও গালিচা দিয়ে সাজিয়েছিলেন যার আনুমানিক মূল্য ছিল ষাট হাজার টাকা। এ ছাড়াও সাদাউল্লা খান একটি কবিতা লিখে *আরামগাহে*-র দেওয়ালে গেঁথে দেন। আলিমর্দান খান আরামগাহ-র (বা *খোয়াবগাহ*) জন্য গালিচা দেন। দেওয়ানখানা-ই আম-এর ছাদ, দেওয়াল ও স্তম্ভ তুর্কির ভেলভেট ও চিনা রেশমের কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়েছিল। এই ঘরের উঠোনে আহমদাবাদের সরকারি কারখানার কারিগররা বড় ছাঁদনা তৈরি করে লাগিয়েছিল। এই জায়গায় প্রায় এক হাজার লোক দাঁড়াতে পারত। রূপার একটা ছোট দেওয়াল দিয়ে এটা ঘেরা হয়েছিল। সম্রাটের সিংহাসনের চারপাশে ছিল সোনার ছোট দেওয়াল। ওঁর সামনে যুবরাজরা ও বড় বড় ওমরাহরা ছোট জায়গায় বসেছিলেন। এখানেই শাহজাহান একটা বিশেষ সাধারণ দরবার করেন এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে *খিলাৎ* দেওয়া হয়। খিলাৎ ছাড়াও দারা শুকো পান একটি হাতি ও ছ হাজার টাকা। ওঁর পদমর্যাদাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাদাউল্লা খান ও মক্রামত খানও বিশেষ খিলাৎ পান ও ওঁদের পদমর্যাদাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল (২৭ ফুট উঁচু, ১২ ফুট চওড়া ও ৩.৮ মাইল লম্বা) শাহজাহানাবাদ শহরকে ঘিরে রেখেছে। ১৬৫১ থেকে ১৬৫৮ সালে তৈরি হয়েছিল যদিও এটাই একমাত্র চেষ্টা নয় দিল্লি শহর ঘেরার। ১৬৫০ সালে একটা মাটির দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু বর্ষায় ভেঙে পড়ে যায়। নতুন পাঁচিলের মধ্যে ছিল সাতাশটি বুরুজ এবং ছোট বড় দরজা। এখন অবশ্য বড় বড় দরজাগুলি ছাড়া আর কিছু শনাক্ত করা যায় না।

পাঁচিলের নিয়মিত ব্যবধানে ছিল সাতটি বড় দরজা যা ব্যবহার করা হত বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য। এ জন্য এদের নামকরণও করা হয়েছিল ওইভাবে - যেমন কাশ্মীরি, মোড়ি, কাবুলি, লাহোরি, আজমিরি, তুর্কোমানি ও আকবরাবাদি। নদীর দিকের দরজাগুলির মাঝে ছিল রাজ ঘাট, কিল্লা ঘাট ও নিগমবোধ ঘাট। এগুলিই ছিল হিন্দুদের পারলৌকিক ক্রিয়া করার ঘাট। বড় দরজাগুলি ছাড়াও ছোট ছোট দরজাগুলি সর্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য। এদের অনেকগুলিই ছিল সাধারণ লোকেদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। যমুনার পারে জিনাৎ-আল মসজিদ দরজা, ফরাসখানা দরজা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শহরের দেওয়ালের মধ্যে দুটি বড় টিলা ছিল। একটি ছিল দেওয়ালের উত্তর-পশ্চিম দিকে *ঝুঝলাল পাহাড়ি* ও অন্যটি *ভুজলাল পাহাড়ি*, প্রায় শহরের মাঝখানে, যার উপর ছিল জামা মসজিদ।

শাহজাহানাবাদের পরিকল্পনার মধ্যে ইসলামীয় ও হিন্দু প্রভাব পড়েছিল। রাস্তার পরিকল্পনা করা হয়েছিল পুরনো হিন্দুশাস্ত্রের স্থাপত্য বিদ্যা ব্যবহার করে। এইসব বাস্তু শাস্ত্রগুলিতে বাড়ি তৈরি করা ও বিভিন্ন ধরনের মহল্লার কথা বলা হয়েছে। একটি বাস্তু শাস্ত্র, *মনসারা* (লেখা আনুমানিক ৪০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দে) ধনুকের পরিকল্পনা দিয়েছিল বিশেষত নদীর ধারের শহর গড়ে উঠবার বেলায়। এই পরিকল্পনা শাহজাহানের ওস্তাদদের প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। উত্তর-দক্ষিণ রাস্তা যেটি আকবরাবাদি দরজা থেকে কাশ্মীরি দরজা পর্যন্ত গিয়েছে, যার মধ্যে ছিল ফৈজ বাজার, হচ্ছে এই ধনুকের ছিলা। যে রাস্তাগুলো দক্ষিণ থেকে পূর্বে তুর্কোমানি দরজা ও আজমিরি দরজাকে লাহোরি দরজার সঙ্গে যোগ করিয়ে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে গিয়ে মোরি ও লাহোরি দরজাতে মিলছে, ছিল ধনুকের বাঁকানো দুটি অংশ। চাঁদনি চক দুর্গের লাহোরি দরজা থেকে শহরের লাহোরি দরজা পর্যন্ত ছিল—এটি ধনুকধারীর হাত। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী দুটি রাস্তার সংযোগস্থল ছিল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই প্রাসাদ-দুর্গ তৈরি করা হয়।

শাহজাহানাবাদের পরিকল্পনায় ইসলামীয় প্রভাব এসেছিল প্রধানত ইরান থেকে। মোগল কলাক্ষেত্রে পারসিক প্রভাব ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। হুমায়ুন প্রায় বারো বছর ইরানে ছিলেন এবং পারসিক দরবারের রীতিনীতি জানতেন। দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য ছিল আকবরের সময় থেকেই শিয়াভাবাপন্ন। এরা পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রেখেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগলরা এই রাজ্যগুলি দখল করলে মোগল দরবারে ইরানি প্রভাব বেড়ে যায়। মোগল রাজ্য স্থাপিত হলে পর ইরান থেকে ক্রমাগত লোক আসতে থাকে। শাহজাহানের সময়ে দেখা যায় যে মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ওমরাহ ছিলেন ইরানি যার মধ্যে আমরা পাই শায়েস্তা খান, আসফ খান, জাফর খান, মক্রামত খান ও আলিমর্দান খান। এইসব সাফাবিদ ওমরাহ ছাড়াও পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, হাকিম ইত্যাদিরা মোগল দরবারে এসেছিলেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে বদাওনি বলছেন যে ইরানের প্রায় সব বড় কবি, প্রায় ১৭০ জন, মোগল দরবারে এসেছিলেন। আবদুর রহিম খান-ই খানান তাঁর নিজের অধীনে বারুলি নামে এক ইরানিয়ান বাস্তুকারকে রেখেছিলেন যিনি আগে সাফাবিদ সম্রাটদের কাছে কাজ করেছেন। উনি

বুরহানপুরে জাহাঙ্গিরপুর নামে এক মহল্লার রাস্তা ও বাজার তৈরি করেন। লাহোর দুর্গের টালির কাজ করেছিলেন এক পারসিক। এ ছাড়াও দার্শনিকরা এসেছিলেন যাদের মধ্যে আমরা মির আবদুল কাশিম বলে একজনের নাম পাই। আসফ খান একে দুবার শাহজাহানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। উনি অবশ্য শেষে ইরানে ফিরে যান।

ইসলামীয় ধারণায় শহরকে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অনেক সময় মানুষের শরীরকে শহরের কেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শরীরের চারটি অঙ্গ চারটি দরজার সঙ্গে তুলনীয়। পরম্পরা অনুযায়ী ইসলামীয় শহরের কল্পনা শাহজাহানাবাদেও পাওয়া যায়। চাঁদনি চক হচ্ছে মেরুদণ্ড, মাথা হচ্ছে প্রাসাদ-দুর্গ ও জামা মসজিদ হৃদয়। প্রাসাদ-দুর্গটি পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ করা। চাঁদনি চক পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ও জামা মসজিদের মুখও পশ্চিম দিকে। শহরের দরজাগুলি বিশ্বরূপ ও চারদিকের আটটি দরজা স্বর্গের চার দরজার সঙ্গে তুলনীয়।

শাহজাহানের প্রাসাদ-দুর্গকে সরকারি দলিল দস্তাবেজে ও সভাক্ষেত্রে বলা হত *কিলা মুবারক* (পুণ্য দুর্গ)। ফতেপুর সিক্রির পাহাড় থেকে লাল পাথর নিয়ে যমুনার পাড়ে একটু উঁচু জমির উপর করা হয়েছিল। শহরের দুর্গ পাঁচিল ছিল যমুনার ধারে। প্রায় দু মাইল অনিয়মিত অষ্টকোণ ঘিরে পাঁচিলটা ছিল। এটির ভিতরের জায়গা ছিল আগ্রার আকবরের দুর্গ এলাকার দ্বিগুণ এবং প্রায় ১২৫ একর জায়গা ঘিরে ছিল (৩১০০ ফুট × ১৬৫০ ফুট)। নদীর দিকে পাঁচিলের উচ্চতা ছিল ষাট ফুট কিন্তু শহরের দিকে এটি ছিল ৭৫ ফুট। জমিতে এটি চওড়া ছিল ৪৫ ফুট—এখানে সরু হয়ে উপরে ৩০ ফুট হয়েছিল। বিরাট চারটি দরজা, দুটো ছোট দরজা এবং একুশটি বুরুজ নিয়ে প্রাসাদ-দুর্গ ঘেরা। লাহোরি ও আকবরাবাদি দরজা দুটিই ছিল প্রধান দরজা। দুটি দরজার সামনে শাহজাহান প্রমাণ মাপের দুটি জোড়া হাতির মূর্তি বসিয়েছিলেন। ঔরংজেব সম্রাট হয়ে এ দুটি ভেঙে ফেলেন। এর বদলে তিনি ওই দুটি দরজাকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন এবং লাহোরি দরজাতেই কিলাধ্যক্ষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সলিমগড় দরজা ও নদীর দিকের দরজা ছিল আর দুটি দরজা। সলিমগড় দরজা ও শাহবুরুজের মধ্যে ছিল ছোট একটা দরজা এবং অন্য আর একটি ছিল জাহানারা বেগমের বাসার কিছু দক্ষিণে। এই খোলা জায়গা দিয়ে বড় একটা নালি নদীতে পড়েছিল।

স্থলের দিকে একটা বড় পরিখা দুর্গটিকে ঘিরে ছিল। এর পিছনে ছিল তিনটি বাগান যেগুলি দুর্গ ও শহরের মধ্যে ছিল। লাহোরি দরজা ও দুটি বড় রাস্তার সংযোগস্থলের মধ্যে ছিল বড় একটা চক। এখানে পাহারা দেবার সময় রাজপুত ওমরাহরা তাঁদের সৈন্য রাখতেন ও পরীক্ষকরা সৈন্য পরীক্ষা করত। পূর্ব দিকে নদীর ধারে ছিল বালুকাময় একটা জায়গা। এখানেই লোকেরা সকালে সম্রাটকে দর্শন করত। পরে বিকেলে এখানে হাতির লড়াই হত সম্রাট ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে ও অন্য সময় মনসবদাররা তাঁদের সৈন্যদের সম্রাটের সামনে কুচকাওয়াজ করাতেন। উত্তর-দক্ষিণ রাস্তা আকবরাবাদি ও সলিমগড় দরজাকে দুইভাগে ভাগ করেছিল। বড় ভাগটির মধ্যে প্রবেশ সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটি ছিল নদীর দিকে। এর মধ্যে বাসস্থান

ও দপ্তরখানা দুইই ছিল।

দক্ষিণ দিকের ভাগটি ছিল হারেম এবং এখানে সম্রাট, তাঁর ছেলেরা ও হারেমের দাসীরা ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারত না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এদিকের অনেক সৌধ ভেঙে যায়। এদিকের সব থেকে বড় বাড়ি হচ্ছে *ইমতিয়াজ মহল* বা *মমতাজ মহল*। পরবর্তীকালে একে বলা হয়েছে *রংমহল*। এ বাড়ির ছাদের ভিতরের দিক ছিল রং করা ও জায়গায় জায়গায় সোনা দিয়ে বাঁধানো। চার কোণে চারটি খস ঝোলানোর জায়গা ছিল এবং এই চার কোণের উপর দিকে গম্বুজ সোনা দিয়ে মোড়া। বাড়ির সামনে বড় একটা বাগান যার মধ্যে মার্বল দিয়ে করা জলাধার রয়েছে। শাহজাহানের সিংহাসনের (*দেওয়ান-ই-আম*) পিছন দিক দিয়ে একটা ছোট দরজা ও পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে এই বাগানে যাওয়া যেত। প্রতিদিনের দরবারের পর শাহজাহান এই বাগান দিয়ে ইমতিয়াজ মহলে যেতেন।

এই মহলের উত্তরে ছিল মার্বল দিয়ে করা একটি বাড়ি যাকে আরামগাহ বা খোয়াবগাহ বলা হত। এখানে সম্রাট ঘুমোতেন। এর পূর্ব দিকের দেওয়াল থেকে একটা ঝুল-বারান্দা বেরিয়ে আছে যাকে *ঝরোখা-ই দর্শন* ও পরে *মুসলমান বুরজ* বলা হত। এর ভিতরের দেওয়াল ছিল নানা রঙে চিত্রিত করা। একটা মার্বলের পরদা নদীর দিক থেকে এটিকে আড়াল করে রেখেছে। প্রতিদিন সকালে শাহজাহান এই বারান্দা থেকে সাধারণ লোকেদের আর্জি গ্রহণ করতেন।

ইমতিয়াজ মহলের দক্ষিণে ছিল হারেম। এর ঘরগুলি ছিল সোনার জল দিয়ে ও নানা রঙে চিত্রিত করা। ভিতরের ছোট ছোট পথগুলি নানা রঙের পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো যার ফলে বাসস্থানগুলি আলাদা ভাবে ছিল। উঠোনে এক কেন্দ্রীয় জলাধারের চারপাশে ছিল ছোট ছোট বাগান। একটা বড় খালের (*নহর-ই বিহিস্ত* বা স্বর্গীয় খাল) জল এর মধ্য দিয়ে বয়ে যেত এবং ওই জলের মাধ্যমে ফোয়ারা চালু হত। এর মধ্যে বড় বাড়িটি ছিল জাহানারা বেগমের যে বাড়িটিকে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা মমতাজ মহল বলে অভিহিত করেছেন। আসলে এই নামে অন্য একটি বাড়িকে বলা হত। একটা সুন্দর মার্বল পরদা নদীর দিক থেকে এই বাড়িকে আলাদা করে রেখেছে। এর দেওয়াল ও ছাদে ছিল কাচের টুকরো বসানো। বিধবা ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য আলাদা বাড়ি ছিল যাকে বলা হয় *খাওয়াসপুরা*।

ভিতরের উত্তর দিকের অংশে ছিল প্রাসাদের দপ্তর। ইমতিয়াজ মহলের পশ্চিম দিকে আছে দেওয়ান-ই আম। এর প্রায় ছয় ফুট উঁচুতে একটা মার্বল পাথর দিয়ে ঘেরা জায়গায় শাহজাহান বসতেন। এর ঠিক নীচে মার্বল বাঁধানো চত্বরে অভিজাতরা নানা ধরনের আর্জি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। হলটি খোলা এবং চল্লিশটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর উঠোনের তিন দিকে সারিবদ্ধভাবে আছে একই ধরনের ঘর যেখানে আমিররা পাহারায় থাকতেন। এই উঠোনের পশ্চিম দিকে আছে *নক্করখানা* বা ঢাক ও সঙ্গীতের ঘর।। দেওয়ান-ই আমের বিরাট দরজা দিয়ে ঢুকে যাওয়া যেত। দরবারের সময় সঙ্গীত বাজানো হত। উঠোনের উত্তর দিকের একটা ছোট দরজা দিয়ে দেওয়ান-ই খাসে যাওয়া যায়।

দেওয়ান-ই আমের পূর্ব দিকে ছিল দেওয়ান-ই খাস যাকে অনেক সময় *শাহমহল*

ও *গোসলখানা* বলা হত। এটিকে প্রাসাদের সবথেকে সুন্দর বলা যায় কারণ এটি সম্পূর্ণই মার্বল পাথর দিয়ে করা। এর দেওয়ালের নীচের দিকে লাগানো ছিল নানাধরনের মণিমুক্তা এবং ছাদের ভিতরের দিকে ছিল লতাপাতা, গাছ ও ফলের নানা রঙের চিত্র। ছোট ছোট কাচের টুকরো লাগানো ছিল দেওয়ালে ও ছাদের ভিতরের দিকে। চারটি গম্বুজ আছে চার কোনায়। ঘরের মাঝখানে ছিল বিরাট একটা সিংহাসন যেটি রুবি, হিরে ও মুক্তা দিয়ে ঢাকা ছিল। দুটি পাখাওয়ালা ময়ূর ছিল সিংহাসনের ছাদের দুদিকে যার থেকে এটিকে বলা হত ময়ূর সিংহাসন। এই সিংহাসন নিয়ে নানারকম প্রবাদ থাকলেও, এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে এটি ফরাসি স্বর্ণকারের করা নয়। নাদির শাহ এটি লুঠ করে পারস্যে নিয়ে যান।

এই হলঘরের সামনে বিরাট চক এবং তার পাশে রয়েছে ছোট ছোট ঘর। চকের পশ্চিম প্রান্তে একটা দরজা আছে, আগে যেটি লাল পরদায় ঢাকা থাকত। এখানে থেকেই দেওয়ান-ই আমে যাতায়াত করা যায়। আগে হলঘরে ঢোকার আগে এই লাল পরদার সামনে সালাম জানাতে হত। প্রাসাদের থাকবার জায়গার মধ্যে দেওয়ান-ই খাস তৈরি করার একটা তাৎপর্য ছিল। এই হলে যাবতীয় গোপন আলোচনা হত।

দেওয়ান-ই খাসের উত্তর দিকে আছে হাম্মাম। এর সঙ্গে রয়েছে মসজিদ ও বাজার। স্নানাগারটিও মার্বল পাথরে করা। নানা রঙের ছবি আঁকা ও মোজাইক ও কাচের টুকরো দিয়ে সাজানো। এটি তিনতলা। একটি জামা কাপড় বদলানোর জায়গা ও অন্য দুটি ঠাণ্ডা ও গরম জলে স্নান করার ঘর।

প্রাসাদ-দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে *শাহবুরুজ*। গুজরাট থেকে বিশেষভাবে পালিশ করা মার্বল আনিয়ে এই তিনতলা সৌধটি তৈরি করা হয়েছিল। নীচের দিকের দেওয়াল মোজাইক করা, উপরের তলাগুলিতে সোনার কাজ করা। নীচের ঘরের মাঝখানে একটা ছোট জলাধার আছে। জানালায় খস বসানো থাকত বলে মনে হয়। দেওয়ান-ই খাসের কাছে একটা ছোট মসজিদ মার্বল পাথর দিয়ে করা আছে। একে বলা হয় মোতি মসজিদ এবং ঔরংজেবের তৈরি একটিই সৌধ এই প্রাসাদে। এটি তৈরি করতে এক লাখ ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

প্রাসাদ-দুর্গের উত্তর দিকে হায়াৎ বক্স ও মাহতাব বাগান নামে দুটি বাগান ছিল। হায়াৎ বক্স বাগানটি বড়—মাঝখানে জলাধার যার মধ্যে গরমের সময় কাটানোর জন্য একটা ছোট বাড়ি আছে। এই বাগানে ৪৯টি ফোয়ারা ছিল। বাগানের চারপাশে জল ছিটকে উপরে যাবার জন্য আরও ১১২টি ফোয়ারা ছিল। জলাধারটির চারদিক থেকে নালি করে জল আসত যেগুলিতে তিরিশটি রূপার ফোয়ারা ছিল। উত্তর-দক্ষিণের পথের দিকে দুটি ছোট বাড়ি আছে যেগুলি হিন্দু মাসের নাম অনুযায়ী, শাওন ও ভাদাওন রাখা হয়েছিল। পশ্চিম দিকের ছোট বাগানটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এখানে একটি গরমের সময়কার জন্য ছোট বাড়ি আছে যাকে *বালাল মহল* (জলের বাড়ি) বলা হয়। *নহর-ই বিহিস্ত* এসবের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছিল। এই বাগানগুলির উত্তর দিকে ছিল যুবরাজের বাড়ি। দারা শুকো ও ঔরংজেবের বাড়িগুলি ছিল প্রাসাদ-দুর্গের বাইরে।

ভিতরের জায়গাটির পশ্চিমে ছিল বড় একটা অষ্টকোণাকৃতি জায়গা যেখানে প্রাসাদ-দুর্গের অধিকাংশ লোকই থাকত। নক্করখানার সামনে ছিল একটা বড় খোলা চতুষ্কোণ জায়গা যাকে বলা হত *জিলাওখানা*। এখানেই আমির, মন্ত্রী ও বিদেশি দূতরা অপেক্ষা করতেন দরবারের জন্য। কেবল যুবরাজই নক্করখানার মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারতেন। অন্যদের এখানে নেমে হেঁটে যেত হত। জায়গাটির দুপাশে সারিবদ্ধ ঘর আছে যেখানে আমিররা তাঁদের সৈন্য নিয়ে প্রতিদিনের পাহারায় থাকতেন। চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কয়েকটা বাড়ি ছিল যেখানে প্রাসাদের *নাজির* বসে কাজকর্ম করতেন। একটা অষ্টকোণাকৃতি জলাধার এই চত্বরের মাঝখানে রয়েছে।

দুর্গের লাহোরি দরজা থেকে জিলুখানার পাড় পর্যন্ত একটা ঢাকা বাজার করা হয়েছিল। এটিকে বলা হত *বাজার-ই মুসাকফ*। ২৭০ ফুট লম্বা, ২৭ ফুট চওড়া ও দোতলার সমান উঁচু এই বাজারের দুপাশে সারিবদ্ধ দোকান ছিল। এর মাঝখানের অংশের ছাদে কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছিল আলো বাতাস আসার জন্য। এই ধরনের বাজার ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

জিলুখানার জলাধার-এর মধ্য দিয়ে ও সলিমগড় ও আকবরাবাদি দরজার সঙ্গে যোগ করে নহর-ই বিহিস্ত চলে গিয়েছিল। দুর্গের বাড়ি ও দোকানঘরে জল সরবরাহ করে এটি পরিখায় পড়েছিল। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল আস্তাবল। এর পাশের অন্যান্য ঘরগুলিতে ছিল কারখানা, নানা জিনিসের গুদামঘর এবং কোষাখানা ও টাঁকশাল। বাকি অংশটিতে থাকত সৈন্য, কেরানি, বণিক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, জ্যোতিষী ইত্যাদিরা যারা প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

প্রথম মাটি কাটার সময় থেকে শাহজাহানের প্রথম প্রবেশের মধ্যে ছিল নয় বছরের কিছু কম সময়। এই সময়ের কাজের খরচ হয়েছিল প্রায় ষাট লক্ষ টাকা। জাহানারা বেগম ও হারেমের অন্যান্য মহিলারা তাঁদের বাড়ির জন্য খরচ করেছিলেন সাত লক্ষ টাকা। চার লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল বাজার, বাড়ি, চক, কারখানা, দপ্তর ও আস্তাবলের জন্য। বিশ লক্ষ টাকার কিছু বেশি খরচ করা হয়েছিল পাঁচিল ও পরিখার জন্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গের তুলনায় এর খরচ হয়েছিল প্রায় আড়াই গুণ। দেওয়ান-ই খাসের দেওয়ালে আমির খসরুর দুটি লাইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল : আগর ফিরদৌসে বররুইয়ে জমিন অস্ত, হামিন অস্ত এ হামিন অস্ত এ হামিন অস্ত (পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তা হলে সেটা এখানে)

আবদুল হামিদ লাহোরি শাহজাহানের আর্থিক নৈপুণ্য ও ওঁর ধনদৌলতের প্রশংসা করেছেন। আকবরের প্রায় একান্ন বছর রাজত্বের শেষে তিনি প্রচুর ধনদৌলত রেখে মারা যান। কিন্তু জাহাঙ্গিরের সময় এর অনেকখানি শেষ হয়ে যায়। শাহজাহান এই অসুবিধে দূর করেন ও প্রচুর খরচ করেও প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকার মতন গহনা ও নগদ টাকায় রেখে যান। এর একটা কারণ যে তিনি প্রায় তিন কোটি টাকা খালিসার (সরকারি জমি) খাজনা ঠিক করেছিলেন যার ফলে মোট সাম্রাজ্যের এক-সপ্তমাংশ রাজকোষে জমা হত। এর মধ্যে আড়াই কোটি টাকা বিভিন্ন প্রাসাদ, দুর্গ, বাগান ইত্যাদিতে খরচ করা শাহজাহানের পক্ষে কিছু অসুবিধে ছিল না। এর

পরিষ্কার প্রতিফলন দেখা যায় জমা-দমিতে (যে খাজনা ধার্য করা হচ্ছে)। আকবরের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে এই জমা দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। এরও কারণ হিসেবে দেখানো যায় দাক্ষিণাত্যের চারটি প্রদেশ ও বাগথানা রাজ্য মোগলের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। ফলে ১৬৪৭ সালে জমা প্রচুর বেড়ে যায় যার হিসেব অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি করেছেন। এ প্রশ্নের বিশদ আলোচনা এখানে অবান্তর।

শাহজাহানাবাদে লোকেরা বিভিন্ন ধরনের বাড়িতে থাকত। উচ্চপদস্থ আমির, ওমরাহ ও যুবরাজরা যে বাড়িতে থাকতেন তার মধ্যে থাকত বাগান, নালি ভর্তি জল, সুন্দর সুন্দর ঘর। নিচু দিকের আমির ও ধনী বণিকরা টালি দিয়ে সাজানো ইট বা পাথরের তৈরি বাড়িতে থাকতেন। সমকালীন ফারসি ইতিহাস থেকে জানা যায় যে হিন্দু ও আর্মেনিয়ান বণিকরা ছতলা উঁচু বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু তাদের বাড়িতে বাগান, ফোয়ারা ইত্যাদি ছিল না। সাধারণ ব্যবসায়ীরা উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো দোকানের উপরে বা পিছনে থাকতেন। সৈন্যরা, দাসদাসী বা কারিগরদের অনেকে দুর্গের মধ্যে বা বাইরে থাকত। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শহরের খালি জায়গা ভরে যেতে থাকে। এমনকী পথের উপরেও এমনভাবে চলে আসে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই দেখা যায় যে পথ দিয়ে বাড়ি ফেরা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। বহু কুঁড়েঘর থাকায় আগুন লাগার ভয় সব সময়ই ছিল। ১৬৬২ সালে তিনটি আলাদা আগুনে প্রায় ষাট হাজার লোক মারা যায়।

উচ্চপদস্থ আমির ও যুবরাজরা চলনে বলনে সম্রাটের অনুকরণ করতেন। এঁদের বাড়িগুলিও ছিল প্রাসাদের অনুকরণে করা। এঁদের অনেকেরই বিরাট প্রাসাদ ছিল যার কথা দেশি-বিদেশি লেখকরা বলে গিয়েছেন। একটা বড় পাঁচিল দিয়ে বাড়ি ঘেরা ছিল যার সামনে অনেক সময় পরিখা থাকত। এর নক্করখানার পাশের ঘরে ছিল রক্ষীবাহিনী। ভিতরে ঢুকলে জিলুখানার মতো চত্বর ছিল যেখানে সৈন্য ও দাসদাসী হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করত। দরজার ডান দিকের ও বাঁ দিকের উঠোনে ছিল আস্তাবল, কারখানা, গুদাম, রান্নাঘর এবং দাসদাসী ও অন্যান্যদের বাসস্থান। সামনের উঠোন পেরোলে দরজা দিয়ে যুবরাজ ও আমিরের থাকার জায়গা। এটিও ছিল দুটি ভাগে ভাগ করা—একটি ব্যক্তিগত ও অন্যটি দপ্তর। ব্যক্তিগত অংশে ছিল *মহল সরাই* বা হারেম। এখানে ঘরগুলি ছিল বাগানের মধ্যে জলাধারের পাশে যেখানে নালি দিয়ে জল আসত। এর প্রধান বাড়ি ছিল *শিসমহল* (কাচের ঘর) যেটি নানারকম রঙে চিত্রিত করা ও কাচের টুকরো দিয়ে সাজানো। সফদর জং-এর বাড়িতে স্তম্ভে পর্যন্ত কাচের টুকরো লাগানো ছিল।

মহল সরাই-এর নীচে ছিল *তেহখানা* বা *সর্দখানা*। গরমের সময়ে মাটির নীচের এই ঘরে বিশ্রাম করা হত। এই ঘরের মাঝখানে ছিল একটি জলাধার। সফদার জং-এর তেহখানা ছিল ৭৮ ফুট লম্বা, ২৭ ফুট চওড়া ও তিনটি ভাগে বিভক্ত করার জন্য ছিল মার্বল পাথরের স্তম্ভ। উপরের ফাঁক দিয়ে আলো ও বাতাস আসত। জলাধারে ছিল ফোয়ারা।

একটা উঁচু দেওয়াল দিয়ে মহল সরাই দপ্তরখানা থেকে আলাদা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল দেওয়ানখানা যেখানে আমির তাঁর অভ্যাগতদের সঙ্গে বসতেন।

দেওয়ালে পরদা ও মাটিতে ছিল্ল গালিচা এবং অনেক সময়ে দেওয়ালে বড় আয়না। দেওয়ানখানার কাছে ছিল মহাফেজখানা যেখানে আমির বসে কবিতা লিখতেন ও সরকারি কাগজ দেখতেন। এতে প্রচুর বই থাকত। অন্যান্য ঘরগুলিও ছিল সুন্দরভাবে সাজানো। গরমের সময়ে মেঝেতে মাদুর বিছানো হত যার উপর থাকত সাদা চাদর। দেওয়ানখানায় অনেক সময়ে অভ্যাগতরা ছোট ছোট কাঠের টুলে বসতেন যার উপর রেশম জড়ানো কুশন থাকত। অনেক সময়ে লোকেরা মাদুরে বা গালিচায় বসতেন। ঘরের দেওয়াল ও ছাদে লতাপাতা ও ফলফুলের চিত্র আঁকা থাকত।

সাদাত খান-এর বাড়ির স্নানাগারে পাঁচটি ঘর ছিল। এর উপরে কাচের একটা গম্বুজ বসানো ছিল। এ ছাড়াও ছিল সংলগ্ন মসজিদ। বাড়ির বৈশিষ্ট্য ছিল তার বাগানে (*খানাবাগ*)। বাগানটিকে নালির জলের সাহায্যে অষ্টকোণাকৃতি করে ভাগ করা হত এবং জল ধীরে ধীরে নেমে চলে যেত কেন্দ্রীয় জলাধারে। এর মাঝখানে কিছু উঁচুতে ছিল বাড়ি। জানালায় লাগানো থাকত খস। বড় বড় লোকের বাড়ির জলাধারটি ছিল বড় এবং নৌকোও থাকত। দেওয়ানখানা থেকে নৌকো করে সরাসরি জলাধারের বাড়িতে আসা যেত। ১৬৭১ সালে ঔরংজেব এরকম নৌকা করে হুমায়ুনের সমাধিতে প্রার্থনা করার জন্য গিয়েছিলেন।

এই বাড়িগুলি তৈরি করার খরচ ছিল প্রচুর। সমকালীন লেখক মুহম্মদ সালি এগুলির খরচ এক লক্ষ টাকা থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা ধরেছেন। আমরা আগে দেখেছি যেখানে আগ্রা দুর্গের খরচ ছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা, সেখানে একটা বাড়ির জন্য বিশ লক্ষ টাকা যথেষ্ট বেশি বলে মনে হয়। দারা শুকোর বাড়ি চার লক্ষ টাকার উপর যায়নি।

উচ্চপদস্থ আমিরদের ও যুবরাজদের বাড়িগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ছিল যমুনা নদীর পারে। এগুলি প্রধানত ছিল প্রাসাদ-দুর্গের কাছে নদীর পাড়ে, জামা মসজিদের আশেপাশে এবং দেওয়ালের মধ্যে প্রধান দরজার কাছে। প্রাসাদ-দুর্গের ডান দিকে ও বাঁ দিকে নদীর পারে ছিল সব থেকে ভাল জায়গা। সফদর জং-এর প্রাসাদ ছিল শহরের সব থেকে বড় ও সুন্দর। ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত এটি ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বাড়ি। মোগল সম্রাটদের ক্ষমতা এর পরে কমতে আরম্ভ করলে এখানে যিনি বাস করতেন তিনিই পিছন থেকে শহর শাসন করতেন। দারা শুকো, আলি মর্দান খান, সাদাউল্লা খান—ইত্যাদির বাড়ি ছিল নদীর ধারে। অনেক সময়ে শহরের দলাদলির একই মনোভাবসম্পন্ন লোক কাছাকাছি থাকতেন।

জামা মসজিদের চারপাশে ছিল নিচু স্তরের আমিরদের বাড়ি। এর মধ্যে ছিলেন খান দৌরান (মুহম্মদ শাহর উজির), সরবুলান্দ খান (এক সময় গুজরাটের শাসনকর্তা) ইত্যাদি। দরজার কাছে ছিল নবাব সাদাত খানের প্রাসাদ। ওঁর বাড়ি ছিল কাবুলি দরজার কাছে। আজমিরি দরজার কাছে ছিলেন কামার আলদিন খান (মুহম্মদ শাহর উজির)। এই দুটি প্রাসাদ ছিল শহরের সুন্দর বাড়িদের অন্যতম। এর যেমন সুবিধে ছিল শহরতলির সঙ্গে যোগাযোগ, অসুবিধে তেমনি ছিল প্রাসাদ-দুর্গ থেকে এদের দূরত্ব। এর ফলে এঁরা দরবারে উকিল রাখতেন যারা শিক্ষিত পায়রার সাহায্যে

এঁদের বাড়িতে খবর পাঠাত।

রাজত্বের প্রথম দিকে শাহজাহান আদেশ দেন যে সব শহরে মুসলমান আছে সেখানে মসজিদ বানাতে। এর ফলে দিল্লির অলিতে গলিতে, বাজারে, চকে মসজিদ বানানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। সর্বভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বক্ষণ সংস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দিল্লিতে একটা সমীক্ষা করে পাঁচিলের মধ্যে ৪১০টি সৌধ পেয়েছিল। প্রাসাদ-দুর্গের বাইরে ছিল ৩৭৮টি সৌধ যার মধ্যে ২০২টি ছিল মসজিদ। এর মধ্যে ২০০টি তৈরি হয়েছিল ১৬৩৯ সাল থেকে ১৭৩৯ সালের মধ্যে। এগুলিকে মসজিদ অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। উপরের স্তরের দিকের মসজিদ ছিল জামা মসজিদ, যেটি ভারতীয় ভূখণ্ডের সব থেকে বড় মসজিদ। ৬ অক্টোবর ১৬৫০ সালে এর প্রথম প্রস্তর লাগানো হয়। ছয় বছর কাজের পর এটি শেষ হয়। এর খরচ পড়েছিল দশ লক্ষ টাকা। এটি ছিল প্রধানত সম্রাট ও তাঁর পরিবারের শুক্রবার প্রার্থনার জন্য। এখানেই নতুন সম্রাটের নাম ঘোষণা করা হত।

দ্বিতীয় স্তরে ছিল আটটি মসজিদ যা প্রধানত তৈরি করেছিলেন বেগমরা যাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ ওমরাহদের স্ত্রীরাও রয়েছেন। এর মধ্যে ফতেপুরি ও আকবরাবাদি মসজিদ উল্লেখযোগ্য। লাল পাথরের তৈরি এই দুটি মসজিদ ছিল প্রধান দুটি বাজারে। আর ছটা মসজিদের মধ্যে চারটি তৈরি করেছিলেন সম্রাটের পরিবারের বেগমরা। শহরের প্রধান দুটি রাজপথের ধারে ভাল জায়গায় এই মসজিদগুলি ছিল।

তৃতীয় স্তরে ছিল ৯১টি মসজিদ দিল্লি ও শহরতলিতে। এগুলি ছোট এবং প্রধানত আমির, বণিক, বিদেশি দূত ও কারিগরসম্প্রদায় তৈরি করেছিল। এগুলির মধ্যে ৩১টি মসজিদ ওমরাহ তৈরি করেছিলেন।

শাহজাহানাবাদের দুটি প্রধান রাজপথকে বাজার বলা হত কারণ এই পথগুলির দুপাশে ছিল সারিবদ্ধ দোকান। সব থেকে বড় যেটি সেটি ছিল দুর্গের লাহোরি দরজা থেকে ফতেপুরি মসজিদ পর্যন্ত। ১৬৫০ সালে জাহানারা বেগম এটি তৈরি করে দেন। চল্লিশ ফুট চওড়া ও ১২৫০ গজ লম্বা এই পথের দুধারে ১৫৬০টি দোকান ও বারান্দা ছিল। নহর-ই বিহিস্ত এ পথের মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত যার দুপাশে ছিল গাছ। এর প্রতিটি ভাগের একটা করে নাম ছিল। দুর্গের লাহোরি দরজা থেকে কোতোয়ালি চবুতরার চক পর্যন্ত এটি ছিল ৪৮০ গজ এবং নাম ছিল *উর্দু বাজার*। প্রাসাদের সৈন্য, কেরানি, দাসদাসীরা এতে বাজার করতেন। সেখান থেকে জাহানারা বেগমের চক পর্যন্ত ছিল ৪৮০ গজ এবং বলা হত *আশরফি* বা *জৌহরি* বাজার। মনে হয় এই অংশটাতে টাকাপয়সার লেনদেন হত।। উত্তর দিকে জাহানারা একটা সরাইখানা ও বাগান করে দেন এবং দক্ষিণে একটা স্নানাগার। চাঁদনি রাতে চাঁদের আলো জলে পড়ে চিকচিক করত বলে সাধারণ লোকে বলত চাঁদনি চক, যদিও অন্য মত আছে। সোনারূপার ঝিলিকের জন্য নাকি এই নাম দেওয়া হয়েছিল। ফতেপুরি মসজিদের সামনে ছিল একটা জলাধার ও চত্বর। একটা সরাইখানা এখানে ছিল। পথের দুধারে ছিল দোকান যেখানে বহুমূল্য রত্ন থেকে মিঠাই পর্যন্ত পাওয়া যেত। দোকানের পিছনে গুদাম ও গুদামের উপরে ব্যবসায়ী থাকত। মাঝে মাঝে ছিল কফিহাউস যেখানে কবিরা আমিরদের কবিতা পড়ে শোনাতেন।

শাহজাহানাবাদের আর একটি বড় বাজার ছিল আর একটি পথের ধারে যেটি দুর্গের আকবরাবাদি দরজা থেকে শহরের আকবরাবাদি দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এটি চওড়ায় ছিল তিন ফুট লম্বায় হাজার পঞ্চাশ গজ। এখানে ছিল ৮৮৮টা দোকান। নবাব আকবরাবাদি বেগম ১৬৫০ সালে তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে দিয়েও গিয়েছিল নহর-ই বিহিস্ত-এর একটা শাখা। দুর্গের দরজার দক্ষিণে ছিল একটা মসজিদ—কালো, লাল ও সাদা পাথরের তৈরি। মসজিদের কাছে বেগম একটা সরাইখানা করে দেন ও পথের ওপরে একটা হাম্মাম তৈরি করেন। রাস্তার মাঝখানে উনি একটা চক তৈরি করে দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রৌশন আল-দৌলা খালের দুপাশে আলোর সারি বসিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে একে বলা হত *ফইজ বাজার*।

দুর্গের আকবরাবাদি দরজার বাইরে সাদাউল্লা খান *খাস বাজারের* মধ্যে একটা চক তৈরি করেছিলেন। এটি ছিল জামা মসজিদ ও প্রাসাদ-দুর্গের রাস্তার উপর। এখানে হাকিমরা, জ্যোতিষী, কথকঠাকুর, এমনকী নাচনিওয়ালিরাও বসতেন। এখানকার দোকানে পশু, পাখি, ওষুধ, ফল, ফুল ইত্যাদি পাওয়া যেত। এ ছাড়াও সারা শহরের অলিতে গলিতে ও পথের মোড়ে ছোট ছোট বাজার বসত।

লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের বাইরে শহরতলিও বাড়তে থাকে যেটি গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কয়েক মাইল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এমনকী নদীর ওপারেও শহরতলি শুরু হয়ে যায়। শহরতলি কতটা বড় ছিল এটা জানা যায় না। বার্নিয়ার বলছেন শহরতলিতে প্রচুর সংখ্যায় বাগান থাকার ফলে এলাকা নির্ণয় করা শক্ত। ১৬৬৮ সালে এক ইংরেজ ভ্রমণকারী বলেছেন যে উত্তর ও দক্ষিণে শহরতলি তিন-চার মাইল বিস্তৃত ছিল। ১৭৪৭ সালে এক জার্মান পাদরি বলেছেন যে দক্ষিণে আরব দরজা থেকে উত্তরে প্রায় আট মাইল পর্যন্ত শহরতলি চলে গিয়েছে। উনি বলেছেন যে পশ্চিমে জয়সিংপুরা অবধি এটি বিস্তৃত। ওই ইংরেজ ভ্রমণকারী শহরের আয়তনের হিসেব ধরেছেন, শহরতলি সমেত, আট মাইল। সুতরাং ১৭৩৯ সালে বলা যায় যে শহর শহরতলি মিলিয়ে আয়তন ছিল ৩৩০০ একর যার মধ্যে পাঁচিলের মধ্যেকার এলাকা ছিল ১৫০০ একর। শহরতলিতে ছিল ৫২টি বাজার ও ৩৬টি মণ্ডি।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহরতলি ছিল আজমিরি দরজার বিপরীত দিকে পাহাড়গঞ্জ। একে পাঁচটা বড় বাজারের একটা বলে ধরা হয়েছে। এটাই ছিল শস্যের প্রধান বাজার। নদীর ওপার থেকে শস্য এখানে এসে জমা হত ও শহরের দোকানগুলিতে যেত। পাহাড়গঞ্জ থেকে আকবরাবাদি দরজার মধ্যে ছিল শাহগঞ্জ বাজার। যমুনার বিপরীত দিকে ছিল পতাপগঞ্জ ও সহদরা যেখানে শস্য বণিকরা থাকতেন। এঁরা দোয়াব অঞ্চল থেকে শস্য এনে ওখানে জমা করতেন ও পরে নদী পার হয়ে পাহাড়গঞ্জে চালান দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যয়ে এ দুটি মহল্লা নষ্ট হয়ে যায়। পাহাড়গঞ্জের কাছে ছিল জয়সিংপুরা। বোধহয় জয়সিং-এর প্রাসাদ এখানে ছিল। এর দক্ষিণে ছিল *রিকাবগঞ্জ* যেখানে বানজারারা শস্য নিয়ে এসে থাকতেন।

শহরের কাবুল দরজার ঠিক পিছনে ছিল মোগলপুরা। নহর-ই বিহিস্ত এই শহরতলিকে ভাগ করে চলে গিয়েছে। সাধারণত বলা হয় যে খলজি সুলতানদের

সময় থেকেই মোগলরা এখানে বসবাস শুরু করে যার ফলে এই নাম হয়েছে। মোগলপুরার উত্তরে ছিল *সবজিমণ্ডি*। এক সময় এটাই ছিল তরিতরকারির জায়গা। মোরী ও কাশ্মীরি দরজার সংলগ্ন যে বাজারগুলি ছিল সেগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিনষ্ট হয়ে যায়।

হুমায়ুনের সমাধির *চাহারবাগ* বাগান সম্ভবত তাজমহলের বাগানকে প্রভাবিত করেছিল। এর চত্বরে আরও অনেকের সমাধি আছে, যার মধ্যে পড়ে হুমায়ুনের স্ত্রীরা, দারা শুকো ও পরবর্তীকালের মোগল সম্রাটরা। জাহান্দার শাহ ও ফারুখশিয়ারের কবরও এখানে। সন্তদের কবরের মধ্যে সুফিসাধক নিজামউদ্দিন আওলিয়ার কবর উল্লেখযোগ্য। ১৩২৫ সালে কবরটি তৈরি হলে পরবর্তীকালে সংস্কার করা হয়েছে। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এটির একবার সংস্কার করান। ওই পুরনো সৌধটি আর নেই। বর্তমান সৌধটি নির্মাণ করেন ১৫৬২-৬৩ সালে ফারিদ্দুন খান। এর চত্বরে জাহানারা বেগম, মুহম্মদ শাহ এবং আমির খসরুর সমাধি আছে। এর কাছে আছে আবদুর রহিম খান-ই খানান-এর সমাধিসৌধ, যেটি তাঁর মৃত্যুর আগেই ১৬২৬ সালে তৈরি করা হয়েছিল। লাহোরি দরজার দেড় মাইল দক্ষিণে আছে *কদম্‌শরিফ* যেখানে ১৩৭৬ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ তৈরি করেন তাঁর সমাধি। ওঁর ছেলে ফৎ খান-এর সমাধিও ওখানে রয়েছে যার উপর পদচিহ্ন রয়েছে। সাধারণত বলা হয় যে ফিরোজ শাহ্-র গুরু মক্কা থেকে এই পদচিহ্ন নিয়ে এসেছিলেন। আজমিরি দরজার বাইরে ঔরংজেবের উচ্চপদস্থ আমির গাজিউলদীন-এর সমাধি রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর আগে ১৭১০ সালে এটি তৈরি হয়েছিল। শাহজাহানের মেয়ে রোশনআরা বেগমের সমাধি রয়েছে সবজিমণ্ডিতে যেটি তিনি মৃত্যুর আগে ১৬৫০ সালে তৈরি করেছিলেন। এই সব সমাধিকে ঘিরে বার্ষিক *উরস* উৎসব পালন করা হয়।

মোগল রাজধানী বাগান দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মধ্যে অষ্টকোণাকৃতি বাগানগুলিতে থাকত কেন্দ্রীয় জলাধার যার মধ্যে থাকত *বরাদরি* বা গরমের সময়কার বাড়ি। এই জলাধারে চারপাশ দিয়ে জল আসত। সম্রাটের পরিবারের অনেকেই যমুনার পাড়ে ও শহরের দরজার পাশে এরকম বাগান তৈরি করিয়েছিলেন। শহর তৈরি হবার সময়ই শাহজাহান যমুনার পাড়ে আকবরাবাদি দরজার দক্ষিণে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে খিজিরাবাদ বলে একটা বাগান করান। ১৬৫৮ সালে ঔরংজেব দারা শুকোকে বন্দি করে এখানে রেখেছিলেন। কাবুল দরজার বাইরে শাহজাহান *তিস হাজারি বাগ* বলে আর একটি বাগান তৈরি করান। ঔরংজেবের মেয়ে জিন্নাত-আল নিসা বেগম ও মুহম্মদ শাহর স্ত্রী, মালিকা জামানি-র কবর এখানেই আছে। ১৬৫০ সালে রোশনআরা বেগম সবজিমণ্ডিতে একটা বড় বাগান করান। লাহোর দরজার দু মাইল পশ্চিমে একটা বড় বাগানকে *শালিমার* বলা হয়। ১৬৫৩-৫৪ সালে এটি তৈরি হয়েছিল এবং ঔরংজেব এখানে সম্রাট হন ১৬৫৮ সালে। শহরের মধ্যে সব থেকে সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলেন জাহানারা বেগম চাঁদনি চকের উত্তরে ১৬৫০ সালে। একে বলা হত *সাহিবাবাদ*। নহর-ই বিহিস্ত থেকে এর জল আসত নালিতে, জলাধারে ও ফোয়ারায়। সাধারণত হারেমের মহিলারা এখানে আসতেন গরমের সময়ে।

মোগল শহরগুলি সাধারণত নদীর পাড়ে জলসরবরাহের সুবিধের জন্য গড়ে উঠেছিল। সম্রাট ও ওমরাহরা নানাধরনের খাল কেটেছিলেন জল আনবার জন্য। ১৬৩৯-৪০ সালে আলি মর্দান খান লাহোরের বাইরে একটা খাল কাটার প্রস্তাব দেন। এটির নামকরণ করা হয় *শাহনহর* এবং এটি প্রায় একশো মাইল দূরে রবি নদীর উৎস থেকে জল আনত। মোগল আমলের সব থেকে উল্লেখযোগ্য খাল হচ্ছে নহর-ই বিহিস্ত। যমুনার উত্তরে প্রায় ৭৫ মাইল দূর থেকে এটি শহরে জল নিয়ে আসত। সাধারণত বলা হয় যে প্রথম ভাগটি সুলতান ফিরোজ শাহ করিয়েছিলেন ১৩৫৫-৫৮ সালে। এটি জল নিয়ে আসত সুলতানের শিকারের জায়গায় এবং বর্ষার সময় ছাড়া এতে জল থাকত না। আকবরের সময়ে দিল্লির শাসনকর্তা, সিহাব-আলদিন খান, এটির সংস্কার করেন যার ফলে এটির নামকরণ হয় *নহর-ই সিহাব*। ১৬৩৯ সালে শাহজাহান আলি মর্দান খানকে খালটির সংস্কারের আদেশ দেন। হান্সি ও হিসার থেকে ৭৮ মাইল খাল কাটা হয়। জল ভালভাবে পাবার জন্য ও জলের উদ্বৃত্ত অংশকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচ খিলানযুক্ত জলের নালি তৈরি করা হয় যার তলা দিয়ে জল যেত। শহরতলি দিয়ে গিয়ে খালটি শাহজাহানাবাদে ঢুকেছিল কাবুল দরজা দিয়ে। এর উপর সম্রাট ঔরংজেবের এক আমির একটি পুল করে দেন। শহরের ভিতরে ঢুকে খালটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি শাখা ফৎপুরি মসজিদের কাছে চাঁদনি চকে আসে এবং পথের মাঝখান দিয়ে গিয়ে ফৈজবাজারে যায়। অন্যটি সাহিবাবাদ বাগান দিয়ে প্রাসাদ-দুর্গর উত্তর-পশ্চিম কোণে শাহ বুরুজের কাছে গিয়েছে। এখান থেকে একটি কলের সাহায্যে দুর্গের মেঝেতে জল তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল। মার্বল পাথরের নালির মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকের ঘরগুলিতে জল নেওয়া হত। এর থেকে ছোট শাখায় বাগানে যেত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত যমুনার থেকে জল শহরে আসছিল। সমকালীন লেখকরা এই খালের প্রচুর প্রশংসা করেছেন কারণ এটি শহরকে সবুজ করেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হলে খালটি শুকিয়ে যায়।

১৬৫০ সালে শাহজাহানাবাদের লোকসংখ্যা কত ছিল নির্ণয় করা শক্ত। ১৭৩৯ সালে একজন ইংরেজ আমলা বলছেন যে শহরে ছত্রিশটা মহল্লা আছে। এসবের থেকে অধ্যাপক ব্লেক বলছেন ১৬৫০ সালে শহরের জনসংখ্যা প্রায় চার লাখ লোকের নীচে। পাঁচিলের মধ্যে প্রায় তিন লাখ লোক বাস করত এবং শহরতলিতে আরও প্রায় এক লাখ লোক। ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের লেখা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্যারিস শহরের জনসংখ্যার সঙ্গে দিল্লির জনসংখ্যার তুলনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে প্যারিসের জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ধরলে আমরা তুলনীয় একটা সংখ্যা পাচ্ছি। ১৬৭৯ সালে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে জনসংখ্যা আর বাড়েনি বলে মনে হয়—বরং কিছু কমতে পারে। ১৭০৭ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহ আবার দিল্লিতে ফিরে আসেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই দিল্লির বাইরে ছিলেন। পরবর্তী সম্রাটরা দিল্লিতে থাকার ফলে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে চার লাখ হয়ে যায়।

১৬৫৩ সালে কোলবার্টকে লেখা বার্নিয়ার-এর চিঠি থেকে আমরা দিল্লি শহরের

প্রথম দিকের অবস্থার ছবি পাই। উনি লিখছেন যে দিল্লি একটা নতুন শহর যমুনা নদীর পারে সমতলভূমিতে। নদীর দিক ছাড়া আর সব দিকেই পাঁচিল আছে যেটা তখনও শেষ হয়নি। প্রায় একশো ফুট দূরে দূরে পুরনো ধরনের বুরুজ আছে ও পাঁচিলের পিছনে হাঁটবার পথও আছে। এর শহরতলি বেশ বড় ও লাহোরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত সারিবদ্ধ বাড়ি রয়েছে যেটি আসলে পুরনো শহরের অংশ। এ ছাড়াও তিন-চারটি ছোট শহরতলি রয়েছে। এর ফলে শহরটি আরও বেড়ে গিয়েছে।

দুর্গের পরিখার সঙ্গে একটা বড় বাগান আছে। বাগানের পরে একটা বড় রাজকীয় চক যার বিপরীত দিকে বড় রাস্তা শেষ হয়েছে। এখানে সৈন্যসামন্তর কুচকাওয়াজ হয়। এ ছাড়া এখানে একটা বাজার বসে যেখানে প্রায় সব কিছু পাওয়া যায়। প্যারিস-এর *পঁ নফ* (নতুন পুল)-এর মতো এখানে শারীরবিদ্যা দেখানো হয়। হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষীরা এখানে বসে। একটা গালিচার উপর বসে সামনে একটা জ্যোতিষের বই ও কিছু যন্ত্র নিয়ে বসে এরা এক পয়সায় লোকের ভাগ্য দেখে। মহিলারা কাপড়ে জড়িয়ে খুব বেশি সংখ্যায় ওখানে যায়। গোয়ার এক আধা পতুর্গিজ খুব ভাল উপার্জন করে ওখানে বসে যদিও ও লেখাপড়া কিছুই জানে না। ওর বইটি পতুর্গিজ ভাষায় প্রার্থনার বই।

যে দুটি রাস্তা চকে এসে মিশেছে সেগুলি ২৫ বা ৩০ ফুটের বেশি চওড়া নয়। যতদূর দেখা যায় এরা সোজা চলে গিয়েছে। যেটি লাহোর দরজার দিকে গিয়েছে সেটি আরও বেশি লম্বা। দুটি পথই প্রায় একই রকম দেখতে। রাস্তার দুধারে ইটের ঘর রয়েছে এবং এদের উপরে ছাদ—প্যারিসের *প্লাস রয়াল*-এর মতো কোনও বাড়ি উপরে নেই। এখানেই দিনের বেলায় কারিগররা কাজ করে, ব্যবসায়ীরা তাদের মাল দেখায়। এ ঘরগুলির মধ্যেকার দরজা দিয়ে পিছনে যাওয়া যায় যেখানে গুদাম আছে। ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলি এই গুদামের উপরের তলায়। রাস্তা থেকে দেখতে সুন্দর লাগে এবং মনে হয় ভিতরে জায়গা আছে। ধুলোময়লা থেকে দূরে এবং বাতাস আসে ভিতরে। এর ছাদে অধিবাসীরা রাতে ঘুমোয়। সারা রাস্তা জুড়ে অবশ্য বাড়ি নেই। শহরের খুব অল্প কয়েকটা জায়গাতেই ভাল বাড়ি আছে। ধনী ব্যবসায়ীদের বাড়ি অন্য জায়গায় যেখানে তারা কাজের পর চলে যায়।

এ দুটো রাস্তা ছাড়াও আরও পাঁচটা রাস্তা আছে যেগুলি এত বড় বা সোজা নয়। এদের মাঝখান দিয়ে আরও বহু রাস্তা চলে গিয়েছে—প্রায় সব রাস্তার দুপাশেই দোকানঘর আছে। কিন্তু এগুলো আগের মতো সাজানো বা বড় নয়। এই সব রাস্তার মাঝে মাঝে বসতি আছে মনসবদারদের ও ধনী বণিকদের। এই সব বাড়িগুলি দেখতে অতটা সুন্দর নয়। খুব অল্প কয়েকটাই শুধু ইট বা পাথরের তৈরি। কয়েকটা শুধু মাটি আর খড় দিয়ে করা, কিন্তু দেখতে ভাল, বাতাসও আছে। ছাদ খড়ের হলেও মাঝে মাঝে লম্বা শক্ত বেত দিয়ে শক্ত করা। মাটির দেওয়ালগুলি সাদা চুনকাম করা। এই সব বাড়ির আশেপাশে রয়েছে বহু ছোট ছোট কুঁড়েঘর মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি। এখানে সাধারণ সৈনিক, দাসদাসী ও অন্যান্য অনুচররা থাকে। এই সব কুঁড়েঘরের জন্য দিল্লিতে মাঝে মাঝেই আগুন লেগে বহু লোকের মৃত্যু হয়। গত বছর এই রকম আগুনে লোক ছাড়াও উট ও ঘোড়া মারা গিয়েছিল। এমনকী হারেমের কিছু মহিলাও

মারা যায় কারণ তারা বাইরে বেরোতে চায়নি।

এই সব কুঁড়েঘরের জন্যই বার্নিয়ার দিল্লিকে কয়েকটা গ্রামের সমষ্টি বলেছেন। ওমরাহদের বাড়ি প্রধানত নদীর ধারে বা শহরতলিতে। এই সব বাড়িতে উঠোন, বাগান, গাছ, ফোয়ারা ও ছাদ রয়েছে যেখানে অধিবাসীরা রাতে ঘুমোয়। যদিও হিন্দুস্থানের রাজধানীতে বহু ভাল বাড়ি আছে, কিন্তু ইউরোপের মতো নয়। ইউরোপের শহরগুলির চোখধাঁধানো দোকান দিল্লিতে নেই যদিও এখানে পৃথিবীর দুর্মূল্য দ্রব্য বিক্রি হয়। এখানকার ফলের বাজারে পারস্য, বল্‌খ, বোখারা ও সমরখন্দের ফল পাওয়া যায়। এই সব ফলের দাম খুব বেশি। একটা তরমুজের দাম প্যারিসের দেড় পাউণ্ড। ওমরাহদের খাবারের মধ্যে এটাই প্রধান খরচ। বাংলা, গোলকুণ্ডা ও গোয়া থেকে সুন্দর আম আসে। বহু ধরনের রুটি প্রস্তুতকারক থাকলেও এদের রুটি ভাল নয়। দুর্গের মধ্যে যা বিক্রি হয়, তা মন্দ নয়। ওমরাহরা বাড়িতে রুটি করে যেগুলি খুব ভাল, এর মধ্যে মাখন, ডিম ও দুধ মেশানো হলেও, একটু পোড়া। বাজারের দোকানে রান্না করা মাংস পাওয়া যায়। গরুর ও ছাগলের মাংস সারা শহরেই পাওয়া যায় যদিও প্যারিসের তুলনায় দাম বেশি।

১৭৩৯ সালে নাদির শাহ দিল্লি লুঠ করার আগে দরগাকুলি খান *মুরাক্কা-ই দেহলি* লেখেন। এই বইটি ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লেখা সঙ্গীন বেগের বই *সইর-ই মনজিল*-এর ওপর নির্ভর করে অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান একটি প্রবন্ধ লেখেন যার থেকে নাদির শাহর দিল্লি আক্রমণের আগের অবস্থার ছবি পাই।

শাহজাহানাবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বসতবাড়ির এলাকার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নেই, এমনকী বাণিজ্যিক এলাকা ও বসতবাড়ি এলাকার মধ্যেও কোনও বিভাজন নেই। ফলে উচ্চপদস্থ ওমরাহ ও গরিব কারিগর একই মহল্লায় পাশাপাশি থাকে। সাধারণত একটা সম্প্রদায় এক মহল্লায় থাকলেও কোনও কোনও জায়গায় একই মহল্লায় দুই সম্প্রদায়ও মিলেমিশে থাকে। জাতের বেলায় বা পেশার বেলাতেও আমরা ওই একই ছবি পাই। হিন্দু ও মুসলমানরা সম্প্রদায়গত হিসেবে আলাদা মহল্লায় থাকলেও অনেক সময়ে দুই সম্প্রদায় মিলে একই উৎসব পালন করেছে, যেখানে শিয়া-সুন্নির তফাতও থাকছে না। মহরম উৎসবের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। শেখ নাসিরুদ্দিন চিরাগ-ই দিল্লির সমাধি ছিল শাহজাহানাবাদের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। কিন্তু দেওয়ালির মাসে এখানে হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিতভাবে আলোর উৎসব পালন করত। সম্রাট মুহম্মদ শাহ এখানে পাকা পাঁচিল করে দিলে সঙ্গীতের উৎসবও শুরু হয়ে যায়। মনজুন নানক শাহির উৎসবও দুই সম্প্রদায় মিলিতভাবে করত। দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গীতজ্ঞরা মিলিতভাবে কদম রসুল থেকে যাত্রা শুরু করতেন বসন্তপঞ্চমীর দিনে এবং সর্বসাধারণ ওই উৎসবে শামিল হতে পারত।

শাহজাহানাবাদ শহরটি প্রধানত দুর্গকে কেন্দ্র করে চলত যার সঙ্গে ছিল জামা মসজিদ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এ শহরের ব্যবসায়িক কেন্দ্র ছিল চাঁদনি চক। চক সাধারণত চতুষ্কোণ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অষ্টকোণও হয়। পেশাগত মনোরঞ্জনের জায়গা ছাড়াও এটা ছিল লোকেদের মিলনের জায়গা। ১৭৩৮ সালে দরগা কুলি খান যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ইনি এই জায়গার প্রশংসা করেছেন। এর মাঝে ছিল সুন্দর

খাল। এর চারপাশের রাস্তায় সব কিছু বিক্রি হত। একটি রাস্তায় বহুমূল্য রত্ন, অন্য রাস্তায় সুগন্ধি, আরেক রাস্তায় কাচের বাসন ও চিনদেশের পোর্সিলিন। এতই সুন্দর মদের গ্লাস পাওয়া যায় যে একশো বছর বয়সের লোকও এতে করে মদ্যপান করতে চাইবে।

এ ছাড়াও এখানে ছিল *কাওহাখানা* (কফি হাউস)। যেখানে সাহিত্যরসিকরা প্রতিদিন স্বরচিত কবিতা বলতেন। এ ছাড়াও লোকে সন্ধ্যায় এখানে বেড়াতে আসত।

রাস্তাকে বলা হত *কুচা* যার সঙ্গে বাজার যোগ করা হত। এটি কোনও লোকের নামের সঙ্গে বা কোনও সম্প্রদায়ের বা কোনও পেশার পরে ব্যবহার করা হত। যেমন ছিল *কুচা-ই বুলাকি বেগম* বা *কুচা যোগীওয়ারা* ইত্যাদি। এখন অবশ্য কুচাকে গলি বলা হয়—যেমন *কুচা সমোসাকে* বলা হয় *সমসেওয়ালিগলি*। যেখানে রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সে জায়গাটাকে বলা হত *সিরাহা*—যেমন *সিরাহা বৈরাম খান*। পাড়ার সাধারণ নাম ছিল *মহল্লা*। এটি কোনও লোকের নামে হতে পারত—যেমন *মহল্লা মুহম্মদ আলি খান* । কিন্তু সাধারণভাবে কারিগরদের পেশার নামে হত—যেমন *মহল্লা চুড়িগরণ* বা *মহল্লা ধোবীওয়ালা* । কোনও কোনও মহল্লা জায়গার বৈশিষ্ট্য নামের মধ্যে বহন করত— যেমন *মহল্লা ইমলি*। একইভাবে বাজারগুলির নাম ছিল যার সঙ্গে *চক* শব্দটি লাগানো হত—যেমন *চাঁদনি চক* বা *চক সাদাউল্লাখান*।

শাহজাহানাবাদে বাজার শব্দটি খুবই কম ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তার দুপাশের দোকান ও দোকানের সঙ্গে বসতবাড়ি, এক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম চলে আসত—যেমন *বাজার সীতারাম* বা *ফৈজ বাজার* । কোনও কোনও সময়ে পেশার নামে হত—যেমন *জৌহরি বাজার* । পাইকারিহারে কেনার বাজারগুলির সঙ্গে *গঞ্জ* লাগানো হত এবং ওই নামের মধ্যে জায়গার কোনও বৈশিষ্ট্য থাকত না। যেমন *দরিয়াগঞ্জ, পাহারগঞ্জ* ইত্যাদি।

অনেকগুলি দোকান থাকলে বলা হত *দাকাকিন*—যেমন *দাকাকিন হালুইয়ান* (মিষ্টি বিক্রেতা) বা *দাকাকিন চিরিমারান* (পাখি বিক্রেতা)। ব্যক্তিগত বা একটা দোকান অনেকসময় পাশের দোকানের নামে চলত—*দুকান* টেকচাঁদ বা *দুকান কিষাণচাঁদ সরফ* । কোনও এক বিশেষ দ্রব্যের পাইকারি বাজারের সঙ্গে *মন্ডি* বা *মান্ডভি* লাগানো হত যেমন *সবজিমন্ডি* বা *মাণ্ডভিপান* । দুটি উল্লেখযোগ্য নাম পাওয়া যায়—*ছাট্টা* এবং *কাটরা* । ছাট্টা মানে ঢাকা গলি বা বাজার। কিন্তু অনেকসময়েই এটা বোঝায় কোনও এলাকা যেখানে কারিগররা বাস করে ও কাজ করে—যেমন ছাট্টা *মোমগরণ* (মোম তৈরির কারিগর)। অনেক সময়ে যে লোক ওই এলাকা তৈরি করেছে, তার নামে বলা হত—যেমন *ছাট্টা লাল তনসুখ রাই* । কোনও কোনও ক্ষেত্রে জায়গার নাম এসে পড়েছে—যেমন *ছাট্টা নিগমবোধঘাট* । *কাটরা* মানে ছোট চতুষ্কোণ বাজার। অনেক সময় এটা পাইকারি বাজার বোঝাত যেখানে মাল গুদামজাত করা আছে। নূরজাহানের একটা আদেশ ছিল আমলারা ব্যবসায়ীদের কাটরায় যেখানে মাল গুদামজাত করা হয়েছে, সেখানে হস্তক্ষেপ না করে। এর কতকগুলি কোনও বিশেষ দ্রব্যর নামে করা হত—যেমন *কাটরা বাজ্জাজান*

(কাপড়ের ব্যবসায়ী) বা *ঘি কা কাটরা*। অনেক সময়েই এগুলি যে লোক তৈরি করেছে, তার নামে হত— যেমন *কাটরা আদিনা বেগ খান*।

দিল্লির নগরশেঠ-এর কথা কিছু জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর লেখক সঙ্গীন বেগের লেখায় হাভেলি নগরশেঠ বলা হয়েছে বলে মনে করা হয় যে দিল্লিতেও নগরশেঠ ছিল। আবুল ফজল কোতোয়ালের কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। দিল্লিতে যে কোতোয়াল ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বসতবাড়ির মধ্যে বড় স্তরের বাড়িকে বলা হত *হাভেলি*। এর মধ্যে থাকত দেওড়ি, উঠোন (সহন), মহলসরা (থাকার জায়গা), বালাখানা (উপরের তলা), জিলাওখানা (উপরের তলা ঝোলানো বারান্দা যুক্ত) এবং দিওয়ানখানা। শুধু বড় বাড়ি হলেই হাভেলি বলা হবে এরকম নয়, বাড়ির মালিকের পদমর্যাদাও এর সঙ্গে জড়িত—যেমন *হাভেলি আজম খান* বা *হাভেলি বক্সী ভবানীশঙ্কর*। কোনও পেশার সঙ্গেও হাভেলি নাম জড়িয়ে ছিল—যেমন *হাভেলি খইয়াত* (দরজি) বা *হাভেলি জিনাৎ তাওয়াইফ* (নাচনিওয়ালি বা বেশ্যা)। অনেক হাভেলিতে থাকত ঘর লাগানো মিনার বা বুরুজ।

হাভেলির থেকে নিচু স্তরে ছিল *মকান*। হাভেলির মতোই মকানও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বসতবাড়িকে বলা হত। যেমন *মকান রাজা জয়সিং* বা *মকান নবাব ফতউল্লাহ বেগ খান*। *মকানত* বলা হত বাড়ির সমষ্টিকে, কখনও বাড়ির মালিকের নামে বা কখনও সামাজিক অবস্থার জন্য—যেমন *মকানত-ই-পণ্ডিতান-ই কাশ্মীরি* বা *মকানত-ই-মুরশিদজাদাহা* (যুবরাজ)। এ ছাড়া ছিল ব্যক্তির নামে যেমন *মকানত-ই মুহম্মদ আমিন খান*। *মনজিল* শব্দটি বর্তমানে ব্যবহার করা হলেও, ওইসময় ছিল বিরল। কেবল মাত্র *মনজিল জাহান-আরা বেগমের* নাম পাওয়া যায়। *কোঠি শব্দটির* মানে দুর্গের থেকে ছোট কিন্তু ওই সময়ে কারখানা বা গুদামের বদলে ব্যবহার করা হত। ওই শব্দ থেকে এসেছে *কোথার* যার মানে বোঝায় গুদাম। ছোট ঘরকে বলা হত *কোঠরি*। ওই সময়ে *কোঠি* বলতে উচ্চবিত্তদের বসতবাড়ি বোঝাত। ইউরোপীয়ানদের বসতবাড়িকেও কোঠি বলা হত— যেমন *কোঠি ডাকতার লাডলো সাহাব* বা *কোঠি কর্নেল জেমস স্কিনার*।

বাংলা শব্দটি (বাঙ্গালো) বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ১৭৩৯ সালের *মুরারকাতে* বলা হচ্ছে যে প্রতিটি মহল্লাতেই বাংলা রয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে এর ব্যবহার বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে যদিও ইংরেজরা এটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে দিয়েছে। হাভেলি ধরনের বাড়ি এগুলি নয় কারণ এগুলি ছিল আলাদা বাড়ি যার সঙ্গে অন্য বাড়ির কোনও সংযোগ নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও শাহজাহানাবাদ ছিল ব্যস্তসমস্ত শহর যেখানে সবকিছুই পাওয়া যেত, যার কারিগর, ব্যবসা, বাণিজ্য ভালভাবে চলছিল। নাদির শাহি আক্রমণ, আহমদ শাহ দুরানির আগমন, আফগান ও মারাঠাদের হামলা এবং শেষকালে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ এই শহরের চেহারা বদলে দিয়েছিল যার বর্ণনা আমরা পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের লেখক সওদার *শহর আসোব* বা মির তকি মির-এর অমর রচনায় যার অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

দিল্লি যো এক শহর থা, আলম মে ইন্তিখাব
রেহেতে থে মুন্তাখাব হি, জাঁহা রোজগার কে
উসকো ফালাক নে লুটকে, বরবাদ কর দিয়া
হাম রেহেনেওয়ালে হ্যায়, উসি উজরে দিয়ার কে ॥

মির তকি মির-এর বিলাপের সাক্ষী ছিলেন অনেকের মধ্যে ফরাসি অভিজাত কাউন্ট অফ মোদাভ। ১৭৭৫ সালের প্রথম দিকে আগ্রা থেকে মথুরা হয়ে মোদাভ দিল্লি আসেন। বার্নিয়ার এঁর রচনায় মুগ্ধ হলেও ভুল ধরতে দ্বিধা করেননি।

মোদাভ বলছেন যে শহরটা যমুনার পাড়ে অর্ধচাঁদের মতো। শহরটিকে তিনটি বড় রাস্তা সমান্তরাল ভাবে চলে গিয়ে কেটেছে। যে রাস্তাটি জামা মসজিদের দিকে গিয়েছে তার দুপাশে দোকান। এগুলি রাস্তার দিকে মুখ করা কিন্তু একটা দোকানের ভিতর দিয়ে অন্য দোকানে যাওয়া যায় না। বড় বড় সব ব্যবসায়ীরা এখানে দোকান রেখেছে এবং খাবারসুদ্ধ সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়। এই তিনটি সুন্দর রাস্তার সঙ্গে রয়েছে ছোট আরও পাঁচটি রাস্তা যেগুলি একই দিকে যাচ্ছে। এগুলি কেটে অনেক ছোট ছোট পথ চলে গিয়েছে। পাহাড়ের মধ্যে হলেও পাহাড় কেটে এমনভাবে শহর তৈরি করা হয়েছে যে মনে হয় যেন একটা সমতলভূমির উপর শহরটি বসানো। এর একটাই শহরতলি আছে যেটি লাহোর দরজা থেকে বেরিয়ে দুমাইল অবধি চলে গিয়েছে। এখানেই খাবারের সব কিছু বিক্রি হয়। এখানকার বাড়িগুলি মাটির। কিন্তু এই শহরতলিতে বহু লোক থাকে। এই শহরতলির শেষে একটা টিলা আছে যেখানে উঠলে দিল্লি শহর দেখা যায়।

সুন্দর বাড়ি খুব বিরল নয়। কিন্তু পুরনো প্রাসাদ ও বাড়িগুলি যা ওমরাহরা তৈরি করেছিলেন, প্রায় সবই ভেঙে পড়েছে। কেবল ব্যবসায়ী ও সাহুকারদের বাড়ি ছাড়া আর কারওর বাড়িই ভাল অবস্থায় নেই। শহরটিতে আগে যমুনা থেকে বড় খালে করে জল আসত। প্রায় সব মহল্লাতেই এই জল যেত। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই খাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এই খাল কেটে জল আনার ব্যবস্থা করেছিলেন আলি মর্দান খান। শহরের বেশির ভাগ রাস্তায় এবং বড় বড় রাস্তায় এই খাল দেখা যায় যার মধ্যে দিয়ে জল যেত। বড় রাস্তার খালটি বেশ বড় ও আমস্টারডামের খালের সঙ্গে তুলনীয়। সব জলই এসে দুর্গের পরিখার মধ্যে পড়েছে এবং এর পরে যমুনায় চলে যায়।

জামা মসজিদের বর্ণনার পর মোদাভ বলেন যে এই শহরে কয়েকটা সর্বসাধারণের স্নানাগার আছে যেগুলি পারস্যের স্নানাগারের ধরনে করা। এখানে পাঁচ ছটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ি দেখা যায় যেগুলি বিদেশি বণিকদের থাকার জায়গা। এক একটা দেশের লোক এক একটা বাড়িতে থাকে যেগুলি আসলে সরাইখানা। এর মধ্যে সবথেকে বড় ও ভাল সরাইখানা হচ্ছে বেগম সাহেবার তৈরি। এটি লাহোর দরজার কাছে এবং ভাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

সাধারণভাবে শহরের বাড়িগুলি দোতলা এবং উপরে ছাদ আছে। অধিকাংশ বড়লোকের বাড়িতে বাগান আছে। ওদের কুয়ো আছে কিন্তু কুয়োর জল নোংরা।

বাড়িগুলি ইট বা পাথরের বা খড় ও মাটির তৈরি। কেবলমাত্র শহরের মাঝখানের বাড়িগুলির অবস্থা ভাল। প্রান্তিক বাড়িগুলি প্রায় সবই ভেঙে পড়েছে। এটাই অরাজকতার ফল। গত চল্লিশ বছরে দিল্লি শহর চারবার লুঠ হয়েছে। দুর্গের দরজার সামনে বড় রাস্তা চকে মিশেছে। এ জায়গায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা থাকে। রাস্তায় যেসব জিনিস বিক্রি হয় সেখানে ভাল কাপড়, মোটা কাপড়, মুলতানের কাপড়, লাহোরের অস্ত্র, কাশ্মীরের শাল, তামাকের বোঝা, শস্য, তেল, নানা ধরনের ফল ইত্যাদি পাওয়া যায়। অধিকাংশ খাবারই রাস্তার উপরেই বানানো হয়। এখানে মাছ রান্না করা হয় ও মাংস শিকের সাহায্যে ঝলসানো হয়। নানাধরনের মিষ্টি পাওয়া যায়, যেগুলি খেতে ভাল নয় এবং মাছি লেগে থাকে। শরবতও পাওয়া যায়। বরফ তৈরি করে আগুনের সাহায্যে, যেগুলি গরমের সময়েও থাকে, কিন্তু দাম খুব বেশি। খাবারের দাম দিল্লিতে কম। সাধারণত গরুর ও খরগোসের মাংস পাওয়া যায়। কাছে শহরতলিতে শুয়োরের মাংসও পাওয়া যায় কিন্তু দিল্লিতে আনলে ঝামেলা হবে। পাখির মাংস প্রচুর পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি ভাল ধরনের নয়।

দুর্গের বর্ণনায় উনি বার্নিয়ারের বর্ণনা অনুকরণ করেছেন। খালটির রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এখন আর জল নেই। নদীর একটা শাখা এই দুর্গ ও সলিমগড় দুর্গের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। দুর্গের মধ্যে প্রাসাদের অবস্থা বেশ খারাপ। নাদির শাহ, আবদালি, মারাঠারা ও প্রধান উজির গাজি-আলদিন খান এই সুন্দর প্রাসাদের সব কিছুই নিয়ে গিয়েছে। সমস্ত আসবাব, পরদা ইত্যাদি সবই নিয়ে যাওয়ায় এর গৌরবের কিছু আর নেই। সলিমগড় দুর্গে আগে বন্দিদের রাখা হত। এখন কেউ থাকে না—পরিত্যক্ত। ওখানে বাদশার ৭০/৮০টি কামান আছে। এর তামার পাতে ঢাকা সাদা পাথরের গম্বুজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরাট দরজার মধ্য দিয়ে এর ভিতরে যাবার পথটি অতীব সুন্দর। এই প্রাসাদটি সম্রাট মুহম্মদ শাহ নাদির শাহকে দিয়েছিলেন থাকার জন্য। পুরনো দিল্লি আগে একটা বড় শহর ছিল। নতুন দিল্লি থেকে একটা লম্বা রাস্তা দিয়ে এখানে যেতে হয়। এখনও বহু বাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের শেষ দিকে দুর্গের মধ্যে একটা পুরনো প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। একে পুরনো দিল্লির দুর্গ বলে (পুরনো কিল্লা)। নতুন দিল্লি থেকে দুই ক্রোশ দূরে।

দিল্লি থেকে কিছু দূরে সুন্দর বাগানের মধ্যে সম্রাটের মনোরঞ্জনের একটা বাড়ি ছিল। বাগানটিকে বলা হত শালিমার। এখন এই বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এমনভাবে যে ধ্বংসস্তূপও পাওয়া যায় না। গাছগুলি কেটে জ্বালানো হয়ে গিয়েছে—কয়েকটি গাছ এধার-ওধারে রয়েছে অতীত গৌরবের সাক্ষী হয়ে। যমুনা এখান থেকে দূরে। একসময় যমুনা নদী দিয়ে নৌকা যাতায়াত করত। এখন নৌকা দেখা যায় শুধু নদী পারাপার হবার জন্য। মথুরা ও আগ্রা থেকে কয়েকটা নৌকা অবশ্য এখনও আসে। আগে দিল্লি থেকে নদী পার হবার জন্য নৌকার পুল ছিল। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সেটাও ভেঙে গিয়েছে।

চারপাশের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে মোদাভ দিল্লির অতীত গৌরবের কথা শুনেছেন। তিনি প্রধানত দায়ি করছেন নাদির শাহি আক্রমণকে যার ফলে মোগল সাম্রাজ্য ও দিল্লির গৌরব অস্তমিত হতে শুরু করে।

১০

পঞ্জাব

১০.১ লাহোর

লাহোরের কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এটা এখন আর জানা যায় না, যদিও নানারকম প্রবাদ ও কাহিনী চালু আছে। আরব ভূগোলবিদরা ও মুসলমান ঐতিহাসিকরা এ শহর সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছেন। *হুদাদুল-আলম* নামে দশম শতাব্দীর একটি আরবি ভূগোল বইতে লাহোরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ওখানে বলা হচ্ছে যে লাহোর একটা শহর যেটি মুলতান শাসনকর্তার অধীনে এবং এখানে মুসলমান অধিবাসী নেই। আল-বেরুনি লাহোরকে একটা এলাকা বলে দু জায়গায় উল্লেখ করেছেন যার রাজধানী হচ্ছে মান্দায়ুকুর। একাদশ শতাব্দীতে শেখ আহম জানজানি লেখেন যে লাহোর শহর প্রতিষ্ঠা করেন রাজা পরীক্ষিত। এঁর মৃত্যুর পরে দুর্ভিক্ষতে লাহোর জনশূন্য হয়ে পড়ে কিন্তু আবার জনসমাগম হতে থাকে রাজা বিক্রমজিৎ-এর সময়ে। পরবর্তীকালে রাজা দীপচাঁদ দিল্লির রাজা হয়ে তাঁর ভাইপো লোহারচাঁদকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা করেন। এই লোহারচাঁদই লাহোরকে তাঁর রাজধানী করেন। ইনি নাম রাখেন লোহারপুর যার অপভ্রংশ হচ্ছে লাহোর। অন্যান্য মুসলমান ঐতিহাসিকরা একাদশ শতাব্দীতে কখনও লাহোরকে এলাকা হিসেবে বলছেন, আবার কখনও শহর হিসেবে দেখাচ্ছেন। একাদশ শতাব্দীতে পারসিক ঐতিহাসিক বৈহায়িকি গজনি রাজাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লাহোরকে শহর বলেছেন এবং তার দুর্গের নাম মান্দায়ুকুর বলেছেন। এই ধরনের উল্লেখ একাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সান সলমান, পাঞ্জাবি কবি, তাঁর কবিতায় অনেকবার লাহোরের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রতিবারেই উনি লাহোর নামের কিছু পরিবর্তন করেছেন। সুলতান ইলতুতমিসের সময়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মনসূর লাহোর প্রতিষ্ঠার কাহিনী বলেছেন। ওই শতাব্দীতে আমির খসরু মোঙ্গলদের আক্রমণের বিবরণ লিখতে গিয়ে লাহোরের নাম বদলে লিখেছেন লাতহূর। এমনকী পঞ্চদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা লাহোরকে একটা এলাকা বলেছেন আল-বেরুনির অনুসরণে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে হায়দার মির্জা দোগলাট তাঁর বিখ্যাত বই *তারিখ-ই রশিদিতে* লাহোরের অবস্থান

নির্ণয় করেছেন। উনি হুমায়ুনের সময় কাশ্মীর জয় করেন ও পরে এর রাজা হন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাহাঙ্গিরের একজন অভিজাত তাঁর অভিধানে লাহোরের বিভিন্ন নাম ও তার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। মান্দায়ুকুর বা মান্দাকুর থেকে একাদশ শতাব্দীর মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে ঐতিহাসিক টমাসের বক্তব্য যে গজনির মাহমুদের সময় মাহমুদপুর ছিল মান্দাকুর বা লাহোর। মাহমুদ এর নাম বদলে ছিলেন এরকম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসবের থেকে বলা যায় যে লাহোরের প্রতিষ্ঠার কোনও বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে নবম খ্রিস্টাব্দ থেকেই লাহোরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও লাহোর প্রতিষ্ঠার প্রবাদ কাহিনী চলতে থাকে। ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ার লাহোর পুরনো শহর বুকেফেলাস নামে অভিহিত ছিল কিনা সেটা নিয়ে খোঁজ করার উৎসাহ বোধ করেননি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সুজন রাই তার বিখ্যাত বইতে লিখছেন যে রামচন্দ্রের ছেলে লব লাহোরের প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাঞ্জাবি কবি খইরুল্লা ফিদা লিখেছেন যে আয়াজই লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালের কিছু লেখক সুজন রাইকে অনুসরণ করে লবই যে লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা, সেটা বলেছেন। এর মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখক কর্নেল টড-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামও এই মত-এর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে টলেমির ভূগোলে লাবোকলা বলে যে শহরের নাম আছে ওটিই লাহোর। উল্লেখযোগ্য যে স্ট্রাবো বা প্লিনির লেখায় এ ধরনের কোনও উল্লেখ নেই। সুতরাং বলা যায় দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে লাহোর শহরের পত্তন হয়েছিল।

সুলতান মাহমুদ লাহোর এলাকা নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যে নিলেও লাহোরে থাকেননি বা শহর সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাননি। রাজা জয়মাল-এর বংশধররা বিদ্রোহ করে এ অংশটি দখল করে নিলে, মুহম্মদ ঘোরি লাহোরের দিকে যাত্রা করেন। পথে আততায়ীর আঘাতে তাঁর মৃত্যু হলে প্রথমে সুলতান মামুদ ও পরে কুতুবউদ্দিন আইবক লাহোরে ১২০৬ সালে সিংহাসনে বসেন। চৌগান খেলার সময় তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হলে ওঁর ছেলে সুলতান আরাম শাহ সিংহাসনে বসেন। ১২১০ সালে ওঁকে সরিয়ে সুলতান ইলতুতমিস লাহোরে সিংহাসনে বসেন। সুলতান ইলতুতমিস দিল্লিতে মারা গেলে রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১২৩৬ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন। লাহোর ততদিনে দিল্লির একটি প্রদেশ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহমদ শাহ দুরানি বারবার আক্রমণ করলেও এটি শিখদের হাতে রয়ে যায়।

পুরনো হিন্দুসময়কার লাহোরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কালের প্রবাহে ও বারবার আক্রমণে সবই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর ফলে কেউ কেউ মনে করেন যে পুরনো শহরটি এই জায়গায় ছিল না। প্রবাদ কাছে যে পুরনো লাহোর শহর ছিল বর্তমান শহরের তিন মাইল পশ্চিমে *ইছুরা* নামে একটি গ্রামে। আর একটি কাহিনী আছে যে বর্তমান লাহোর শহরের প্রধান দরজা, লাহোরি দরজা, পুরনো শহরের দিকে মুখ করে আছে।

কিন্তু প্রাক্-মোগল যুগের চিহ্নও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। দুটি ছোট মসজিদ ও

আর দুএকটি ধর্মীয় জায়গা ছাড়া সুলতানি যুগের কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয় যে সুলতানি যুগে লাহোর একটা বাণিজ্যিক শহর ছিল, কিন্তু বড় বাড়ি বা প্রাসাদ ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে আমির খসরু বলছেন যে সামানা ও লাহোরের মধ্যে কসুরেই এক জনবসতি দেখা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইবন বতুতা মূলতান থেকে দিল্লি আসার পথে লাহোরে থামেননি। ওই শতাব্দীর শেষে তৈমুর লং লাহোরে আসেননি যদিও অধীনস্থ সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলেন লুঠ করার জন্য। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লাহোরের উল্লেখ করেননি। লোদিদের সময়ে লাহোরে দুটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল বলে বলা হয়, কিন্তু তার প্রমাণ এখনও মেলেনি।

মোগলদের সময়েই লাহোর বাড়তে থাকে ও নানাধরনের সৌধ তৈরি হতে থাকে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—দুর্গ। কবে এটি শুরু হয়েছিল, সেটা সঠিক বলা যায় না। ১১৮০ সালে মুহম্মদ সাম-এর আক্রমণের সময় দুর্গটি ছিল বলে মনে করা হয়। ১২৪১ সালে মোগলরা এটি ধ্বংস করে কিন্তু ১২৬৭ সালে বলবান এর পুনর্নির্মাণ করেন। তৈমুর-এর সৈন্যদল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এটি ধ্বংস করলে ১৪২১ সালে সুলতান মুবারক শাহ এটি আবার তৈরি করেন। ১৪৩২ সালে এর কিছু সংস্কার করা হয়। আকবর পুরনো কেল্লা ভেঙে আবার নতুন করে দুর্গ তৈরি করান। আবুল ফজল এই দুর্গ তৈরি করার কথা বললেও, সময় দেননি। মির্জা মুহম্মদ হাকিমের বিদ্রোহের সময় (১৫৬৬ সাল) এটির উল্লেখ পাওয়া যায় বলে বলা যায় যে ওই সময়ের আগেই এটি তৈরি হয়েছিল।

দুর্গটি চারটি বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছিল। আকবরের সময়ে এর প্রথম কাজ শুরু হয়। বদাওনি এর মধ্যে *দেওয়ান-ই আম*-এর উল্লেখ করেছেন। শিখদের সময়ে যে মানচিত্র পাওয়া যায় তার সঙ্গে বদাওনির বর্ণনার মিল আছে। দেওয়ান-ই আম-এর পিছনের দিকে ছিল সিংহাসনের ঘর। ১৫৯৭ সালে আকবর কাশ্মীর থেকে ফিরে দেখেন যে দেওয়ান-ই আম-এর অনেকখানি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় যে এটি ছাড়াও আরও কয়েকটি বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। আকবর এগুলির সংস্কার করেন।

দুর্গ তৈরির দ্বিতীয় সময় শুরু হয় ১৬১৭-১৮ থেকে। জাহাঙ্গির-এর আদেশে মাসূর খান দেওয়ান-ই আম-এর পশ্চিমে খিলান যুক্ত পথ করান যেটি দেখতে শাহজাহান এসেছিলেন ১৬১৯ সালে। ১৬২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাহাঙ্গির এসে দেখেন যে অনেকগুলি সৌধ করা হয়েছে যেটি করতে সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছিল।

তৃতীয় সময়টি শুরু হয় শাহজাহানের আমলে ১৬৩১-৩২ সালে। বাদশাহনামার লেখক আবদুল হামিদ লাহোরি এর বর্ণনা দিয়েছেন। সম্রাট একটা চল্লিশ স্তম্ভযুক্ত বড় হল করান আগ্রা ও লাহোরে যাতে ওমরাহদের রোদ ও বৃষ্টির মধ্যে না দাঁড়াতে হয়। এটি তৈরি করা হয় ঝরোখার সামনে। এর সঙ্গে *শাহ বুর্জও* তৈরি করা হয়। শাহজাহান এই বুর্জ-এর সঙ্গেই নওলাখা প্রথা চালু করেন। সাধারণত জাহাঙ্গিরের সময়ে এখানে টালির কাজ করা হয় বলে বলা হয়। কিন্তু *বাদশাহনামা* থেকে মনে হয়

যে এই কাজ শাহজাহানের সময়ে হয়েছিল। দেওয়ালের ভিত থেকে শাহ বুর্জ-এর উচ্চতা ছিল একুশ গজ। এ ছাড়া জাহাঙ্গিরের সময়ে হাতিপোল থেকে শাহ বুর্জ পর্যন্ত দেওয়াল ছিল না। শাহজাহানের সময়ে এটা করা হয় এবং এই সময়েই এখানকার টালির কাজ করা হয়। ১৬৩৩ সালে শাহজাহান *খোয়াবগাহ* তৈরি করেন। ১৬৪৪ সালে তিনি মার্বল পাথরের একশো ছত্রি করেন। শাহজাহান যে জাহাঙ্গিরি, মহলের সংস্কার করিয়েছিলেন সেটা তৎকালীন লেখক মুহম্মদ শালি কাম্বোর লেখা থেকে পাওয়া যায়। মুহম্মদ শালি লাহোর দুর্গের মধ্যের প্রাসাদের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন—গোসলখানা, খোয়াবগাহ—যার ভিতরের মেঝেতে নানা রত্ন লাগানো ছিল, উঠোন, ঝরোকা ও দেওয়ান-ই আমের চল্লিশ স্তম্ভ যুক্ত হলঘর যার ছোট পাঁচিল ছিল এবং মার্বল ছত্রি সমেত শাহ বুর্জ যার উঠোনে ছিল জলাধার ও ফোয়ারা।

চতুর্থ সময়ে তৈরি হয় প্রধান পশ্চিম দরজা ও তার সংলগ্ন দেওয়াল। এই দরজা দিয়ে দুর্গ থেকে মসজিদে যাওয়া যায়।

দুর্গর সামনের অংশটি শহরের উত্তর দিকে প্রায় পাঁচশো ফুট চলে এসেছে। এনামেল টালির নানারকমের বাহার করা আছে এই অংশে যেটা গোঁড়া মুসলমানি ধারণার মধ্যে নেই। নানারকম দৃশ্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি, হাতি, ঘোড়া যুক্ত আছে। দুর্গের আয়তন ১২৫০ ফুট ও ১১০০ ফুট এবং পশ্চিমের দরজাটিই ছিল প্রধান। ইংরেজরা দখল করার পর এই দরজাটি ইট দিয়ে বন্ধ করে হাতিপোলের সামনের ছোট দরজা, যেটি দুর্গের পিছনের দরজা, সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করা হয়। এক সময়ে এই দরজাটি সম্রাট ও মহিলাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছিল।

রবি নদীর বিপরীত দিকে জাহাঙ্গির একটা বাগানে কিছুদিন ছিলেন যার নাম তিনি আত্মজীবনীতে বলেছেন *দিলামিজ বাগান* । একবার কাবুলে যাবার পথে চারদিন ছিলেন ও আর একবার এই বাগানে তাঁর মার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। জাহাঙ্গিরের বিখ্যাত স্ত্রী, নূরজাহান, এই বড় বাগান (১৫০০ ফুট, চতুষ্কোণ) তৈরি করে ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘিরেছিলেন। ১৬টি আলাদা জায়গা ছিল ফুলের জন্য যেগুলি জলের নালি দ্বারা ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি সংযোগস্থলেই একটা করে ফোয়ারা ছিল এবং নিয়মমাফিক একটা কেন্দ্রীয় জলাধার ছিল। এর প্রধান দরজার দুপাশে ঘর ছিল। এই বাগানেই জাহাঙ্গিরের সমাধি ছিল যদিও সমকালীন লেখকরা বাগানের নাম বলেননি। ইংরেজ আমলে তারা এই ঘরগুলি দখল করে নেয় প্রধানত সহদরার কাছে কারখানার ইউরোপীয়ানদের রাখার জন্য।

শালিমার বাগানের উল্লেখ করেছেন আবদুল হামিদ লাহোরি। উনি বলছেন যে এই বাগানে সম্রাটের জন্য অনেক সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সম্রাট মহিলাদের নিয়ে এখানে আসতেন। মুহম্মদ শালির লেখাতেও এর যাথার্থ্য দেখা যায়।

সমকালীন পারসিক ইতিহাসে দেখা যায় যে বাগানের সবথেকে উঁচু জায়গাকে বলা হচ্ছে *ফারা বক্স* ও কেন্দ্রীয় জায়গাকে বলা হচ্ছে *ফৈজ বক্স* । কিন্তু কেন শালিমার নামকরণ করা হল তার পরিষ্কার বিবরণ আমরা সমকালীন লেখায় পাই না। ফলে নানা রকম প্রবাদ ও কাহিনী এই নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শালিমার নামটি প্রথম পাওয়া যায় সুজন রাই-এর লেখায়, যিনি ঔরংজেবের সময়ে লিখেছেন। উনি

বলছেন যে শহরের চারপাশে খুব সুন্দর সুন্দর বাগান থাকলেও শালিমার বাগান ছিল বিখ্যাত, যেটি তৈরি করেন সম্রাট শাহজাহান কাশ্মীরি বাগানের আদলে। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক লতিফ বলেছেন যে এটি শাহজাহানের ছয় বছরের রাজত্বকালের মধ্যে শেষ হয় (১৬৩৪ সাল)। ঐতিহাসিক হুইলার শাহজাহানকে দেওয়া একটি কবিতার মধ্যে এই বাগান তৈরির তারিখ পেয়েছেন ১৬৩৭ সাল। *তারিখ-ই লাহোর*-এর লেখক কানাইহালাল ওই একই মত পোষণ করেন। কেউ কেউ এর তারিখ ১৬৩৮ সাল বলে বলেছেন।

এই কোনও তারিখই ঠিক নয়। *বাদশাহনামাতে* পরিষ্কার দেখা যায় যে শাহজাহানের চতুর্থ বছরেই বাগান ও খালটির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। খলিলুল্লা খান-এর উপর এই কাজের ভার দেওয়া হয়। এর থেকে দেখা যায় যে বাগানের কাজ শেষ হয়ে যায় ১৬৪২ সালে এবং শাহজাহান প্রথম আসেন ৩১ অক্টোবর ১৬৪২ সালে। এই বাগানের জল আনার জন্য মাধোপুর থেকে দু লাখ টাকা খরচ করে খাল কাটা হয়। এই কাজের ভার দেওয়া হয় আলি মর্দান খান ও মুল্লা আলাওল মুলক-এর উপর। রবি নদী যেখানে পাহাড় থেকে সমতল জমিতে পড়েছে সেখান থেকে খাল কাটার পরিকল্পনা হয়। নুরপুর-এর দিকে রাজপুর গ্রাম থেকে খাল কাটা শুরু হয়। এই খালটির নামকরণ করা হয় *শাহ নহর* ও শেষ হয় ১৬৪৫ সালে। লাহোরির মতে বাগানের উপর দিকের জমিতে জল তোলা হত নীচের একটা কুয়ো থেকে। মাঝামাঝি ও নিচু জায়গাগুলিতে জল আসত খাল থেকে। লাহোরি এই বাগানের একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। উপরের দিকে আটটি সৌধ ছিল যেগুলিকে ফারা বক্স বলা হত। উত্তর দিকের বাড়িতে সম্রাট থাকতেন এবং একে বলা হত *তাখ্‌ত্থানা*। মার্বল পাথর দিয়ে গড়া ও নানারকম খোদাই করা, এই বাড়িটির মাঝখানে ছিল একটা মার্বলখচিত জলাধার। এর দুপাশে দুটি ঘর ছিল এবং সামনে স্তম্ভযুক্ত ছত্রি। পিছন দিকে একটা বারান্দা যাকে বলা হত *শাহ নাশিন* । জল এই বাড়ির মাটির নীচ দিয়ে গিয়ে বাগানে পড়ত। প্রায় প্রতিটি মোড়েই ছিল মার্বল পাথরের কাজ। পূর্ব দিকের বাড়িতে ছিল ঝরোখা। এর সামনে ছিল দিওয়ান-ই আম। দক্ষিণ দিকের মাঝখানে ছিল সম্রাটের থাকার ঘর। এই দুই বাড়ির মধ্যে ছিল একটা খাল। এইদিকের বাগানে ১০৭টি ফোয়ারা ছিল। বাগানের প্রতি কোণে একটা অষ্টকোণাকৃতি ঘর একটা মিনার-এর সঙ্গে। মাঝখানের জায়গায় জল উপর থেকে খালে পড়ছে। এর মাঝখানে ছিল একটা বাঁধানো মার্বল পাথরের সিংহাসন ও কাছে মার্বল পাথরের বাঁধানো বসার জায়গা। এখান থেকে জল গিয়ে কেন্দ্রীয় জলাধারে পড়েছে। জলাধারের মাঝখানে ছিল একটা চবুতরা। এর পূর্ব দিকের কোণে ছিল হাম্মাম যার দেওয়াল নানারকমের কাজে ভর্তি। তিনটি ঘর ছিল—একটা জামা বদলানোর, একটা গরম জলের ও অন্যটা ঠাণ্ডা জলের। এই মাঝামাঝি জায়গাটিকে বলা হত ফৈজ বক্স। নীচের অংশটি উপরের ধরনের মতোই। তফাত শুধু যে খালটি এখানে দক্ষিণ থেকে উত্তরে কাছে এবং পাশে তিনসারি করে ফোয়ারা আছে। এই দিকের বাগানে ১৪৩টি ফোয়ারা। এর উত্তর দিকে যে বাড়িটি ছিল তাকে দিওয়ান-ই খাস বলা হয়। এটি মার্বল খচিত। এর নীচ দিয়ে জল গিয়ে উত্তর দিকে ফলের বাগানে পড়েছে। *বাদশাহনামার* মতে

বাগানটি সম্পূর্ণ করতে ছয় লাখ টাকা লেগেছিল। পরবর্তী কালের লেখকরা বলেছেন যে বাগানটি সাত ভাগে বিভক্ত ছিল—স্বর্গের সাত ধাপের মতো। কিন্তু এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি—কোনও ধরনের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। শিখ রাজা রঞ্জিৎ সিংহর তৈরি একটা দোতলা বাড়ি পুব দিকে রয়েছে যার শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৮২০ সালে উইলিয়াম মুরক্রাফট এ বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি বাগান ছিল।

জাহাঙ্গির রাজাওর-এ মারা যান ৮ নভেম্বর ১৬২৭-এ। ওঁর মৃতদেহ লাহোরে এনে সহদরায় দিলামিজ বাগানের মধ্যে সমাহিত করা হয়। শাহজাহান একটি সমাধিসৌধ তৈরি করেন যাকে বলা হয় *মকবরা-ই জাহাঙ্গির*। নানারকম ভাস্কর্য ও নানা রঙের চিত্র এতে আছে। একটা লাল পাথরের চবুতরার উপর বাড়িটি রয়েছে। বড় দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে যেতে হয়। সৌধর চারপাশে করিডর দিয়ে ঘেরা আছে যার মধ্যে অনেক ঘর আছে। করিডরটির মেঝে মোজাইক করা ও মার্বল পাথরে কোরানের বাণী লেখা আছে। সৌধর ভিতরে মার্বল পাথরের সমাধি যার উপর কোরানের বাণী ও জাহাঙ্গিরের সমাধি লেখা আছে। সমাধিসৌধর কীরকম চেহারা ছিল এ নিয়ে পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

এর কাছেই আছে নূরজাহানের সমাধি, যিনি ১৬৩৮ সালে মারা যান। ওঁর সমাধিসৌধ উনি নিজেই তৈরি করেছিলেন এবং জাহাঙ্গিরের সমাধিসৌধের মতোই দেখতে। এর মার্বল পাথর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই শহরে আসফ খানের সমাধি আছে। শাহজাহানের স্ত্রী আরজুমন্দ বানু বেগমের ইনি পিতা ছিলেন এবং ১৬৪১ সালে মারা যান। সব থেকে আলোচিত সমাধিসৌধ বোধহয় আনারকলির সমাধি। আসল নাম নাদিরা বেগম বা শরফুন্নিসা। নানাধরনের কাহিনী এর সম্বন্ধে ছড়িয়ে আছে যদিও তাঁর আত্মজীবনীতে জাহাঙ্গির এর সম্বন্ধে কিছু বলেননি। পুরনো শহরের দক্ষিণে এই সমাধি। পরবর্তীকালে এর উপর দিয়ে প্রচুর ঝড়-ঝাপটা চলে গিয়েছে। রঞ্জিৎ সিংহর সময় এই বাড়িটিতে ছিলেন খারাক সিং। এর পরে এটি ইতালীয় সেনাপতি ভেন্টুরাকে থাকতে দেওয়া হয়। খারাক সিং আসার আগেই এর সমাধির পাথরটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইংরেজরা শহর দখল করলে বাড়িটিকে রেসিডেন্সি করা হয়।

উপরের পাথরটি সরানো হলেও, বিংশ শতাব্দীতে খোঁড়ার পর আসল সমাধি পাঁচ ফুট নীচে পাওয়া গিয়েছে। কালো মার্বল পাথরের সমাধিতে যে শিলালেখ আছে তাতে সলিমের নাম আছে ('অনেক ভালবাসার সলিম, আকবরের ছেলে')। এখানে দুটি তারিখ আছে—একটি ১৫৯৯ সাল যখন সমাধিস্থ করা হয় ও অন্যটি ১৬১৫ সাল যখন বাড়িটি শুরু করা হয় সমাধির উপরে।

আনারকলির কাহিনী কোনও সমকালীন পারসিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এটি শুরু করেন একজন ইংরেজ বণিক, উইলিয়াম ফিঞ্চ, যিনি লাহোরে এসেছিলেন নীল বেচতে। দিল্লি থেকে লাহোরে উনি আসেন ১৬১১ সালে—অর্থাৎ প্রথম তারিখের বারো বছর বাদে। উনি লিখছেন শকরগঞ্জ (চিনির বাজার)-এ শহরের বাইরে বড় চতুষ্কোণ বাগানের মধ্যে ডানিয়েলের মা ইসমারক কেলের (যার সঙ্গে সলিমের

লাহোর শহরের পথনির্দেশিকা

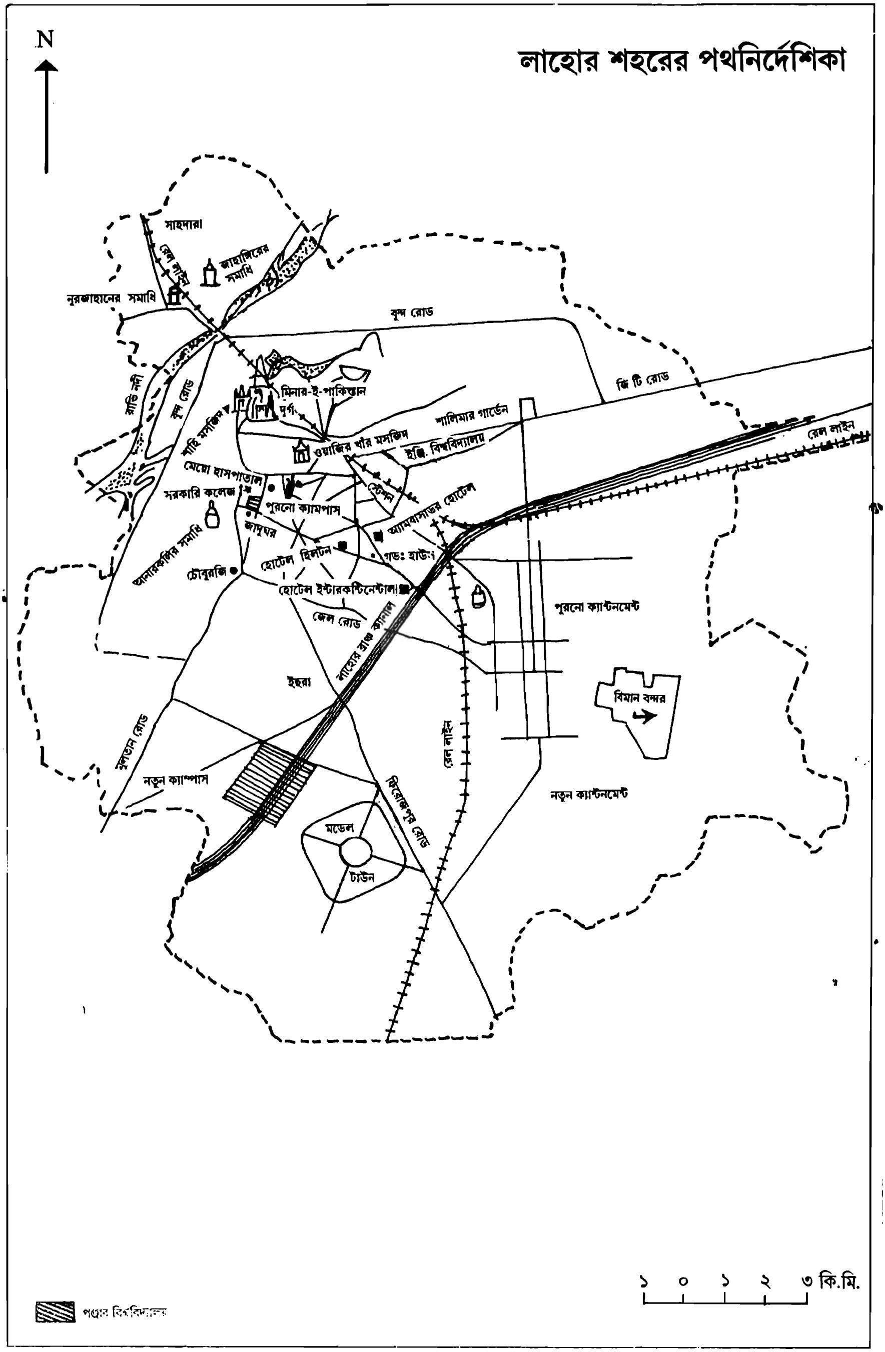
N
সাহদারা
রেল লাইন
জাহাঙ্গিরের সমাধি
নুরজাহানের সমাধি
বৃন্দ রোড
রাভি নদী
বৃন্দ রোড
জি টি রোড
মিনার-ই-পাকিস্তান
শাহি মসজিদ
দুর্গ
শালিমার গার্ডেন
ওয়াজির খাঁর মসজিদ
ইঞ্জি. বিশ্ববিদ্যালয়
রেল লাইন
মেয়ো হাসপাতাল
সরকারি কলেজ
স্টেশন
পুরনো ক্যাম্পাস
অ্যাম্বাসাডর হোটেল
জাদুঘর
আনারকলির সমাধি
হোটেল হিলটন
গভঃ হাউস
চৌবুরজি
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল
পুরনো ক্যান্টনমেন্ট
জেল রোড
লাহোর ব্রাঞ্চ ক্যানাল
ইছরা
বিমান বন্দর
মুলতান রোড
রেল লাইন
নতুন ক্যাম্পাস
ফিরোজপুর রোড
নতুন ক্যান্টনমেন্ট
মডেল
টাউন
১ ০ ১ ২ ৩ কি.মি.
▨ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

সৌজন্য: এম. বকির, *লাহোর পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট*

সম্পর্ক ছিল এবং যাকে আকবর জীবন্ত কবর দেন) সমাধির ওপর শেখ ফরিদ (সলিমের আরেকটা নাম) একটা সুন্দর মসজিদ তৈরি করে দেন।

ইংরেজ বণিকের এই কাহিনীর কোনও সমর্থন সমকালীন ইতিহাসে মেলে না। ডানিয়েলের মা আনারকলি ছিলেন এর কোনও প্রমাণ নেই। ১৬৪২ সালে দারা শুকোর একটা লেখা থেকে জানা যায় যে আনারকলির বাগান ছিল শহরের দক্ষিণে এবং এর দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একটা গম্বুজ ছিল। এই লেখায় কোনও উল্লেখ নেই যে কার সমাধি এখানে রয়েছে। এ ছাড়াও সলিম সম্রাট হবার পর এটি তৈরি করলে তাঁর জাহাঙ্গির নাম থাকত। যেহেতু ১৫৯৯ সাল লেখা রয়েছে এটা পরিষ্কার যে সম্রাট হবার আগেই তিনি এই সমাধি করান। ইংরেজ ঐতিহাসিক দেখাচ্ছেন যে আকবর ৬ নভেম্বর ১৫৯৮ সালে লাহোর ছেড়ে চলে যান। সুতরাং ১৫৯৯ সালে উনি জীবন্ত কবরের আদেশ দেবেন লাহোরে থেকে এটাও মেনে নেওয়া কঠিন। সুতরাং প্রশ্ন আসে যে এটা কার সমাধি? ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে জাহাঙ্গিরের এক স্ত্রী, সাহেব-ই জামাল, ১৫৯৯ সালে লাহোরে মারা যান। উনি সুলতান পারভেজের মা ছিলেন। ১৫৮৬ সালে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে ওঁর বিবাহ হয়। সুতরাং এ কবরটি জাহাঙ্গিরের স্ত্রী সাহেব-ই জামালের, আনারকলির নয়।

এ ছাড়াও শহরের মধ্যে আরও কয়েকটি সৌধ দেখা যায়। রবি নদীর দক্ষিণ পাড়ে একটা বহু পুরনো সৌধ দেখা যায় যার দেওয়ালের পাদদেশে নদীর জল আছড়ে পড়ছে। এটি বাবরের ছেলে মির্জা কামরান-এর বরাদরি বলে ধরা হয়। একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে এটি আছে। রবি নদী তখন প্রায় দু মাইল দুরে ছিল। সম্রাট মুহম্মদ শাহর সময়ে নদী এগিয়ে আসে ও অনেকগুলি মোগল বাগান গ্রাস করে নেয়। খিলানের তলায় রঙিন চিত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়।

মুলতানের পথে আর একটি বাগানের মধ্যে যে সৌধটি দেখা যায়, তাকে *চৌবুরজি* বলে বলা হয়। বাইরের দেওয়াল চমৎকার নীল ও সবুজ এনামেল টালিতে ঢাকা। ভিতরে দেওয়ালচিত্র এখনও চমৎকার আছে। পুরনো কাহিনী অনুযায়ী বাগানটি আরও বিস্তৃত ছিল। সৌধের উপরের দিকে নীল রঙের পোর্সিলিনের উপরে কোরান থেকে লেখা রয়েছে। একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে ১৬৪৬ সালে এটি করা হয়েছিল এবং জেবিন্দা বেগম এই বাগানটি মিঁয়া বাইকে দেন। জেবিন্দা বেগমকে কেউ কেউ জেবউন্নিসা বেগম (ঔরংজেবের মেয়ে) বলে ধরেছেন। কিন্তু মিঁয়া বাই-এর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। এ হলেও ওই সময়ে জেবউন্নিসা বেগম খুবই ছোট ছিলেন।

মোগল লাহোরের বৈশিষ্ট্যর মধ্যে একটা হল নানাধরনের মসজিদ। এদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল *বাদশাহি মসজিদ* যার সাদা গম্বুজ ও উঁচু মিনার বহু দূর থেকে দেখা যায়। একটা উঁচু চবুতরার উপর খিলান দিয়ে তৈরি হবার ফলে জমি থেকে এটি অনেক উঁচু। পুব দিকে উঁচু লাল পাথরের দরজার মধ্য দিয়ে বাইশটি পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। পাথরগুলি কাবুল থেকে আনা হয়েছিল। ভিতরের শিলালেখ থেকে জানা যায় এটি ঔরংজেবের মসজিদ ও ১৬৭৪ সালে তৈরি শেষ হয়েছিল। সুজন রাই-এর মতে খরচ পড়েছিল পাঁচ লাখ টাকা।

১৮৪০ সালের ভূমিকম্পে মিনারগুলির উপরের ছত্রিগুলি ভেঙে যায়। এর পরেই এটি শিখদের হাতে চলে যায়।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি মসজিদ আছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ওয়াজির খানের মসজিদ। শেখ আহমদ দিন আনসিরি ১৬৩৪ সালে এক সন্তের সমাধির উপরে তৈরি করেন। আনসিরি পেশায় ছিলেন হাকিম কিন্তু শাহজাহানের সময়ে তিনি ওয়াজির খান উপাধি পেয়ে উজির হন। ১৬৩২ থেকে ১৬৩৯ সাল তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। মসজিদটির বৈশিষ্ট্য এর দেওয়ালের অপূর্ব ভাস্কর্য যেগুলি রং করা। ভিতরের শিলালেখ থেকে তারিখ জানা যায়। সৈয়দ আহমদ লতিফ ওয়াকফের পুরনো দলিল থেকে দেখাচ্ছেন যে নবাব ওয়াজির খান এই মসজিদ থেকে দিল্লি দরজা পর্যন্ত পথের দুধারের সব দোকান ও বাড়ির মালিক ছিলেন। এ ছাড়াও দিল্লি দরজার কাছে হাম্মামেরও মালিক ছিলেন। এখানকার সব সম্পত্তির আয় তিনি এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিয়েছেন।

এ ছাড়াও ছিল সুনহারা মসজিদ বা সোনার মসজিদ, যেটি ছিল কাশ্মীর-বাজার রাস্তা ও বান বাট্টান রাস্তার সংযোগস্থলে। নবাব ভিখারি খান ১৭৫৩ সালে এটি তৈরি করেন। পিতলের তিনটি গম্বুজ আছে। চারপাশের দোকানগুলির আয় থেকে মসজিদ চলে। দুর্গের পুব দিকে মাস্তি দরজার কাছে আছে একটি পুরনো মসজিদ যার নির্মাণকাল লতিফ স্থির করেছেন ১৬১৪ সাল। শিলালেখ থেকে জানা যায় যে জাহাঙ্গিরের মা মরিয়াম জামানি এই মসজিদটি তৈরি করেছেন। মরিয়াম জামানি রাজা বিহারিমলের মেয়ে ছিলেন বলে ধরা হয় যদিও এ সম্বন্ধে এখন কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ইট দিয়ে তৈরি এই মসজিদটি পাঠান ও মোগল যুগের মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব। ১৬৩৫ সালে শাহজাহানের দাই আঙ্গা একটি মসজিদ তৈরি করেন যার নামেই মসজিদ। এঁর আসল নাম ছিল জেবুন্নিসা ও মোগল অভিজাত মুরাদ খানের স্ত্রী ছিলেন। ভিতরে কোরানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা আছে। নানাধরনের টালির কাজ ও রঙের ব্যবহার করা হয়েছে।

লাহোরের উপর একটি সুন্দর হিন্দি ভাষায় রচিত জাটমল নাথ-এর গজল পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কবি বলছেন যে লাহোর দেখার পর তিনি আর সব শহর ভুলে গিয়েছেন। রবি নদীর উপর নৌকা আছে, জল স্বচ্ছ এবং হাঁস ও অন্যান্য পাখি রয়েছে। শহরটা বড় সমতল জমির উপর এবং এর ব্যাসার্ধ বারো ক্রোশ। এর চারপাশে ঘেরা উঁচু পাঁচিল যার বারোটা দরজা আছে যেখানে নহবত বাজানো হচ্ছে অবিরাম। দরজায় বিরাট হাতি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা মোতায়েন।

শহরে অনেকগুলি বাজার আছে যাদের রকমও আলাদা। কোনওটা কাটরা, কোনওটা বা গঞ্জ; কোথাও মন্ডি যেখানে বহু লোক ভিড় জমাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে তেলি, সুগন্ধির বিক্রেতা, হালওয়াই (মিষ্টি তৈরি করে), লোহারু, থাথেরা, তাম্বুলি (পান বিক্রেতা) জৌহুরি, কুমহার, মুচি, স্বর্ণকার ও ঘোড়ার মোজা ও সাজ বিক্রেতা। পটুয়া ও পানসারিরা রয়েছে বহু দালালের সঙ্গে। এ ছাড়া জরির কারিগর, বাজাজা (কাপড় বিক্রেতা) ও ধনী শরফও রয়েছে। ফল বিক্রেতা ও রুটি বিক্রেতা রয়েছে।

বিভিন্ন পেশার লোকেরা আছে যাদের মধ্যে ধরা যায় তাম্বুদার, চিত্রকার, কাঁসেরা, ধোবি, ধুনিয়া, কোলি, কাসিবি ও বানিয়া। বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের কেনাবেচা চলতে থাকে যার মধ্যে রয়েছে ধানকুচি, ভেলভেট, জারওয়াফ, দুলিচা (গালিচা), জারি, নীলও বিক্রি হয়। পণ্ডিত ও জ্যোতিষীরা বাজারে বসে ভাগ্য বলতে থাকে। এ ছাড়া রয়েছে রংরেজ, দরজি, রাজকারিগর, দাবগার ইত্যাদি। কাজিরা শহরে ঘুষ না নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে। মুল্লা ও খাতিব কোরান নকল করে এবং পণ্ডিতরা বেদ ও পুরাণ আবৃত্তি করে। কয়েকজন তাবিব (ডাক্তার) শহরে আছে। এ ছাড়াও রয়েছে গণিকারা— গোলানী, গৃদাকিনী, কাঞ্চনী, ভেস্য—যারা ক্রমাগত পান চিবোয়। লোকেরা ওখানে উত্তেজক পানীয় পায়। যুবকরা চৌপদ ও নার্দ খেলে এবং গান শোনে। বাজারের মধ্যে নাচ, গান, কৌতুক—সবই দেখা যায়। কুস্তি খেলা এর মধ্যে বড় অঙ্গ ছিল। কবি লাহোরের মহিলাদের নানাধরনের প্রসাধন ব্যবহার ও সাজপোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন। শহরে বিভিন্ন মহল্লা ছিল। এদের মধ্যে সুন্দর ছিল বাচ্ছোয়ালি ও সোনাইয়া। এ ছাড়া ছিল তালবাদা, তিলা, সৌদামিক্ষা, বুখারগঞ্জ যেটি ছিল মন্ডি। রাজপুরা ছিল শস্যভান্ডার। বানিয়ারা থাকত আম্বের মহল্লায়।

কবি কয়েকটা সৌধের কথাও বলেছেন। উনি উল্লেখ করেছেন শস্যভান্ডার, জৈন মন্দির, ধর্মশালা, বেগমের মসজিদ ও গির্জা এই সবের। রাজপ্রাসাদ, উনি বলেছেন, ছিল ইন্দ্রের বিমানের মতো এবং ওখানে মানুষ ও জন্তুর নানা রঙের ছবি আঁকা রয়েছে।

ছোট এই কবিতার মধ্যে সব কিছুর বর্ণনা না পাওয়া গেলেও, শহরের এমন একদিকের ছবি কবি দিয়েছেন যা সাধারণ আকর থেকে পাওয়া দুর্লভ। শহরের নিচুতলার বাসিন্দা ও তাদের পেশা এই কবিতায় যেমন জীবন্ত হয়ে এসেছে, তেমনি এ শহরের কর্মব্যস্তময় জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি এই কবিতায় পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে এই হিন্দু কবি জাহাঙ্গিরের শাসনের খুব প্রশংসা করে ওঁকে রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওঁর নিরপেক্ষ বিচার, চারপাশের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় উদারতা ওঁকে এই জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে। শহরের মধ্যের বাজারে বসে পুরোহিতরা বেদ ও পুরাণ নির্ভয়ে আবৃত্তি করছে এটা মধ্যযুগের চিরাচরিত রীতি যার প্রমাণ আমরা অন্য শহরেও পাই।

১৬১১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি উইলিয়াম ফিঞ্চ লাহোরে আসেন। এর পরেই আসেন তুর্কির দূত। লাহোরকে ফিঞ্চ বলেছেন পুব দিকের বড় শহরগুলির অন্যতম। এর ব্যাসার্ধ ২৪ পোন ও পরিখা দিয়ে ঘেরা। ওই সময়ে রাজার আদেশে পাঁচিল গাঁথা হচ্ছিল। পাঠানদের সময়ে এটি ছিল ছোট একটি গ্রাম। তখন মুলতান ছিল অনেক বড়। হুমায়ুন লাহোরকে বড় করেন। শহর ও শহরতলি নিয়ে এটি ৬ ক্রোশ। শহরের দুর্গটি একটা শক্ত ইটের পাঁচিলে ঘেরা। এর বারোটা দরজা আছে। ন'টি ভিতরের দিকে ও তিনটি নদীর ওপরে। রাস্তাগুলি বড় এবং বাঁধানো। অধিবাসীদের অধিকাংশই বানিয়া ও কারিগর। বড় লোকেরা অধিকাংশই শহরের বাইরে থাকে। বাড়িগুলি ভাল এবং উঁচু, প্রধানত ইটের তৈরি। এর জানালা ও দরজাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হিন্দুদের বাড়িতে যেতে হলে ছয়/সাত ধাপ উঠে যেতে হয়। যাতে

রাস্তা থেকে বাড়ির ভেতর দেখা না যায় সেইভাবে তৈরি। নদীর ওপর দুর্গ। নদী দিয়ে বর্ষার পর ওপরে সিন্ধুর থাট্টা বা নীচে যাওয়া যায়। নদী পুব দিক থেকে এসে পশ্চিমে চলে গেছে শহরের উত্তর দিক দিয়ে।

নদীর ধারে দুর্গের মধ্যে রাজার বাসস্থান। শহরের মধ্যে বাঁ দিকের বড় দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে কিছুদূর গেলে আবার আর একটা দরজা। এটা অনেক ছোট। এটা দিয়ে ভিতরে গেলে চতুষ্কোণ উঠোন। এর সঙ্গে রয়েছে *আতসখানা* ও রাজার রক্ষীরা। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে গেলে একটা উঠোন যেখানে দরবার বসে। এর পাশেও আতসখানা ও রক্ষীরা আছে। একটা উঁচু জায়গায় আলো লাগানোর ব্যবস্থা। এখান থেকে এগোলে আর একটি ছোট উঠোন যার মাঝখানে রয়েছে *দেওয়ানখানা*। এর সঙ্গে রয়েছে দুটি তিনটি ঘর যেখানে রাজা রাত্রির প্রথমভাগে, আটটা থেকে এগারোটা অবধি বসেন। দেওয়ালে রাজার ছবি আছে সিংহাসনের উপর হাঁটু মুড়ে বসা। এর পাশে ছবিতে রয়েছে ডান দিকে সুলতান পারভেজ ও অন্যান্য ছেলেরা। এর পাশে শাহ মুরাদ ও ডানিয়েল, রাজার দুই ভাই। এর পরে মির্জা শরিফ, আসফ খানের দাদা। এর পরে মির্জা রুস্তম, কান্দাহারের পূর্বতন রাজা। তারপর খান-ই খানান, কুতুবউদ্দিন খান কোকা, রাজা মানসিংহ, আজম খান, আসফ খান (জাফর বেগ), শেখ ফরিদ, কিলিজ খান ও রাজা জগন্নাথ। সম্রাটের বাঁ দিকে রাজা ভাও সিং যিনি চামর দোলাচ্ছেন, রাজা রামদাস, মহাবৎ খান ও অন্যান্য রাজারা। এই চিত্রকলার মধ্যে দ্রষ্টব্য হচ্ছে যে দরজার উপর রাজার ডান দিকে রয়েছে যিশু খ্রিস্টের ছবি ও বিপরীত দিকে ভার্জিন মেরি। এই দেওয়ানখানাটি সুন্দর, রবি নদীর উপরে। এর পশ্চিমে ছোট দরজা দিয়ে গেলে একটা ছোট উঠোন পাওয়া যায়। যেখানে পাথরে বাঁধানো বসার জায়গা আছে। উপরে সামিয়ানার আচ্ছাদন। এর থেকে একটু এগোলে ঝরোখা যেখান থেকে নীচে বন্যপশুদের লড়াই দেখা যায়। এই জায়গার দেওয়ালের চিত্র থেকে দেখা যায় যে আকবর বসে আছেন যার সামনে রয়েছে হাতে বাজপাখি নিয়ে সলিম ও পাশে আকবরের অনান্য ছেলেরা। এর শেষে একটা ছোট দেওয়ানখানা আছে যেখানে রাজা বসতেন। এর পিছনে থাকার ঘর। এঘর থেকে একটা বাঁধানো উঠোনে যাওয়া যায় যার ডান দিকে দোতলা একটা বাড়ি। প্রতি বাড়িতেই আটটি আলাদা জায়গা আছে হারেমের মহিলাদের জন্য। এই ঘরগুলির জানালা থেকে নদী ও উঠোন দেখা যায়। সব ঘরগুলিরই দরজাগুলি বাইরে থেকে বন্ধ, কোনওটাই ভিতর থেকে নয়। যেখানে রাজা বসতেন তাঁর মাথার উপরে অনেকগুলি ছবি আছে দেবদূত ও শিংওয়ালা শয়তানদের।

আগেকার উঠোনের যেখানে রক্ষীরা পাহারায় রয়েছে, বাঁ দিকে একটা নতুন দরবার করা হয়েছে। এটি পার হয়ে ছোট উঠোন আতসখানা সমেত। এর দরজা দিয়ে গেলে চতুষ্কোণ বড় মহল, যাকে নতুন মহল বলে। এখানে প্রায় দুশো মহিলা থাকেন। আবার পুরনো উঠোনে ফিরে গেলে, ডান দিকে এগোলে আর একটা উঠোন। এর বাঁ দিকে আর একটা বড় মহল, যেখানে ষোলোটা আলাদা থাকার জায়গা আছে, যার মধ্যে রয়েছে বাঁধানো উঠোন ও জলাধার। এসবই নদীর উপরে। সুলতান খুরম-এর মার বাসার উপরে একটা বড় আলো লাগানো, যেমন রয়েছে

রাজার বাসার উপরে। এর মাঝখানে একটা জায়গা রাজার বসার জন্য। এই বসার জায়গার উপরে রয়েছে ওইসব শয়তানের ছবি। শেষ অংশে রাজার অনেক ছবি আছে—প্রধানত তাঁর মহিলাদের সঙ্গে। কারও হাতে মদের বোতল, কারও হাতে পেয়ালা। পিছনে একজন চামর দোলাচ্ছে। কেউ কেউ খোলা তরোয়াল নিয়ে আবার কারও হাতে ধনুক-বাণ। এর সামনে বাঁধানো উঠোন যার দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে নদী দেখা যায়। শেষকালে নদীর ধারে মার্বল পাথরের বসার জায়গা, উপরে ছোট ছাদ দেওয়া। এর নীচে সুন্দর বাগান মনোরঞ্জনের জন্য। এর পিছনে রাজার বাড়ি। দেওয়াল ও ছাদ সোনা দিয়ে মোড়া। পাশে মানুষের সমান উচ্চতায় ভেনিসের আয়না বসানো তিন-তিন করে একের উপরে আর একটি। নীচে, দেওয়ালে রাজার পূর্বপুরুষদের ছবি—আকবর, হুমায়ুন, বাবর—সবাই ফকিরের পোশাক পরা।

এই মহলের বড় দরজা দিয়ে বেরোলে আবার শহরে আসা যায়। মহলগুলি প্রায় দুই মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে করা। দুর্গের বাইরে পুব দিকে আসফ খান (জাফর বেগ)-এর বাগান। দুইপাশে সাইপ্রাস গাছের সারির মধ্য দিয়ে চলার পথ। বিভিন্ন ধরনের জলাধার ও বসার জায়গা। ভিতরে একটা জলাধারের মাঝখানে একটা পাথরের স্তম্ভযুক্ত দেওয়ানখানা। এর পিছনেও ছোট ছোট বাড়ি আছে মহিলাদের জন্য। পিছনে আর একটি বাগান ও বাড়ি। এর মধ্যে জলাধার ও বাড়ি পাথরের স্তম্ভযুক্ত। এর পাশেই রাজার বাগান বহু ধরনের ফল ফুলে ভরা।

দুর্গের পশ্চিম দিকে ফেরি করে নদী পার হবার ব্যবস্থা আছে যার পরে কাবুল, কাসগরের পথ। নদীর ওপারের জায়গা খুব সুন্দর। বহু বাগান আছে। এরপরেই উনি আনারকলির সমাধির কথা বলেছেন যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

প্রাসাদের এই ধরনের বর্ণনা, বিশেষত দেওয়ালচিত্রের, আমরা আর পাই না। ফতেপুর সিক্রি ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গার দেওয়ালচিত্রের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও, প্রাসাদের মধ্যেকার দেওয়ালের প্রত্যক্ষদর্শীর এরকম জীবন্ত বর্ণনা আর নেই। পরবর্তী দুটো বর্ণনায় আমরা দেখব যে সম্রাট শাহজাহানের পরে লাহোরের কী অবস্থা হয়েছিল।

আগে উল্লিখিত হয়েছে যে বার্নিয়ার লাহোর পুরনো বুকেফেলাস কিনা সেটা জানতে আগ্রহী ছিলেন না। রবি নদীর প্লাবনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলছেন যে এই নদী তার গতিপথ ঘন ঘন বদলায়। বার্নিয়ার যখন গিয়েছিলেন তখন নদী শহর থেকে আরও আধমাইল দূরে সরে গিয়েছে যার ফলে অধিবাসীদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। বার্নিয়ার বলছেন যে দিল্লি ও আগ্রার তুলনায় লাহোরের বাড়িগুলি অনেক উঁচু কিন্তু যেহেতু গত কুড়ি বছরে দরবার এখানে বসেনি, সেহেতু বাড়িগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই একেবারে ভেঙে গিয়েছে এবং কয়েকটি হঠাৎ ভেঙে গিয়ে অধিবাসীদের মাটি চাপা দিয়েছে। এর কারণ ছিল যে গত কয়েক বছর ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় এই সব বহুকালের পুরনো বাড়ি ধসে পড়ে। এ শহরে এখনও পাঁচ-ছটা বড় রাস্তা আছে, যার মধ্যে অন্তত দুটো এক মাইলের উপর লম্বা। কিন্তু ওই রাস্তার পাশের অনেকগুলি বাড়ি ধসে পড়েছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন হবার ফলে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ এখন

আর নদীর পাড়ে নেই। এখানকার রাজপ্রাসাদ বড় ও সুন্দর হলেও, দিল্লি বা আগ্রার তুলনায় নিকৃষ্ট।

১৬৬৫ সালে ফরাসি পরিব্রাজক থেভনো ভারতে আসেন। ওঁর লাহোর সম্পর্কে বক্তব্যর সঙ্গে বার্নিয়ারের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। উনি বলেছেন যে রবি নদীর উপরের প্রধান শহর লাহোর এখন আর নদীর উপরে নেই কারণ নদী আধমাইল দূরে সরে গিয়েছে। যখন দরবার এখানে ছিল, তখন এটা ছিল সুন্দর শহর। রাজারা দিল্লি, আগ্রার থেকেও এই শহরকে বেশি পছন্দ করতেন। এটা একটা বড় শহর এবং এর মধ্যে মসজিদ, সাধারণ লোকের জন্য স্নানাগার, সরাইখানা, চক, জলাধার, প্রাসাদ ও বহু বাগান ছিল। দুর্গটি এখনও আছে। কারণ এটি খুব মজবুতভাবে তৈরি। এর বারোটি দরজার মধ্যে নয়টি গ্রামাঞ্চলের দিকে ও তিনটি শহরের দিকে। রাজপ্রাসাদের ভিতরে আছে এবং তার সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি এখনও। এর দেওয়ালে বহু ছবি আছে যেগুলি থেকে মোগল রাজাদের বীরত্বের কাহিনী পাওয়া যায়। এদের পূর্বপুরুষদের ছবিও বড় করে করা। একটা দরজায় ক্রুশ আছে ও অন্য দরজায় ভার্জিন মেরির ছবি আঁকা। থেভনো অবশ্য মনে করছেন যে জাহাঙ্গির এগুলো করেছিলেন পতুর্গিজ সাহায্য পাবার জন্য। শহরের বড় বড় বাড়িগুলি প্রতিদিনই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা রাস্তা দুই মাইলের মতন লম্বা। এদের দুপাশের প্রাসাদগুলি ভেঙে পড়ছে। শহরটি খুব পুরনো নয়। হুমায়ুনের আগে এটি ছিল ছোট একটা শহর। হুমায়ুন দুর্গ তৈরি করে এটাকে বড় করেন। হুমায়ুন এখানে দরবার বসান যার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি এত বড় হয়ে যায় যে এর শহরতলি প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। যেহেতু এখানে অনেক হিন্দু বাস করে, সেজন্য এখানে অনেক মন্দির আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলিতে ভাস্কর্য আছে। সাত-আট ধাপ উঠে এগুলির ভিতরে যাওয়া যায়।

লাহোরের চারপাশের গ্রামাঞ্চলটি বড় এবং প্রচুর ফসল হয়। ধান, গম ও অন্যান্য ফল প্রচুর পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানের মধ্যে এখানেই সবথেকে ভাল আখ হয় এবং এর মদও ভাল। শহরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্প উৎপাদন হয়। এর মধ্যে রং করা কাপড় উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানের অন্যান্য জায়গার যা কিছু হয় সবই এখানে পাওয়া যায়। ওঁর পরিচিত এক ভারতীয়ের মতে এখান থেকে সম্রাট তিনকোটি সাত লক্ষ খাজনা পান (সম্ভবত তামার মুদ্রার দামে)। আগ্রা থেকে লাহোর পর্যন্ত পথের দুধারে গাছের সারি আছে। এই শহরে হিন্দুদের একটা মঠ আছে যাকে বলা হয় ভারতিয়া। এরা নিরামিশাষী, এমনকী রান্নাও করে না। রান্না করা খাবার ভিক্ষা করে খায়। এদের মতে শহরটি দু হাজার বছরের পুরনো যখন থেকে তাদের মঠ আছে।

১০.২ সিরহিন্দ

পঞ্জাবের কয়েকটি শহরের ইতিহাস খুবই পুরনো, সে ইতিহাস এখনও পরিষ্কার করে উদ্ধার করা হয়নি। পুরনো জায়গার মধ্যে একটা রয়েছে সিরহিন্দ। এরও প্রথম দিকের ইতিহাস অজানা এবং বিতর্কিত। নূরউদ্দিন সিরহিন্দি তাঁর বই *রৌজাৎ-আল কায়ুম*-এ বলেছেন যে সিরহিন্দ ফিরোজ শাহ তৃতীয়ের সময়ে পত্তন করা হয়। এই শহরটি সিংহের জঙ্গলের মধ্যে ছিল বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল সিহরিন্দ (সিহ=সিংহ এবং রিন্দ=জঙ্গল—সিহরিন্দ পরবর্তীকালে 'সিরহিন্দ' হয়ে যায়)। আর একজন লেখক বলেছেন যে যাদব বংশের কৃষ্ণের বংশধর সাহির রাও বা লোমান রাও ওই সময়ে লাহোরে রাজত্ব করছিলেন। তিনি ৫৩০ সংবত-এ এটির প্রতিষ্ঠা করেন। আর একজন বলেছেন যে চৌহান ঠাকুর বা রাজা নশো বছর আগে বাইরের থেকে লোক এনে এখানে বসান। কেউ কেউ সিকান্দার লোদির সময়ে এর পত্তন হয়েছিল বলেছেন।

এসব মতামতকে বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না কারণ কেউ কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। এটা নিশ্চিত যে শহরটি তুর্কিরা আসার আগেই ছিল ও বোধহয় যাদব বংশের সাহির রাও-এর আগে ছিল। জ্যোর্তিবিদ বরাহমিহির বলেছেন সৈরহিন্দিরা যে জায়গায় বাস করে সেখানে সিরহিন্দ অবস্থিত। বরাহমিহির এই তথ্য পেয়েছিলেন তাঁর আগের জ্যোতির্বিদ পরাশরের লেখা থেকে। পরাশরের সময়কাল ধরা হয়েছে প্রথম খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং ওই সময়ে সিরহিন্দ ছিল যে তা বলা যায় তবে তখন এর নাম ছিল সৌরন্ধ্র। প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহাম দুটো নাম যে একই সে কথা বলেছেন।

একথা বলা হয় যে এখানে ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন খাল কাটেন, তখন হাড়ের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। এর কয়েকটি মানুষের হলেও, অন্য কয়েকটি হাতির। পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণে আরও জীবজন্তুর ফসিল পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এ জায়গাটা যে ইতিহাসপূর্ব যুগের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিতাব-আল-হিন্দ-এ আল-বেরুনি লিখছেন যে সিরহিন্দ প্রথমে শাসন করেন চন্দ্রবংশীয়রা, পরে সূর্যবংশীয়রা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পারসিকরা সিরহিন্দ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে এবং সিরহিন্দের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু নানা কারণে তারা শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করেনি। সম্প্রতি গুপ্তযুগের হিন্দু মন্দিরের কিছু পাথর পাওয়া গিয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ ভারতে এসেছিলেন। তিনি পুরনো শহর সিরহিন্দের খুব প্রশংসা করেন। উনি বলেছেন যে এটা ছিল শতদ্রুর রাজধানী। শতদ্রুর পশ্চিমে ছিল নদী এবং শতদ্রুর ব্যাসার্ধ ছিল ৩৩৩ মাইল। উনি সিরহিন্দকে কুলুর ১১৭ মাইল দক্ষিণে বলেছেন।

আলেকজান্ডার কানিংহাম শতদ্রু শহরকেই বলছেন পুরনো সিরহিন্দ। এর স্বপক্ষে উনি মুদ্রার সাক্ষ্য এনেছেন। সুলতানি যুগের মুদ্রা থেকে মোগল যুগের মুহম্মদ শাহর মুদ্রা (১৭২৫ সাল) পাওয়া গিয়েছে। দশম শতাব্দীর কিছু মুদ্রা ছিল

যার মধ্যে কণিষ্কর মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং বলা যায় প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সিরহিন্দ শহর ছিল। সিরহিন্দের উত্থান মৌর্যদের পরেই শুরু হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে শতদ্রুর রাজধানী হয়ে যায়। সিরহিন্দের উত্থানের পিছনে ছিল মৌর্য-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে বিস্তার। এটা শুধু পঞ্জাব-এ সীমাবদ্ধ ছিল না, কাশ্মীর ও আফগানিস্তান পর্যন্তও ছড়িয়েছিল। পাটলিপুত্র থেকে যে পথ দিয়ে এই সব জায়গায় যাওয়া যেত, তার মধ্যে সিরহিন্দ একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে ছিল। জলন্ধর ও থানেশ্বরের মধ্য দিয়ে এই পথ বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল যার মধ্যে সিরহিন্দ একটা বড় জায়গা নিয়েছিল। ক্রমে সিরহিন্দ পাশের শহর রোপারকে ছাড়িয়ে যায় এবং শতদ্রুর রাজধানী হয়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুসাহি রাজারা নন্দন থেকে বিতাড়িত হলে সিরহিন্দকে রাজধানী করা হয়।

একাদশ শতাব্দীতে সাটলেজ নদীর পশ্চিম পাড়ের অংশ তুর্কিদের হাতে চলে যায়। লাহোরকে তারা রাজধানী করে। যতদিন সাটলেজকে ধরা হচ্ছিল গজনি শাসকদের ও চৌহান রাজাদের সীমান্ত, ততদিন সিরহিন্দের সামরিক গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরি রাজপুতদের পরাজিত করলে সাটলেজ নদীর দুই পারই একই শাসনের অধীনে আসে। এর ফলে সিরহিন্দের গুরুত্ব কিছু কমে যায়, কিন্তু সামরিক কারণটি থেকেই যায়। পরবর্তীকালের সুলতানরা পঞ্জাবকে আটটি ভাগে ভাগ করেন, যার মধ্যে সিরহিন্দ ছিল অন্যতম। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড চতুর্দশ শতাব্দীর পঞ্জাবে ছয়টি ভাগ দেখেছেন যার মধ্যে সিরহিন্দ একটি।

শাসনযন্ত্রের দিক থেকে সামানার গুরুত্ব ছিল বেশি। এটি ছিল শিক-এর প্রধান যেখানে সিরহিন্দ ছিল শিক-এর একটা পরগণামাত্র। সিরহিন্দ ছিল দিল্লি-লাহোর পথের উপর। কিন্তু সামানা দিল্লি থেকে সোনিপৎ হয়ে পাকপাটান পথের উপর। পাকপাটান ছিল দুটি পথের সংযোগস্থলে—একটি এসেছিল কান্দাহার-মুলতান থেকে ও অন্যটি ডেরা ইসমাইল খান-এর মধ্যে দিয়ে কাবুল থেকে। মোঙ্গল ও গক্করদের আক্রমণের ফলে প্রথম পথটিতে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় পথটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। ফলে সামানাতে ব্যবসায়ীরা আসত ও সামানা কাপড় তৈরির জায়গা হিসেবে বড় হয়ে উঠতে থাকে। সিরহিন্দ এ সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

মুহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলক কাংড়া উপত্যকার জায়গাগুলি দখল করার পরিকল্পনা করেন। ফিরোজ শাহ সিরহিন্দের সামরিক গুরুত্ব অনুধাবন করেন কারণ পাহাড়ের ভিতরে যাবার পথগুলির সঙ্গে সিরহিন্দের যোগাযোগ ছিল। ফিরোজ শাহ সিরহিন্দকে সামানার শিক থেকে সরিয়ে আনেন। স্থানীয় দুর্গের সংস্কার করা হয় এবং এর নাম রাখা হয় ফিরোজপুর। ওই সঙ্গে শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ফিরোজ তুঘলক সিরহিন্দের মধ্যে দিয়ে একটি খাল কাটান।

সৈয়দ ও লোদি সুলতানদের সময়েও সিরহিন্দ উন্নতি করতে থাকে। সুলতান শাহ লোদি প্রথমে সিরহিন্দের শাসনকর্তা ছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি ইসলাম খান নামে সম্রাট হন। এঁর ভাইপো বাহলুল লোদির জন্ম হয়েছিল সিরহিন্দে এবং যুবা বয়স

পর্যন্ত তিনি ওই শহরেই থাকেন। সৈয়দ ও খোক্করদের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ ছিল সিরহিন্দের উপর নির্ভরশীল। ১৪৫৬ সালে যখন তিনি দিল্লিতে যান, তখন তাঁর ছেলে নিজাম খানকে সিরহিন্দের শাসনকর্তা করে যান। পানিপথ যুদ্ধের আগে বাবর ও আকবর সিরহিন্দ দখল করেছিলেন।

মোগল যুগে মোঙ্গল ও গক্করের আক্রমণের আশংকা ছিল না। দেশেও সাধারণভাবে শান্তি ছিল। ফলে সিরহিন্দের উন্নতি অব্যাহত থাকে। দিল্লি-লাহোর পথ আবার গুরুত্ব পেলে সিরহিন্দও গুরুত্ব পেতে থাকে। সুলতানি যুগের থেকে মোগল যুগে এই পথের ব্যবহার আরও বাড়তে থাকে। কাবুল, শ্রীনগর, লাহোর, দিল্লি ও আগ্রা শাসনতন্ত্রের কাছে গুরুত্ব পেলে সিরহিন্দও গুরুত্ব পায়। কিন্তু পাকপাটান-সামানা পথটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ডেরা ইসমাইল খান ও মুলতানের দিকের ব্যবসায়ীরা ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যের দিক থেকে সিরহিন্দ ওই পথের তুলনায় অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। লাহোরের পরেই পঞ্জাবে মোগল যুগে সিরহিন্দ দ্বিতীয় শহর হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। চিন ও তিব্বতের মালও সিরহিন্দের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল ক্ষমতা অস্তমিত হলে পঞ্জাব শিখদের হাতে চলে যায়। এর ফলে সিরহিন্দের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। সিরহিন্দ সরকারের ফৌজদার ওয়াজির খান গুরু গোবিন্দ সিং-এর ছোট ছেলেদের মেরে ফেলার উত্তরে বান্দাসিং বাহাদুর সিরহিন্দ আক্রমণ করেন। মোগলরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ১৭৬৩ সালে শিখরা আফগান শাসনকর্তা জৈন খানকে পরাজিত করে শহরের দখল নেয়। অনেক সরকারি দপ্তর ভেঙে ফেলা হয় ও গাধা দিয়ে মাটি চাষ করানো হয়। ১৭৬৪ সালে সিরহিন্দ পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্যে চলে আসে। পাতিয়ালার মহারাজারা এই শহরের দিকে কোনও দৃষ্টি দেননি। বরং এর বাড়ির মালমশলা নিয়ে পাতিয়ালায় কিল্লা মুবারক তৈরি করেছিলেন। ওঁরই উৎসাহে সিরহিন্দের বহু অধিবাসী পাতিয়ালাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই শহরের প্রতি শিখদের অনীহা থাকার ফলে সিরহিন্দের পতন শুরু হয়ে যায়।

পঞ্জাবের দুটি শহরে উত্থান-পতন ও ভিতরকার চেহারা আলাদা ছিল। লাহোর কিছু সময়ের জন্য মোগল রাজধানী হবার ফলে এর সঙ্গে আগ্রার অনেক মিল ছিল। দুর্গ, মসজিদ, সরাইখানা ও হাম্মাম লাহোরকে উত্তর ভারতের প্রথম শ্রেণীর শহরের মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু সিরহিন্দ কখনওই রাজধানী হয়ে উঠতে পারেনি। খুব বেশি হলে এটি ছিল সরকারের প্রধান। সামরিক দিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে এর গুরুত্ব ছিল, কিন্তু কখনওই এটি আগ্রা বা লাহোরের চেহারা বা মর্যাদা পায়নি। সুতরাং মোগলযুগের পঞ্জাবের সব শহর এক চরিত্রের নয়, এক চেহারাও নয়।

১১

সুরাট

সুরাটের উদ্ভব কবে হয়েছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। প্রবাদ আছে যে এর নাম ছিল সত্যপুরা। দশম থেকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি ছিল গুজরাট-এর চালুক্য রাজ্যের অন্তর্গত। ১৪০৭ সালে এটি মুসলমান সুলতানদের দখলে আসে। ১৫৭৩ সালে গুজরাট বিজয় পর্বে আকবর এটি দখল করেন। এটিকে তখন গুজরাট প্রদেশের একটি সরকারে পরিণত করা হয়। এর বন্দরের ও শহরের শাসনকর্তা ও দুর্গের কিল্লাদার-এর নিয়োগ করতেন কেন্দ্রীয় সরকার। ১৫২৯-৩০ সালে পর্তুগিজরা এটি লুঠ করে পুড়িয়ে দেয়। ১৬১২ সালে ইংরেজরা পতুর্গিজদের নৌযুদ্ধে হারিয়ে দিলে পতুর্গিজ আক্রমণের ভয় কমে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যুবরাজ খুরম ও যুবরাজ মুরাদ এটি লুঠ করেছিলেন। ১৬৬৪ ও ১৬৭০ সালে শিবাজি দুবার এ শহর লুঠ করেন। মারাঠা আক্রমণের ভয় শিবাজির মৃত্যুর পরেও বহুকাল ছিল।

তাপ্তি নদীর নীচের দিকে সুরাট অবস্থিত ছিল। এখানকার জলে প্রচুর পলিমাটি পড়ার ফলে ছোট জাহাজ ছাড়া শহরের বন্দরে ঢোকা যেত না। ফলে সমুদ্রগামী বড় জাহাজগুলি সমুদ্রের ধারে সোয়ালিতে বন্দর করত। জুন থেকে সেপ্টেম্বরে প্রচুর বর্ষা হত ও মাঝে মাঝে ঝড় উঠত। ১৬২৫ সালে এরকম ঝড়ে শহরের বাড়ি ও বন্দরের জাহাজের ক্ষতি হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ছিল নিরাপদ যখন ইউরোপগামী জাহাজগুলি ছাড়ত।

সুরাটের চারপাশের জমি উর্বর হওয়ায় ভাল ফসল হত। ধান, গম, বাজরা, ইত্যাদি ছাড়াও তুলো, নীল ও নানাধরনের ফল হত। এর ফলে সুরাটের শহরতলিতে ও আশেপাশে গড়ে উঠেছিল সুতো ও নীল তৈরির শিল্প। জাহাজ আসায় জাহাজ ও আনুষঙ্গিক মালের শিল্পও গড়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হত যার মধ্যে ১৬৩০-৩২ সালে দুর্ভিক্ষ ও ১৬৮৩ সালে ভয়াবহ প্লেগ হয়েছিল।

১৬০৯ সালে উইলিয়াম ফিঞ্চ বলেছেন যে, সুরাট শহরে অনেক বণিক ও বাড়ি আছে। নদী দিয়ে শহরে আসতে তিনি সুরাট দুর্গ দেখেন—মজবুত ও চারপাশে পরিখা আছে যার উপর একটা ঝোলানো সাঁকো আছে যেটা তুলে ফেলা যায়। এর সামনে একটা ময়দান আছে। শহরের চারপাশে পরিখা এবং বুনো ঝাড় দিয়ে ঘেরা। শহরের তিনটে দরজা আছে। উনি শুল্কবিভাগের বাড়ি ও বাজারের কথা বলেন,

যেখানে ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশু বিক্রি হয়। নদীর বিপরীত দিকে রান্দের শহর যার রাস্তাগুলি সরু কিন্তু বাড়িগুলি সুন্দর। শহরের বাইরে রয়েছে গোপী তালাও আর আমবাগান। তিন বছর পরে পাদরি প্যাট্রিক কপল্যান্ড ইট ও পাথরের বাড়ির কথায় বলেছেন যে ছাদগুলি সমতল। লোকেরা রেশমের জামা পরে এটাও লক্ষ করেছেন।

সমসাময়িক বণিক দ্য লে সুরাটের আরও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন জাহাঙ্গিরের রাজত্বের প্রথম দিকে। উনি বলছেন যে সুরাট মোগলদের প্রধান বন্দর যদিও শহরটি প্রায় সাত ক্রোশ দূরে। ফলে আমদানি ও রপ্তানির মাল নদীতে ছোট নৌকো করে জাহাজ থেকে নিয়ে যেতে হয়। সোয়ালিতে জাহাজগুলি নোঙর ফেলে মাল ওঠায় ও নামায়। এখান থেকে গাড়িতে করে স্থলপথে মাল আনা যায় কিন্তু সেটা আরও ব্যয়সাধ্য। অবশ্য নদী দিয়ে মাল আনাও খুব নিরাপদ নয় কারণ মালাবার জলদস্যুরা নদীর মুখে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করে। সুরাট শহরটি ভালভাবে তৈরি এবং ব্যাসার্ধ প্রায় দুই ক্রোশ। এর কোনও দেওয়াল নেই, কিন্তু পরিখা আছে। স্থলের দিকে চারটি দরজা আছে। নদীর ধারে একটা দুর্গ আছে, সাদা কোরাল পাথর দিয়ে গড়া। এটি ছোট কিন্তু কামান ও বন্দুক রয়েছে। একে আরও জোরদার করার জন্য দেওয়ালের ভিতরে আর একটি দেওয়াল বানানো হয়েছে যার উপর ত্রিশটি বন্দুক রয়েছে। ইংরেজদের আসার আগে মুসলমানরা সুরাটে ভাল বাণিজ্য করত যার অনেকখানিই এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পর্তুগিজদের হাত থেকে হরমুজ বেরিয়ে গেলে সুরাটের বণিকরা পারস্যে মাল পাঠাত প্রধানত ইংরেজদের জাহাজে। এরা একা যেতে সাহস করত না পতুর্গিজ আক্রমণের ভয়ে। সুরাটে তখন শুল্কের হার ছিল আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শতকরা সাড়ে তিন। সোনা বা রুপোর উপর ছিল শতকরা দুই।

শহরের বাড়িগুলির বর্ণনা দিয়েছেন এডওয়ার্ড টেরি। যিনি ১৬২০ সালের আগে সুরাটে এসেছিলেন। টেরি খুব আশ্চর্য হয়ে যান দেখে যে এই বাড়িগুলির চিমনি নেই। বাড়ির ছাদ সমতল যেখানে অধিবাসীরা সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা বাতাস পায়। এই সব বাড়িগুলি ইট ও পাথরের তৈরি এবং উপরের তলার ঘরগুলিতে জানালা ও দরজা আছে আলো-বাতাসের জন্য। অবশ্য টেরি বলেছেন যে, আহমদাবাদের বাড়িগুলি সুরাটের থেকে ভাল।

সুরাটের দোতলা বাড়ির কথা বলেছেন টমাস রো, যিনি ১৬১৯ সালের আগে এসেছিলেন। উনি সুরাটের শাসনকর্তাকে দুর্গের সামনের ময়দানে পোলো খেলতে দেখেন। উনি কোনও মজবুত বাড়ি সুরাট শহরে না দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। রো-র এই বক্তব্যের সবটা মানা যায় না, কারণ ১৬২৫ সালে পিটার মুন্ডি যখন সুরাটে আসেন তখন উনি দেখেন যে সুরাটের বাড়িগুলি মজবুত এবং ছাদে হাঁটা যায়। মুন্ডি প্রধানত একটা বড় রাস্তার কথা বলেছেন, যেটা শহরের নভসারি দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এ সবের থেকে মনে হয় যে, শহরটি গড়ে উঠছে, কিন্তু এখনও বাড়িগুলি রাস্তার উপর এসে পড়েনি। বড় জলাধার-এর উল্লেখও উনি করেছেন। উনি বলছেন যে, জাহাজ আসার পর সোয়ালিতে বাজার বসে এবং জাহাজ চলে গেলে দোকানগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সোয়ালিতে উনি মুসলমান ও বানিয়া বণিকদের

কথা বলেছেন।

পিটার মুন্ডি ১৬৩০-৩২ সালে গুজরাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা বলেছেন, যার বর্ণনা পাওয়া যায় ভ্যান টুইস্ট-এর লেখায়। সুরাটে খাবার প্রায় ছিলই না এবং যা পাওয়া যাচ্ছিল, তাও শাসনকর্তা ও দুজন ব্যবসায়ী চড়া দামে কিনে নিচ্ছিল। ফলে নীল, কাপড় ও অন্যান্য ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ১৬৩৫ সালে অবস্থা ফিরতে শুরু করে, কারণ টুইস্ট বলছেন যে, ওইসময় থেকেই সুরাটের শস্যর দাম পড়তে শুরু করে। ১৬৩৮ সালে ম্যান্ডেলস্লো যখন সুরাটে আসেন তখন দুর্ভিক্ষের ছায়া আর নেই, যদিও উনি দুর্ভিক্ষর উল্লেখ করেছেন। এর ফলে সুরাটের উন্নতি ব্যাহত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ম্যান্ডেলস্লো ১৬৩৮ সালের শেষ দিকের পাঁচ মাস সুরাটে ছিলেন। সোয়ালি থেকে নদী দিয়ে আসতে উনি দুপাশে সুন্দর বাগান, চাষের জমি, গাছ ও বাড়ি দেখেছেন। উনি শহরের তিনটে দরজা দেখেছেন। প্রথমটি যাচ্ছে খাম্বাজ ও আহমদাবাদের দিকে, দ্বিতীয়টি বুরহানপুর ও তৃতীয়টি নভসারিতে। এর আগের বর্ণনায় আমরা চারটি দরজার কথা পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে এটি মিলছে না, যে ধরনের অমিল আমরা খাম্বাজের বেলাতেও আগে দেখেছি। অন্যদের সঙ্গে ওঁর বক্তব্যের আরও কিছু তফাত পাওয়া যায়। উনি নদী পেরিয়ে রান্দের শহরে গিয়েছিলেন, যাকে উনি বলছেন ধসে যাওয়া পুরনো শহর। এই শহরে ওলন্দাজদের একটা গুদাম আছে এবং শহরের অধিবাসীরা নভাইৎ। এরা মুসলমান এবং অধিকাংশই ব্যবসায়ী বা জাহাজের লোক। সুরাটের দুর্গ বলতে গিয়ে উনিই প্রথম দুজন শাসনকর্তার কথা বলেছেন—একজন কিল্লার ও অন্যজন শহরের। দ্বিতীয় জনই শহরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কুঠিগুলি শহরের মধ্যে সব থেকে ভাল। দুর্গর একটা দরজা দিয়ে বাজারে যাওয়া যায়। এ ছাড়া গোপী তালাওর প্রশংসা করেছেন। এখানে এত জল থাকে যে, গরমের সময়েও শহরে জলের অভাব হয় না। এর থেকে স্পষ্ট যে, রান্দের শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই এখন সুরাট শহরে যার ফলে সুরাট শহর বাড়ছে। কিন্তু এখনও এতটা বাড়েনি যে, শহরে জলের কষ্ট হবে। শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন শাসনকর্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ম্যান্ডেলস্লো বলছেন যে, শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মোগলরাই অগ্রগণ্য, কারণ এদেরই রাজা। এ ছাড়া এরা অস্ত্রধারণ করে ও ব্যবসা-বাণিজ্যর মধ্যে যায় না। বানিয়ারা অত্যন্ত কর্মঠ এবং প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এরা খুবই ধার্মিক। প্রচুর সংখ্যায় বিদেশিদের কথা উনি বলেছেন যার মধ্যে পড়ে আরব, তুর্কি, পারসিক, আর্মেনিয়ান ও ইহুদিরা, যারা বাণিজ্য উপলক্ষে সুরাটে এসেছে। এদের বাড়িগুলি অবশ্য ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কুটির থেকে ছোট। উনি বলেছেন যে, পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর জায়গা এই শহরে আছে।

গোপী তালাওর সব থেকে ভাল বর্ণনা পাওয়া যায় পিয়েত্রো দেলা ভালার রচনায়। উনিই ১০ ফেব্রুয়ারি ১৬২৩ সালে সুরাটে আসেন। সুরাট শহরকে সুন্দর বলার পর শহরের আশ্চর্য জলাধারের কথা বলেছেন। এর চারপাশ বাঁধানো, সিঁড়ি

দিয়ে জলের কাছে যাওয়া যায়। এর মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপের মতন—সাঁতরে বা নৌকো করে যেতে হয়। এই জলাধারের পাশে আর একটি ছোট জলাধার আছে। এই দুটি জলাধারের মধ্যে একটা ছত্রি বা খিলান দেওয়া সৌধ আছে। সুরাটের লোকেরা বলেন এটি গোপী তালাও। ইনিই বোধহয় সেই গোপী মালিক, যার কথা পতুর্গিজ ঐতিহাসিক বলেছেন। সম্ভবত যখন তিনি সুরাটের শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি এটা করেছিলেন। উনি বলছেন যে, এই শহরে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের থেকে কিছু বেশি।

সপ্তদশ শতকের চতুর্থ দশকে ফরাসি পরিব্রাজক বুলইয়া ল্য গুজ সুরাটে এসেছিলেন। ততদিনে সুরাট অনেক বড় হয়ে গিয়েছে এবং উনি বলছেন, সুরাট পুব দিকের সব থেকে বড় বন্দর। শহরের সঙ্গে তিনি ফ্রান্স-এর রুঁয়ে শহরের তুলনা করে বলেছেন যে, এর জনসংখ্যা ভাল। দুর্গের সঙ্গে উনি রোমের সেন্ট অ্যানজ দুর্গের তুলনা করেছেন। এও বলেছেন যে, দুর্গ তৈরি করার বিদ্যা ভারতীয়রা পর্তুগিজদের কাছ থেকে নেয়নি। সারা পৃথিবী থেকে এত সংখ্যক জাহাজ এই সুরাট বন্দরে আসে যে উনি বলছেন যে, এর শুল্ক থেকে অনেক আয় হয়। ততদিনে সোনা আমদানির উপর শুল্ক বাড়িয়ে করা হয়েছে শতকরা চারভাগ, যদিও বাকিটা একরকমই আছে। শহরের বাড়ি সম্পর্কে অবশ্য উনি কিছু বলেননি।

ফরাসি স্বর্ণকার তাভারনিয়ার কয়েকবার সুরাটে এসেছেন। ওঁর লেখা থেকে বোঝা শক্ত কোন সময়ের সুরাটের কথা উনি বলছেন। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি তিনি প্রথম আসেন এবং সুরাট ছেড়ে শেষবারের মতো তিনি চলে যান ১৬৬৭ সালে। ওঁর লেখা পড়ে মনে হয় সুরাটের প্রথমদিকের অভিজ্ঞতার কথাই উনি বলছেন। ল্য গুজ-এর বক্তব্যের মধ্যে যে অসাধারণ বাণিজ্যিক উন্নতির কথা আছে, তাভারনিয়ার-এর লেখায় এর সমর্থন মেলে। উনি বলছেন যে, সুরাটে টাকার কোনও অভাব নেই, কারণ প্রধান বণিকরা এখানে টাকা ঢালে পারস্য উপসাগর ও দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্যের জন্য। কিন্তু এই বাণিজ্যের অনেকখানিই নির্ভর করছে পশ্চাদভূমির সুরক্ষার উপর। ব্যক্তিগত বণিকদের তুলনায়, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কম হারে শুল্ক দেয়, কারণ শাসনকর্তারা ওদের আনা টাকা চায়। শহর সম্পর্কে তাভারনিয়ার বলেছেন যে, এটি মাঝারিগোছের শহর এবং দুর্গটা খারাপ। শহরের দেওয়ালটা মাটির যেটি বিশের দশকের পরে তৈরি হয়েছে। শহরে নটা বা দশটা ভাল বাড়ি আছে, যার মধ্যে শাসনকর্তার আছে দুটি বা তিনটি। বাকি বাড়িগুলি কুটির, মাটি, খড় ইত্যাদি দিয়ে করা। মুসলমানদের কয়েকটা ভাল বাড়ি আছে এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি এদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। ওঁর লেখা থেকে মনে হয় যে, শহরটা দুর্গের কাছ থেকেই শুরু হয়েছিল যার পাশে রয়েছে শুল্কবিভাগের বাড়ি। যেখানে বিদেশিদের মাল, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত, তল্লাসি করা হয়। ম্যান্ডেলস্লো এর আগে এই ধরনের তল্লাসির কথা বলেছেন।

পাদরি ম্যানুয়েল গোদিনহো ১৬৩৩ সালে ভারত থেকে পর্তুগালে যান। যাবার সময়ে তিনি সুরাটের বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। উনি বলছেন যে, সুরাট আগে একটা

গরিব শহর ও অজানা বন্দর ছিল। বর্তমানে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কল্যাণে এটা একটা ধনী শহর এবং সমস্ত পূর্বদেশের মধ্যে বিখ্যাত বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দামানের থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, তাপ্তি নদীর উপরে ও বেলাভূমি থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। বড় জাহাজ ভিতরে আসতে পারে না। যদিও নদী খুব গভীর নয়, কিন্তু নদীর মধ্যে ব্যবসায়ীরা কয়েক জায়গায় বড় বড় গর্ত করে রেখেছে যাতে বড় জাহাজগুলি ভাটার সময় ওখানে নোঙর করতে পারে। নদীর জল ভাটার সময় ভাল কিন্তু জোয়ারের সময় ময়লা। ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাহাজগুলি নদীর উত্তরে সোয়ালিতে নোঙর করে এবং ওরা জমির এত কাছে যে কামান দেগে তাদের মালপত্র সাবধানে রাখতে পারে। এই দুই কোম্পানির ব্যক্তিগত শুল্কর বাড়ি আছে তাদের মাল খালাস করার জন্যে। পর্তুগিজ জাহাজগুলি কয়েকবার সোয়ালিতে এদের জাহাজ আক্রমণ করেছে, কিন্তু জেতেনি।

শহরটি চওড়ার থেকে বেশি লম্বা। পর্তুগালের ইভোরা শহর থেকে এই শহর বড়। এই শহরের জনসংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ। শ্বেতকায় মুসলমান, ভারতীয় মুসলমান, সব ধরনের হিন্দু, বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান, এমনকী সারা পৃথিবী থেকে লোক এসে এখানে হয় বসতি স্থাপন করেছে নয় বাণিজ্যিক কারণে এসেছে। সুরাটে স্পেনীয় লোক, ফরাসি, জার্মান, ইংরেজ, হাঙ্গেরিয়ান, পোলিশ, ওলন্দাজ, ফ্লেমিস, ইটালিয়ান, সুইডিশ, তুর্কি, আরব, পারসিক, তাতার, জর্জিয়ান, শক, চিনা, মালাবারি, বাঙালি, সিংহলি, আর্মেনিয়ান ও বহু ধরনের বহু বর্বর জাতির লোক রয়েছে।

বাড়িগুলি সাধারণ ও তালপাতা দিয়ে ছাউনি করা। ফলে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে, কয়েকটা রাস্তার শেষ অবধি আগুন চলে যায়। অবশ্য কয়েকটা বড় প্রাসাদের মতন বাড়ি আছে। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের, কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে সাধারণ। মুসলমানরা সাধারণত বাড়ির বাইরেটা সাধারণ রেখে, বাড়ির ভিতরের অংশ খুব সুন্দর করে সাজায়। রাস্তা দেখে দেখলে এগুলি মনে হয় নরক, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে মনে হয় স্বর্গ। এদের বাড়ির ছাদের ভিতরের দিকে চমৎকার রঙিন ছবি আঁকা, সোনালি রং দিয়ে ঘরগুলি সাজানো। দেওয়ালগুলি প্লাস্টার-এর পালিশ করা ও গালিচা দিয়ে ঢাকা। চেয়ারের পরিবর্তে মাটিতে গালিচার উপর কুশন আছে হেলিয়ে বসার জন্য। বাগানে ফোয়ারা, সারিবদ্ধ গাছের মধ্যে দিয়ে হাঁটার পথ। অন্যদিকে হিন্দু বানিয়ারা বাইরে থেকে দেখার মতো করে বাড়ি তৈরি করে, ভিতরের সুখ ও সৌন্দর্যর চাইতে। একতলা পর্যন্ত এরা পাথর আর চুন দিয়ে করে। তার উপরে খালি কাঠের কাজ যার মধ্যে সেগুন কাঠের কাজ রয়েছে। নানা ধরনের রং ও এনামেল দিয়ে এগুলি ঢাকা।

শহরে কয়েকটা মসজিদ আছে এবং প্রতিটি মুসলমান জাতির জন্য আলাদা করে আছে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যেটি পূর্ব দিকের দরজার বাইরে রয়েছে। বড় ও উঁচু বাড়ি যার মিনারে শরিফ-এর থাকার ব্যবস্থা আছে। সুরাটের দুটি সরাইখানাও চমৎকার। ছাদ দেওয়া উঠোনের চারপাশে থাকার ঘর। একটা মাত্র ঢোকার দরজা, যেটা রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রয়েছে কয়েকটা একতলা বাড়ি যেগুলি মুসলমানদের স্নানের জায়গা। শহরের খরচায় এগুলি চালানো হয় এবং

সব কিছুই বিনামূল্যে, এমনকী গরম জলও।

শহরের চারপাশ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা নয়, কেবল ইটের স্তর রয়েছে, যেটির উচ্চতা বেশি নয়। এর চারটে দরজা আছে, যার প্রত্যেকটিতেই রক্ষী রয়েছে। লোকে মাল নিয়ে এলে এরা শুল্কবিভাগ অবধি সঙ্গে যায়, যাতে শুল্ক না দিয়ে কেউ পালাতে না পারে। যারা মাল নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, তাদেরকে শুল্কবিভাগের চিঠি দেখাতে হয় যে তারা শুল্ক দিয়েছে। সুরাটে নদীর কাছে দুটো শুল্কের বাড়ি আছে। যেসব মাল সমুদ্রপথে আসছে, সেগুলি খালাস করা হয় বড় শুল্ক বাড়িতে। ছোটটি পশ্চাদভূমির মাল পরীক্ষা করে। নদীর পারে আরও কতকগুলি শুল্কের বাড়ি যেগুলি শহরের বাইরে যে মাল যাবে, সেগুলি পরীক্ষা করে। শুল্কের হার সাধারণত শতকরা পাঁচ। ওলন্দাজদের বেলায় বর্তমান মোগল শাসনকর্তা শতকরা একভাগ শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে। ১৬৬১ সালে জাকার্তার ওলন্দাজ শাসনকর্তা প্রচুর উপঢৌকন পাঠালে এটা করা হয়।

সুরাটের প্রতিরক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এর দুর্গের উপর। এটি নদীর ধারে এবং তিনটি বুরুজ আছে। এর মাঝামাঝি জায়গায় প্রায় বিশটি কামান আছে যার কয়েকটি লোহার ও কয়েকটি ব্রোঞ্জের। এগুলিতে অবশ্য কোনও কাজ হয় না কারণ হয় কতকগুলি ফাটা বা কোনওটাকে নিয়ে যাবার গাড়ি নেই। দুর্গের পরিখা গভীর কিন্তু চওড়া নয়। প্রায় দুশো লস্কর আছে যাদের অধিকাংশই স্থানীয়। এক মোগল কাপ্তান আছে যে শহরের শাসনকর্তার অধীন নয়। কিন্তু এ একবার দুর্গের ভিতরে ঢুকলে সম্রাটের আদেশ ছাড়া বাইরে বেরোতে পারে না। এ ছাড়া ওই কিল্লাদার কয়েক লক্ষ টাকার ধনদৌলত রক্ষণাবেক্ষণ করে কারণ সুরাটে সারা সরকারের খাজানা আসে। এ ছাড়াও টাঁকশালে যে টাকা তৈরি হয় সেগুলিও আসে। মোগল টাকার মূল্য খুব ভাল। এর মূল্য পর্তুগিজ *ক্রুসাডোর* (সোনার মুদ্রা) সমান। মোগল মুদ্রা প্রধানত করা হয় স্পেনের *পাটাকা* ও পারস্যের *লারিন* থেকে যার মধ্যে নির্ভেজাল রুপো রয়েছে।

সুরাট দুর্গে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ঢাক বাজানো হয়। দুর্গের চারপাশে কোনও বাড়ি নেই কিন্তু সামনে রয়েছে চমৎকার বাজারের জায়গা। এখানে প্রতি বিকেলে মেলা বসে যেখানে সব কিছু কেনা যায়।

ভারতের সব থেকে বড় বাণিজ্যিক জায়গা সুরাট এবং পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বিত্তশালী। সারা পৃথিবী থেকে সব থেকে ভাল মাল এখানে আসে। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা ইউরোপ থেকে পণ্য নিয়ে আসে। সুরাটের অধিবাসীরা পণ্য আনে লোহিত সাগর, আফ্রিকা ও এশিয়ার সব জায়গা থেকে। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নিয়মিতভাবে সারা ভারত থেকে সুরাটে আসে প্রধানত গরুর গাড়িতে বা উটের পিঠে। এই শহরের অধিবাসী বণিক ও ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ধনী। কয়েকজনের আছে পঞ্চাশ বা ষাট লাখ টাকা এবং কারওর কারওর আছে পঞ্চাশটি জাহাজ, যা সব জায়গায় যায়।

সুরাটের চারপাশে গম, চাল ও নানারকম তরকারি হয়। পারসিরা কাজু থেকে মদ তৈরি করে। শহরের বাইরে পূর্ব দিকে দুটো ফাঁকা জমিতে মুসলমানদের বহু কবর আছে। এটি ছাড়িয়ে আরও এগোলে দুটি ঘেরা জায়গায় রয়েছে ইংরেজ ও

ওলন্দাজদের কবরখানা। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের জন্য আলাদা কবরের জায়গা আছে। কবরের উপরের ক্রস দেখে এগুলি শনাক্ত করা যায়।

শহরের দরজার বাইরের দুটি গভীর কূপ থেকে শহরে খাবার জল নিয়ে আসা হয়। হিন্দুরা অবশ্য নদীর জল ব্যবহার করে কারণ একটা কুয়োর মধ্যে একবার একটা মরা গরু পড়েছিল। বড়লোক হিন্দু ও মুসলমানরা সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করে কিন্তু মাথায় টুপি দেয় না, কারণ মোগল সাম্রাজ্যে সেটা রাজার প্রতীক। কেউ কেউ অবশ্য বলদে টানা ছোট গাড়ি করে যায়, রেশম ও অন্য কাপড়ের উপর বসে, যার উপর গালিচা ও কুশন থাকে। কিন্তু ঘোড়াটানা গাড়ি এরা ব্যবহার করে না, পালকিও সেরকম করে না।

একসময়ে সুরাটে জেসুইট পাদরিদের একটা বিদ্যালয় ছিল। ওখানকার পাদরিরা খুবই ব্যস্ত থাকতেন, কারণ প্রচুর পর্তুগিজ ও তাদের দাসেরা পর্তুগাল থেকে এসে এখানে বসবাস করত। এত বেশি খ্রিস্টান পরিবার ছিল যে একশোটি পাদরি থাকলেও তারা বিশ্রাম পেত না। জেসুইটরা এ জায়গাটি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে, কারণ মোগলরা পর্তুগিজদের কাছ থেকে কিছু দাবি করলে ওই পাদরিদের ধরবে না দিতে পারলে। এর পরিবর্তে রোম থেকে দুজন ফরাসি পাদরিদের পাঠানো হয়েছে যারা পর্তুগিজ বা স্পেনের দয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের বাড়ির মধ্যে একটা ছোট গির্জা আছে যেখানে ক্যাথলিকরা যায়। বহু হিন্দু যোগী এখানে আছে, যারা মাটিতে শোয়, খালি পায়ে ও খালি মাথায় হাতে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটে। এরা ভিক্ষে করে দিন কাটায়। বছরে দুবার হাঁড়ি ভর্তি জল নিয়ে এরা নদীতে যায়। এদের ওষুধের জ্ঞান বেশি আছে বলে এরা দাবি করে যদিও এরা ভেষজ ওষুধ ছাড়া আর কিছু জানে না।

ফরাসি পরিব্রাজক থেভনো সুরাটে আসেন ১০ জানুয়ারি ১৬৬৬ সালে। উনিই প্রথম সুরাটের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ততদিনে নতুন ইটের দেওয়াল দিয়ে শহর ঘেরা হচ্ছে। এটা শুরু হয়েছিল সম্ভবত ১৬৬৪ সালে কিন্তু শেষ হবার আগে শিবাজি আক্রমণ করে শহর লুঠ করেন। থেভনো শহরের ধনী বণিকদের কথা বলেছেন, যার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ভিরজি বোরা। নতুন দেওয়াল সম্পূর্ণ হলে শহরের মধ্যে বাড়ি খুঁজে পাওয়ার অসুবিধে হতে থাকে কারণ সবাই তখন শহরের মধ্যে আসতে চাইছে। এ ছাড়াও যে তিনটি শহরতলি ছিল, সেগুলিও লোকে পূর্ণ হয়ে যায়। লোকেরা তখন শহরের মধ্যে বাড়ি তৈরিতে টাকা ঢালছে। একদিকে যেমন গরিবদের জন্য কুঁড়েঘর রয়েছে অন্য দিকে ধনীরা পাথরের বাড়ি করছে সুরাটের বাইরে থেকে আনা কাঠ টালি দিয়ে। এগুলির দাম খুব বেশি। একটা সাধারণ ইটের বাড়ি সুরাটে করতে গেলে খরচ পড়ত পাঁচ/ছয় হাজার ফরাসি পাউন্ড পর্যন্ত, যার মধ্যে চুনের খরচই ছিল প্রায় ১২০০ পাউন্ড। দামান থেকে বজরা করে এই কাঠ আনা হত কারণ স্থল দিয়ে আনতে গেলে খরচ আরও বেশি পড়ত।

থেভনো দুর্গ, পরিখা, বাজার ও ময়দান এবং দুইজন শাসনকর্তার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা একে অপরের থেকে স্বাধীন ছিল। ওঁর লেখা থেকে মনে হয় যে শহরটি দুর্গর প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওঁর লেখা থেকে আরও মনে হয় যে,

বাড়ি তৈরির মালমশলার দাম বেড়ে গিয়েছে, যদিও উনি কোনও পরিষ্কার তথ্য দেননি। শহরের পাকা দেওয়াল হবার ফলে অধিবাসীদের কাছে পাকা বাড়ির চাহিদা বেড়ে গিয়েছে, এটা ওঁর লেখা থেকে পরিষ্কার। শহর ও তার দৌলত বেড়ে যাবার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে থেভনোই প্রথম বিদেশি যিনি সুরাটের কোতোয়াল এর উপর দু পাতা লিখেছেন। অপরাধী ধরলে তার শাস্তির কী ব্যবস্থা হবে তার কথাও উনি বলেছেন। খোজা মিনাস এক বড় ধনী বণিক। তাঁর বাড়িতে চুরি ও কোতোয়ালের চোর ধরা সম্বন্ধে থেভনো খুব উৎসাহ নিয়ে বলেছেন যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে কোতোয়াল ও তার লোকেদের সঙ্গে অপরাধীদের পূর্ব যোগাযোগ ছিল। ক্রমবর্ধমান বর্ধিষ্ণু শহরের যা যা সমস্যা, সে সব আমরা থেভনোর লেখাতেই পাই। সুতরাং ফরাসি কোম্পানিও যে সুরাটকে তাদের প্রধান কেন্দ্র করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু শহরের নানা সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ লোকেরা ওই ইউরোপীয়দের ভাল চোখে দেখছে না এটা বোঝা যায়। এর কারণ হয়তো ততদিনে ভারত মহাসাগরে সুরাটের কাছে ইউরোপীয় জলদস্যুর আগমন হয়েছে যারা সুরাটের বণিকদের প্রায় অরক্ষিত জাহাজগুলি অবহেলায় ধরছে। বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপো আসার ফলে তামার তুলনায় রুপোর দাম পড়ে যাচ্ছে। অন্তত তাভারনিয়ারের সময়কার দাম এর সঙ্গে তুলনা করলে এটাই দেখা যায়। আর একটি কারণ ছিল অবশ্য তামার আমদানি আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। তাভারনিয়ার যেখানে একটি রুপোর টাকার বিনিময়ে ৪৯/৫০ তামার মুদ্রা পাওয়া যেত বলছেন, থেভনো সেখানে দেখছেন এক টাকায় সাড়ে বত্রিশ বা তেত্রিশ তামার মুদ্রা।

সুরাটকে থেভনো বলেছেন যে, এলোমেলো ভাবে বড় এবং এর অধিবাসী কত সেটা বলা শক্ত। কারণ যখন জাহাজ থাকে (জানুয়ারি থেকে এপ্রিল) তখন শহরে এত লোক হয় যে থাকার জায়গা পাওয়া যায় না। শহরে ভারতীয় ছাড়া, তুর্কি, আরবি, পারসিক, আর্মেনিয়ান, খ্রিস্টানরা আছে। এদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু ও আগেকার অগ্নিউপাসক পারসিকরা আছে। প্রায় একশো খ্রিস্টান পরিবার রয়েছে।

দুর্গটি শহরের দক্ষিণ দিকে নদীর পাশে। প্রধানত নদীর দিক থেকে আক্রমণ ঠেকানোর জন্যই করা। এটা চতুষ্কোণ, মোটামুটি বড়। এর চারকোণে চারটে মিনার আছে। দুর্গর তিন দিকে পরিখা সমুদ্রের জলে ভর্তি। চতুর্থ দিকটির পরিখা নদীর দিকে, ফলে ওখানে নদীর জল আসে। দেওয়ালের উপরে কয়েকটি কামান সাজানো এবং প্রদেশের খাজনা ওখানেই জমা হয় যা বিশেষ আদেশের পর পাঠানো হয়। এই দুর্গের প্রবেশপথটি পশ্চিম দিকে সুন্দর একটা দরজার মধ্য দিয়ে। এর থেকে বাজার বা ময়দানে যাওয়া যায়।

বাড়িগুলির ছাদ সমতল। পাথর আনা ব্যয়সাপেক্ষ বলে কাঠ ও টালি দিয়ে করা। টালিগুলি অর্ধগোলাকৃতি এবং আধইঞ্চি মোটা। এগুলি ভাল করে পোড়ানো না হবার ফলে দুটি করে টালি একসঙ্গে লাগানো দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিদিন থাকে না। বেত দিয়ে টালিগুলি জোড় লাগানো হয়। এগুলি অবশ্য বড়লোকেদের বাড়ি। বর্ষাকালে মোমের কাপড় দিয়ে এগুলো ঢাকা হয় কাজ করার সময়। কিন্তু তাতে

বিশেষ কাজ হয় না। ফলে ভিজে টালিই লাগানো হতে থাকে। সুরাটের রাস্তাগুলো চওড়া কিন্তু বাঁধানো নয়। এখানে সব রকমের পাখির মাংস পাওয়া যায়। খ্রিস্টান ও মুসলমানরা গরুর মাংস খায়। পাঁঠার মাংসও খুব ভাল। ফেব্রুয়ারি থেকে আঙুর পাওয়া যায় যার থেকে ওলন্দাজরা মদ তৈরি করে। বড় সাদা আঙুর সাধারণত আসে সুরাটের কাছের একটা শহর নভসারি থেকে। স্থানীয় কিছু মদ, যেমন তাড়ি, এখানে পাওয়া যায়। সুরাটে সব ধরনের জিনিসই পাওয়া যায়, যেগুলি পৃথিবীর সব জায়গায় যায়।

শহরের বাইরে মৃতদেহ সৎকারের জায়গা আছে। এটি ব্রোচ দরজা থেকে প্রায় চারশো গজ দূরে। ক্যাথলিকরা কিছু দূরে নিজেদের সমাধি করেছে। ইংরেজ ও ওলন্দাজের আলাদা সমাধিক্ষেত্র আছে। ভারতীয়দেরটিও আলাদা। বানিয়ারা সাধারণত নদীর ধারে মৃতদেহ দাহ করে। এর পরে ছাই তাপ্তি নদীতে ফেলে দিয়ে আসে কারণ ওই নদীকে ওরা পুণ্যময় নদী বলে মনে করে। দু বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের মৃতদেহ দাহ করা হয় না।

ইংরেজদের সমাধিক্ষেত্রের দিকে যাওয়ার পথে একটা বড় কুয়ো পড়ে যার উপরে খিলান দিয়ে ছত্রি করা। খিলানের ফাঁক দিয়ে আলো আসে। ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামা যায়। ছত্রির বাইরে কারও মুখ খোদাই করা। হিন্দুরা একে মহাদেও মন্দির মনে করে পুজো দেয়। দামান দরজার দিকে হাঁটার পথ প্রশস্ত। কিছু দূরে গেলে একটা বড় জলাধার পাওয়া যায়। যাবার পথে এই দরজায় বিশ্রাম করা যায়। এই জলাধারের দুটি কোণ—প্রতি কোণই একশো ফুটের তফাতে। নীচটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। চারপাশে সিঁড়ি আছে, যা দিয়ে সহজেই জলে নামা যায়। পাথরগুলি খাম্বাজ থেকে আনা। তিনটি জায়গায় পশুদের জল খাবার জায়গা আছে। এই জলাধারের মাঝখানে একটা পাথরের সৌধ। দুটি ছোট সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। নৌকো করে এখানে যেতে হয়। বর্ষাকালে জল উপচে পড়ে, যার জন্যে খাল কেটে ওই জল মাঠে নেবার ব্যবস্থা আছে। কোনও কোনও জায়গায় জল পেরোনোর জন্য ছোট সাঁকো আছে। খালগুলি দেওয়ালের তিনটি ফুটো দিয়ে বাইরে গিয়েছে। কাছেই একটা মসজিদ আছে। গোপী নামে এক ধনী বানিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই জলাধার নিজের খরচে করিয়েছিলেন। সুরাটে যা জল খাওয়া হয় সবই এই জলাধার থেকে আসে। এ ছাড়া শহরে জলসরবরাহর জন্য পাঁচটি কুয়ো আছে। দুর্গ তৈরি হবার সময়ে এই জলাধারটি তৈরি করা হয়েছিল এবং লোকেদের মতে দুটোর খরচ প্রায় একই পড়েছিল। এটা অনেকটা রোমানদের জলাধারের মতো। কিন্তু সংস্কারের অভাবে প্রায় ছয় ফুট মাটি পড়ে সেটা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

এর প্রায় আধমাইল দূরে জাহানারার বাগান। বিভিন্ন ধরনের গাছ সরলরেখায় লাগানো। চারদিক দিয়ে পথ এসে যেখানে মিলেছে সেখানে একটা ছোট নালি আছে। বলদে করে কুয়ো থেকে জল তুলে এই নালিতে ঢালা হয়। মাঝখানে চারদিক খোলা বাড়ি আছে। প্রত্যেকদিকে একটি করে দেওয়ান লাগানো। প্রত্যেকটির সামনে জলের জায়গা যেখান থেকে নালি করে সোজা পথগুলির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। এটির চেহারা ইউরোপীয় বাগানের মতো নয়।

সুরাটের বন্দর সোয়ালি শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে এবং বেলাভূমি থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। জোয়ারের সময়ে জাহাজ নদী দিয়ে শহরে আসে, কিন্তু কেবলমাত্র জাহাজ সারানোর জন্য। ছোট নৌকো সবসময়েই যাতায়াত করতে পারে। সোয়ালিতে বন্দরের পাশে ছোট ছোট বাগান আছে সমুদ্রের উপর যেখানে নৌকো বাঁধা যায়। শুল্কবিভাগের জিনিসপত্র বন্দর থেকে চুরি যাবার ফলে ১৬৬৬ সাল থেকে জাহাজগুলি বেলাভূমিতেই আসে শাহবন্দরের আদেশে। বহু জায়গা থেকে জাহাজ আসে ও যায় যার থেকে রাজার শুল্ক হয় বছরে বারো লাখ টাকা যা প্রায় এক লাখ ফরাসি পাউন্ডের সমান। শাহবন্দর মুসলমান এবং শহরের শাসনকর্তার অধীনে। কেরানিরা সবাই বানিয়া কিন্তু পিওনরা মুসলমান। ১৬৬৪ সালে শিবাজি শহর লুঠ করে সোনাদানা ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রায় তিনকোটি ফরাসি পাউন্ড-এর সমান। শিবাজি আসার আগেই প্রায় সবাই পালায়। শিবাজি অবশ্য খ্রিস্টানদের মঠ লুঠ করেননি প্রধানত পাদরি আমব্রোসের প্রতি শ্রদ্ধায়।

ফরাসিরা সুরাটে এসে বসলেও বিশেষ সুবিধে করতে পারছিল না। তারা এক পাদরি, আবে কারেকে পাঠায় ও অভিজ্ঞ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার এর কাছে থেকে মতামত চায়। আমরা কারে ও বার্নিয়ার-এর প্রতিবেদন (দ্বিতীয়টি সুরাট থেকে লেখা ১০ মার্চ ১৬৬৮) থেকে সুরাট সম্পর্কে এঁদের মতামত এখানে দিচ্ছি।

১৬৬৮ সালে কারে সুরাটকে বাণিজ্যিক শহর বলে অভিহিত করেছেন। ওঁর কাছে আবহাওয়া খুব গরম ও থাকা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে। বাইরে থেকে বাড়িগুলি দেখে ওঁর খুব ভাল লাগে। এর পর বাড়ির ভিতরকার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটি খুবই বিরল। এটি একটি ধনী ব্যক্তির বাড়ি। দেওয়ালগুলিতে পোর্সিলিন লাগানোর ফলে আলো ঠিকরোচ্ছে, ঘরে ফুলদানিতে তাজা ফুল। জানালাতে কচ্ছপের ও কুমিরের আঁশ লাগানো যাতে রোদ সরাসরি না আসে, অথচ আলো থাকে। বাড়ির পিছনে এই পরিমাণ খরচ করার অর্থ যে শহরে সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু এ ছাড়াও বলা যেতে পারে যে সরকার এই ধন দৌলত সম্পর্কে সন্দিগ্ধ নয় বরঞ্চ অনেক বেশি উদার।

কারে কতকগুলি সরকারি দপ্তরের বাড়ির কথা বলেছেন যেগুলি সম্ভবত থেভনোর পরে তৈরি হয়েছিল। সুতরাং আমরা তিন ধরনের বাড়ির কথা পাই— প্রথমত, কুঁড়েঘর গরিবদের জন্য, দ্বিতীয়ত, বড়লোকেদের বাড়ি এবং তৃতীয়ত, দপ্তরখানা। যেহেতু শহরটি কোনও পরিকল্পনামাফিক গড়ে ওঠেনি, সুতরাং বিশেষ কোনও এলাকা কোনও বিশেষ ধরনের বাড়ির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। অন্তত এই সময়ে কোনও শ্রেণী বিভাজন আমরা এলাকার মধ্যে পাই না। এর ফলে শহরের মধ্যে থাকা বড়লোকেদের পক্ষে কষ্টকর মনে হতে পারে এবং শহরের বাইরে তাঁরা আরামের ব্যবস্থা খুঁজবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুরাটের বণিকদের জীবনযাত্রার মধ্যে কারে মার্সেই বন্দরের বণিকদের জীবনযাত্রার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। সুরাটের বণিকরা এখন শহরের বাইরে বাড়ি করছে যেখানে সময় সময় তারা পরিবার নিয়ে চলে যায়। এটি প্রধানত শহরের আওয়াজ ও ভিড় এড়ানোর জন্য। এর থেকে মনে হয় পাঁচিলের বাইরের গ্রামাঞ্চলে

ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে যে শহর বাড়াবার আর কোনও জায়গা নেই, ফলে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের মধ্যে একটা অন্য ধরনের যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে। এর থেকেই সুরাটের শহরতলি তৈরি হতে থাকে। তবে এমনও হতে পারে যে এই সব বণিকরা মোগল অভিজাতদের জীবনযাত্রা অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। মোগল অভিজাতরা শহরের বাইরে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করত যেটা মোগল সম্রাট ও তাঁর পরিবারের বাইরে বাগানবাড়ি তৈরি করার প্রবণতা থেকে দেখা যায়। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি শহরের মাঝখানে বিরাট বাড়ি নিয়ে তাদের কুঠি বানিয়ে ছিল। ওই সব বাড়িতেই তারা তাদের কারিগরদের ও কেরানিদের থাকতে দিত। এটি দিল্লির থেকে আলাদা। বার্নিয়ার বলেছেন যে দিল্লির কারিগররা বাইরে থেকে শহরে আসত সকালে ও সন্ধ্যায় কাজের পরে আবার ফিরে চলে যেত। শহরের দোকানগুলিতে প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যেত। ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী বলা-যায় যে, বণিকরা ওই সব দোকানের উপরে থাকত, যদিও সুরাট শহরে সেরকম কোনও স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শহর সম্বন্ধে কারের উচ্ছ্বাস, তাঁর দেশের লোক সুশন্ দ্য রেনফোর্টের লেখায় মেলে না। উনি ছিলেন ফরাসি কোম্পানির ভারতের সচিব ও কারের সঙ্গেই ভারতে আসেন। অত্যন্ত সাবধানি রেনফোর্ট শহর সম্বন্ধে অতটা উচ্ছ্বাস দেখাননি। উনি বলছেন যে সুরাটের অধিকাংশ বাড়িতেই কোনও জানালা নেই। এখানকার অধিবাসীরা বাড়ির মধ্যে কুয়ো করে তার মধ্যে ধনরত্ন রাখে। এটি অবশ্য কারেও লক্ষ করেছেন। স্বভাবতই রেনফোর্ট কোম্পানির জিনিসপত্রের সুরক্ষার জন্য চিন্তিত ছিলেন। উনি বলছেন যে কোতোয়াল লোকজন নিয়ে সারারাত পথে পথে ঘোরে, যেটির উল্লেখ থেভনোও করেছেন। চুরি সম্পর্কে থেভনো ও রেনফোর্ট যতটা মনোযোগ দিয়েছেন, সে থেকে মনে হয় যে চল্লিশের দশক থেকে সুরাটের এদিকের অবস্থা খারাপ হয়েছে।

কারের মতো রেনফোর্ট পাথর ও কাঠ দিয়ে বাড়ি বানানোর কথা বলেছেন, যার দাম অনেক বেশি, কারের মতো উনিও সমতল ছাদ দেওয়া দোতলা বাড়ির কথা বলেছেন। এই ছাদে সন্ধ্যার পর মেয়েরা যেত। কোনও কোনও বাড়িতে ফুল সাজানো বাগানের মধ্যে ফোয়ারা ছিল যেটি মোগল অভিজাতদের জীবনযাত্রার অনুকরণে করা। রেনফোর্টই প্রথম শহরের মধ্যে সুন্দর মসজিদের কথা বলেছেন। থেভনো ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে সুরাট শহরে হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে থাকে। এঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে সম্রাট তাঁর ধর্ম আরোপ করার চেষ্টা করছেন না। কিন্তু রেনফোর্ট বলছেন যে ধর্মের গোঁড়ামি শুরু হয়ে গিয়েছে যা আগে সুরাটে ছিল না। হিন্দুদের বলা হচ্ছে যে হয় মন্দির শহরের বাইরে নিয়ে যেতে না হলে নিজেদের বাড়ির মধ্যে করতে। এটা যে সম্রাটের আদেশ নয় সেটা ১৬৬৯ সালের একটা ঘটনায় বোঝা যায়। ওই সালে সুরাটের কাজি শহরের একটা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দেন। এর প্রতিবাদে সুরাটের বানিয়ারা শহর ছেড়ে চলে যায় এবং সম্রাটের কাছে আবেদন পাঠায়। সম্রাট কালবিলম্ব না করে কাজিকে বদলি করে দেন যার পর বানিয়ারা সুরাটে ফিরে আসে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ফরাসি

কোম্পানির বণিক ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ যিনি এই বিবরণ দিয়েছেন, সুতরাং কাজির আদেশ যে সম্রাটের আদেশ নয় এটা খুব পরিষ্কার। তবে সম্রাটের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে হিন্দুদের জন্য শুল্কের হার বাড়িয়ে শতকরা পাঁচ করা হয়েছে।

শিবাজির আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও, সম্ভবত মোগল আমলা ও মারাঠাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকার ফলে শহরের দেওয়াল সম্পূর্ণ করা হয়নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও ফরাসি পরিব্রাজক গ্যাব্রিয়েল দেলন সুরাটকে ফ্রান্সের মঁপিলেয়ার-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শহরে নতুন এলাকা তৈরি হচ্ছে প্রধানত ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা যার ফলে এলাকার শ্রেণী বিভাজন শুরু হয়ে যায়। যে রাস্তাগুলি বাঁধানো নয়, সেগুলি প্রতিদিনই জল দেওয়া হতে থাকে ধুলো কমানোর জন্য। নতুন এলাকার বাড়িগুলির ছাদ সাদা প্লাস্টারে করা সমতল। পুরনো এলাকার বাড়িগুলি এখনও টালির ছাদ ব্যবহার করছে। নতুন বাড়ির ছাদগুলি সমতল হলেও মাঝখানটা উঁচু যাতে বর্ষার জল গড়িয়ে পড়ে। বাড়িগুলি দোতলা। শহরে এত লোক হয়েছে যে শহরের রাস্তায় লোকে রাত্রে ঘুমায়। এতদিনে শহরে জলের সমস্যা শুরু হয়েছে। সরকার থেকে সাধারণের জন্য স্নানাগার তৈরি করেছে। এক একটির প্রবেশমূল্য এক একরকম। স্নানাগারেও শ্রেণী বিভাজন দেখা যায়। গরিবদের জন্য বিনা পয়সার স্নানাগারও রয়েছে। যেহেতু ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতেই স্নানাগার ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে যে নতুন প্রবেশমূল্য নেওয়া স্নানাগারগুলি বিদেশি ও মধ্যবিত্তদের জন্য। নতুন এলাকাগুলিতে বাগান হয়েছে শুধু তাই নয়, রাস্তার দুপাশে গাছের সারি লাগানো হয়েছে, যেটা দেখে ফরাসি পরিব্রাজকের প্যারিসের কুর-দ্য-লা রেনের কথা মনে পড়ে। শহরে বিত্তশালী লোকেরা নানাধরনের কাজ চাইছে পয়সার বিনিময়ে। এটা দেখা যায় যে হকাররা সকালে ও বিকেলে বাড়ি বাড়ি গরম উনুনের উপর কফি ফেরি করে বেড়ায়। প্রতি কাপের মূল্য আধপয়সা। বলা যেতে পারে যে এই ধরনের কাজ উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিহ্ন। কারণ ধনী ও অভিজাতদের বাড়িতেই এসব করার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে, যার কথা অধ্যাপক ইকতিদার আলম খান বলেছেন, যারা এই ধরনের জিনিস চাইছে কম খরচে।

শহরের বিত্তশালী লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরাট ও তার শহরতলির সম্প্রসারণ ও যোগাযোগ নিবিড় হচ্ছে। সুরাটের চারপাশের জমিতে প্রচুর পরিমাণে গম ও চাল হয় প্রধানত খারিফ মৌসুমে যা সুরাটে চালান করা হয়। সুরাটের অধিবাসীরা এই চাল ও গমের উপর নির্ভরশীল। সুরাটের কাছে ওমব্রা গ্রামে পারসিরা তাড়ি তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করে। থেভনো তাড়ি তৈরি করার কথা বলেছেন কিন্তু কারা করে বলেননি। সুরাট থেকে সোয়ালি পর্যন্ত পথ গাছের সারি দিয়ে ঢাকা; বণিকরা কখনও গিয়ে বনভোজন করে। এই পথের অনেকখানিই জুড়ে এখন মারাঠা তাড়িত লোকেরা এসে বসছে কারণ শহরের মধ্যে এখন আর কোনও জায়গা নেই। বলা যায় যে সুরাট শহর এখন সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে শহরে বাড়ি না পেয়ে বণিকরা বাজারে দোকানের মধ্যে রাত কাটায়। ১৬৭১ সালে ফরাসি সেনাপতি লা হে বলেছেন যে সুরাট লিয়ঁ শহরের সমান। উনি সুরাটের জনসংখ্যা ধরেছেন দশ

লাখ—যেটি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত বলে ধরা যায়। মধ্যযুগের শেষে রোম শহরে লোকসংখ্যা প্রায় দশ লাখ ছিল।

ওই ফরাসি সেনানায়কের লেখা থেকে খুব পরিষ্কার যে ধনী বানিয়ার সংখ্যা সুরাটে বেড়ে গিয়েছে। উনি বলছেন যে তিরিশজন এরকম ধনী আছে যারা নগদ টাকায় দুই লাখ ফরাসি পাউন্ডের সমান টাকা রাখে। এদের মধ্যে দশজনের কাছে বিশ লাখ বা ত্রিশ লাখ আছে। দামাদাবার দেশাই গুজরাটের প্রধান ইজারাদার এবং এঁর কাছে তিন কোটি পাউন্ডের সমান টাকা আছে। ওঁর নিজের দখলে ছিল গ্রান্দভি দ্বীপ ও বিশ মাইল জায়গা। এখান থেকে ভাল কাঠ নিয়ে উনি সুরাট শহরে বিক্রি করতেন খুব চড়া দামে জাহাজ ও বাড়ি বানানোর জন্য। এ ছাড়াও অনেক বণিক আছে যারা দালালির কাজ করে টাকা করেছে। কয়েকজন বণিকের নিজস্ব জাহাজ আছে, যেমন আগা কাশিম। উনি জাহাজ ভাড়া দিতেন। মোগল শাসনকর্তার দুটি জাহাজ ছিল যেগুলি ভাড়া দিয়ে উনি বছরে চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের মতন আয় করতেন।

১৬৭১ সালে সুরাটের শুল্ক থেকে আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে পনেরো লক্ষ টাকায়। তবে বলা দরকার যে এই আয় সম্পূর্ণ বন্দরের নয়। প্রতি শহরের সঙ্গেই চাষযোগ্য জমি ছিল এবং তার খাজনা ও স্থলপথে শহরে যাতায়াতের শুল্ক এর সঙ্গে যোগ হত। এই খাজনা নির্ভর করত কতটা জমি রয়েছে তার উপর। আবুল ফজলের ১৫৯৫-৯৬ সালের হিসেব থেকে দেখা যায় যে গুজরাটের অন্যান্য শহরের তুলনায়, আহমদাবাদ ছাড়া, সুরাটের সংলগ্ন এই জমির পরিমাণ অনেক বেশি। সুতরাং বন্দরের আয়ের মধ্যে শহরের আয়ও ছিল যার মধ্যে ছিল লাগোয়া জমি।

ওই সময়ে আর একজন ফরাসি বণিকের লেখা পাওয়া যায়। ইনি হলেন বেলাঞ্জার দ্য লেসপিনে। উনি বলছেন যে সুরাটে প্রচুর লোক আছে এবং সমস্ত পূর্ব দিকের মধ্যে সুরাটই সবথেকে বড় ও ধনী শহর। সুরাটের মধ্যে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায়, বাগানগুলিকে শহরের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শহরের মধ্যে দামি কাঠ ও পাথর বাদ দিয়ে পোড়া ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে, নবাগতদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক রয়েছে। শিবাজির আক্রমণের ফলে শহরে উন্নতি বা প্রসারের বাধা হয়নি। ধর্মীয় স্বাধীনতায় তখনও কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি। কিন্তু শাসনকর্তার অত্যাচার শুরু হয়েছে। খোজা মিনাস, যিনি আর্মেনিয়ান বণিকদের মধ্যে প্রধান, অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শাসনকর্তার ক্রমাগত অর্থ দাবি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। খুব সম্ভবত সম্রাটের কাছে এটা যায়নি। কারণ এটা থামাবার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।

বহু জাহাজ বন্দরে আসায় জাহাজে মাল ও খাদ্যশস্য দেবার জন্য সুরাটের শহরতলিগুলি গড়ে উঠতে থাকে। চারপাশে কয়েকটা বাজার-শহর হয়েছে যার মধ্যে ইউরোপীয়রা সোয়ালি, আমোরিস, বাস্তি, দামেকুইন ইত্যাদি উল্লেখ করেছে। এগুলি থেকে জাহাজে শস্য ও মদ চালান দেওয়া হত। এই সব জায়গায় ইউরোপীয়রা মুসলমানদের বলদটানা গাড়ি করে প্রায়ই যেত। কিন্তু সুরাটে ইউরোপীয় ও

মুসলমানদের মধ্যেকার সম্পর্ক ভাল ছিল না। খুব কম সময়ই মুসলমানরা ইউরোপীয়দের নিজেদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেত। খুব বেশি বন্ধুত্ব হলে তবেই এটা তারা করত। সুতরাং বার্নিয়ারের সময়ের জগত থেকে এটা আলাদা এবং প্রধানত এসেছে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। অন্যদিকে বড়লোক হিন্দুদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক ভাল ছিল। তাদের দাসী ও রক্ষিতাদের অনেক সময়ে ইউরোপীয়দের দিত। সুরাটের হিন্দু সমাজ তখন অনেক উদার ছিল। এমনকী ষাট বছর বয়সের হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ করার বাধা ছিল না। সাধারণত ষাট বছর বৃদ্ধ বয়স বলে ধরা হত না কারণ বহু লোকেই একশো বছর অবধি বাঁচত। এমনকী ফরাসি পরিব্রাজকের চোখের সামনেই মহিলারা আধফুট লম্বা নালি লাগানো হুঁকোতে তামাক সেবন করেছে। সতীদাহ প্রথা প্রধানত ছিল বানিয়াদের মধ্যে যারা ছিল খুব গোঁড়া। এরা এদের ছেলেমেয়েদের তিন বছর বয়সে বিয়ে দিত। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও মুসলমানদের আগমনের ফলে গোঁড়ামি আরও বেড়ে গিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনকী সুরাট শহরে আরাক মদ খোলাখুলি ভাবেই বিক্রি হত ও সাধারণ লোকেরা প্রচুর খেত কারণ এটা ছিল সস্তা। সুরাটে সত্তরের দশকের জীবন ছিল অনেক বেশি উদার ও প্রায় অত্যাচারবিহীন। কিন্তু এরপর নেমে আসতে থাকে বিপর্যয় যার মূলে হয়তো রয়েছে মোগল-মারাঠা লড়াই, মোগলদের আর্থিক অবস্থার অবনতি, ক্রমাগত জলদস্যুতা ও মধ্যপ্রাচ্যের দুই মুসলমান সাম্রাজ্যের ধীরে ধীরে পতন। এই বিপর্যয়ের চেহারা দেখার আগে আমরা আর একটি বর্ণনা দেখব ১৬৮৯ সালের ভ্রমণকারী জে. ওভিংটনের।

ওভিংটন বলছেন যে শহরের ব্যাসার্ধ, শহরতলি ধরে প্রায় তিন মাইলের মতো এবং এর চেহারাটা অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মতো। এর কারণ নদী এখানে বাঁক নিয়েছে। শহরের একটা দেওয়াল আছে যার মধ্যে দূরে দূরে রয়েছে মিনার। দুর্গটি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যার একদিকে নদী ও অন্যদিকে পরিখা। এর আগে আমরা দেখেছি যে চার দিকেই পরিখা আছে। মনে হয় নদীর জল একদিকের পরিখার মধ্যে সরাসরি আসায়, একদিকে নদী এটাই দেখা যায়। দুর্গটি চৌকো ও প্রতি কোণে একটা করে বড় মিনার আছে। দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের থাকার জায়গা আছে। দেওয়ালের উপর কামান বসানো।

অনেকগুলি বাড়িই বড় ও ভাল, কিন্তু যে পরিমাণে ধনী আছে, সেই পরিমাণে বড় বাড়ি নেই। কারণ এখানকার ধনীরা সরকারের ভয়ে বিলাসদ্রব্য ও ধনরত্ন লুকিয়ে রাখে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদ সমতল; মাঝখানে উঁচু স্পেন ও পর্তুগালের বাড়ির মতো টালি দিয়ে ঢাকা। দেওয়ালগুলি ইট বা পাথরের। জানালাতে কোনও কাচ নেই—আলো, বাতাস আসার জন্য খোলা। নিচু ও উঁচু তলার মেঝেগুলি ছাদের মতো সমতল ঠাণ্ডা রাখার জন্য। গরিব লোকেরা শহরের একপ্রান্তে থাকে। এদের বাড়িগুলি বাঁশ ও খাপরা দিয়ে করা। উপরে তালপাতার আচ্ছাদন। শহরের রাস্তাগুলি অধিকাংশ জায়গাতে সরু; কেবল কয়েক জায়গায় চওড়া। সন্ধ্যাবেলায় বাজারের জায়গাতে লন্ডনের থেকেও এত বেশি লোক যে ওদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া শক্ত। এদের অধিকাংশই বানিয়া ও অন্যান্য ব্যবসায়ী যারা তাদের মাল সাজিয়ে রেখে

বিক্রি করে। এখানে অনেকেই দাঁড়িয়ে হাতের উপর রেশমের কাপড় বা মাথায় জিনিস রেখে লোক ডাকে মাল দেখার জন্য।

শহরের মাঝখানে দুর্গের সামনে ময়দান। এখানে মাল রেখে বিক্রি করা হয়। বর্ষাকাল ছাড়া দিনে ও রাত্রিতে এই মাল বিক্রি চলে। এখানেই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি গাঁটরিতে মাল বেঁধে জাহাজে তোলার জন্য অপেক্ষা করে। সুরাট মোগল সাম্রাজের মধ্যে জিনিস বিক্রির জন্য প্রসিদ্ধ। শুধু ইউরোপের জিনিস দেওয়া বা নেওয়া নয়, একই বাণিজ্য চলে চিন, আরবদেশ, পারস্য ও ভারতের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে। নদীটি সেই দিক থেকে খুব সুবিধের কারণ ওইসব মাল ওই নদী দিয়েই যাতায়াত করে। পারস্য দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা ছাড়াও, সবধরনের দুর্মূল্য রত্ন এখানে আসে বিক্রির জন্য। এখানকার বন্দরে সব বিদেশি মুদ্রার আমদানিতে শতকরা আড়াই ভাগ শুল্ক দিতে হয়। এর থেকে মনে হয় যে সোনা আমদানির শুল্কের হার একসময়ে বেড়ে গেলেও আবার কমানো হয়েছিল। অন্যদেশে জাহাজ প্রথমে এলে একটা শুল্ক দিতে হয়। চারশো টনের জাহাজের শুল্ক হবে হাজার ডলার। কিন্তু এখানে মালের উপর শুল্ক।

সুরাটে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল আসে যার মধ্যে রয়েছে আগ্রা, দিল্লি, ব্রোচ, আহমদাবাদ এবং অন্যান্য শহর, যেগুলি বিক্রি করা হয় ইউরোপীয়, তুর্ক, আরব ও আর্মেনিয়ান বণিকদের কাছে। আর্মেনিয়ানরাই পৃথিবীর সব দেশে এই সব মাল ছড়িয়ে দেয়।

সুরাট শহরে কোতোয়াল ছাড়াও অন্যান্য আমলারা রয়েছে। ছোটখাটো অপরাধের জন্য চাবুক মারা হয়। আরও বড় অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু গত বিশ বছরে এ দণ্ড কাউকে দেওয়া হয়নি। ওভিংটন থাকার সময়ে কয়েকজন ইউরোপীয় জলদস্যু ধরা পড়েছিল এবং তাদের বিচার হচ্ছিল। এখানে মোগল, হিন্দু ও পারসি অধিবাসীরা থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনও গোলমাল নেই। সম্রাট অবশ্য হিন্দু মন্দির নতুনভাবে তৈরি করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং উন্মুক্ত জায়গায় সভার উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করায়, ওই ধরনের ধর্মীয় সভা আগেকার থেকে কমেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক ভাল নয়। ১৬৭১ সালের জুলাই মাসে কয়েকজন ওলন্দাজ নাবিকের সঙ্গে একজন প্রভাবশালী বণিক আগা জাফরের লোকজনের মধ্যে বচসা হয় যার থেকে হাতাহাতি হয়। শহরের মুসলমানরা সুরাটের মুৎসুদ্দির (শাসনকর্তা) কাছে আর্জি দিলে, তিনি ইউরোপীয়দের বাড়িতে মুসলমানদের নিয়োগ বাতিল করে দেন। এর পরে একজন ইংরেজের উপর অতর্কিত আক্রমণ হলে, ইউরোপীয়েরা কুঠি বন্ধ করে সোয়ালি চলে যায়। নানারকম আলোচনার পর একটা চুক্তি সই হলে (২১ অগস্ট) ইউরোপীয়রা ফিরে আসে। একটা শর্ত ছিল যে ইউরোপীয়দের মাল যাতায়াতে কোনও বাধা দেওয়া হবে না।

এই ধরনের ঘটনা থেকে মনে হয় যে শহরের শাসনকর্তার সঙ্গে প্রভাবশালী বণিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বণিকদের সম্পর্কে রাষ্ট্র উদাসীন বলে যা বলা হচ্ছে, সেটা অন্তত সুরাটের বেলায় খাটে না। ১৬৭২-৭৩ সালে মারাঠা আক্রমণের

পরিপ্রেক্ষিতে মুৎসুদ্দি বণিকদের নিয়ে সভা করেন। বণিকরা শাসনকর্তার প্রস্তাবে মত না দিয়ে শহরে কেনাবেচা বন্ধ করে দেয়। ১৬৭৩ সালে ফরাসি কোম্পানি শাসনকর্তার কাছে বহু দফা শর্ত দেয়। এর মধ্যে ছিল ফরাসি প্রধান তাঁর নিশান ও ঢাক ব্যবহার করতে পারবে ও শহরে ঢুকতে বেরোতে গেলে কোনও অনুমতিপত্র লাগবে না। অর্থাৎ ফরাসিরা নিজেদের ক্ষমতা প্রায় শাসনকর্তার সমান করতে চাইছে।

১৬৭৫ সাল থেকেই সুরাট শহরে টাকা পয়সার ঘাটতি দেখা যায়। ১৬৭৬ সালে মারাঠা রামনগর দখল করে সুরাটে দূত পাঠায়। তক্ষুণি সোনার দাম পড়ে যায় ও বড় বণিকরা টাকা লগ্নি করতে চায় না। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে কয়েকজন ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে যায়। এর মধ্যে বণিকরা সুরাটের মুৎসুদ্দি গিয়াসুদ্দিন-এর পরিবর্তন চায়। মির্জা মুহম্মদ বেগ শাসনকর্তা হন। গিয়াসুদ্দিন প্রায় এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন।

এ সব সত্ত্বেও সুরাটের বাণিজ্য বাড়ছিল। মার্তাঁ যখন ১৬৮১ সালে সুরাটে বদলি হয়ে আসেন, তখন তিনি দেখেন যে মুসলমান জাহাজের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ১৬৭০ সালে তিনি দেখেছিলেন মাত্র ১৭ কি ১৮টা জাহাজ। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ষাটে। খালি শুল্কবিভাগের লোকেরা বেশি কড়াকড়ি করছে ও সঙ্গম জলদস্যুরা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শহরের মধ্যেও গোলমাল বেড়েছে। এপ্রিল-মে মাস (১৬৮২ সাল) জুড়ে শহরে কয়েকবার আগুন লাগে যার ফলে প্রায় ৫০০ বাড়ি পুড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে এই আগুনগুলি লাগিয়েছে একদল লোক—যারা আগুনের সাহায্যে বাড়ি লুঠ করছিল। কয়েকজন ধরা পড়ে ও শাস্তি পায়। ২১ অগস্ট ১৬৮৪ সালে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে শহরের অনেক বাড়ি পড়ে যায়।

অক্টোবর ১৬৮৪ সালে যখন সালামত খান মুৎসুদ্দি হয়ে আসেন তখন সুরাট পড়তির মুখে। সত্তরের দশকের আয় কমে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ৯ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। একটা কারণ হতে পারে যে সুরাটের পশ্চাদভূমি তখন আর নিরাপদ নয় যার ফলে মাল আসাও কমে গিয়েছে। গ্রাসিয়া ও কুলি উপজাতিরা আহমদাবাদ ও সুরাটের মধ্যেকার রাস্তায় লুঠপাট করতে থাকে। মালাবার জলদস্যুরা সুরাটের বণিকদের নৌকো লুঠ করতে শুরু করেছে। সুযোগ বুঝে সালামত খান প্রধান বানিয়াদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করতে থাকেন। সম্রাটের কাছে অভিযোগ করে লাভ হয় না। ফলে পরের বছর সুরাটের আয় আরও কমে যায়। এখন ৯ লাখ ৩ হাজারে দাঁড়ায়। শহরের রাস্তায় কোতোয়ালের লোক ও ওলন্দাজ নাবিকদের মধ্যে বড় আকারের একটা সংঘর্ষ হয়। সালামত খান শুল্ক বিভাগের কেরানিদের থেকে জোর করে টাকা আদায় করতে থাকে। ওই দপ্তরে যে মালপত্রের মূল্যায়ন করে, বায়াদাস, পঞ্চাশ হাজার টাকার পরিবর্তে মুক্তি পায়। এর পরে মাল ওজন করার কর্মচারীকে আটক করা হয়। প্রায় দু সপ্তাহ শুল্কবিভাগ বন্ধ থাকে।

এ সব সত্ত্বেও এপ্রিল ১৬৮৬ সালে মার্তাঁ লিখছেন যে পৃথিবীর বাণিজ্যিক শহরের মধ্যে সুরাট প্রধান। উনি একে ক্যাদিস শহরের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেখানে সোনা, রূপার তাল ঢোকে ও বেরোয়। কিন্তু সুরাটে একবার এগুলো ঢুকলে আর বেরোয়

না। মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য তখনও পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, আচে, চিন ও ম্যানিলার সঙ্গে চলছে। এদের জাহাজের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৭২টি। অধিকাংশ জাহাজই সুরাটের পারসি ছুতোররা বানিয়েছে অবশ্য ইংরেজ জাহাজের অনুকরণে।

মার্তাঁ বলছেন যে শহরটি খারাপভাবে তৈরি ও নোংরা এবং কয়েক জায়গায় প্রচুর জল জমে থাকে বর্ষার সময়ে। সালামত খান আদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিটি বাড়ির অধিবাসীরা নিজেদের দরজার সামনের জায়গা পরিষ্কার রাখবে। সে কাজ শুরু হয়েছিল। শহরটা ধনুকের ছিলার মতো দেখতে যেটা নদীর দিকে মুখ করা। একটা দুর্গ আছে দক্ষিণ দিকে কিন্তু সেটা ইউরোপীয় আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না। এর চেহারাটা কী বলা শক্ত। কয়েক বছর হল শহরের দেওয়াল করা সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু একটা বুরুজের থেকে আর একটা বুরুজের মধ্যেকার তফাত সমান নয় এবং এদের উচ্চতাও সমান নয়। একটা আক্রমণেই সারা জায়গা দখল হয়ে যাবে।

অন্যান্য সূত্র থেকে দেখা যায় যে শহরটি বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত। এক একটি মহল্লায় সাধারণত এক জাতের বা এক পেশার লোকে থাকে। বানিয়ারা এক মহল্লায় থাকার চেষ্টা করে, মুসলমানরা আর এক মহল্লায়। নিচু ও অন্ত্যজ জাতির লোকেরা, যাদের ওভিংটন হালালখোর বলছেন, শহরের প্রান্তে থাকে। বাড়ির সামনের ময়লা বর্ষার জলে ধুয়ে যায় এবং সালামত খানের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। ১৬৯১ সালে ভয়াবহ প্লেগ হয় যার ফলে প্রায় দু লাখ লোক প্রাণ হারায়। শহরের অবস্থা খারাপ হবার ফলে মেয়েদের সুরক্ষাও কমে যায় এবং সন্ধ্যার পর মহিলাদের তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এমনকী এক শাসনকর্তার ছেলেও এর মধ্যে লিপ্ত ছিল।

সুরাট শহরের উপর দিয়ে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায় তার ইতিহাস অনেকটাই জানা। বাইরে সমুদ্রে জলদস্যুদের আক্রমণ মোগল বণিকদের জাহাজের উপর, ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ, মারাঠাদের আক্রমণ, সুরাটের ভিতরের অবস্থার অবনতি, শাসনকর্তাদের অত্যাচার—সব মিলিয়ে সুরাটকে অবনতির পথে ঠেলে দেয়। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের অনবদ্য লেখায় এই অবনতির চেহারা পাওয়া যায় যেখানে অনেক কারণের মধ্যে রয়েছে কিল্লাদার ও শহরের শাসনকর্তার লড়াই।

সুরাটের বাণিজ্যিক উত্থানের মূলে ছিল সাফাবিদ সম্রাটদের আমলে পারস্যের বাণিজ্যের উন্নতি ও অটোমানদের উৎসাহে লোহিত সাগর এলাকায় বাণিজ্যের পুনর্জন্ম। এর ফলে ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যের জোয়ার আসে। পর্তুগিজদের ভারতীয় মহাসাগর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে গুজরাট বাণিজ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমের দিকে যায়। ভারতীয় বণিকরা মশলার বাণিজ্য ছেড়ে কাপড়ের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে। সুরাটের উত্থানের সঙ্গে লোহিত সাগরের বাণিজ্য ও কাপড়ের ব্যবসা জড়িত।

সুরাটের পতনের সঙ্গে তাপ্তি নদীর পলিমাটি পড়া জড়িত নয় বলে অধ্যাপক দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন। মারাঠাদের দুবার সুরাট লুঠ করাও বড় কোনও ঘটনা নয়। ১৭০১ সালেও সুরাটে প্রায় ১১২টি সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতে সুরাটের পতনের জন্য দায়ি তিনটি সাম্রাজ্যের অবক্ষয়—সাফাবিদ, অটোমান

ও মোগল। এর ফলে সুরাটের বাণিজ্য কমতে থাকে যার জন্য অনেকখানি দায়ি মারাঠাদের সুরাটের পশ্চাদভূমি দখল। ১৭৪০ এর দশকে মারাঠারা গুজরাটের প্রায় অধিকাংশ জায়গাই নিজেদের দখলে আনলে পর সুরাটের বাণিজ্য বড় ধাক্কা খায়। ১৭৫৯ সালে ইংরেজরা সুরাট দখল করে মোগল সেনাধ্যক্ষ নামে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে আসে। মোগল শাসনযন্ত্র নামেমাত্র থাকলেও ক্ষমতা ওদের হাতে ছিল না। ততদিনে বোম্বাইয়ের উত্থান হয়েছে এবং ধনী বণিকরা প্রায় সকলেই বোম্বাই চলে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য আবার কিছু বাড়লে সুরাটের কিছু সুরাহা হয়। কিন্তু সেটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। মোগল সাম্রাজের গৌরবসূর্য ততদিনে অস্তমিত হয়েছে এবং সুরাট একটা ছোট প্রাদেশিক শহরে পর্যবসিত হয়েছে।

১২

কালিকট

কালিকট শহরের ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। পুরনো নাম খোজিকোট কেন হয়েছিল, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ভাস্কো-ডা-গামার পঞ্চদশ শতকের শেষে আসার পর থেকে রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষত কোচিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস, লেখা হলেও শহরটি অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ ভ্রমণকারীদের মতে সমুদ্র এগিয়ে এসে শহরের অনেকখানি গ্রাস করে ফেলেছিল। এমনকী শহরের মাঝখানে যে ইংরেজ কুঠি ছিল, তার খানিকটা জলের তলায় চলে যায়। এখানে আমরা কয়েকজন ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত দেখব যাঁরা কালিকটের পুরনো শহরকে দেখেছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পারস্য সম্রাট শাহরুখ আবদুর রাজ্জাকে ভারতে পাঠান। কালিকটের কথা উনি বলেছেন যে বন্দরটি খুব নিরাপদ এবং হরমুজ বন্দরের মতো সব দেশ থেকেই বণিকরা এখানে আসে। আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, গোয়া থেকে জাহাজ আসে বিভিন্ন ধরনের পণ্য নিয়ে। এই জাহাজগুলি বন্দরে যতদিন খুশি থাকতে পারে। সমুদ্রের ধারে এই শহরে অবিশ্বাসীদের বাস। এখানে বহু সংখ্যক মুসলমান বাস করে। এরা দুটো মসজিদ এখানে তৈরি করেছে যেখানে শুক্রবার প্রার্থনা করতে যায়। এদের একজন কাজি আছে এবং এদের অধিকাংশই সফেই মতে বিশ্বাসী (আবু আবদাল্লা মুহম্মদ বেন ইদ্রিসকে সফেই বলা হয়)। সুরক্ষা এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার এ শহরের মধ্যে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত যার ফলে বিদেশি বণিকরা তাদের পণ্য জাহাজ থেকে নামিয়ে বিনা দ্বিধায় বাজারে পাঠায়। হিসেব রাখা বা মালের উপর নজর রাখার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করে না। শুল্কবিভাগের আমলারা নিজেরাই মাল পাহারা দেয়। মাল বিক্রি হলে মালের এক-চল্লিশ ভাগ শুল্ক দিতে হয়। মাল বিক্রি না হলে কিছু দেবার নেই। এখানকার রাজাকে *জামোরিন* বলা হয়। উনি মারা গেলে ওঁর বোনের ছেলে রাজা হয়। রাজার নিজের ছেলে রাজা হয় না। জোর করে কেউ রাজা হয় না। হিন্দুদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে যাদের মধ্যে পরম্পরা চলে আসছে যে তাদের একজন মহিলার বহু স্বামী থাকবে। সময়টা এরা ভাগ করে নেয়। জামোরিন এই শ্রেণী থেকে এসেছে। রাজার সঙ্গে হলঘরে দেখা করে উনি নিজের বাড়িতে ফিরে যান।

কালিকটের প্রথম বিস্তৃত বর্ণনা, প্রবাদ কাহিনী সমেত, পর্তুগিজ ভাষায় লেখেন দুয়ার্ত বারবোসা। মালাবারের রাজা চেরামন পেরুমল মুসলমান হয়ে যান এটা প্রথম ইনিই লেখেন এবং এই প্রবাদ বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। শোনা যায় যে পেরুমল মক্কায় যাবার আগে তাঁর রাজ্য আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এর পরে একটা জনমানবশূন্য সমুদ্রতীর থেকে তিনি জাহাজে চড়েন। এই জায়গাটি বারবোসার প্রবাদ অনুযায়ী কালিকট শহর। যাবার আগে এই জায়গাটি তিনি তাঁর ভাইপোকে তাঁর তরবারি সমেত দিয়ে যান। গেজেটিয়ারে বলা হচ্ছে যে তরবারিটি এখনও জামোরিনের প্রাসাদে রক্ষিত আছে। ওই ভাইপো ওখানে একটি শহর পত্তন করেন যার নাম কালিকট। গোলমরিচের বাণিজ্য করেই এই শহরের উন্নতি হয়েছে। কালক্রমে এখানকার রাজা মালাবারের মধ্যে সব থেকে পরাক্রান্ত হলে, ওঁর উপাধি হয় জামোরিন বা সামুদ্রি। মালাবারের বাকি রাজাদের মুদ্রা তৈরি করার বা টালি দিয়ে বাড়ি বানানোর অধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে কোচিন ও কানানোরের রাজারা মুদ্রা তৈরি করেছে।

কালিকটের রাজা হিন্দু ও শহরের একটু বাইরে একটা প্রাসাদে থাকেন। এম. এল. ডেমস এই প্রাসাদ সম্পর্কে বলছেন যে কালিকটে কতকগুলি বাড়িকে তালি কোভিলানাম বলে যেটি জামোরিনের কলেজ হয়েছে। এটি সাম্প্রতিক কালে জামোরিনের প্রাসাদ ছিল। কিন্তু বারবোসা যে প্রাসাদের কথা বলছেন সেটি কালী মন্দিরের উত্তরের পুরনো প্রাসাদ। জায়গাটিকে এখনও বলা হয় *কোট্রা পারাম্বা* বা বাগান দুর্গ। পুরনো বাড়ির চিহ্ন এখানে দেখা যায়। এখানেই ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ১৭৬৬ সালে হায়দার আলি যখন আক্রমণ করেন তখন জামোরিন দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগুন লাগিয়ে মারা যান। এখানে বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের কাছারি ছিল। সামনের পুকুরটিকে বলা হয় মানানচিরা বা মানবিক্রমণ-চিরা অর্থাৎ জামোরিনের পুকুর। ডেমসের এই বক্তব্য কতটা মানা যায় এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও কোনও ভ্রমণকারীর লেখা থেকে আমরা দেখব যে তারা ওই প্রাসাদের খোঁজ পায়নি। হায়দার আলির সময়কার প্রাসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর হতে পারে।

রাজপ্রাসাদে রাজার থেকে একটু দূরে একদল লেখক হাতে লোহার কলম নিয়ে বসে থাকে যারা রাজার বিচার ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলি লম্বা শক্ত তালপাতার উপরে লেখে। এরা নায়ার কিন্তু লেখক হলে এদের উপাধি মেনন দেওয়া হয় বলে ঐতিহাসিক ডেমস বলছেন। এ ছাড়া রাজপ্রাসাদে উচ্চ জাতের প্রায় হাজার মহিলা আছে যারা প্রাসাদ ও দরবার পরিষ্কার রাখে। রাজা যেখানে যান এরা আগে আগে সেখানে গিয়ে পরিষ্কার করে। অনেক নায়ার পুরুষও খোলা তরবারি নিয়ে এদের সঙ্গে যায়।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষদিকে আসেন লিনসখোটেন। উনি বলছেন যে পর্তুগিজরা আসার আগে কালিকট শহর বিখ্যাত ছিল সারা ভারতের মধ্যে। এখানেই জামোরিন, মালাবারের সম্রাট, থাকেন। পর্তুগিজরা কোচিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কালিকটের বিপক্ষে গেলে কালিকটের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এখন এটা মালাবারের একটা

সামান্য শহর। কোচিনের রাজা কালিকটের রাজার থেকে ধনী।

সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশকে পিয়েত্রো দেলা ভেলা কালিকটে এসেছিলেন পর্তুগিজ নৌবহরে চড়ে। উনি বলছেন যে শহরটা সমুদ্রের ধারে এবং জামোরিনের রাজপ্রাসাদ বেশি দূরে নয়। ঐতিহাসিক ইস্টউক এই প্রাসাদকে পুরনো প্রাসাদ বলে দাবি করেছেন এবং উনি ওখানে দুটি স্তম্ভ ও একটি বারান্দা দেখেছিলেন। দেলা ভেলা মাটিতে নেমে বাজারে যান যেটা সমুদ্রের ধারে। বাড়িগুলি মাটি দিয়ে করা কুঁড়েঘর ও তালপাতার ছাউনি দেওয়া। এগুলি খুব নিচু। রাস্তাগুলি সরু কিন্তু খুব লম্বা। বাজারটিতে সবধরনের খাবার ও জীবনধারণের অন্য জিনিসও পাওয়া যায়। সাধারণ লোকেরা সাদা তাঁতের বা রেশমের কাপড় পরে। উচ্চবিত্তরা নীল বা সাদার উপর অন্য রঙের কাপড় পরে। গাঢ় নীল রং এদের কাছে শ্রদ্ধার কাপড়। পুরুষ ও মহিলারা লম্বা চুল রাখে ও মাথার উপরে বেঁধে রাখে। উভয়রাই হাতে, কানে ও গলায় রত্ন বসানো গয়না পড়ে। পুরুষরা সাধারণত খোলা তলোয়ার ও ঢাল বা অন্য অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে। এরা প্রায় সবাই হিন্দু ও এদের নায়ার বলা হয়। এদের পেশা যুদ্ধ করা। উপকূলের মালাবারিরা অবশ্য মুসলমান। কালিকটের বাজারে পর্তুগিজ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি হয়।

কালিকট শহর বেশ বড়। বাজার থেকে দেলা ভেলা প্রাসাদের দিকে যান। পথে অনেক বাগান দেখেন। রাস্তা থেকে একটু দূরে বাগানের গাছের মধ্যে তিনি বাড়িগুলি দেখেন। এদের বাইরেটা দেখা যায় না, খুব ছোট দেখায়। এগুলি ছোট ছোট জায়গা করে ভাগ করা। যেগুলি কালো পাথরের নিচু দেওয়াল গিয়ে ঘেরা। এর মধ্যের রাস্তাগুলি বাজারের রাস্তার থেকে ভাল। বাড়িগুলিতে কোনও জানালা নেই। এগুলির মধ্য দিয়ে হাঁটলে মনে হয় যেন কোনও জনমানবহীন পুরীর মধ্য দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে প্রচুর লোক আছে। ছোট বাড়িগুলির জন্য মনে হয় জায়গাটা ছোট।

প্রাসাদের প্রধান দরজা দিয়ে একটা ছোট চকে পড়তে হয় যার মধ্যে গাছ আছে। সামনে কোনও রক্ষী নেই—সবটাই খোলা। কিন্তু এর সামনে সারি দিয়ে ঝাড় বসানো বোধহয় জীবজন্তুদের ঠেকানোর জন্য। এর মাঝখানে দরজার বাইরে রয়েছে কতকগুলি সিঁড়ি যার পর আর একটা দরজা রয়েছে। এই দরজা দিয়ে ভিতরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে একটা বড় লম্বা উঠোন পাওয়া যায় যার পাশে অনেকগুলি ঘর রয়েছে। উঠোনের মাঝখানে অনেকগুলি গাছ আছে ছায়া দেবার জন্য। এই উঠোনের শেষে রাজার মহিলাদের ঘরগুলি যেগুলি ছিল ঢোকার পর বাঁ দিকে। ইউরোপীয় প্রাসাদের তুলনায় এই বাড়িটি কিছুই নয় বলে দেলা ভেলার মনে হয়েছে। কিন্তু ওদের জীবনযাত্রার মধ্যে এটা রাজপ্রাসাদ। বাড়িতে একটা ঢাকা বারান্দা আছে যার পরে আছে একটা দরজা যার মধ্য দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা যায়। রাজার আদেশ পাওয়ার পর দেলা ভেলা দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ভিতরে যান। পাশে একটা ঘরে ময়ূরের উপর ব্রহ্মার মূর্তিও দেখেন। এটা পেরিয়ে একটা ছোট উঠোন যার পাশে ছোট ছোট ঢাকা বারান্দা ছিল। কোনও কোনওটা জমির উপর আর কোনও কোনওটা মাটি থেকে কিছু উপরে। বারান্দাতে ছিল বাঁধানো উঁচু বসার জায়গা যেখানে বসে

তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজার চারপাশে সভাসদ দাঁড়িয়ে ছিল যাদের মধ্যে একটি পর্তুগিজ যুবকও ছিল যার নাম চিকো। এ ছাড়াও একজন ভারতীয় খ্রিস্টান ছিল যে আগে পর্তুগিজদের দাস ছিল কিন্তু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। দেলা ভেলা ও তাঁর সঙ্গীরা ভিতরে ঢোকার পর দরজা লোহার বাঁট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক রাত অবধি আলোচনা চলার পর ওঁরা বেরিয়ে আসেন।

১৬৬০-এর দশকে থেভনো কালিকটের বর্ণনা দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে শহরটা বন্দর থেকে একটু দূরে। পর্তুগিজরা আসার আগে এটা ভারতের মধ্যে বড় বাণিজ্যিক জায়গা ছিল এবং সব জায়গা থেকেই জাহাজ আসত। এসব কথাবার্তা জানা যায় ভাস্কো-ডা-গামার লেখা ডায়েরি থেকে। উনি লিখছেন যে কালিকট বন্দরে সব ধরনের জাহাজ দেখা যায় লোক ভর্তি। প্রায় দু মাইল যাবার পরও দেখেছেন যে অনেক বড় জাহাজ পাড়ে তোলা হয়েছে। কতগুলি জাহাজ আসত তা প্রমাণ পাওয়া যায় ইতালীয় এক বণিকের ১০ জুলাই ১৪৯৯ সালের লেখা চিঠি থেকে। উনি লিখছেন পর্তুগিজরা ওই বন্দরে ২১ মে থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত ছিল। এই সময়ের মধ্যে ১৫০০ মুসলমান জাহাজ মশলা নিয়ে আসে। সবথেকে বড় জাহাজ হবে প্রায় ৮০০ টন।

থেভনো বলছেন যে কালিকট শহরে কোনও দেওয়াল নেই, কারণ মাটি খোঁড়া মাত্র জল বেরোতে শুরু করে। কালিকটে কোনও ভাল বাড়ি নেই রাজার প্রাসাদ ও কয়েকটি মন্দির ছাড়া। বাড়িগুলি ছাড়া ছাড়া। কিন্তু শহরে ভাল বাগান আছে। জীবনযাত্রার সব কিছুই এখানে অফুরন্ত। এই একই কথা বলেছেন পরের দশকের আগন্তুক ফরাসি বণিক বেলাঞ্জার দ্য লেসপিনে। উনি বলছেন যে জামোরিনের শহর খুবই বড়। কিন্তু খারাপ ভাবে তৈরি। বাড়িগুলি সবই কুঁড়েঘর, পর পর সাজানো নয়। নদীর দিকে একটু এগোলে দেখা যায় খুব নোংরা। রাজার বারো হাজার সৈনিক আছে যা থেকে তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এটা অবশ্য ফরাসি বণিকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। উনি যখন রাজার কাছে যান তখন রাজার ছয় হাজারের বেশি লোক ছিল না। রাজা সাধারণত কালিকটে থাকেন। উনি রাজাকে দেখেছেন বেশ বয়স্ক ও গম্ভীর এবং ফরাসিদের সঙ্গে চুক্তি করতে চান। ফরাসিরা চুক্তিপত্রে সই করেছিল। রাজার প্রাসাদ থেকে উনি ও আধিকারিক ক্যারন একটা বাড়িতে এলেন যেটা ওঁদের জন্য সাজানো হয়েছিল। আসবার পথে নানারকম বাঁশি ইত্যাদির আওয়াজ শুনতে শুনতে এসেছিলেন। ফরাসিরা নানারকম উপহার দেয় যার মধ্যে ছিল তিনটে আয়না, পারস্য দেশের মদ ও একটা রুবি।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক কে. পি. পি. মেনন বলেছেন যে জামোরিন কালিকটের দখল নেন ৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের পর। ভাস্কো-ডা-গামার ১৫০২ সালে কালিকট আক্রমণের পর ১৫০৯ সালে আলফনসো দ্য আলবুকার্ক কালিকট আক্রমণ করেও সফল হন না। ১৫১৩ সালে জামোরিন ডম গার্সিয়ো দ্য নরোনহার সঙ্গে চুক্তি করেন। কিন্তু কালিকট ও কোচিনের লড়াই চলতে থাকে। মেনন হিসেব করেছেন যে ১৫০২ থেকে ১৭৫৭ সালের মধ্যে ওদের ৯টি যুদ্ধ হয়েছিল। গোয়াতে পর্তুগিজরা বিজয়ী হলে জামোরিন তাদের কালিকটে একটা দুর্গ বানাতে দেন যেটির তদারকি

করেন আলবুকার্ক নিজে। এই দুর্গটি প্রায় সমুদ্রের জলের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। ১৬০৪ সালে ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের হারিয়ে কালিকটে নামে ও জামোরিনের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। ১৬০৭ ও ১৬০৮ সালে এই চুক্তি অনুমোদন করা হয়। ওলন্দাজরা এর পর অল্পবয়স্ক জামোরিনকে রাজা করেন যার ফলে পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। ১৬৪৪ সালে জামোরিন ইংরেজদের আহ্বান করেন কালিকটে কুঠি তৈরি করার জন্য। ওই বছরই তারা কুঠি বানায় যদিও ওলন্দাজরা ক্রমাগত বাধা দিচ্ছিল।

১৬৬৯ সালের প্রথম দিকে ফরাসিরা কালিকটে আসে। মার্তাঁ ও সুশন দ্য রেনফোর্ট এর বর্ণনা রেখে গিয়েছেন যার সঙ্গে আমরা সমকালীন আর একজন ফরাসির (নাম ডেলন) বর্ণনা মেলাতে পারি। মার্তাঁ বলছেন যে শহরের কয়েকটা বাড়ি ইট আর পাথরে করা, আর কয়েকটা মাটির। উল্লেখযোগ্য যে আশির দশকের পর্যটক ফ্রায়ার এই শহরের বাড়ি দেখে নিরাশ হয়ে বলেছেন যে খ্রিষ্টানদের থাকার মতো একটা বাড়িও নেই। মার্তাঁ বলছেন যে এই শহরে এত বাগান আছে যে একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এগুলো সাজানো নয়। এ প্রসঙ্গে ওঁর সঙ্গী রেনফোর্ট বলেছেন যে শহরটা সাজানো নয় এবং ভাল কোনও রাস্তা নেই। এর কিছুটা বিপরীত বক্তব্য রেখেছেন সমকালীন ভ্রমণকারী ডেলন। ইনি বলছেন যে শহরটি বাজার-শহর হিসেবে ভাল এবং পাঁচটি সুন্দর রাস্তা আছে। তবে মার্তাঁ বলেছেন যে শহরটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়। প্রায় এক মাইল যাবার পর উনি জামোরিনের প্রাসাদে এলেন। ওঁরা অবশ্য খুব মনোযোগ দিয়ে বাড়িটা দেখেননি। বলছেন যে পাঁচিলের ভাস্কর্য ভাল ও দরজার সামনে ৪০/৫০টি কামান আছে। এগুলি লোহা ঢালাই করা। ওঁর সঙ্গী রেনফোর্ট লিখছেন যে নারকেল গাছের সারির মধ্যেকার লম্বা পথ দিয়ে ওঁদের আনা হল পাথরের প্রাসাদের সামনে। রাজা তখন সেখানে ছিলেন না। ডেলন বলছেন যে এটা রাজার প্রাসাদ নয়। এটি তাঁর উচ্চপদস্থ আমলা রাজাদরের বাড়ি। ভাস্কো-ডা-গামার লেখায় রাজার পুরনো প্রাসাদের কথা পড়া যায়। মার্তাঁ বলছেন যে প্রাসাদের দরজায় পর্তুগালের প্রতীক ও একটা গ্লোবের নীচে রাজা এমানুয়েলের কথা লেখা আছে। আরও এগিয়ে ওঁরা পাথরে বাঁধানো কয়েকটা পুকুর পেরিয়ে গেলেন। ওই সব পুকুরে হিন্দুরা স্নান করছিল। ইংরেজ কোম্পানির একটা কুঠি আছে। ঐতিহাসিক মেননের মতে প্রথম ইংরেজ কুঠি পরিত্যাগ হবার পর, তারা দ্বিতীয় কুঠি বানায়। ডেলন বলছেন যে জমি যেখানে উঁচু হয়ে যাচ্ছে সেখানে ওই কুঠি বানানো হয়েছিল। কিছুদিন আগে ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের গোলমালে তিনজন ইংরেজ আহত হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা কুঠি আক্রমণ করেছিল। শহরের শাসনকর্তা হস্তক্ষেপ করে গোলমাল মেটান। ডেলন যে জায়গায় কুঠির কথা বলছেন সেটা মেননের সঙ্গে মেলে না।

মার্তাঁ বলছেন যে কালিকট শহর আগে অনেক বড় ছিল। ঐতিহাসিক কে. ভি. কে. আয়ার বলছেন যে কালিকট নাম এসেছে কয়েলকট্টু বা কোয়েলকট্রা থেকে যার মানে হয় জামোরিনের সুরক্ষিত জায়গা। ১৪৪৪ সালে পর্যটক নিকোলো কন্টি এর ব্যাসার্ধ ধরেছেন আট মাইল। প্রায় আড়াইশো বছর পরে ফ্রায়ার বলছিলেন যে শহরের ব্যাসার্ধ চার মাইল। ফ্রায়ার আরও বলেছেন যে শহরটি উঁচু থেকে ধীরে ধীরে

নেমে যাচ্ছে। মার্তাঁও বলেছেন যে পর্তুগিজরা এখানে একটা দুর্গ করেছিল, কিন্তু এখন সেটি পরিত্যক্ত। উনি বলছেন যে ওই দুর্গটি এখন প্রায় জলের ভিতরে এক মাইল দূরে, কারণ সমুদ্র এই উপকূলে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিন্তু ডেলন এটা পুরোপুরি মানেন না। উনি বলছেন যে সমুদ্র এগিয়ে আসার কারণ ওদিকে নিচু জমি এবং মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রচণ্ড জোরে যে দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস আসে, তার ফলে এটা হয়েছে। উনি নিজে ইংরেজদের কুঠি জলের ভিতরে যাবার সাক্ষী। ডেলন বলছেন যে পর্তুগিজ দুর্গটি জল থেকে বেশ দূরে ছিল, কিন্তু এখন জলের চার মাইল ভিতরে। ফ্রায়ার এটি সমর্থন করে বলছেন যে দুর্গটি জলে প্রায় ঢেকে গিয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার যে সপ্তদশ শতাব্দীর সমুদ্র কালিকটের অনেকখানি জায়গা গ্রাস করে নিয়েছিল।

মার্তাঁ বলছেন যে শহরে আগে যে পরিমাণ বাণিজ্য ছিল এখন তা বদলে গিয়েছে। গোলমরিচের ব্যবসা এখনও চলে এবং ওটাই এর প্রধান বাণিজ্য। ডেলন বলছেন যে কালিকটের বাণিজ্য পর্তুগিজরা নিয়ে নিয়েছিল এবং কালিকটের দুর্ভাগ্যর উপর গোয়া গড়ে উঠেছে। মার্তাঁ শহরে হিন্দু ও মুসলমান দুইই দেখেছেন। কিছু ঘর ইহুদি আছে যারা মুক্তা বেচবার জন্য ওঁদের জাহাজে এসেছিল। নায়ারদের লোকে শহরে বাইরে যাবার সময়ে নিয়ে যায়।

১৬৭২ সালের ২৮ মার্চ, ফরাসি বণিক লেস্ত্রা, পানিয়ানির থেকে দূরে নোঙর করেন। তীর থেকে কামানের শব্দ শুনে ওঁরা সচকিত হয়েছিলেন কিন্তু পরে জানলেন যে মুসলমানরা প্রতি বছর মার্চ মাসে তাদের উৎসব করে। এর পরে জামোরিনের কাছে পাঠানো হয় চিঠি সমেত। উনি ফিরে এলে জানা গেল যে কালিকটের রাজা ওঁদের ভালভাবে আপ্যায়ন করেছেন ও ফরাসিদের সমস্ত কিছু দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। পরের দিন সকালে জামোরিনের দুই ছেলে আসে পালকি ও সঙ্গে চল্লিশজন লোক নিয়ে। জলের ধারে এদের সংগীত দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। এরপর এঁরা রং করা নৌকোয় চড়ে ফরাসি নৌসেনাপতি লাহের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দুপুরে খাওয়ার সময় ফরাসিরা কাচের গেলাসে করে লাল মদ দিলে ওঁরা পান করতে রাজি হন না। কিন্তু না খেলে অসভ্যতা হবে মনে করে পরে ওঁরা খেয়েছিলেন। এরপর নানারকম উপহার বিনিময় করে তাঁরা বিদায় নেন।

পরের দিন ডিরেক্টর ক্যারন পানিয়ানি (ছোট শহর যেখানে কালিকটের রাজা জামোরিন সাধারণত থাকেন) গেলেন। ওঁর প্রাসাদ ভালভাবে পাথর ও ইট দিয়ে তৈরি। মাঝে মাঝে মাটি দেওয়া ও এত ছোট যেন মনে হয় যে একটা বণিকের বাড়ি, দুর্গ নয়। ওখানে কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী সৈন্য আছে। আর আছে কয়েকজন সভাসদ। এদের সঙ্গে রয়েছে পানিয়ানির সমস্ত স্ত্রীলোক। এদের মধ্যে কয়েকজন ওদের হাত ধরে টানছিল নিজেদের কুঁড়েঘরে নিয়ে যাবার জন্য। এর পরে জামোরিন ও ক্যারনের কথাবার্তা হয়।

জামোরিনের বয়স প্রায় ৭০ বছর—রং খয়েরি কালো মেশানো, লম্বা সাদা দাড়ি আছে। কোনওরকমেই সাড়ে তিনফুটের বেশি লম্বা নন। তাঁর আঙুলে বহুমূল্যের হিরে রয়েছে। সঙ্গে অস্ত্রও আছে। গলায় বহুমূল্যের মুক্তার হার যার মুক্তাগুলো এত

বড় যা ক্যারন এর আগে আর দেখেননি। একটা বড় খোলা জায়গায় সৈন্যদের নিয়ে প্রতি বছর যুদ্ধের মহড়া করা হয় যেখানে রাজা, যুবরাজ ও সভাসদরা থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ ও ফরাসিরা গোলমরিচের ব্যবসা নিয়ে যুদ্ধ লাগায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কালিকট কার্যত ইংরেজদের অধীনে চুক্তি করে চলে যায়। ততদিনে অন্য জায়গায় গোলমরিচের বাণিজ্যের উত্থান হয়েছে।

১৩

কোচিন

চতুর্দশ শতাব্দীর আগে বন্দর শহর কোচিনের কথা জানা যায় না।১৩৪১ সালের প্লাবনের পর বন্দরের মুখ বড় হয়ে গেলে জাহাজ আসতে শুরু করে। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের চিনা প্রতিনিধিরা এর উল্লেখ করেছেন। কোচিন প্রথমে ভাস্কো-ডা-গামার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু কালিকটের জামোরিন পর্তুগিজদের বাধা দিতে শুরু করলে গামা কালিকটের বশংবদ কোচিনের রাজাকে বিদ্রোহী হতে বলেন। পেড্রো আলভারেস কাব্রাল কোচিনের রাজার সঙ্গে একটা চুক্তি করেন ১৫০০ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৫০৫ সালে পর্তুগিজ দুর্গ কোচিনে তৈরি হলে শহর শুরু হয়। পর্তুগিজ দলিলে একে নীচের কোচিন বলে বলা হচ্ছে। রাজা থাকতেন উপরের কোচিনে। জামোরিন এই চুক্তির বিরুদ্ধে কোচিনের রাজাকে যেতে বললে তিনি রাজি হন না। বরং ১৫০২ সালে গামা যখন কানানোরে ছিলেন, তখন তাঁকে কোচিনে আসতে নিমন্ত্রণ করেন। গামা স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মশলার দাম নির্ধারিত করে দেন। জামোরিন কোচিন আক্রমণ করলেও এর আর বদল হয়নি। বলা যেতে পারে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ কোচিনে তৈরি হয়।

১৫০৪ সালে আলবুকার্ক কোচিনের বন্দরকে পৃথিবীর অন্যতম ভাল বন্দর বলে বলেছেন। এর কারণ ওখানে জাহাজগুলি সুরক্ষিত থাকে। পর্তুগিজরা সব সময়ই চেষ্টা করছিল যাতে কোচিন কালিকটের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। ১৫০৫ সালে কোচিনের নতুন রাজা হবার সময় পর্তুগালের রাজা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পর্তুগিজ ভাইসরয় রাজাকে একটা সোনার মুকুট দেবেন ও সিংহাসনে আরোহণ করার উৎসব পরিচালনা করবেন। জামোরিনের সঙ্গে যুদ্ধ হবার ফলে কোচিনের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য একটা বাৎসরিক টাকা দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দুর্গের পর্তুগিজ অধ্যক্ষ সিংহাসন আরোহণের উৎসব পরিচালনা করতেন।

পর্তুগিজদের সঙ্গে কোচিনের রাজা বরাবর সুন্দর সম্পর্ক রেখে চলেছেন। পর্তুগিজদের টাকা ধার দিয়েছেন ব্যবসা করার জন্য; স্থানীয় বণিকদের কাছে পর্তুগিজদের জন্য জামিন থেকেছেন। পর্তুগিজদের সঙ্গে মিলে কোচিনের সঙ্গে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এমনকী পণ্য আসত মালাস্কা থেকে কোচিনে যেগুলি পাঠানো হত পর্তুগালে। এর মধ্যে ছিল চন্দন কাঠ ও বিভিন্ন ধরনের মশলা। করমন্ডল উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে কোচিনের বাণিজ্য বাড়তে থাকে।

এর ফলে কোচিনে জাহাজ তৈরি করা ও সংস্কার করার কাজ শুরু হয়ে যায়। পর্তুগিজ দলিলে বলা হচ্ছে যে কোচিনের জাহাজঘাটা লিসবনের মতো। এখানে বড় ও ছোট পর্তুগিজ জাহাজ তৈরি করা হত অন্তত ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত। এর একটা কারণ অবশ্য ছিল যে কোচিনে বাসিনের থেকেও ভাল টিক কাঠ পাওয়া যেত। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে পর্তুগিজ ভাইসরয় তাঁর রাজাকে জানাচ্ছেন যে কোচিন জাহাজ তৈরির উৎকৃষ্ট জায়গা যার ফলে ১৫৯৬ সালে রাজা কোচিনে দুটি বড় জাহাজ বানানোর আদেশ দেন। কোচিন থেকে প্রধানত গোলমরিচ যেত লিসবনে যেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এগুলি চালান যেত। এ ছাড়া ইতালীয় ও জার্মান কোম্পানিরা পর্তুগালের সঙ্গে চুক্তি করে পণ্য কিনত। ১৫৮৫ সালে পর্তুগালের সঙ্গে আলোচনার পর মশলার দাম বাড়ানো হয়।

পর্তুগিজরা সব সময়ই স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বাণিজ্য চালাতে চাইত। কোচিনের রাজার এক আদেশে দেখা যাচ্ছে যে পর্তুগিজদের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য রাজা খ্রিস্টান ও হিন্দু বণিকদের বেশি পছন্দ করছেন মুসলমান বণিকদের তুলনায়। কিন্তু কয়েকজন খ্রিস্টান বণিক ছাড়া আর কারুর কাছে লগ্নি করার মতো টাকা ছিল না। অবশেষে পর্তুগিজরা মুসলমান বণিকদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় তাদের টাকা ও ক্ষমতার জন্য। রাজার আদেশ অমান্য করে পর্তুগিজ আমলারা এই সব মুসলমান বণিকদের সাহায্য নিয়ে তাদের নামে বাণিজ্য করত। স্থানীয় কোচিন বণিকরা করমন্ডলে বাণিজ্যর জন্য লোক রেখেছিল। বেরিনা মারাক্কার ও মামালে মারাক্কারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এরা ছিল পর্তুগিজদের বন্ধু ও সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এদের বাণিজ্য ছিল।

১৫২৪ সালের আগে গোয়া থেকে পর্তুগিজরা মুদ্রা তৈরি করার জন্য কারিগর পাঠাত। এর পরে পর্তুগিজরা কোচিনে টাঁকশাল করে যেখান থেকে পর্তুগিজ মুদ্রা *ক্রুজাডোস* তৈরি করা হত। ১৫৬৮ সালের পর *জেরাফিন* নামে রূপার মুদ্রাও কোচিনে তৈরি করা হতে থাকে। মাঝে মাঝে তামার মুদ্রা তৈরি হলেও নিয়মিত হয়নি। ১৫৭৭ সালের পর কোচিনের সান্টাক্রুজ শহরের লোকেদের অনুরোধক্রমে এটি নিয়মিত করা হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে কোচিনের বহু আমলারই মাহিনা দিতেন পর্তুগালের রাজা। এরা অবশ্য সবাই পর্তুগিজ। এই আমলাদের সংখ্যা ১৫৬৪ সালের পর অনেক বেড়ে যায়। নায়ারদেরও নিযুক্ত করা হয় বিভিন্ন কাজে। এক-একটা নায়ার দলের উপরে ছিলেন পানিক্কর। ১৫৭৪ সালে জেসুইট কলেজও খোলা হয়। এ সবের থেকে পর্তুগিজ কোচিন ও মালাবার কোচিনের মধ্যে তফাত করা যায়। পর্তুগিজ কোচিন ছিল কোচিন দুর্গ, যেখানে সান্টাক্রুজ গির্জা ও সেন্ট ফ্রান্সিস গির্জা ছিল। মালাবার কোচিন ছিল রাজার এলাকা ও মন্দির নিয়ে। সুতরাং পর্তুগিজ গোয়ার সঙ্গে এর মৌলিক তফাত আছে। পর্তুগিজ গোয়াতে ভারতীয়রা থাকলেও ভারতীয়

রাজা ও তাঁর ক্ষমতা ছিল না। কোচিনে এই দুই ক্ষমতার সহাবস্থান এই শহরকে অনন্য করে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজরা ভারতীয় শহরগুলিতে সমান্তরাল ক্ষমতার বাতাবরণ তৈরি করে যার সঙ্গে কোচিনের কিছুটা তুলনা করা যায়। কিন্তু কোচিনে দুই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিশেষ হয়নি, ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান রাজনৈতিক বিরোধ কোচিনে অনুপস্থিত।

কোচিন-এর পর্তুগিজ অংশটিকে পর্তুগিজরা শহরের মর্যাদা দেয় ১২ মার্চ ১৫২৭ সালে রাজার বিশেষ আদেশবলে। ততদিনে পর্তুগিজরা স্থানীয় মেয়েদের বিবাহ করতে শুরু করেছে যার অধিকার দেওয়া হয় ১৫১০ সালের পর। শহরের মর্যাদা পাওয়ার পর পর্তুগিজ কোচিনকে ইভোরা ও গোয়া শহরের সমান মর্যাদা দেওয়া হতে থাকে। ১৫৩০ সালের পর অবশ্য কোচিন থেকে গোয়াতে রাজনৈতিক কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কোচিনের মর্যাদার কিছু ক্ষতি হয়নি। ১৫৪২ সালে বলা হয় শহরের যে মর্যাদা কোচিনকে দেওয়া হয়েছে তার কোনও লাঘব হবে না। কোচিনের পৌরসভা সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনেক সময় নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সরকারও এটা শেষকালে মেনে নিয়েছিল। ১৫৫১ সালের ভাইসরয় ডম আলফানসো দ্য নরোনহার একটা আদেশে দেখা যায় যে শহরের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কোচিনের রাজার সঙ্গে কিছু কিছু সমস্যা লেগে থাকে। পর্তুগিজ জাহাজ আসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও পর্তুগিজরা বেশি সংখ্যায় কোচিনে বসবাস শুরু করলে গরুর মাংসের চাহিদা বেড়ে যায়। কোচিনের রাজা রাজ্যের মধ্যে গরু মারার অনুমতি দিতে রাজি হন না। শেষকালে ঠিক হয় যে কয়েকটি বিশেষ জায়গায় এটা করা যাবে। ১৫৫৭ সালে কোচিনের বিশপ করা হয়।

পৌরসভার বেশি টাকার সংস্থান না থাকার ফলে যে অসুবিধে হচ্ছিল, সেটা দূর করার জন্য ১৫৫১ সালে ভাইসরয় আদেশ দেন যে কতকগুলি বিশেষ জমি বিক্রি করা যাবে। শহরের মধ্যে লোক বেড়ে যাওয়ায় শহরের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। এর জন্য ১৫৫১ সালে তৃতীয় পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। ক্রমশ পৌরসভা বড় হতে থাকে ও নতুন লোক নিয়োগ করা হতে থাকে।

কোচিনের বন্দরে একটি ঘাট (জেটি) ছিল যেটা পর্তুগিজ সরকার ব্যবহার করত তাদের জাহাজের জন্য। কিন্তু পর্তুগিজদের সংখ্যা বাড়ার ফলে ও তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বাড়ার ফলে ওই ঘাটও ব্যক্তিগত জাহাজ চালানোর জন্য দেওয়া হতে থাকে। পর্তুগিজদের বাণিজ্যর উপর শুল্ক বসানো কোচিনের রাজার অধিকারের মধ্যে পড়ে। বিশেষত কোচিনে যে সব পর্তুগিজরা বসবাস করছে তাদের বাণিজ্যর উপর শুল্ক বসানোর অধিকার রাজার ছিল। প্রথম দিকে কোচিনের রাজা এই ধরনের শুল্ক আরোপ করেননি। পর্তুগিজরা আসার আগে কোচিনের রাজা বিভিন্ন মশলা, জামাকাপড়, মোম ও সিসার উপর কর নিতেন। পর্তুগিজরা আসার পর তারা পর্তুগিজদের আদেশ দেয় ওই সব শুল্ক পর্তুগিজ রাজাকে দেবার জন্য। কিছুকাল পরে কোচিনের রাজা ওই শুল্কগুলি দাবি করেন কারণ জমি তাঁর। এই বক্তব্য পর্তুগালের রাজা মেনে নিলে ওই শুল্ক কোচিনের রাজাকে দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু

কেবলমাত্র ওইসব পণ্যের উপর শুল্কই তিনি পেতে থাকেন। কোনও সময় ভুল করে আদেশ দেওয়া হয় যে সব জিনিসের উপর শুল্কই কোচিনের রাজা পাবেন। কিছুদিন পরে ভুলটি ধরা পড়ে এবং পুরনো ব্যবস্থা বহাল থাকে।

কোচিনে জাহাজঘাটার জন্য ও বাড়ি তৈরির জন্য কাঠের খুব চাহিদা ছিল। পর্তুগিজরা আদেশ দেয় যে কোচিন থেকে কাঠ বাইরে পাঠানো যাবে না। পৌরসভার আয় বাড়ানোর জন্য ১৫৫৮ সাল থেকে মুসলমান ও কানারিজ দোকানদারের উপর কর বসানো হয়। পর্তুগিজ কাপ্তানদের বাড়িগুলি তারা কোচিন ছেড়ে চলে গেলে পর, পৌরসভার হাতে চলে যাবে। সরকারি বিচার থেকে যা আয় হবে তার একটা অংশ ১৫৭২ সাল থেকে পৌরসভা পাবে। পৌরসভার বিভিন্ন পদের জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর একবার ভোট হবে।

শুল্ক নিয়ে কোচিনের রাজার সঙ্গে পর্তুগিজদের মাঝে মাঝে সমঝোতা হলেও গোলমাল প্রায়শই হচ্ছিল। নতুন সমঝোতা ও নতুন শর্ত আরোপ করা হচ্ছিল। ১৫৮৪ সালে ভাইসরয় ও কোচিনের রাজার মধ্যে একটা নতুন সমঝোতাপত্র সই হয়। শুল্ক সমস্যাই ছিল এর প্রধান বিষয়। কোচিনের রাজা দাবি করেন যে কোচিনের অধিবাসীদের ও পর্তুগিজদের বাণিজ্যপণ্যর উপরে শুল্ক দিতে হবে। ১৫৩০ সালের রাজার আদেশপত্রও এখানে দেখানো হয়। ১৫৫৬ সালের এক আদেশপত্রে বলা হচ্ছে যে হিন্দু ও মুসলমান বণিকদের সঙ্গে সমান হারে পর্তুগিজরা সমস্ত পণ্যের উপর শুল্ক দেবে। এটাও বলা হচ্ছে যে কোচিন বন্দরটি কোচিনের রাজার। প্রথম সমঝোতা হয় যে ১৫৮৪ সালের আগে পর্যন্ত কোচিনের রাজার যা সব শুল্ক ছিল, তা উনি মাপ করে দিলেন। তবে এটা ঠিক হয়ে যায় যে কোচিনে যা সব পণ্য আসবে, জলে বা স্থলে, তার শুল্ক পাবেন কোচিন রাজা। পর্তুগালের রাজার অধীনস্থ আমলারা শতকরা ছয় হিসেবে শুল্ক দেবে। বিবাহিতরা দেবে শতকরা সাড়ে তিন কেবল মাত্র আমদানির সময়, রপ্তানির জন্য কোনও শুল্ক লাগবে না। এ ছাড়াও পর্তুগিজরা শতকরা এক দেবে শহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। বাকিরাও, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, আর্মেনিয়ান, স্থানীয় খ্রিস্টানরাও সাধারণ শুল্ক দেবে। ১৫৮৫ সালে বিশেষ আদেশবলে পৌরসভা শুল্কবিভাগের বাড়ি ও জেলখানার মধ্যের চকে শুল্ক নেবার ব্যবস্থা করে। ১৫৮৯ সালে আর একটি ঘাট তৈরি করা হয় যার জন্য কোচিনের অধিবাসীরা অর্থ সংগ্রহ করে দেয়। এর জন্য তারা অর্ধশতাংশ হারে শুল্ক দিয়েছিল।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখা যাচ্ছিল যে পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চাল কিনে নিজেদের বাড়িতে রাখে ও সময়মতো বেশি দামে শহরে বিক্রি করে। এমনকী পর্তুগাল-এর শত্রুদের কাছে ও অখ্রিস্টান লোকেদের কাছে বিক্রি করে। এর ফলে শহরের লোকেদের অসুবিধে হচ্ছে। ১৫৯১ সালে ভাইসরয় আদেশ দেন যে ক্যাপ্টেন ও পর্তুগিজ আমলারা চালের ব্যবসা করতে পারবে না। চাল কোচিনে আসামাত্র চকে নিয়ে যাওয়া হবে শুল্ক দেবার জন্য ও ওখান থেকেই সাধারণের কাছে সাধারণ দামে বিক্রি করা হবে। ১৫৯২ সালে পৌরসভা পনেরোটি দোকান ঠিক করে দেয় চাল বিক্রি করার জন্য। এই ব্যবস্থা পর্তুগালের রাজা অনুমোদন করেন ১৫৯৩ সালে। ১৫৯৮ সালে চাল রাখার জন্য দুটি গুদামের

সংস্কার করা হয়। এর জন্য শতকরা একাংশ শুল্ক যে নেওয়া হচ্ছে তার টাকা থেকে এই কাজ পাওয়া যাবে। ১৬০০ সালে এই আদেশ পুনরায় জারি করা হয়। ওই সময়ে একই সমস্যা দেখা যায় মাংস বিক্রি করা নিয়ে। ১৬০০ সালে ভাইসরয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পৌরসভাকে অনুরোধ জানান। ওই একই সময়ে বলা হয় যে শহরের সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং পৌরসভার নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত বাড়ির ছাদ একরকম করতে হবে। ওই সময়ে জাহাজঘাটার কাছে অ্যানটনিও দ্য ব্রিটো ফোগাসাকে একখণ্ড জমি দিলে পৌরসভা প্রতিবাদ করে। ১৬০১ সালে ওই জমি ফেরত নিয়ে ব্রিটোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

কোচিন শহরের বর্ণনা প্রথমদিকের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের লেখায় বেশি পাওয়া যায় না যার থেকে মনে হয় যে শহরের প্রসার বিশেষ হয়নি। মালাক্কা থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমে টোমে পিরেজ লিখছেন যে কোচিন রাজ্য ছোট হলেও শক্তিশালী। কোচিন ও ভাইপিন দ্বীপ নিয়ে এই রাজ্য যার মধ্যে ছয় হাজার নায়ার বাস করে। ১৫০৯ সালের এক পর্তুগিজ দলিলে দেখা যাচ্ছে যে ওই দ্বীপ থেকে পর্তুগিজরা কাঠ নিয়ে আসছে কোচিনে তাদের জাহাজ সারানো ও তৈরি করার জন্য। পিরেজ বলছেন যে পর্তুগিজদের আসার আগে কোচিন ছিল কালিকট রাজার অধীনে। কোচিনের রাজাকে হাতি দিতে হত কালিকটের রাজাকে এবং কোচিনের রাজা বছরেও কোনও মুদ্রা তৈরি করতে পারত না। কিন্তু পর্তুগিজদের সাহায্য নিয়ে কোচিনের রাজা স্বাধীন ও পরাক্রান্ত হয়ে যান।

ভ্রমণকারী দুয়ার্ত বারবোসা ওই একই সময়ে কোচিনে এসেছিলেন। ওঁর বর্ণনায় আর একটু বেশি তথ্য পাওয়া যায়। উনি বলছেন যে কোচিন গোলমরিচের জন্য বিখ্যাত—এখানকার প্রায় সব গাছই গোলমরিচের গাছ। এ ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্য হয়। এ রাজ্যের মধ্যে বড় একটা নদী আছে যাকে সাধারণত কোচিন নদী বলা হয়। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা একে নদী বলতে চাননি—এটি সমুদ্রের জলের একটা অংশ। বারবোসা বলছেন যে এই নদীর পারেই রয়েছে একটা শহর যেখানে মুসলমান ও হিন্দুরা বাস করে। এরা সব বড় বণিক। এদের অনেক জাহাজ আছে যার সাহায্যে এরা করমণ্ডল উপকূল, গুজরাট ইত্যাদি জায়গায় বাণিজ্য করে। সুপারি, গোলমরিচ, গুড়, তালের রস ইত্যাদি প্রধান পণ্য। নদীর মুখে পর্তুগিজরা একটা সুন্দর দুর্গ করেছে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায় যে আলফানসো ও ফ্রান্সিসকো আলবুকার্ক ১৫০৩ সালে পর্তুগালের রাজার আদেশক্রমে এই দুর্গ বানান। ১৫০৪ সালে কালিকট আক্রমণ করে পরাজিত হয়। বারবোসা বলছেন যে ওখানে একটা বড় বসতি আছে যার মধ্যে পর্তুগিজ ও স্থানীয় খ্রিস্টানরা থাকে। এই দুর্গের মধ্যে পর্তুগিজরা নতুন জাহাজ বানায় ও পুরনো জাহাজ সারায়। লিসবনের জাহাজঘাটার মতই এখানে গ্যালি ও কারাভেল তৈরি করা হয়। মালাক্কা থেকে ওষুধ আসে সেগুলি ছাড়াও জাহাজে প্রচুর গোলমরিচ নেওয়া হয় পর্তুগালে নিয়ে যাবার জন্য।

ষষ্ঠদশ শতকের শেষ দিকে লিনসখোটেনের বৃত্তান্তে শহরের একটা ছবি পরিষ্কার হয়। এর থেকে মনে করা যায় যে ওই সময়ে একটা শহর গড়ে উঠেছিল যা আগেকার

পর্তুগিজ দলিল থেকেও আমরা দেখেছি। লিনসখোটেন বলছেন যে কোচিনে পর্তুগিজরা, ভারতীয়রা ও মালাবার খ্রিস্টানরা বাস করে। শহরটা প্রায় গোয়ার মতো বড়। লোকসংখ্যা বেশি। বাড়িগুলি ভালভাবে তৈরি ও গির্জা আছে। নদীটা সুন্দর ও বন্দরটিও ভাল। শহরটা পেরিয়ে জমির দিকে গেলে একটা ছোট নদী পাওয়া যায় যেটা সাধারণত লোকেরা পায়ে হেঁটে পার হতে পারে। এটি পেরিয়ে গেলে যে জায়গাটা পাওয়া যায় সেটি কোচিনের ওপরে ও মালাবারিদের দখলে। এরা নিজের ধর্ম অনুসরণ করে। এখানেই রাজা তাঁর দরবার বসান। এটিও ভারতীয় ধরনের বাড়িতে ভর্তি এবং প্রচুর লোক আছে। এখানে প্রতিদিন বাজার বসে এবং সব জিনিসই কেনা যায়। কোচিন আসলে একটা দ্বীপ এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী আছে। উত্তরদিকে ভাইপিন দ্বীপ যার চারপাশে জল। হল্যান্ডের মতো এখানকার জমিও নিচু এবং কোনও পরিখা নেই। এখানে প্রচুর পরিমাণে লবঙ্গ পাওয়া যায় যা সিংহলের লবঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বছর দু জাহাজ ভর্তি করে গোলমরিচ যায়। এর জন্য ও লবঙ্গর জন্য কোচিনের রাজাকে শুল্ক দিতে হয়। পর্তুগিজরা এখানে প্রথম শুল্কের জন্য বাড়ি তৈরি করে। যেহেতু বাণিজ্য অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে, কোচিনের রাজার আয়ও বেড়েছে।

১৬৬৩ সালে ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের আক্রমণ করে হঠিয়ে দিয়ে কোচিন দখল করে। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার এই যুদ্ধের একটা বিবরণ দিয়েছেন, যেটিকে মশলার যুদ্ধ বলা যায়। এই বিবরণ থেকে কোচিন শহরের একটা ছবি পাওয়া যায়। ১৬৬২ সালে ওলন্দাজরা ক্রানানোর দখল করে কোচিন শহরের দিকে এগোতে থাকে। ওদের সামনে ছিল একটা নদী যার ওপর কোচিন শহর। মনে করা হচ্ছে যে ওলন্দাজরা ভাইপিন দ্বীপ দখল করেছিল। ওখান থেকে সিংহলি সৈন্য নিয়ে ওলন্দাজরা সেন্ট অ্যান্দ্রে গির্জার সামনে কোচিনে নামে যেখানে পর্তুগিজরা কিছু মালাবারি সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পর্তুগিজরা গির্জাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পিছু হঠে যায়। ততদিনে ওলন্দাজরা কোচিন শহর ঘিরে ফেলে খাবার আসা বন্ধ করে দেওয়ায় শহরে খুব খাদ্যাভাব দেখা যায়। ওলন্দাজরা শহরের দিকে যায় ও রাজার বাড়িতে গিয়ে দেখে যে সেখানে কেউ নেই। ওখানে কিছু লোককে মেরে ফেলে এবং একজন রানিই ধরা পড়েন। ওই রানিকে জামোরিন-এর কাছে জামিন রাখা হয়। ওলন্দাজরা কোচিন-এর বিরুদ্ধে জামোরিনের সঙ্গে শর্ত করেছিল যে কোচিন দখল করলে পর জামোরিনকে ক্রানানোর দেওয়া হবে। ওলন্দাজরা এর পর সমুদ্রের ধারে সেন্ট জাঁ গির্জার কাছে, সেন্ট টমাস গির্জার পাশে ও কালভেট্টি বাজারে কামান বসায়। কালভেট্টিতে মোপলারা বাস করত। কালভেট্টির মানে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ধরেছেন পাথর কাটার কারিগর যদিও কেউ কেউ এর মানে করেছেন ফাঁসি দেওয়ার জল্লাদের দ্বীপ বা খাল। এর সামনের নদী পার হবার চেষ্টা করলে পর্তুগিজরা দূর থেকে কামান দেগে বহু ওলন্দাজকে হতাহত করে। এমনকী ওলন্দাজরা রাত্রে আক্রমণ করলে পরাজিত হয়। ক্রানানোর-এর শাসনকর্তাকে পর্তুগিজরা বন্দি করে। প্রায় দু মাস চেষ্টার পরও ওলন্দাজরা কোচিন দখল করতে পারে না। শেষকালে এক রাত্রে প্রচুর লড়াই-এর পর ওলন্দাজরা কালভেট্টি বাজারের

দিকের দুর্গের দেওয়াল দখল করতে সমর্থ হয়। পরের দিন পর্তুগিজরা হার স্বীকার করে। জামোরিনকে ক্রানানোর-এর দুর্গ ভেঙে দেওয়া হয়। কোচিনের পুরনো রাজা পালিয়ে গিয়েছিলেন। ওলন্দাজরা নতুন একজনকে রাজা বলে স্বীকার করে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। ইনিই যুবরাজ ভিরকেরালা এবং এঁর সঙ্গে ওলন্দাজদের চুক্তি হয় ২২ মার্চ ১৬৬৩ সালে। শহর রক্ষার জন্য কিছু ওলন্দাজ সৈন্য রেখে বাকিরা বাটাভিয়াতে চলে যায়। বাটাভিয়া দুর্গের জন্য একজন শাসনকর্তা পাঠান। উনি সেন্ট জনের দরজা থেকে সেন্ট পল গির্জা, যে জায়গাটিকে কালভেট্টি বলে, দুর্গের থেকে আলাদা করেছেন কারণ ওই জায়গাটা সুরক্ষিত করার পক্ষে বড়। ওলন্দাজরা দখল নেবার পর থেকে কিছুদিন কোচিনে খাবার খুব সস্তা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পরেই শাসনকর্তা তামাক ও অন্যান্য খাবারের উপর শুল্ক বসান। একজন মাত্র ব্যবসায়ীকে এগুলি সরবরাহ করতে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে সে যেরকম ইচ্ছা দাম নিত। শাসনকর্তা সৈন্যদেরকে শহরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন প্রায় জেলখানার মতো। এরা মদ বা তাড়ি কিছু খেতে পারত না। কারণ এগুলির উপর প্রচণ্ড বেশি শুল্ক চাপানো হয়েছিল। পর্তুগিজদের সময়ে যে টাকায় একজন থাকতে পারত, ওলন্দাজদের সময়ে তার দ্বিগুণ খরচ লাগত। কারণ পর্তুগিজরা শহরের উপর এসব কর বসায়নি। অন্যান্য লোকেদের সামান্য অপরাধের জন্য শাসনকর্তা তাকে রাজ্যের বাইরে চার-পাঁচ বছরের জন্য নির্বাসন দিতেন।

তাভারনিয়ার-এর কোচিন জয়ের তিন-চার বছর পরে থেভনো এসেছিলেন। উনি বলছেন যে ওলন্দাজরা পুরনো রাজার এক আত্মীয়কে রাজা করে জামোরিন উপাধি দিয়েছে। পুরনো রাজা তাঁর কাকার প্রাসাদ তানোর-এ চলে গিয়েছেন, যেটি কালিকট থেকে প্রায় ষোলো মাইল দূরে। কোচিনে নদীটি কালিকট-এর সীমানা হিসেবে আছে। কোচিন-এর বন্দর খুব ভাল এবং জমি থেকেই সহজে জাহাজে ওঠা যায়। শহরে প্রচুর গোলমরিচ পাওয়া যায়। এখানে কিছু লোক আছে যাদের পা এত ফোলা যে প্রায় হাতির পায়ের সমান। নায়ার-এর থেকে সামাজিক মর্যাদার অনেক নিচুতে রয়েছে পেলিয়ারা, যারা অচ্ছুৎ। এরা শহরে ঢুকতে পারে না। এদের কোনও কাজ থাকলে শহরের বাইরে গিয়ে চিৎকার করে ডাক দিয়ে টাকা একটা জায়গায় রেখে দিয়ে যায়। বণিক ওই জায়গা থেকে টাকা নিয়ে মাল রেখে দিয়ে আসে। মালাবারে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের চল নেই। পাহাড়ে বড় বড় হাতি পাওয়া যায় যেগুলি ব্যবহার করা হয়। কোচিনের একটা বড় পুকুর সম্পর্কে স্থানীয় হিন্দুদের খুব শ্রদ্ধা আছে। ওদের মতে এই পুকুরের সঙ্গে নদীর যোগ আছে। এই পুকুরের মাঝখানে একটা মন্দির আছে। স্থানীয় লোকেদের মতে সত্য কথা বললে ওখানকার পুকুরের কুমির কিছু বলে না। থেভনো অবশ্য কোনও কুমির দেখতে পাননি।

১৬৬৯ সালের প্রথম দিকে মাদাগাস্কার থেকে ফরাসি নৌবহরের সাথে ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ কোচিনে আসেন। ওখানকার ওলন্দাজ শাসনকর্তা ওদের ভালভাবে অভ্যর্থনা করেন যদিও এতজন ফরাসি শহরে এসেছে শুনে একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। মার্তাঁ বলেছেন যে পর্তুগিজরা দুর্গ তৈরি করে শহরকে অনেক বড় ও ধনী করে দেয়। শহরটা সুন্দরভাবে তৈরি, গির্জা ও অন্যান্য বাড়িগুলি ভাল করে বানানো। রেনফোর্ট,

যিনি মার্তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, বলছেন যে বন্দরটি বড় ও বাড়িগুলি পর্তুগিজ ধরনে সাদা পাথর ও টালির ছাদ দিয়ে করা। সব বাড়িরই উচ্চতা সমান। উনি বলছেন যে ওলন্দাজরা অর্ধেক শহর ধ্বংস করেছে! পর্তুগিজরা তেইশটা গির্জা তৈরি করেছিল যার মধ্যে মাত্র একটা তখন দাঁড়িয়ে আছে।

মার্তাঁ বলছেন যে পর্তুগাল এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যে ইউরোপে পর্তুগাল ও ওলন্দাজদের শান্তিচুক্তি হবার পর আক্রমণ করা হয়েছিল। মার্তাঁ অবশ্য এর ইতিহাস জানতেন না। ১৬১৮ সালে কোচিনের রাজা পর্তুগালের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন হবার জন্য ওলন্দাজদের ডাকেন। কিন্তু তারা তখন আসেনি। মার্চ ১৬৬২ সালে ওলন্দাজরা কোচিন আক্রমণ করলে পরাজিত হয়। হল্যান্ড ও পর্তুগাল-এর মধ্যে চুক্তি হয় ৬ আগস্ট ১৬৬১। এটা ছাপানো হয় ইউরোপে ১৪ ডিসেম্বর ১৬৬২ সালে। এটা পূর্ব দিকে ছাপানো হয় ১৪ মার্চ ১৬৬৩। শর্ত একটা ছিল যে ছাপানোর পর শান্তি হবে। যেহেতু ওলন্দাজরা কোচিন জয় করেছিল ৭ জানুয়ারি ১৬৬৩ সালে, সুতরাং তারা ওই প্রতিবাদ মানেনি। মার্তাঁ বলছেন যে বলপ্রয়োগ না করলে এই ধরনের প্রতিবাদে কিছু হয় না। ওলন্দাজরা জায়গাটিকে সুরক্ষিত করার জন্য শহরের চারপাশে দেওয়াল দেয় যার মধ্যে শহরতলিগুলিও ছিল। এর মধ্যে নয়টি বুরুজ ছিল। মার্তাঁ যখন এসেছেন তখন তিনি দেখেছেন শহরের অর্ধেকটায় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তখনও দেওয়ালের কাজ চলছিল। রেনফোর্ট বলেছেন যে ওলন্দাজরা পাহাড় থেকে পাথর কেটে লাল পাথরের দেওয়াল করছিল। মার্তাঁ বলছেন যে এর ফলে শহরটি সুরক্ষিত হয়ে যাবে। নদীটা উত্তর দিকের দেওয়াল অবধি চলে গিয়েছিল। ওখানে জোয়ারের সময় দশ বা বারো ফুট জল থাকে। জায়গাটি স্বাস্থ্যকর, বাতাসও ভাল কিন্তু খাবার জল ভাল নয়। এই জল খেয়ে লোকের পা ফুলে যায়। অন্যান্য খাবার জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়। রেনফোর্ট বলছেন যে ওলন্দাজরা কুয়োর জল খায়, যেটি মোটামুটি ভাল। উনি খাবারের যা দাম দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানকার রুটি ও মাংস সস্তা। ১৫৮৩ সালের পর ফিচ বলেছেন যে এখানে খাবার পাওয়া যাচ্ছিল না। এটা হতে পারে যে তখন পর্তুগিজরা সিংহলে খাবার পাঠাচ্ছিল এখান থেকে। মার্তাঁ বলেছেন যে খাবার প্রচুর পাওয়া যায় এবং সস্তা, যদিও জাহাজের উপর থেকে যে খাবার তাঁরা কিনেছিলেন তার দাম বেশি। ওলন্দাজরা স্থানীয় ক্যাথলিকদের দিয়ে দুর্গ তৈরি করাচ্ছিল এবং সেজন্য তারা একটা গির্জাতে ক্যাথলিকদের ধর্ম পালন করতে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা এটা বাতিল করে দেয় অন্তত শহরের মধ্যে। এখানে প্রচুর গোলমরিচ পাওয়া যায় যদিও ওলন্দাজরা যতটা পাবে ভেবেছিল, ততটা পায়নি।

কোচিন এই রকম ভাবেই চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজরা ওলন্দাজদের হঠিয়ে কোচিন দখল করে।

১৪

গোলকুণ্ডা

বর্তমান কালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হারুণ খান শেরওয়ানি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের তুর্কমান রাজ্যের সুলতান কুলিকে গোলকুণ্ডার প্রথম নায়ক বলে অভিহিত করেছেন। সুলতান কুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে মাহমুদাবাদ-বিদরে আসেন। উনি কুতুব-উল-মুল্ক উপাধি নেওয়ার আগে খাওয়াস খান হামদানি নামে পরিচিত ছিলেন। তেলেঙ্গানার গোলমালের কারণে উনি ওখানকার তরফদার হন। গোলকুণ্ডার দুর্গও ওঁর অধীনে দেওয়া হয়। কোন তারিখে উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে গোলকুণ্ডা রাজ্য শুরু করেন এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ ১৫১২ সালে ওই স্বাধীনতা হয়েছিল বলে ধরেছেন। কিন্তু গোলকুণ্ডা দুর্গের বাইরে জামা মসজিদ-এর শিলালেখতে বাহমনি রাজা মাহমুদ শাহর নাম পাওয়া যায়। এর ফলে কেউ কেউ মাহমুদ শাহ-র মৃত্যুর সময় (১৫১৮ সাল) ওই স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেছেন। কিন্তু ফেরিস্তা ছাড়া আর কোনও সমকালীন লেখক রাজকীয় পদ গ্রহণ করার উল্লেখ করেননি। একটিমাত্র ইতিহাসে বলা হচ্ছে যে সুলতান কুলি সিংহাসনে বসেছিলেন, কিন্তু তিনি বাহমনি রাজার প্রতি অনুগত ছিলেন। এর থেকে মনে হয় যে উনি রাজার মতো আচরণ করলেও, বাহমনির আনুগত্য সরকারিভাবে অস্বীকার করেননি। বাহমনিদের কাছে উনি ছিলেন *বড়ে মালিক*। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বাহমনি সাম্রাজ্য ভেঙে যাচ্ছিল। বিজাপুরের শাসক স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। সুলতান কুলি গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে ওয়ারাঙ্গল পর্যন্ত জায়গা শাসন করতেন প্রায় স্বাধীন ভাবেই।

বিজয়নগর, বাহমনি ও বিজাপুরের রাজাদের সঙ্গে দশ বছরের বেশি যুদ্ধ করে যখন ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান কুলি তাঁর ছেলের হাতে খুন হন, তখন তেলেঙ্গানা রাজ্য গোলকুণ্ডা থেকে মসুলিপত্তম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। শিয়া মতবাদ রাজ্যে তখন কিছু ঢুকেছে। অবিরাম যুদ্ধের মাঝে সুলতান কুলি বাড়ি বা সৌধ বিশেষ করতে পারেননি। গোলকুণ্ডা দুর্গের বালাহিসার দরওয়াজার বাইরে তিনি যে মসজিদটি তৈরি করেছিলেন, সেটি আছে। গোলকুণ্ডা দুর্গের দেওয়াল উনি শক্ত করে দেন। সাধারণত বলা হয় যে আগে এখানে একটা পুরনো কাকতিয় দুর্গ ছিল কিন্তু সুলতান কুলি এর নাম দেন গোলকুণ্ডা যেটি তেলেগু শব্দ গুলেরু বা মেষপালক থেকে

এসেছে। প্রবাদ আছে যে একটি মেষপালক তাঁকে ওই জায়গা দেখিয়ে দেন। কিন্তু সমকালীন ইতিহাসে দেখা যায় যে সুলতান কুলি এই দুর্গের নাম দিয়েছিলেন মুহম্মদনগর। মেষপালকের এটা দেখানোর কোনও দরকার নেই কারণ সুলতান কুলি আসার আগেই পুরনো দুর্গ ও তার কেন্দ্রের বালাহিসার-এর চূড়া বহুদূর থেকে দেখা যেত। এ ছাড়াও বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ছিল দুর্গের দেওয়াল। সমকালীন ঐতিহাসিকরা সুলতান কুলির প্রাসাদের বা তাঁর অভিজাতদের বাড়িগুলির প্রশংসা করে গিয়েছেন যার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। সুলতান কুলি তাঁর অভিজাতদের আদেশ দিয়েছিলেন দুর্গের মধ্যে বাড়ি বানাতে। কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য তিনি একটা বড় বাজার বসান যেটা দুর্গের বালাহিসার দরওয়াজা থেকে ফৎ দরওয়াজা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওখানে পুরনো যুগের সৌধের কিছু চিহ্ন আছে। কাহিনী আছে যে জামা মসজিদের পাশে সুলতান কুলি একটা বড় হাম্মাম তৈরি করেছিলেন যেখানে বিনা খরচে লোকেরা স্নান করতে পারত। অবশ্য গোলকুণ্ডার স্থাপত্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য—পারসিক, হিন্দু ও পাঠান শৈলীর মিলন—সুলতান কুলির মৃত্যুর পর এসেছে। উনি নিজের জন্য একটা সমাধিসৌধ করে যান যেটি আশেপাশের সমাধির থেকে বড়। এটি বাহমনি স্থাপত্যশৈলীতে গড়া। এতে যে শিলালেখ আছে তাতে ওঁর নাম পাওয়া যায়। মৃতদেহ স্নান করানোর জন্য দুটি হাম্মাম পাওয়া যায়—একটি সুলতান কুলির সমাধিসৌধের কাছে ও অন্যটি বালাহিসার দরওয়াজার মধ্যে। এগুলি ছিল প্রধানত রাজপরিবারের জন্য। এই দুটির মধ্যে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ছিল এবং নীচের নালি দিয়ে ময়লা জল বেরিয়ে যেত। দুটি হাম্মামের মধ্যেই একটা গোলাকার চবুতরা ছিল।

সুলতান কুলির মৃত্যুর পরে কিছুদিন গৃহযুদ্ধের পর ইব্রাহিম রাজা হন ১৫৫০ সালে এবং ৩১ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে বিজয়নগর বানিহাট্টির যুদ্ধে (জানুয়ারি ১৫৬৫) হেরে যায়। উনি উড়িষ্যা ও বিজাপুর আক্রমণ করে জয়লাভ করলেও ওই অংশগুলি ফেরত দিয়েছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাস *তারিখ-ই কুতুবশাহিতে* বলা হচ্ছে যে উনি প্রথম থেকে রাজকীয় সম্মান গ্রহণ করেন। ওঁর সমাধিতেও ওঁকে রাজা বলে বলা হচ্ছে। ওঁর সময়েই গোলকুণ্ডা রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল বলে বলা যায়, যদিও উনি মুদ্রা তৈরি করেছিলেন কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ইব্রাহিম দুর্গের ও শহরের দেওয়াল মজবুত করার ব্যবস্থা করলেন। বর্তমানের যে দেওয়ালটি রয়েছে এটি প্রায় ৮০০০ গজ জুড়ে এবং বর্তমান হায়দরাবাদ শহরের কাছে পর্যন্ত গিয়েছে। সম্ভবত ১৫৫৯-৬০ সাল নাগাদ এই দেওয়ালটি সম্পূর্ণ হয়। এর সঙ্গে করা হয় মাক্কি দরওয়াজা মক্কার দিকে মুখ করে। দেওয়ালে বড় আকারের ৮৭টি বুরুজ আছে যার কয়েকটি অষ্টকোণাকৃতি। একটির নাম ছিল ইব্রাহিম বুরুজ। এ ছাড়া আটটা বড় দরজা ছিল দেওয়ালের মধ্যে বুরুজ সমেত। এই দরজাগুলির সঙ্গে ধারালো লোহার খণ্ড লাগানো আছে হাতির আঘাত এড়ানোর জন্য। বুরুজগুলি ও দেওয়ালটির উচ্চতা ছিল জমি থেকে ৬৫ ফুট। এর চারপাশে ছিল জলে পরিপূর্ণ পরিখা। হায়দরাবাদের দিক থেকে আসার

পথে পড়ত ফৎ দরওয়াজা যেটি দিয়ে বিজয়ী ঔরংজেব ১৬৮৭ সালে এসেছিলেন। ভিতরে জেনানা মহল সুরক্ষিত করার জন্য আর একটি দেওয়াল ছিল। দুটি শিলালেখ থেকে দেখা যায় যে পরবর্তীকালে সংস্কার করা হয়েছিল। একটি শিলালেখতে দেখা যায় যে পশ্চিমদিকের দেওয়াল সংস্কার করা হয়েছিল ১৬২৮ সালে। অন্যটি ফৎ দরওয়াজার কাছে মুসা-বুরুজ তৈরি করার কথা বলছে। এটির সময় ১৬৫৬ সাল।

ধরে নেওয়া হয় যে দুর্গের মধ্যে বালাহিসার দরওয়াজা থেকে ফৎ দরওয়াজা পর্যন্ত যে জায়গাটি আছে (প্রায় ১২৫০ গজ), ওখানেই প্রাসাদ ছিল। বালাহিসার দরওয়াজা থেকে কিছু উপরে উঠলে একটা ছোট দরজা বোধহয় এই সময়ের চিহ্ন। এটি তৈরি হয়েছিল বালাহিসার দরওয়াজার অনুকরণে। এর মধ্যে পদ্মচিহ্ন খোদাই করা আছে এবং খিলানের ধরনটি পারসিকদের অনুকরণে করা। ফলে হিন্দু ও পারসিক শৈলীর মিশ্রণ এতে রয়েছে যাকে ইন্দো-ইরানিয়ান সংস্কৃতি বলা যায়।

সমকালীন ঐতিহাসিক রফি-উদ্দিন সিরাজি ইব্রাহিমের প্রাসাদের বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে রাজার থাকার জায়গা ছাড়া প্রাসাদে দুটি আলাদা মহল ছিল। প্রথমটি ছিল *জামাখানা* যেখানে রাজার পোশাক রাখা হত। দ্বিতীয় মহলটি ছিল দরজিদের কাজ করার জায়গা। তৃতীয়টিতে ছিলেন *স্বরনৌবত* বা রাজার দেহরক্ষীদের প্রধান। চতুর্থ মহলে কাজ করতেন বিভিন্ন কারিগররা যারা বই বাঁধাতেন, নকল করতেন, সোনার জল লাগাতেন ইত্যাদি। পঞ্চম মহলটি ছিল ঐতিহাসিকদের ও পণ্ডিতদের। শেষটিতে থাকতেন মন্ত্রীরা ও উচ্চপদস্থ আমলারা। এর থেকে সংস্কৃতির প্রতি ইব্রাহিমের অনুরাগ ও উৎসাহ বোঝা যায়। এই প্রাসাদের আর এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। ১৫৯১-৯২ সালে মুসি নদীর উপর শহর তৈরি হলে গোলকুণ্ডা কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

ইব্রাহিমের ৩১ বছর সার্থক রাজত্বকালে শুধু ভারতবর্ষের ভিতর থেকেই লোক আসেনি, মধ্য এশিয়া থেকে প্রচুর লোক এসেছিল বলে বলা হয়। এর ফলে গোলকুণ্ডার লোকসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে পাঁচিলে ঘেরা শহরের মধ্যে লোকেদের স্থান পাওয়া শক্ত হয়ে যায়। ১৫৭৮ সালে ইব্রাহিম মুসি নদীর উপর চমৎকার একটি সাঁকো করে দেন যাকে তেলেগু ভাষায় বলা হত *নারডা।* বর্তমানে একে বলা হয় *পুরানা পোল।* ৬০০ ফুট লম্বা ও ৩৬ ফুট চওড়া, এটি নদীর জল থেকে ৪২ থেকে ৫৬ ফুট উপরে। ২৩টি খিলানের উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে। মুসির জলপ্লাবন চারশো বছরে এর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

ইব্রাহিমের আর একটা বড় কাজ হল হোসেন সাগর নামে এক বিরাট জলাধার তৈরি করা। এর ব্যাসার্ধ ১১.১৬ মাইল ও এর বাঁধ ছিল এক মাইল লম্বা। এটি তৈরি করেছিলেন ইব্রাহিমের জামাই, হোসেন শাহ ওয়ালি। এর খরচ পড়েছিল আড়াই লাখ টাকার উপরে। দুটি চবুতরার উপর খিলান ছিল কিন্তু পরে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। গোলকুণ্ডার দক্ষিণ-পশ্চিমে ইব্রাহিম বাগান করেছিলেন যাকে বলে বাগ ইব্রাহিম শাহি। এটি যমজ টিলা বা যেখানে ভারামতির বরাদরি আছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছিল। ওখানে একটা মসজিদও করেন। এর পশ্চিমে কতকগুলি প্রাসাদের

ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। এ ছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয় করে দেন যেখানে বিনা পয়সায় তারা পড়তে পারত এবং খাবার ও কিছু টাকা পেত।

তাঁর নিজের সমাধিসৌধ ছিল একটা উঁচু চবুতরার উপর তৈরি। জমি থেকে একতলার উচ্চতাই ছিল ৩৬ ফুট। দুদিকে পাঁচটি করে খিলান আছে। একসময় এই অষ্টকোণ সমাধিসৌধ বিভিন্ন ধরনের টালি দিয়ে ঢাকা ছিল যার কয়েকটা এখনও দেখা যায়। এ ছাড়াও, ওঁর সময়ের অন্তত তিনটি মসজিদ দেখা যায়। একটি গোলকুণ্ডার দুর্গের মধ্যে বালাহিসার-এর উপরে, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দুটি গোলকুণ্ডা দুর্গের সংলগ্ন নতুন দুর্গের মধ্যে। এই দুর্গটি ১৬৫৬ সাল নাগাদ আবদুল্লা কুতব শাহ তৈরি করেন বলে বলা হয়। কিন্তু মসজিদ দুটির শিলালেখ থেকে দেখা যায় যে এ দুটি ইব্রাহিম-এর সময়েই তৈরি হয়েছিল। প্রথমটি ১৫৬১-৬২ সালে তৈরি হয় এবং মুস্তাফা খানের মসজিদ নামে বিখ্যাত। একটা উঁচু চবুতরার উপর গ্রানাইট পাথর দিয়ে এটা তৈরি যার ভিতরে একটা উঠোন ও একটা প্রার্থনাসভা আছে। এর মধ্যে ইব্রাহিমের মন্ত্রী মুস্তাফা খানের দুই ছেলের কবর আছে। বানিহাট্টি যুদ্ধের পর মুদগল-এর দুর্গ আলি আদিল শাহকে দিয়ে দিলে মুস্তাফা খানকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আলি আদিল শাহ ওঁকে মির জুমলা পদে নিয়োগ করেন। পরের মসজিদটি তৈরি হয় ১৫৭০ সালে। এটি তৈরি করেন মুল্লা খিয়ালি যিনি তেলেঙ্গানার দাখনী কবি ছিলেন। এর মধ্যেও শিলালেখ আছে।

১৫৮০ সালে ইব্রাহিম মারা গেলে তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে তৃতীয় পুত্র মহম্মদ কুলি সম্ভবত প্রাসাদ রাজনীতির মধ্যে দিয়ে সিংহাসন পান। এঁর মুদ্রার মধ্য দিয়েই দেখা যায় যে কবে রাজধানী হায়দরাবাদে সরিয়ে আনা হয়েছিল। তৃতীয় মুদ্রায় (১৬০৩-৪ সাল) আছে দার-উল সুলতানাত হায়দরাবাদ। এর আগের দুটি মুদ্রাতেই কলকুণ্ডা কথাটি রয়েছে।

মুহম্মদ কুলির প্রধান কাজ বোধহয় নতুন শহর পরিকল্পনা করে তৈরি করা। মুসি নদীর দক্ষিণ পারে এই শহরের নাম দিয়েছিলেন হায়দরাবাদ বা হায়দার-এর শহর। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইব্রাহিম-এর রাজত্বকালেই গোলকুণ্ডার জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম প্রথমে গোলকুণ্ডাকে বাড়াতে চাইছিলেন উত্তর ও পশ্চিমে। এই জন্যই হয়তো তিনি বাগ ইব্রাহিম শাহি তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে কয়েকটি বাড়ি ছিল। কিন্তু ওই জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা বলে জলের কষ্ট ছিল, ফলে এই পরিকল্পনা বেশিদূর এগোয়নি। পূর্ব দিকে মুসি নদী সাধারণত ছোট নদী হলেও বর্ষাকালে দুপাশের জমি জলে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু পুরনো পোল তৈরি হবার পর নতুন শহর তৈরি হবার পক্ষে বাধা রইল না।

১৫৯০-৯১ সালে নতুন শহরের পরিকল্পনা ঠিক হয়ে যায়। কাহিনী আছে যে রাজা শিকার করতে গিয়ে মুসি নদীর পারের সমতল জমি দেখে খুশি হন। ঐতিহাসিকরা এ কাহিনীর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নতুন শহরটি গিরিডন প্রথায় তৈরি, অর্থাৎ বিরাট একটি ক্রশ-এর মতো দেখতে। গোলকুণ্ডা থেকে পুবে একটা রাস্তা আগেই ছিল মসুলিপত্তম পর্যন্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা বড় রাস্তা করে ওই রাস্তাকে ভাগ করেছে। সংযোগস্থলটিতে চারমিনার অবস্থিত।

চারমিনার শেষ হয় ১৫৯১-৯২ সালে। উত্তরের পথটি মুসি নদী পর্যন্ত গিয়েছে আফজল সাঁকোর ধার পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকে পথটি চলে গিয়েছে সোজা কোহ্-ই তুর বা বর্তমানের ফালাকনামা দুর্গ পর্যন্ত। চারমিনার-এর প্রায় আশি গজ দূরে একটা বড় চক আছে, যাকে জিলুখানা বলা হয়। এখন এটিকে *চার কামান* বলে। এর চারিদিকে চারটি খিলান আছে। এই চারটি পথের একটি ধরে গেলে পশ্চিম দিকে রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। প্রাসাদটি হাজার গজ জায়গা নিয়ে করা এবং মুসি নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েছে। বড় চকটির মাঝখানে একটা বড় ফোয়ারা আছে যাকে বলা হয় *চারস্ত-কা হাউস।* শহরের চেহারা পরিষ্কার হয়ে গেলে রাজা চোদ্দ হাজার দোকানঘর করবার আদেশ দেন রাস্তাগুলির দুপাশে। এ ছাড়া ছিল বিদ্যালয়, মসজিদ, সরাইখানা ইত্যাদি।

চারমিনার তৈরি করার কারণ হিসেবে নানা মতামত দেওয়া হয়েছে। একটা মত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ছিল যে এটি ইমাম হোসেনের তাজিয়ার অনুকরণে তৈরি। বলা হয় যে আগে ওখানে তাজিয়া করা হয়েছিল। কিন্তু এর কোনও ভিত্তি ঐতিহাসিক শেরওয়ানি খুঁজে পাননি। আর একটা মত বলা হয় যে এটি ওই বড় চকের দরজা। প্রাসাদটি যেহেতু চকের সামনে, সেহেতু এটিকে দরজা বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এটিও ঠিক নয়, কারণ আসল প্রাসাদটি চারখিলানের পরে।

মুহম্মদ কুলির স্থাপত্যবিশারদরা পুরনো ও নতুন শহরের ছক ধরেই করেছেন। সুলতান নিজে একজন শিল্পী ছিলেন এবং উনিই শহরের কেন্দ্রস্থল ঠিক করেছিলেন। পরবর্তীকালে চারমিনার থেকে নানান রাজকীয় আদেশ প্রচার করা হত। *জিলুখানা,* যেখানে চার খিলান রয়েছে, আগে সৈন্যবাহিনীর এলাকা ছিল। এর পশ্চিম দিকের দরজা, যাকে বলা হত *শের-ই আলি দরওয়াজা,* প্রাসাদের পূর্ব দরজার সামনে ছিল। বাকি তিনটি খিলানকে বলা হত *ত্রিপলিয়া।* মনে রাখতে হবে যে এই সময়ে বাড়ির প্রবেশপথে উঁচু খিলানযুক্ত দরজা করার রেওয়াজ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে। ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা তৈরি হয়েছিল হায়দরাবাদের আগেই। গোলকুণ্ডা দুর্গের বালাহিসার দরওয়াজার কথা বলা হয়েছে।

পূর্ব দিকের খিলানকে বলা হচ্ছে *কালি কামান।* এখানেই রাজার সঙ্গীতজ্ঞরা দিনে পাঁচবার বাজনা বাজাত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজাগুলি সৈন্যরা পাহারা দিত। পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে প্রাসাদের ভিতরে যাওয়া যেত। প্রথমে পড়ত আর একটি দরজা যার পাথরের খাঁচা ছিল ৬০ ফুট উঁচু ও ৩৬ ফুট চওড়া। দরজাটি ছিল এবনি কাঠের ও তার মধ্যে সোনার পেরেক ও বহুমূল্য রত্ন বসানো ছিল। এই দরজার খিলান থেকে একটা পরদা ঝুলত যেটি সোনা বসানো এবং যার ফলে প্রাসাদের ভিতরে কিছু দেখা যেত না। পরবর্তীকালে এই দরজার নাম বদলে বলা হত *কামান সির-ই বাতিল।* চকের চারপাশে নানা ধরনের গাছ লাগানো হয়েছিল রাজার আদেশে।

এই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমে পাওয়া যায় প্রায় হাজার গজের মতো চৌকো জায়গা যেখানে বাড়ি, পুকুর, বাগান ও ফোয়ারা ইত্যাদি আছে। এর মধ্যে যে প্রাসাদটি সব থেকে পুরনো ছিল, যাকে দাদ মহল বলা হত, ছিল নয়তলা উঁচু। বলা

হয় যে সুলতান নিজে ওখানে বসে বিচার করতেন। এই প্রাসাদের একদিক দিয়ে প্রধান রাস্তা দেখা যেত।

কামান সির-ই বাতিল দিয়ে ঢুকলে প্রথমে পাওয়া যায় দপ্তরখানা, তারপর *জামাদারখানা* (কাপড়চোপড়ের) এবং অন্যান্য কারখানাগুলি। জায়গাটির উত্তর দিকে আর একটি বড় দরজা ছিল যার কাছে ছিল বড় একটা চবুতরা। এটিতে বসত সৈন্য, মাহুত, লেখক ইত্যাদি ধরনের লোকেরা। এর পরের বাড়িকে বলা হত *লাল মহল* বা লাল রং-এর প্রাসাদ। এটাই ছিল রাজার আমলাদের জায়গা। এর পরে ছিল *চন্দন মহল* বা চন্দন কাঠের বাড়ি, যার পরে ছিল *সজন মহল,* যেখানে তুর্কি, আরব ও দাখনী সৈন্যরা পাহারা দিত। এই প্রাসাদের শেষ অংশটি ছিল পণ্ডিত, ধর্মীয় ব্যক্তি ও যাদের প্রতি রাজার বিশ্বাস আছে, এরকম লোকেদের জন্য। এর পূর্ব দিকে ছিল একটা বড় চবুতরা প্রায় একশো গজ লম্বা যেখানে প্রাসাদের লোকেদের খাবার দেওয়া হত।

রাজপরিবার সবথেকে বড় প্রাসাদ ব্যবহার করতেন যার নাম ছিল *খুদাদাদ মহল।* এটি তৈরি হয় ১৬১০ সালে রাজার মেয়ের বিবাহের পর। প্রাসাদটি ছিল সাত বা আটতলা উঁচু। এর মধ্যে *হায়দার মহলই* ছিল সব থেকে জমকালো। বলা হয় যে এর ছাদের ভিতরের দিকে ও স্তম্ভগুলিতে বহুমূল্য রত্ন লাগানো থাকত। প্রাসাদটি তৈরি হলে রাজা অভিজাত ও অন্যান্য পণ্ডিতদের খিলাৎ দেন। এ ছাড়া মুহম্মদ কুলি তিনটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে দুটি ছিল পাহাড়ের উপর ও অন্যটি *নদী মহল,* মুসি নদীর দক্ষিণ পারে ছিল। পাহাড়ের উপরের বাড়ির চারপাশে উনি বাগান করেছিলেন যাকে বলা হত *নবৎ ঘাট,* যেটিকে পরে *বাগ-ই দিলখুসার* সঙ্গে যোগ করিয়ে দেওয়া হয়। পুরো জায়গাটাকে বলা হত *বশির বাগ* বা *বাগ-ই আম।* ফৎ ময়দান ও পরবর্তীকালের রেসিডেন্সি বাড়ি এর মধ্যে পড়ত। সব মিলিয়ে জায়গাটা ছিল নয় মাইল।

চারমিনারের দুই মাইল দক্ষিণে একটা টিলার উপর উনি একটা বাড়ি করেছেন যার মধ্যে ছিল চারটে বড় হলঘর ও একটা চবুতরা পুকুর সমেত। এর নাম দেওয়া হয় *কোহ-ই তুর* এবং এটা ছিল শহরের বাইরে। এর উপরেই পরে ফালাকনামা দুর্গ করা হয়। নবৎ ঘাট থেকে কোহ-ই তুর পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই বাগানে ভর্তি ছিল। বাড়ির ছাদেও বাগান করা হয়।

গোলকুণ্ডা থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়েছিল ইব্রাহিম-এর পুলের উপর দিয়ে তার দুপাশে ছিল দোকান। উনি একটা জামা মসজিদ তৈরি করে দেন শহরে ১৫৯৭-৯৮ সালে যার মধ্যে সুন্দর শিলালেখ দেখা যায়। এই মসজিদে সাতশো মতন লোক ধরত ফলে বলা যায় যে নতুন শহরের জনসংখ্যা তখন পর্যন্ত বেশি হয়নি। দুটি বড় স্তম্ভ দুটি হলঘরকে ধরে রেখেছে। এর আগে তিনি আর একটি ধর্মীয় বাড়ি তৈরি করেছিলেন যাকে বলা হত *বাদশাহি অসুরখানা।* এর মধ্যে ইমাম হোসেনের নিশানের ধরনের নিশান রাখা হয়েছিল। যেহেতু কুতুব শাহি ছিলেন শিয়া, সে জন্য এই বাড়ির ধর্মীয় গুরুত্ব ওঁদের কাছে ছিল অপরিসীম। পরবর্তীকালে এর অনেক সংস্কার করা হয়েছিল। ভিতরের শিলালেখ থেকে এর তারিখ জানা যায়। এর

মধ্যে প্রচুর এনামেল করা টালির ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৫৯৫-৯৬ সালে মুহম্মদ কুলি একটা সাধারণের জন্য হাসপাতাল তৈরি করেন যাকে বলা হত *দারুষ সিফা।* ভিতরের উঠোনটি ছিল ১৭৫ ফুট চৌকো যার ফলে পুরো জায়গাটা প্রায় পঁচিশ হাজার স্কোয়ার ফুট। একটি ছিল দোতলা। এটি হাসপাতাল ছাড়াও ছিল উনানি চিকিৎসার বিদ্যালয়। অভিজ্ঞ হাকিমরা বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন ও ছাত্রদের পড়াতেন। অসুস্থ লোকেরা বিনা পয়সায় থাকতে পারত। যারা শিক্ষা নিত, তাদেরকে হাতখরচ দেওয়া হত সরকার থেকে এবং পাশ করার পর চাকরি দেওয়া হত। উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা মসজিদ ছিল যেটি এখনও আছে। কিন্তু সংলগ্ন হাম্মামটি আর নেই। সরাইখানাটি বর্তমানে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসকদের মধ্যে অন্তত দুজন চিকিৎসার উপর বই রেখে গেছেন।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল যার মধ্যে সরাই নিয়ামতউল্লা উল্লেখযোগ্য। ১৬৬৬ সালে ফরাসি পর্যটক থেভনো এখানে ছিলেন যার বর্ণনা আমরা পরে দেখব। এ ছাড়াও বড় বড় মসজিদের সঙ্গে সরাইখানা ও হাম্মাম ছিল।

১৫৯১ সালের আগে যখন পর্যটক র‍্যালফ ফিচ গোলকুণ্ডাতে আসেন, তখনও হায়দরাবাদ তৈরি হয়নি; পরিকল্পনা শেষ হয়েছে মাত্র। উনি পুরনো গোলকুণ্ডা শহরকে বলেছেন ভাল শহর। বাড়িগুলিও ভাল, কাঠ ও ইট দিয়ে করা। পানীয় জল ও তাজা ফল প্রচুর পাওয়া যায়। এখান থেকে আট দিনের পথ গেলে বন্দর মসুলিপত্তম পাওয়া যায় যেখান থেকে মশলাভর্তি জাহাজ ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, পেগু ও সুমাত্রাতে যায়। চারপাশের গ্রামাঞ্চলে ফসল হয়। এখানে হিরে পাওয়া যায়।

সুলতান মুহম্মদ কুতুব শাহ সিংহাসনে বসেন ১৬১২ সালে এবং মারা যান ১৬২৬ সালে। উনি একদিকে মোগল ও অন্যদিকে মালিক অম্বরকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। বাড়ি তৈরি করার চাইতে ওঁর ঝোঁক বেশি ছিল সাহিত্যের প্রতি। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সৌধ তিনি করেছিলেন তাকে বলা হয় মক্কা মসজিদ। এর থেকে মনে হয় যে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি বেড়ে যাওয়ায় ছোট জামা মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। মসুলিপত্তম বন্দরের বাণিজ্য ও রাজ্যে শান্তি থাকায় জনসমাগম বাড়ছিল এতে সন্দেহ নেই। ১৬১৪ সালে এই মসজিদ তৈরি করা শুরু হয় এবং শেষ হয় বহু বছর পরে ১৬৯২-৯৩ সালে যখন হায়দরাবাদ মোগলদের হাতে চলে গিয়েছে। একটা শিলালেখ থেকে এই তারিখ জানা যায়। মসজিদের প্রার্থনাঘরটি ২২৫ ফুট লম্বা ও ১৮০ ফুট চওড়া। উচ্চতায় ৭৫ ফুট। পনেরোটি ভাগে এটি বিভক্ত এবং খিলানযুক্ত স্তম্ভের উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে। উপরে গম্বুজ আছে কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় না। নানাধরনের কাহিনী এই মসজিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বোধহয় জনসংখ্যা বেড়ে যাবার জন্য সুলতান একটি নতুন শহর বসানোর পরিকল্পনা করেন পূর্ব দিকের পথে চারমিনার থেকে ছয় মাইল দূরে। এর নাম দিয়েছিলেন সুলতান নগর। পরিকল্পনা করা হয়েছিল গোলকুণ্ডার ধাঁচে—একটা ভাগে শহর থাকবে ও অন্য ভাগে প্রাসাদ। প্রাসাদ এলাকা গভীর পরিখা দিয়ে

আলাদা করা হয়েছিল। পরিখার পরে ছিল ষাট ফুট উঁচু দেওয়াল। পরিখার কিছু অংশ বর্তমান আছে কিন্তু দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে। প্রাসাদের বাইরে ছিল শহর যার মধ্যের তিনটি সৌধ এখনও বর্তমান। একটি হল বড় মসজিদ যার উঁচু মিনারগুলি বহুদূর থেকে দেখা যায়। মাঝখানের খিলানের তিনদিকে তিনটি বড় খিলান রয়েছে। সামনে বড় উঠোনে জলাধার ও ফোয়ারা রয়েছে। পাশে অনেকগুলি ঘর সমেত একটা বড় বাড়ি আছে যাকে লাইব্রেরি বলা হয়। এর এক মাইল পূর্বে একটা বড় দরজা আছে যাকে বিদার দরওয়াজা বলা হয়।

বাইশ গজ চওড়া শহরের দেওয়াল ভেঙে গেলেও কয়েক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদটি ছিল দোতলা। বহু ধরনের ঘর ছিল বারো ফুট মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রতিটি তলার ছাদ ছিল খিলান করা যার কোনও কাঠের জোর ছিল না। প্রাসাদের ঠিক বাইরে একটা বড় বাড়ি ছিল যাকে *জিলুখানা* বলা যায়। এটি ছিল রাজার দেহরক্ষীদের জায়গায়। পরিকল্পনা ছিল যে এই শহরেও যেখানে চারটি রাস্তা সংযোগ করবে, সেখানে একটা চারমিনার তৈরি করা হবে। কাজ চলবার সময়ে রাজা মারা গেলে আবদুল্লা এ শহরটিতে যেতে রাজি হন না। ফলে এটির কাজও আর এগোয়নি। এখন অবশ্য এর সব ইট, পাথর, কাঠ খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ফলে তিনটি বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকী মসজিদের ইটও খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আর একটি মসজিদ আছে যাকে *খইরিতিবাদ মসজিদ* বলে। এটি তৈরি করেছেন সুলতান মুহম্মদ-এর মেয়ে খইরুতিন্নিসার গৃহশিক্ষক মোল্লা আবদুল মালিক। তিনটি খিলানযুক্ত প্রার্থনাঘরটি ছোট। মসজিদের সামনের দেওয়ালে ইটের কারুকার্য করা। ছাদটি কুতুবশাহি ধরনে তৈরি। এর সঙ্গে উত্তরের দিকে মোল্লা আবদুল মালিক তাঁর নিজের সমাধি করেছিলেন। কিন্তু মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়াতে এই আশা পূর্ণ হয়নি। এখান থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথের ধারে রয়েছে এক বড় জলাধার যাকে বলা হয় *মান সাহিব কা তালাও*। আগে এর দুধারে দুটি মিনার ছিল যার থেকে দেখা যায় যে এটি ১৬২৫ সালে তৈরি। পুকুরটি বর্তমানে ভর্তি করে বাড়ি করা হয়েছে। এ ছাড়াও কয়েকটি মাদ্রাসা, সরাইখানা, হাম্মাম ইত্যাদির চিহ্ন পাওয়া যায়। সুলতানের সমাধিটি আছে। এর বাইরের দেওয়ালে রং করা পারসিক টালি লাগানো আছে। থেভনোর বর্ণনা আমরা পরে দেখব।

আবদুল্লা কুতুব শাহ ১৬২৬ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১৬৭২ সালে মারা যান। গোলকুণ্ডার ইতিহাসে এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মোগলদের আগ্রাসী ভূমিকার ফলে ১৬৭৬ সালে আবদুল্লা হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করে গোলকুণ্ডা দুর্গে আশ্রয় নেন। ওই বছর মুহম্মদ সৈয়দ মির জুমলা কুতুবশাহিদের কাজ ছেড়ে মোগল দিকে যোগদান করলে মোগল আক্রমণ শুরু হয়। কিন্তু গোলকুণ্ডার দুর্গে সুলতান থাকতে আরম্ভ করলে গোলকুণ্ডা শহর উন্নত হতে শুরু করে। হায়দরাবাদের মধ্যে ও কাছাকাছি আবদুল্লা কয়েকটি সৌধ তৈরি করলেও এখন আর সেগুলো নেই।

সিংহাসনে বসার পর আবদুল্লা বাদশাহি অসুরখানার কিছু সংস্কার করেন যা

আমরা জানতে পারি ভিতরের শিলালেখ থেকে। উনি যখন সিংহাসনে বসেন, তখন ছিলেন অ-প্রাপ্তবয়স্ক এবং ওঁর মা হায়াত বক্সি বেগম কাজ চালাতেন। হায়দরাবাদের দশ মাইল পূর্বে ও সুলতাননগরের দুই মাইল পূর্বে হায়াত একটা ছোট শহর প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে হায়াৎনগর বলা হত। এটি তৈরি শুরু হয় ১৬২৫-২৬ সালে। ১৬৩২ সালে সুলতান প্রাপ্তবয়স্ক হলে এখানেই উৎসব করা হয়। এর প্রাসাদটি এখন বড় ঢিপিতে ঢেকে আছে যার মধ্যে ছিল মাটির নীচের ঘর যাকে তাল-মাকান বলা হত। গরমের দিনে থাকার জন্য এই ধরনের ঘরের রেওয়াজ ভারতভূখণ্ডে ছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এর কাছাকাছি ছিল রাজার বাগান, যাকে খাস বাগ বলা হত। এর কাছে রয়েছে বড় একটা মসজিদ ১৫০ ফুট জমির উপরে করা। সম্পূর্ণ এলাকা ধরলে প্রায় বিশ হাজার স্কোয়ার গজ হবে। মসজিদের সামনে খিলান দেওয়া ছিল। এ ছাড়া ছিল দুটি মিনার যেগুলি বহুদূর থেকে দেখা যেত। মসজিদের চারপাশ ঘিরে ছিল ১৪৫টি ঘর ও বারান্দা। এগুলি ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ঘর ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা বড় চৌকো কুয়ো আছে যাকে হাতি বাতলি বলা হয়। হাতি ও বলদের সাহায্যে পুলি দিয়ে এখান থেকে জল তোলা হত। জলটি একটা জলাধারে নিয়ে যাওয়া হত যার থেকে খাস বাগের বিভিন্ন জায়গায় মাটির নালির সাহায্যে পাঠানো হত। পুরনো পোল থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথে কতকগুলি মসজিদ পাওয়া যায় যেগুলি আবদুল্লার সময়ে তৈরি হয়েছিল। এই সময়কার মসজিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সামনের দিকে দুটি মিনার আছে।

গোলকুণ্ডা দুর্গে ঢুকতে গেলে দুটি সৌধ পড়বে। একটা বড় ছত্রি ও অন্যটি একটা মসজিদ। ছত্রিটিকে বলা হয় তারামাতির বরাদরি, শিয়া আদর্শকে তুলে ধরেছে প্রতীক হিসেবে। জমি থেকে ১৫০ ফুট উঁচু, এখানে যেতে গেলে পাঁচটি ধাপ বেয়ে উঠতে হয়, যার পর একটা চবুতরা পাওয়া যায়। আরও বারোটি ধাপ উঠে আর একটা ছোট চবুতরায় পৌঁছাতে হয়। আর একটা চবুতরা ও আরও কয়েকটি ধাপ উঠে ও নেমে বরাদরিতে পৌঁছাতে হয়। বারোটি খিলানযুক্ত সৌধটি অষ্টকোণাকৃতি। এর বিপরীত দিকে পেমামতির মসজিদ। এটিও ১৫০ ফুট উঁচু। এখানে কোনও ধাপ নেই, ধীরে ধীরে উঁচুতে গেলে একটা বারো খিলানের চবুতরা পাওয়া যায়। মসজিদটি সম্পূর্ণ করা হয়নি এবং এর কোনও মিনার নেই।

১৬৫৬ সালের মোগল আক্রমণের পর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করা হয়। দুর্গের দক্ষিণ দিকে শক্ত বুরুজ দিয়ে জোরদার করা হয়। এরপর চারপাশে গভীর পরিখা কাটা হয় এবং একটা নতুন দুর্গ বা *নয়াকিল্লা* তৈরি করা হয়। এটি উত্তর-পশ্চিম দিকের উঁচু টিলাকে বেষ্টন করেছিল কারণ এই উঁচু টিলার উপরেই ঔরংজেব কামান বসিয়েছিলেন। ১৬২৯ সালেই পশ্চিম দিকের দেওয়াল জোরদার করা হয়েছিল যা একটি শিলালেখ থেকে দেখা যায়।

উত্তর-পশ্চিম দিকের বুরুজটিকে বলা হত *মুসা বুরুজ।* এটি দশকোনা যদিও বাইরে থেকে মাত্র ছয়টি দেখা যায়। এটি তিনতলা এবং বড় বড় পাথর জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এক-একটি পাথরখণ্ডের ওজন প্রায় এক টন। মাটির থেকে এটি ষাট ফুট উঁচুতে এবং কামান বসানো। ভিতরে তেলেগু ও ফারসি

শিলালেখতে ১৬৫৬ সালের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। যুদ্ধে মোগল সেনাপতি মির-ই মিরন মারা গিয়েছিলেন তারও উল্লেখ আছে।

দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল নয়া কিল্লা। পুরনো ও নতুন দুর্গের মধ্যে একটাই দেওয়াল ছিল মোতি দরজা ও জামালি দরজার মধ্যে। এটি জোরদার করা হয়েছিল কতকগুলি নতুন বুরুজ তৈরি করে। আবদুল্লার সময়ের কিছুই প্রায় আর নয়া কিল্লায় নেই একটা বাগান ছাড়া, যাকে বলা হত *বাগ নয়া কিল্লা।* একটা সুন্দর নালি দিয়ে বড় কুয়ো থেকে জল আনা হত। বড় কুয়ো থেকে জল আসত ছোট একটা কুয়োতে যার সামনে ছিল একটা চবুতরা (নাম : *দলবাদল চবুতরা*)। মোগল ছকমাফিক এই বাগান তৈরি করা হয়েছিল। এর মাঝখানে ছিল একটা বড় কুয়ো ও একটা ছত্রি। আর একটা ছত্রি ছিল নালির মাঝখানে।

পুরনো দুর্গে দুটি শিলালেখ পাওয়া যায় আবদুল্লার সময়ের যদিও সন্দেহ করা হয় যে ওগুলি ওখানে ছিল কিনা। একটি ১৬৪২ সালে বালাহিসার যাবার পথে অম্বরখানা বা গুদাম তৈরি হবার কথা বলছে। অন্যটি মুসা বুরুজে কয়েকটি দোকান, একটা কুয়ো ও গাছের গুচ্ছর কথা বলছে।

দুর্গের মধ্যে আর একটি সৌধ ছিল শিলালেখ সমেত। এটি হিরা মসজিদ; আকারে বড় নয় কিন্তু উঁচু দেওয়াল দিয়ে ছাত্রদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা ছিল। তিনটি খিলানের মধ্য দিয়ে প্রধান ঘরে যেতে হয়—সামনে দুটি সুন্দর মিনার দুপাশে। তারিখ দেওয়া হচ্ছে ১৬৬৮-৬৯।

১৬৫৬ সালে আবদুল্লা যে প্রাসাদে ছিলেন সেটা শনাক্ত করা শক্ত। উনি আসার আগে এটির নিশ্চয়ই সংস্কার করা হয়েছিল। দুর্গের মধ্যে কোনও প্রাসাদের কোনও শিলালেখ নেই। একটা অনুমান করেছেন ঐতিহাসিক শেরওয়ানি। বালাহিসার দরওয়াজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে বাঁক নিলে একটা তিনতলা বাড়ি দেখা যায়। এটাকে বলা হয় *শিলাখানা* বা বারুদখানা। প্রতিটি তলাতেই সাতটা খিলান আছে কিন্তু অলংকারবিহীন। মনে হয় আবদুল্লার আগে এটি তৈরি হয়েছিল। এটি আগুন লেগে পুড়ে যাবার পর বহু কুতুবশাহি ও আসফশাহি জিনিস পাওয়া গিয়েছে যেগুলি মিউজিয়ামে রাখা আছে।

শিলাখানার সামনে একটা ছাদবিহীন ছোট মসজিদ আছে। মিহ্রাব ও বাইরে চারটে খিলান ছাড়া আর কিছু নেই বিশেষ। চারটে কালো পালিশ করা পাথরের স্তম্ভের অংশ রয়েছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রয়েছে ফুলতোলা টালি যা কখনও কখনও কুতুবশাহি সমাধিতে দেখা যায়। এর বাঁ দিকে গেলে ছোট পথ ধরে কতকগুলো প্রাসাদ দেখা যায়, যেগুলিতে আবদুল্লা থাকতেন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় হাজার ফুট লম্বা ও ৬৫০ ফুট চওড়া, এই জায়গায় রয়েছে তারামতির প্রাসাদ। জিলুখানা, অনেকগুলি ব্যক্তিগত থাকার ঘর, শাহিমহল, কতকগুলি কুয়ো ও ফোয়ারা, তারামতির মসজিদ, উটের আস্তাবল ও বোধহয় দাদমহল (বিচারালয়) যার সঙ্গে রয়েছে ঝরোখা যেটি দিয়ে মাক্কি দরজা থেকে বালাহিসার যাতায়াতের পথ দেখা যায়। এই প্রাসাদগুলিতে দুধরনের দেওয়াল ও খিলান দেখা যায়। অনেকগুলি উঠোন রয়েছে। এর একটা থেকে আর একটা ধাপ নীচে নেমে যেতে হয় যার মধ্যে

চমৎকার ছোট ছোট উঠোন পড়ে। বাইরের প্রাসাদগুলি তারামতির নামে হলেও, ভাবা হয় যে ভিতরের প্রাসাদে আবদুল্লা থাকতেন।

রাজকীয় সমাধিসৌধের মধ্যে রয়েছে হায়াত বক্সি বেগমের (মৃত্যু ১৬৬৭), বড় মসজিদ ও আবদুল্লা কুতুব শাহর সমাধি। প্রায় সবগুলিতেই শিলালেখ রয়েছে।

গোলকুণ্ডা শহরের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ফরাসি পরিব্রাজক তাভারনিয়ার। উনি শহরটিকে বলছেন *ভাগনগর* (ভাগ্যবান শহর)। বলা হয় যে মুহম্মদ কুলি তাঁর একজন মহিষীর নামে এই নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাভারনিয়ার বলছেন যে সাধারণভাবে একে বলা হয় গোলকুণ্ডা প্রধানত দুর্গের নাম থেকে যেটা দু ক্রোশ দূরে। দুর্গটির চার মাইল ব্যাসার্ধ এবং আসলে একটা শহর যেখানে রাজা ঔরংজেবের আক্রমণের পর (১৬৫৬) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ভাগনগর আগে ছিল রাজাদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্র যেখানে ছিল সুন্দর বাগান। চারপাশের এলাকা সমতল কিন্তু শহরের কাছে প্রচুর বড় বড় পাথর রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা বড় নদী শহরের দেওয়ালের গায়ে লাগছে ও মসুলিপত্তম-এর পর সমুদ্রে পড়ছে। ভাগনগরে একটা সুন্দর পাথরের পুল আছে যেটি প্যারিসের পঁ নফ-এর থেকে খারাপ নয়। শহরটি অরলিয়ঁর মতো। এটি ভালভাবে তৈরি এবং বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। শহরে অনেকগুলি সুন্দর বড় রাস্তা আছে কিন্তু বাঁধানো না হবার ফলে ধুলোবালিতে ভরা। গরমের সময় ভাল নয়। পুলে যাবার আগে একটা বড় শহরতলি পড়ে যার নাম আওরঙাবাদ (কারওয়ান শহরতলি)। প্রায় দুই মাইল লম্বা। এখানে বণিক, দালাল ও কারিগররা থাকে। সাধারণ লোকও এখানে থাকে কারণ শহরে শুধু উচ্চবিত্ত ও অভিজাতরাই থাকে। সকাল দশটা/এগারোটা থেকে এই বণিকরা শহরে আসে বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতে। প্রায় চারটা/পাঁচটা পর্যন্ত থেকে বণিকরা ফিরে আসে। এই শহরতলিতে দুটি কি তিনটি সুন্দর মসজিদ আছে যেটা বিদেশিদের সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই শহরতলির মধ্য দিয়েই শহর থেকে গোলকুণ্ডা দুর্গে যেতে হয়।

পুল পার হয়ে রাস্তা ধরে সোজা রাজার প্রাসাদে যাওয়া যায়। ডান দিকে অভিজাতদের বাড়ি ও চার/পাঁচটা সরাইখানা। এগুলি দোতলা; ভিতরে বড় হল ও অনেক ঘর আছে। এই চওড়া রাস্তার শেষে রয়েছে একটা বড় চক, যার কাছে প্রাসাদের দেওয়াল। মাঝখানে একটা বড় ঝোলানো বারান্দা যেখানে রাজা বসে সাধারণ লোকেদের কথা শোনেন। প্রাসাদের প্রধান দরজা আছে কাছের একটা চকে। এই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলে প্রথমে একটা বড় উঠোন আছে যার চারপাশে বারান্দা যেখানে রাজার রক্ষীরা রয়েছে। এখান থেকে আর একটা উঠোনে পড়া যায় যার চারপাশে সুন্দর সুন্দর ঘর আছে। এখানে হাতি রাখা হয়। বড় বড় গাছওয়ালা বাগান আছে। এই বাগানগুলি ছাদের উপরে এবং ছাদটি খিলানের উপর রয়েছে। এই বাড়িটার চেহারা রাজকীয় প্রাসাদের মতো।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শহরে একটা বড় মসজিদ (মক্কা মসজিদ) তৈরি করা হচ্ছে। পাথরগুলির চেহারা বিরাট এবং প্রার্থনার ঘরটি একটা বড় পাথরের যেটা

পাঁচশো/ছশো লোক পাঁচ বছর ধরে কেটেছে। প্রায় ১৪০০ বলদ লেগেছিল এটি নিয়ে আসার জন্য। শহরের বিপরীত দিকে, যেখান থেকে মসুলিপত্তম যাওয়া যায়, দুটো বড় পুকুর আছে (হোসেন সাগর ও মির আলম)। এর এক-একটাই দু মাইল লম্বা ও জলের উপর নানা রং করা নৌকা আছে রাজার ব্যবহারের জন্য। দরবারের প্রধান আমলাদের বাড়ি রয়েছে পাড়ে। শহরের তিন ক্রোশ দূরে একটা সুন্দর মসজিদ আছে গোলকুণ্ডা রাজাদের সমাধির পাশে। এখানে প্রতিদিন বিকেল চারটের সময় রুটি ও পোলাও খাওয়ানো হয়।

শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যবস্থা ভাল। কোনও বিদেশি দরজায় এলে তাকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয় যে তার কিছু নুন বা তামাক আছে কিনা, কারণ এই দুটিই রাজার প্রধান আয়। এমনকী বিদেশিরা দু-তিন দিন দরজায় অপেক্ষা করে ভিতরে আসার অনুমতি পাবার জন্য। রাজা ঝরোখায় বসে বিচার করেন। যারা আবেদন করছে তারা তখন এর নীচে দাঁড়াবে। লোকেদের ও দেওয়ালের মাঝখানের জমিতে তিনটি ছোট লাঠি আছে যেগুলোতে দড়ি বাঁধা আছে। অনুমতি না পেলে এই দড়ি অতিক্রম করার অধিকার কারুর নেই। যখনই রাজা বিচারে বসেন, তখনই সারা চকটা ধরে এই বাধা সৃষ্টি করা হয়। ঝরোখার বিপরীত দিকে লোকের ভিতরে যাবার জায়গা আছে। যাদের ডাকা হয়, তারাই যেতে পারে। সচিব নীচে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং একটা বস্তায় চার-পাঁচটা আবেদন হলে উপরে পাঠিয়ে দেন। উপরের থেকে একটা দড়ির সাহায্যে বস্তাটি তোলা হয়।

প্রধান অভিজাতরা এক সপ্তাহর জন্য প্রতি সোমবার থেকে পাহারায় থাকেন। এঁদের এক-একজনের পাঁচ/ছয় হাজার অশ্বারোহী আছে। এরা সৈন্যদের শহরের আশেপাশে তাঁবুতে রাখে। এরা পুলের উপর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে ঝরোখার চকের সামনে আসে। পিছনে দশ/বারোটি হাতিও থাকে। হাতির পর আসে উটেরা দুই সারিতে। এরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ। এর পরে আসে গাড়িগুলি যার সামনে ও পাশে থাকে ভৃত্যরা ও সামনে একটা ঘোড়া। অভিজাতদের আগে আসে দশ-বারো জন নাচনিওয়ালি। তারা নাচতে নাচতে আসে পুল থেকে। এর পরে আসে অশ্বারোহীরা ও পদাতিকরা। তাভারনিয়ার প্রধান রাস্তার উপরে থাকতেন বলে তিন-চার সপ্তাহ ধরে এই দৃশ্য দেখেছেন।

শহরে, শহরতলিতে ও দুর্গে অনেক বেশ্যা আছে। বলা হয় যে দারোগার খাতায় বিশ হাজার নাম আছে। খাতায় নাম না লেখালে এ কাজ করা যায় না। এরা রাজাকে কোনও কর দেয় না, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এদের কাউকে না কাউকে চকে গিয়ে নাচতে হয়। রাজা না থাকলে নাচ হয় না। সন্ধ্যাবেলায় এদেরকে বাড়ির দরজার সামনে দেখা যায়। এগুলি অবশ্য সবই কুঁড়েঘর। রাত হলে এরা ঘরের সামনে একটা আলো জ্বালিয়ে রাখে যেটাই হল সংকেতচিহ্ন। তখন তাড়ির দোকানগুলি খোলে। চামড়ার বোতলে করে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর থেকে এই তাড়ি আনা হয়। ঘোড়ার দুপাশে ব্যাগ ঝুলিয়ে এগুলি আনা হয় এবং প্রতিদিন পাঁচশো কি ছশো ঘোড়া শহরে ঢোকে। এই তাড়ির উপরে যে কর আছে, তা থেকে রাজার খুব আয় হয়। এই কারণেই অত বেশ্যা উনি রাখতে দিয়েছেন। কারণ প্রধানত ওদের কারণেই এত তাড়ি বিক্রি হয়।

চারপাশে এই তাড়ি বিক্রির দোকান রয়েছে।

গোলকুণ্ডার অধিবাসীরা ফরসা, দেখতে ভাল ও স্বাস্থ্য ভাল কেবল কৃষকরা ছাড়া যারা কালো। বর্তমান রাজার নাম আবদুল্লা কুতুব শাহ। এঁর কোনও ছেলে নেই এবং এঁর তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। প্রথম জনের বিয়ে হয়েছে মক্কার প্রধান শেরিফ-এর আত্মীয়র সঙ্গে, দ্বিতীয় জনের হয়েছে ঔরংজেবের বড় ছেলে সুলতান মুহম্মদ-এর সঙ্গে এবং তৃতীয় জনের বিয়ে হয়েছে রাজার আত্মীয় মির্জা আবদুল হাসানের সঙ্গে। গোলকুণ্ডার রাজা আলির ভক্ত এবং পারসিক তাজ টুপি পরেন। এর ফলে পারসিকরা এই রাজ্যে বেশি সংখ্যায় এসেছে।

এর প্রায় দশ বছর পরে এসেছিলেন ফরাসি পর্যটক থেভনো। উনি বলছেন যে রাজধানীকে বাগনগর বলা হলেও পারসিকরা একে বলে হায়দরাবাদ। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা সমতল জমির উপর এই শহর। শহরতলির বাড়িগুলি মাটির, ছাদ খড়ে ছাওয়া। এগুলি এত ছোট ও নিচু, যে এগুলি কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। লম্বা শহরতলির একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিকে বেরোলে একটা পুল পাওয়া যায়। এখানে ওঁরা কোতোয়ালের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখানে বণিকদের কারাভান মালসমেত অপেক্ষা করছিল পরীক্ষার জন্য। কিন্তু কারাভানের নেতা রাজার পারসিক প্রিয়পাত্রকে জানতেন। উনি অনুমতিপত্র জোগাড় করে পাঠালে, এরা সকলেই পুল পার হয়ে যান। পুলটি তিনটি খিলানের উপর তৈরি এবং বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। তখন জল কম থাকায় পুল-এর তলায় নদীকে শুকনো লাগছিল। কিন্তু বর্ষাকালে এটি প্যারিসের লুভর-এর সামনে সেন নদীর মতন চেহারা নেয়। পুলের শেষে রয়েছে শহরের দরজা। ভিতরে ঢুকে এরা লম্বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। দুপাশে শহরতলির মতোই কুঁড়েঘরের সারি। কিন্তু সুন্দর বাগান আছে। ওঁরা *নিয়ামৎউল্লা* বলে একটা সরাইখানায় গেলেন। এটিও রাস্তার উপরে। দু টাকা মাসে দিয়ে তাভারনিয়ার দুটি ঘর এখানে পেয়েছিলেন।

শহরটি উনি বলছেন যে একটা ক্রশ-এর মতন; চওড়ার থেকে লম্বায় বড় এবং সরলরেখায় চলে গিয়েছে পুল থেকে চারমিনার পর্যন্ত। কিন্তু চারমিনার পেরোলে এই রাস্তা আর সরলরেখায় যাচ্ছে না। এর পর বাঁ দিকে ঘুরে ময়দানে এসে আর একটা রাস্তা ধরে শহরের দরজায় যাওয়া যায়। উনি মেপে দেখেছেন যে বাগনগর ৫৬৫২ ফুট লম্বায় এবং পুল থেকে চারমিনার পর্যন্ত হচ্ছে ২৪০০ ফুট। এর থেকে ময়দান পেরিয়ে শহরের দরজা হচ্ছে ৩২০০ ফুট। দরজার বাইরে শহরতলি ১১০০ ফুট লম্বা।

এ শহরে অনেকগুলি ময়দান আছে কিন্তু রাজপ্রাসাদের সামনে যেটি আছে সবচেয়ে ভাল। এর পুবে ও পশ্চিমে মাটির মধ্যে লাগানো দুটো দিওয়ান (অফিস ঘর) আছে যার ছাদটা কাঠের এবং স্তম্ভগুলিও কাঠের। এই দুটি দিওয়ান কোতোয়ালের দিওয়ান হিসেবে কাজ করে এবং জেলখানাগুলি এই দিওয়ানের মাটির তলায়। প্রতি জেলখানার ঘরের সামনে জলের পাত্র রয়েছে। রাজপ্রাসাদ এর উত্তর দিকে এবং এর উপরে একটা বারান্দা আছে যেখানে সঙ্গীতজ্ঞরা দিনের মধ্যে কয়েকবার বাজনা বাজায় যদি রাজা শহরে থাকেন।

এর মাঝখানে তিন ফুট চওড়া একটা দেওয়াল তোলা হয়েছে হাতিদের লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু এরা লড়াই করতে করতে দেওয়ালটা ভেঙে ফেলে প্রায়ই। আশেপাশের সাধারণ বাড়িগুলি উঁচু নয় এবং অধিকাংশই মাটির তৈরি। কিন্তু অভিজাতদের বাড়িগুলি ভাল দেখতে। এর একপাশে প্রাসাদ যেটা ৩৮০ ফুট লম্বা। অন্যদিকে এটা চারমিনার অবধি চলে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে একটা সুন্দর ছত্রিতে শেষ হয়েছে। এর দেওয়ালগুলি পাথরের করা ও মধ্যে মধ্যে আধা-বুরুজ আছে। এই জায়গাটার দিকে অনেক জানালা আছে একটা খোলা বারান্দাসুদ্ধ। এরা বলে যে ভিতরটা খুব সুন্দর এবং জল উপরের তলার ঘরগুলো পর্যন্ত উঠে যায়। চারমিনারের উপরে একটা জলাধার আছে যেখান থেকে এই বাড়িতে নালি করে জল নিয়ে আসা হয়। রাজার অনুমতি ছাড়া প্রাসাদে ঢোকার কারওর অধিকার নেই এবং রাজা কদাচিৎ ওই অনুমতি দেন। এ ছাড়া আর একটা ভাল চৌকো ময়দান শহরে আছে যেখানে অভিজাতরা ভাল ভাল বাড়ি বানিয়েছে। সরাইখানাগুলি সব ভাল। সব থেকে ভাল হল নিয়ামৎ উল্লার সরাই যেটা রাজার বাগানের বিপরীত দিকে বড় রাস্তার উপর। এটা একটা চৌকো জায়গা এবং এর উঠোনের চারপাশে গাছ আছে। একটা বড় পুকুর আছে যেখানে মুসলমানরা প্রক্ষালন করে।

চারটি মিনার নিয়ে চৌকো সৌধকে চারমিনার বলে। এর চারপাশ খোলা এবং চারটে খিলান আছে। এর প্রতিটি খিলানই একটা না একটা রাস্তার দিকে মুখ করা। একটার উপর আর একটা করে দুটো বারান্দা আছে এবং একটা সমতল ছাদ আছে যার চারপাশে ছোট পাঁচিল দেওয়া বারান্দা। প্রতিটি কোনাতে একটা করে দশকোনা মিনার আছে এবং প্রতিটি মিনারে চারটি বারান্দা আছে যাদের বাইরের দিকে ছোট খিলান। বাইরে থেকে মনে হয় গম্বুজ আছে কিন্তু ভিতরে ভলট করা। এই গম্বুজের তলায় একটা বড় টেবিল খাটের উপর রাখা। এটি জমি থেকে সাত কি আট ফুট উঁচু এবং উপরে যাবার ধাপ রয়েছে। এই সব বারান্দাগুলি দিয়ে জল উপরে নিয়ে যাওয়া যায় যার পর রাজার প্রাসাদে ওই জল নিয়ে যাওয়া হয় এমনভাবে যে প্রাসাদের উপরের ঘরগুলিতেও জল যায়। এই শহরের মধ্যে এটিই সব থেকে সুন্দর জিনিস কিন্তু এর চারপাশে খারাপ দেখতে কাঠের দোকান রয়েছে খড় দিয়ে ছাওয়া যেখানে ফল বিক্রি হয়।

শহরে অনেক সুন্দর বাগান আছে। এদের সৌন্দর্য হচ্ছে যে এর ভিতরের লম্বা পথগুলি খুব পরিষ্কার। কিন্তু এগুলিতে ফুলের সারি নেই বা জলের কাজ নেই। কতকগুলি ছোট জলাধার আছে। শহরের মধ্যেকার বাগানগুলিই সুন্দর। একটা দোতলা বাড়িসমেত এইরকম বাগানেরও বর্ণনা দিয়েছেন তাভারনিয়ার।

বাগনগরে অনেক আইন মানানোর লোক রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রধান হলেন কোতোয়াল যিনি শহরের শাসনকর্তা ও শুল্ক বিভাগের কর্তা। এ ছাড়া উনি টাঁকশাল-এর প্রধান এবং শহরের দেওয়ানি ও ফৌজদারির প্রধান বিচারক। উনি রাজার অনেক বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাজাকে প্রচুর টাকা দেন। এই শহরে অনেক ধনী বণিক, শ্রফ, স্বর্ণকার ও খুব ভাল কারিগর রয়েছে। রাজার অধীনে পারসিক, মোগল ও পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ রয়েছে যাদের কাছে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী আছে। শহরের ব্যবসায়ীরা

ও কৃষকরা স্থানীয় লোক। অনেক পর্তুগিজ এখানে আছে যারা নানান অপরাধের জন্য পর্তুগাল থেকে পালিয়ে এসেছে। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা পরে এখানে বসতি করেছে। এদের মধ্যে ওলন্দাজদের লাভ বেশি হচ্ছে। তিন বছর হল এরা এখানে কুঠি বানিয়েছে। এরা নানা ধরনের কাপড় কিনে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে। এরা মসুলিপত্তম থেকে বলদের গাড়িতে মাল নিয়ে যায় বাগনগরে বিক্রি করার জন্য। অন্যান্য শহরেও তারা বিক্রি করে। বছরে এদের লাভ থেকে যায় প্রায় বারো হাজার ফরাসি পাউন্ড।

এ রাজ্যে বেশ্যাদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এরা ভাল পোশাক পরে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যে লোক যাচ্ছে তাকে ডাকে। চোর ধরা পড়লে তার দু হাত কেটে নেওয়া হয়। এ রাজ্যে ভাল হিরে ওজনের দরে বিক্রি হয়।

গোলকুণ্ডার দুর্গটি, যেখানে রাজা থাকেন, চার মাইল দূরে। প্রথম কুতুব শাহ এর এই নাম দিয়েছিলেন। কারণ একটি মেষপালক ওঁকে এই জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিল। এটি বাগনগরের পশ্চিমে এবং শহরতলি পেরিয়ে যে জায়গা দিয়ে যেতে হয়, সেটা দেখতে খুব সুন্দর। দুর্গের মাঝখানে একটা টিলা উঁচু হয়ে উঠেছে যার চারপাশে রয়েছে রাজার প্রাসাদ। দুর্গটিকেই একটা শহর বলা যেতে পারে। এর পাঁচিলটা তিন ফুট লম্বা পাথর দিয়ে করা এবং ওই রকমই চওড়া। এর চারপাশে গভীর পরিখা আছে, যেটি ছোট ছোট পুকুরে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ভিতরে ভাল জল আছে।

তাভারনিয়ার একে খুব সুরক্ষিত বলে ধরেননি। এতে পাঁচটা গোল বুরুজ আছে কামানসুদ্ধ। দুর্গের অনেকগুলি দরজা থাকলেও মাত্র দুটি খোলা থাকে। একটার ভিতরে ঢুকতে গেলে একটা পুকুরের উপরের সাঁকো পেরিয়ে যেতে হয়। দুটো বুরুজের মধ্যে সরু একটা পথ যেটা এঁকেবেঁকে একটা বড় দরজার সামনে গিয়েছে। এখানে তরোয়াল হাতে একটা পাথরের উপর কয়েকজন ভারতীয় বসে ছিল। অনুমতিপত্র না থাকলে এরা কাউকে ভিতরে যেতে দেবে না। রাজার প্রাসাদ ছাড়া, দুর্গের মধ্যে কোনও ভাল বাড়ি নেই। আমলাদের বাড়িগুলি ভাল। কিন্তু প্রাসাদটি চমৎকার—এমন জায়গায় করা হয়েছে যেখানে বাতাস আসে ও ওখান থেকে দৃশ্যও চমৎকার। একজন বেলজিয়ান চিকিৎসক রাজার প্রিয়পাত্র। উনি যে ঘরে থাকতেন দুর্গের মধ্যে সেখানে একটা ছত্রি ছিল। ওখান থেকে শুধু দুর্গই দেখা যেত তাই নয়, সারা বাগনগরও দেখা যেত। বারোটা দরজা পেরিয়ে রাজার থাকার জায়গায় আসা যায়। দুর্গের মধ্যেই অধিকাংশ আমলারা থাকে। এ ছাড়া বড় বড় ওমরাহ ও অন্যান্য অভিজাতরা এখানে বাড়ি করেছে। বাগনগরেও এদের বাড়ি আছে। দুর্গের মধ্যে কয়েকটা বাজার আছে যেখানে জীবনধারণের সব কিছুই পাওয়া যায়।

দুর্গের মধ্যে কারিগররা বিনা খরচে থাকে। রাজা স্বর্ণকারদেরও প্রাসাদের মধ্যে জায়গা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের বলা বারণ যে তারা কী রত্ন নিয়ে কাজ করছে। রাজার এত রত্ন আছে যে এই সব কারিগরদের আর কারওর কাছে কাজ করার দরকার নেই।

গোলকুণ্ডার রাজাদের সমাধিসৌধ দুর্গ থেকে কিছুটা দূরে। এরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিয়েছে। কারণ প্রতিটির সঙ্গেই একটা করে সুন্দর বাগান আছে।

পশ্চিমের দরজা দিয়ে ওদিকে যেতে হয়।

আবদুল্লা কুতুব শাহর তৃতীয় মেয়ের বিয়ে হয় আবুল হাসানের সঙ্গে যিনি ফৎ দরওয়াজার কাছে শাহরাজুর খানকায় সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছিলেন। দরবারের অন্তর্দ্বন্দ্বে আরব দলের পতন হয়। সৈয়দ মুজাফর ও মুসা খান খান-ই খানান, নিজামুদ্দিনের বদলে আবুল হাসানকে সুলতান করেন। বিজয়ী দল অবশ্য বেশিদিন ক্ষমতায় ছিল না। মদন্না মির জুমলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে এদের ক্ষমতা কমে যায়। দশ টাকার চাকরি থেকে শুরু করে, এই শ্রফ মদন্না বিরাট রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। মদন্না তার ভাই আকান্নাকে উচ্চ পদে বসান। ১৬৭৩ সাল থেকে ১৬৮৬ সালের মধ্যে মদন্না হিন্দুদের উচ্চ পদে বসিয়ে ছিলেন। এদের কয়েকজন ওঁর আত্মীয়। ১৬৮৭ সালে আট মাস অবরোধের পর ঔরংজেব জয়ী হন ও আবুল হাসানকে দৌলতাবাদ দুর্গে পাঠানো হয়। সমকালীন পারসিক ঐতিহাসিকদের মতে হায়দরাবাদ থেকে ঔরংজেব প্রায় পনেরো কোটি মতন টাকা (বিভিন্ন মুদ্রায়) ও অসংখ্য ধনরত্ন ইত্যাদি পেয়েছিলেন।

নানারকম গোলমালের মধ্যে থাকলেও আবুল হাসানের সময়কালে কতকগুলি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল যদিও তাদের এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সব থেকে সুন্দর ছিল বোধহয় একটা প্রাসাদ যেটিকে বলা হত *গোসা মহল*, সম্ভবত গোসা গ্রামে ছিল বলে। এটি আবদুল্লার সময়ে তৈরি করা আরম্ভ হয় এবং গোলকুণ্ডার পতনের বছর শেষ হয়। একটা বড় এলাকার উত্তর দিকে ছিল এই প্রাসাদ। এর জলাধারে প্রচুর ফোয়ারা ছিল। এই জল মাটির নীচের নালি দিয়ে হোসেন সাগর থেকে নিয়ে আসা হত। এই প্রাসাদে ১০০টি হলঘর ছিল এবং ওই সময়ে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। প্রবাদ আছে যে মাটির নীচের পথ দিয়ে গোলকুণ্ডা দুর্গে যাওয়া যেত। এই প্রাসাদের কিছু আর অবশিষ্ট নেই শুধু একটা অতিথিশালা ছাড়া যাকে বলা হয় বরাদরি। এটি উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। দোতলা এই বাড়িতে নানা আকারের ঘর, হলঘর, বিরাট স্তম্ভ এবং খুব সুন্দর জালির কাজ আছে। উপরের মার্বল পাথরে একটা শিলালেখ আছে।

মুসি নদীর উপর আবুল হাসানের একটা প্রাসাদ ছিল যার নাম ছিল *চার মহল*। এটি এখন আর নেই। এটি ছিল চারকোনা এবং গোসা মহলের মতো এরও মাঝখানে ছিল একটা জলাধার যেখানে অনেক ফোয়ারা ছিল। এটি শেষ হয়েছিল ১৬৮৩ সালে। এ ছাড়া পুরনো পুলের পশ্চিম দিকে শেষে যে মসজিদটি আছে, তাকে বলা হয় *মিয়া মিস্ক* বা *মালিক মিস্ক।* এর দরজার উপর ছটা কালো পাথর লাগানো এবং কয়েকটি শিলালেখতে মালিকের জীবনে আবুল হাসানের কাছ থেকে যা ফরমানগুলি পেয়েছেন তার প্রতিলিপি করা। ১৬৮০ সালে মিয়া মিস্ক মারা যান সেটি লিপিবদ্ধ করা আছে।

আবুল হাসানের সময়ে শহরতলিতে আর একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। এটি ছিল মুসিরাবাদে এবং কুতুব শাহি মসজিদগুলোর মতো এটিও পাঁচ খিলানের। দেওয়ালে পোড়া ইটের কাজ রয়েছে যেটি খইরিতিবাদ মসজিদের সঙ্গে তুলনীয়। দুটি উঁচু মিনার আছে। ফৎ দরওয়াজার বাইরে রয়েছে আবুল হাসানের গুরু শাহ

রাজু দ্বিতীয়র সমাধি। উনি ১৬৮৪-৮৫ সালে মারা গেলে ওঁর সমাধি তৈরি হয়। এ ছাড়া গোলকুণ্ডার বালাহিসার-এর মধ্যে একটা পাথরেকাটা পুরনো হিন্দু মন্দির সারানো হয়। অনন্তগিরির পুরনো মন্দিরেরও সংস্কার হয়েছিল। এ ছাড়া হায়দরাবাদের দক্ষিণের শহরতলি মাইসারামে একটা শিব মন্দির তৈরি করা হয়েছিল সরাইখানা সমেত।

থেভনোর পরে ষাটের দশকের শেষ দিকে আসেন মার্তাঁ। উনি বলেছেন যে বাগনগর ও গোলকুণ্ডা দুটি আলাদা জায়গা। গোলকুণ্ডা দুর্গ প্রায় চার মাইল দূরে। বাগনগর একটা বড় বাণিজ্যিক শহর। রাজা ওই সময় গোলকুণ্ডা দুর্গে ছিলেন যেটি অনেক আগে হয়েছে। বাগনগরকে মার্তাঁ বলছেন যে এটি সত্যিই শহর। এটা পরে তৈরি করা হয়েছে এবং ভারতের খুব সুন্দর শহরের মধ্যে একটা। ওঁরা একটা ভাড়াবাড়িতে ছিলেন।

পরের দশকে এসেছিলেন আবে কারে। উনি ১৪ মার্চ ১৬৭৩ সালে বিজাপুর থেকে বাগনগরের কাছে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় ওঁরা এসেছিলেন মাইলাপুরে যেটি হায়দরাবাদের পশ্চিম শহরতলি ও গোলকুণ্ডা যাবার পথে পড়ে। এখানে ওঁরা এক পর্তুগিজ যাজকের বাড়িতে ছিলেন দু দিন। গোলকুণ্ডা ও বাগনগর দুই মাইলের মধ্যে এবং দুটিই খুব বর্ধিষ্ণু শহর। প্রথমটাই রাজধানী কারণ রাজা এখানে থাকেন। এটার খানিকটা উপত্যকায় ও খানিকটা পাহাড়ের উপরে, যার উপর রয়েছে রাজার দুর্গ। এর চারপাশ খাড়া এবং উপরে যাওয়া শক্ত। পুরো জায়গাটাই খুব শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং গ্রামাঞ্চলের দিকটায় বড় পরিখা আছে জলে ভর্তি। এর অর্ধেকটা অবশ্য কাদায় ভরে রয়েছে। এদিকটায় অনেকগুলি বুরুজ আছে কিন্তু এগুলো খুব পুরনো এবং শক্ত নয়। এর ভিতরে রাজার প্রাসাদ ও হারেম। এ ছাড়া যুবরাজ, অভিজাত ও দরবারের আমলাদের বাড়ি আছে। প্রতি সকালে এরা এদের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিকে (ও নিজেরা) নানারকম ধনরত্ন দিয়ে সাজিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলায় সেনাপতিরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কুচকাওয়াজ করে।

কারে একজন পারসিক বণিকের বেশে ছিলেন কারণ তখন গোলকুণ্ডার সঙ্গে ফরাসিদের যুদ্ধ চলছিল সেন্ট থমের অবরোধ নিয়ে। অন্যান্য দেশের বণিকদের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে রাজা এই যুদ্ধ চালাতে চান না কিন্তু মুসা খান এটি চালাচ্ছেন প্রধানত ওলন্দাজদের প্ররোচনায়।

কারে বাগনগর শহরও দেখেছিলেন। উনি বলছেন যে বিরাট এই শহর অনেক জায়গা নিয়ে সমতল জমির উপর তৈরি। একটা সুন্দর নদীর ধারে এটা। শহরে প্রচুর সংখ্যায় বিদেশি ও বণিকরা আছে। বিদেশি বণিকরা ও অন্যান্যরা বাণিজ্য করে এবং তাদের উপর কোনও বাধানিষেধ নেই। এ জায়গাতে এত লোক, দ্রব্য ও ধনরত্ন জড়ো হয়েছে যে মনে হয় এটাই পূর্ব দিকের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। গোলকুণ্ডা থেকে বেরিয়ে কারে হায়াৎনগরে গিয়েছিলেন। উনি বলছেন যে এটা একটা লম্বা শহর এবং একটাই বড় রাস্তা আছে প্যারিসের কাছে লা বুর্গ লা রেনের মতো (প্যারিস থেকে পাঁচ মাইল দূরে)। হায়াৎনগরে, কারে বলছেন, শুধু হিন্দুরাই বাস করে। শহরের মাঝখানে একটা চমৎকার দুর্গ আছে যেটা সাম্প্রতিক কালে তৈরি হয়েছে। এটার চারপাশে একটা

গভীর পরিখা আছে যার তলা ও পাশগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো। সেগুলো এত সুন্দর যে দেখলে মার্বল পাথরের মতো মনে হয়। সুতরাং এর জল খুব তাজা এবং পরিষ্কার। এর পর তিন দিন ধরে পথে যাওয়ার সময় কারে সুন্দর সুন্দর গ্রাম লক্ষ করেছেন। সারা পথ জুড়ে ঘোড়া ও বলদের উপরে চামড়ার বস্তা নিয়ে গোলকুণ্ডায় তাড়ি যেতে দেখেছেন। প্রায় পঞ্চাশ মাইল তাড়ির ব্যবসা খুব ভাল চলে।

কারের পর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকারী আর কেউ আসেননি। কিছুকাল পরে কীভাবে ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করলেন তার ইতিহাস অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। কুতুব শাহিদের হাত থেকে গোলকুণ্ডা চলে গেলে তার দীপ্তিও যে নিভে গিয়েছিল সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এর বর্ণনা কিছুটা পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ফরাসি পর্যটক মোদাভের লেখায়। উল্লেখযোগ্য যে মোদাভ মোগলদের জয়ের পর গোলকুণ্ডার অবস্থার অবনতি হয়েছিল বলেছেন। মোদাভ বলছেন যে মোগলদের বিজয়ের পর এই সমৃদ্ধ শহরের অর্ধেক লোকও আর নেই, এর শিল্প প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং যে হীরকখনি পৃথিবী বিখ্যাত ছিল, সেগুলিতে এখন আর কোনও কাজ হয় না। এই জনসমৃদ্ধ, বিত্তশালী শহরে এই রকম খারাপ সরকার হলে এই রকম ধ্বংসই হয়ে থাকে।

বিদর থেকে সদাশিবপেট হয়ে মোদাভ গোলকুণ্ডা দুর্গের কাছে আসেন। এটা একটা পাহাড়ের চূড়ায় এবং এরকম পাহাড়ের চূড়ার উপর দুর্গ আরও অনেক আছে। পাহাড়টার উপরটা একটু চাপা ও বাড়িতে ভর্তি। একটা মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গোলকুণ্ডা শহরটা পাহাড়ের তলায়। দুর্গটি চতুষ্কোণ ধরনের এবং খুবই সাধারণ। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার কখনও কখনও বিশ্রাম নিতে চাইলে এখানে এসে থাকেন। এখানেই ওদের কোষাগার, কয়েকটা কামান ও কয়েদিদের রাখা হয় বিশেষত যাদের বদলে টাকা পাওয়া যাবে। এই জায়গাটা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হলেও, মোদাভের খুব বেশি কিছু মনে হয়নি। এখানে আসার লম্বা রাস্তার দুপাশে জমি আর পুকুর রয়েছে, কিন্তু কোনও চাষআবাদ হয় না।

ডান দিকে গোলকুণ্ডার দুর্গ রেখে পাঁচ মাইল হেঁটে মোদাভ হায়দরাবাদে আসেন। এটা একটা নতুন শহর, প্রায় দু শতাব্দী আগে তৈরি। গোলকুণ্ডার শেষ মুসলমান-রাজারা এটা বানিয়েছিলেন। গোলকুণ্ডার পুরনো শহর থেকে এটা দুই ক্রোশ দূরে। শহরটা একটা নদীর পার ধরে তৈরি হয়েছে। শহরটা লম্বায় বেশ বড় এবং বড় একটা রাস্তা শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। শহরের যে সব অংশ এই রাস্তার দুধারে, সেগুলির ভগ্নদশা। এই ধ্বংসস্তূপ ও শহরের দেওয়ালের মধ্যে দেখা যায় যে বেশ কিছু জায়গায় চাষ হচ্ছে। চারপাশে বড় বড় পুকুর। এগুলির জল আসছে নদী থেকে এবং পাশের পাহাড়ের থেকে। এই সব পুকুরগুলিই প্রায় চারকোনা এবং কয়েকটা পুকুরের পাড় পাথর দিয়ে বাঁধানো।

বড় রাস্তাটার দুপাশের বাড়িগুলি সবই প্রায় দোতলা। এগুলি একেবারেই চমৎকার কিছু নয়। বড় অভিজাতরা পারস্য দেশের ধরনে কাঠের বাড়ি তৈরি করেছিলেন। রাস্তার প্রায় মাঝখানে একটা বড় সৌধ আছে যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে

উঁচু বারান্দা। এর চারটি দিক চারটি রাস্তার দিকে মুখ করা। চারটি মিনার-এর জন্য একে চারমিনার বলা হয়। এটি শহরের মতোই পুরনো। চারমিনারে যাবার বড় রাস্তা একটা বড় চক তৈরি করেছে রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদের সামনে। এই চকটাই বণিকদের প্রধান মিলনক্ষেত্র। প্রতি সন্ধ্যায় এরা এখানে তাদের পণ্য সাজিয়ে বসে এবং কম দামে বিক্রি করে। তাভারনিয়ার হিসেব করেছেন যে এই সব পণ্যের মোট মূল্য বিশ হাজার টাকার বেশি হবে না এবং প্রতিদিনের বিক্রি দুশো টাকার কম।

রাজপ্রাসাদের সামনের চেহারাটা আর নেই। সব ভেঙে গিয়েছে। প্রাসাদের ভিতরে গরিব লোকেরা বাড়ি তৈরি করেছে। কিন্তু ধ্বংসস্তূপ থেকে বোঝা যায় যে এই প্রাসাদ কী বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। এর সামনে যে চক ছিল, সেটি এক সময় আরও বড় ছিল। কিছু সময় হল এখানে একটা মসজিদ করা হয়েছে যার নাম মক্কা মসজিদ যার ফলে এই জায়গার সৌন্দর্য অনেক কমে গিয়েছে।

এখান থেকে চারমিনার-এর মধ্যে একটা জায়গায় সুবাদার বাড়িতে থাকেন। তার ঢোকার দরজা এই বিরাট রাস্তার উপর। এই বাড়ির কোনও বৈশিষ্ট্য নেই এবং অতি সাধারণ। ওই রকম সাধারণ আর একটি বাড়ি যার নাম চারমহল (চারমিনারের দক্ষিণে চৌমহল্লা)। এই বাড়িতে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার তাঁর কারিগরদের রাখেন। ফরাসি সেনানায়ক বুসি এই বাড়িতে ছিলেন।

চারমিনার-এর পশ্চিমে ও পুবে আরও দুটি রাস্তা আছে। এখানকার বিখ্যাত সাহুকাররা পুব দিকের রাস্তায় নিজেদের বাড়িতে থাকেন। মাঝখানটা একটা বড় চৌকো জায়গা। এর মাঝখানে একটা জলের জায়গা আছে যার পাড়গুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো। এর চারদিকে চারটি খিলান আছে যার মধ্যে দরজা। এটাই রাজপ্রাসাদে ঢুকবার প্রধান প্রবেশপথ এবং এটাকে বলে চার কামান (চারমিনারের উত্তর দিকে)। শহরের অন্য রাস্তাগুলি সরু এবং বেশ নোংরা। এর চারপাশে খুব সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে যার ভিতরে বাগান ও ফোয়ারা আছে। কিন্তু এখন সবগুলিই পরিত্যক্ত।

চারমিনার-এর চারপাশ দিয়ে খাবারের বাজার। দিল্লির বাজারের মতো এই সব খাবার ও অন্যান্য পণ্য সাজানো থাকে। এ ছাড়া যারা রান্না করা খাবার খেতে চায়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে ওখানেই রান্না করে খাবার পরিবেশন করার। বোধহয় এখানেই রাজধানীর আচার আচরণ খুব নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়।

হায়দরাবাদ শহরের চারপাশে দেওয়াল থাকলেও বেশ দুর্বল ও বেশি উঁচু নয়। ঐতিহাসিকদের মতে এই দেওয়াল ৬ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে করা। এটি শুরু করেন মুবারিজ খান এবং শেষ করেন নিজাম-উল মুলক। তাভারনিয়ারের মতে এই শহরের কোনও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই। যে বিশাল জনসমুদ্র বড় রাস্তার সবটা জুড়ে অবিরাম চলেছে, তাদের হিসেব ধরলে মনে হয় যে এই শহরে একটা বিরাট সংখ্যার অধিবাসীরা থাকে। তাভারনিয়ারকে বলা হয়েছিল যে এই শহরে থাকে পাঁচ লাখ অধিবাসী। কিন্তু তাভারনিয়ারের মনে হয়েছে যে এর অর্ধেক লোক এখানে থাকে। ১৮২০ সালে উইলিয়াম হ্যামিলটন মনে করেছেন যে লোকসংখ্যা প্রায় দুলক্ষ। ১৮৮১ সালের গণনায় দেখা যায় যে এই সংখ্যা হচ্ছে তিন লাখ সাতষট্টি হাজার।

হায়দরাবাদ থেকে বিরাট বড় একটা শহরতলিতে যাবার সময় নদীর উপর বড় একটা পুল পাওয়া যায়। এটা পাথরের তৈরি এবং ভারতের পুলগুলির তুলনায় ভাল। এই শহরতলির নাম আওরঙাবাদ। কিন্তু একে কারাভান (কারওয়ান) বলে বলা হয়। এই শহরতলিকেই একটা শহর বলা চলে। এখানে সব বণিকরা থাকে। সব গাড়িও এখানে পাওয়া যায়। সাহুকার ও বানিয়ারা তাদের দোকান এখানে রেখেছে যেখানে তারা সারাদিন থাকে। তাভারনিয়ারের কাছে এই শহরতলির যা বৈশিষ্ট্য চোখে লেগেছে তা হল এখানে সব ধরনের শিকারী বাঘ, চিতাবাঘ নানারকম শিক্ষা দিয়ে বড় করা হয় শিকারের জন্য। কয়েকটা রাস্তা জুড়ে এরা রয়েছে।

মুসলমানরা এই শহর তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের বাড়ি করেছে। দিল্লি ছাড়া আর কোনও শহরে এত আরব ও ডাক্তার দেখা যায় না। এমনকী শহরের একটা এলাকায় একটা বাড়ি আছে যাকে আরবদের কফি খাবার বাড়ি বলে। বলাবাহুল্য ফকিররা এখানে আছে বেশ বেশি সংখ্যায়। মোদাভের মতে ইংরেজরা গোপনে ও নিঃশব্দে এই বিরাট সাম্রাজ্য দখল করার পরিকল্পনা করেছে।

১৫

বিজাপুর

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিজয়নগর-এর সাম্রাজ্যের যখন ভাঙন ধরেছে ও নরসিংহ বিদ্রোহ করে নতুন বংশ স্থাপন করছে, তখন আমরা দেখি যে পাঁচটা রাজ্য দাক্ষিণাত্যে আসছে যাদের মধ্যে রয়েছে বিজাপুরের আদিল শাহ, বিদর বা আহমদাবাদের বারিদ শাহ, বেরার-এর ইমাদ শাহ, আহমদনগর-এর নিজাম শাহ ও গোলকুণ্ডার কুতুব শাহ। এই পাঁচটি রাজ্যের উত্থান বাহমনি রাজ্যের ভেঙে যাওয়া ও বিজয়নগরের মধ্যে অরাজকতার ফল।

১৪৮৯ সালে আদিল শাহ বিজাপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কাশিম বারিদ, যিনি পরবর্তীকালে আহমদাবাদের অধিকর্তা হয়েছিলেন, বিজয়নগরকে আহ্বান করেন বিজাপুর দখল করার জন্য। নরসিংহ এসে মুদকুল ও রাইচুর দখল করলে বিজাপুরের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে যার বর্ণনা ফেরিস্তার লেখায় পাওয়া যায়। আদিল শাহ জায়গাগুলি নিজের দখলে আনেন এবং গোয়াও নিজের দখলে রাখেন। বিজয়নগরের মধ্যে আবার গোলমাল শুরু হলে, আদিল শাহ কিছুটা স্বস্তি পান। আদিল শাহ সম্পর্কে শেষ ঘটনা লিখেছেন ফেরিস্তা। উনি বলছেন যে ১৫০৯ সালে ইউরোপীয়রা হঠাৎ গোয়া দখল করলে আদিল শাহ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে গোয়া দখল করেন। ১৫১০ সালে আদিল শাহ মারা গেলে তাঁর ছেলে ইসমাইল বিজাপুরের রাজা হন। ইতিমধ্যে ১৫০৯ সালে বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় রাজা হন।

আদিল শাহ-র সময়ে র‍্যালফ ফিচ বেলগাঁও থেকে বিজাপুরে এসেছিলেন। উনি বলছেন যে এটা একটা বড় শহর এবং এটাই রাজ্যের রাজধানী। উল্লেখযোগ্য যে ফিচ ওঁর দরবারে বহু হিন্দু অভিজাত দেখেছিলেন যারা মূর্তি পুজো করে। বনের মধ্যে মন্দির বানিয়ে সেখানে মূর্তি রাখে। এখানে প্রচুর হাতি আছে যাদের নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া হয়। এদের বাড়িগুলি পাথরের, খুব উঁচু এবং সুন্দর দেখতে। গোয়া সম্পর্কে উনি বলেছেন যে গোয়া আদিল শাহর রাজ্যে। প্রচুর বণিক এখানে আসে এবং পর্তুগাল থেকে প্রতি বছর পাঁচ-ছয়টা জাহাজ আসে। এখান থেকে জাহাজগুলি কোচিনে যায় গোলমরিচ নিতে। গোয়াতে ফিচকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দি করা হয়েছিল এবং দুহাজার দুকাট তিনি জামিন রেখেছিলেন যে শহর ছেড়ে যাবেন না। দুজন

পাদরি এই জামিনের ব্যবস্থা করে দেন। শেষকালে ওঁরা ওখান থেকে পালান।

ইসমাইল আদিল শাহর সঙ্গে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ হয় ১৫৩৪ সালে। যুদ্ধের সময়ই ইসমাইল মারা যান ও ওঁর ছেলে মালু সিংহাসনে বসেন। ততদিনে আলবুকার্ক গোয়া দ্বিতীয়বার দখল করেছেন নভেম্বর ১৫১২ সালে। নুনিজ বর্ণনা দিয়েছেন যে কেমনভাবে ইসমাইল আদিল শাহ কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে ১৫২০ সালের রায়চুর যুদ্ধে পরাজিত হন। একদিকে গোয়া হাতছাড়া ও অন্যদিকে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজয়ের ফলে বিজাপুরের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে তিনটি মুসলমান শাসকদের মধ্যে একতার সৃষ্টি হয় যার চূড়ান্ত ফলাফল দেখা যায় বিজয়নগরের পতনের মধ্যে। এমনকী কিছুকাল পরে কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর দখল করেন ও অনেকখানি ধ্বংস করেন বলে পর্তুগিজ ঐতিহাসিক নুনিজ বলেছেন। বিজাপুরে থাকাকালীন কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুরের বীর সেনাপতি সালাবাত খানের প্রাণদণ্ড দেন। ওখানে বাহমনি সুলতান মাহমুদ শাহ দ্বিতীয়র তিন ছেলেকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে বড় জনকে দাক্ষিণাত্যর রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন।

ইসমাইল আদিল শাহর মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে রাজা হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ঠাকুমার আদেশে তাঁর চোখ অন্ধ করে সরিয়ে দিয়ে তাঁর ছোট ভাই ইব্রাহিম আদিল শাহ ১৫৩৫ সালে বিজাপুরের সিংহাসনে বসেন। পর্তুগিজরা এই সময়ের পরেই দিউ ও গোয়ার প্রধান জায়গাগুলি আবার দখল করে। বিজাপুর আক্রমণ করে তৃতীয়বার যুদ্ধের পর দিউ দখলে আসে। নুনিজ বলছেন যে অচ্যুত রায়ের সময়ে ইব্রাহিম আদিল শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করে নগলপুর (বর্তমান হসপেট) ধ্বংস করেন। ফেরিস্তা বলেছেন যে ইব্রাহিম বিজয়নগরে এসেছিলেন কিন্তু ধ্বংসের কথা বলেননি।

বিজাপুর শহর ধ্বংসের কথা নুনিজ বলেছেন যদিও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন। উনি বলেছেন যে বিজয়নগরের রাজা বিজাপুরে ঢুকে কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারলেন না প্রধানত জলের অভাবের জন্য। বিজাপুর শহর একটা সমতল ভুমিতে এবং এর জল আসে প্রধানত দুটি বড় জলাধার থেকে যেখানে বৃষ্টির জল জমা হয়। বিজাপুরিরা শহর ছেড়ে যাবার আগেই এই জলাধারের বাঁধ কেটে দেওয়ায় সব জল বেরিয়ে গিয়েছিল, ফলে বিজাপুর শহরে জল আসেনি। এর ফলে রাজা চলে যেতে বাধ্য হন কিন্তু শহরটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। নুনিজ বলছেন যে এর কারণ রাজার আদেশ নয়। রাজার সৈন্যরা রান্না করার কাঠ না পেয়ে বাড়ি ভেঙে কাঠ নিয়ে আসে যার ফলে রাজার প্রাসাদ ছাড়া আর কিছু অক্ষত ছিল না। রাজপ্রাসাদ না ভাঙার কারণ কৃষ্ণদেব রায় তখন ওই প্রাসাদে বাস করছিলেন। নুনিজ বলেছেন যে পরবর্তীকালে যখন ইসমাইল আদিল শাহ শহর ধ্বংস করার কারণ জানতে চান, তখন কৃষ্ণদেব রায় উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে তাঁর বুভুক্ষু সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক সিওয়েল এই যুক্তির সমালোচনা করেননি। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে বিজাপুরের অধিকাংশ বাড়িই পাথরে গড়া, ফলে রান্না করার কাঠ ওখানে খোঁজার দরকার নেই। দ্বিতীয়ত বিজাপুরের অধিবাসীরা যেখান থেকে কাঠ সংগ্রহ করত, সেখান থেকেই কাঠ সংগ্রহ না করার

কোনও যুক্তি নেই।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে ভ্রমণকারীদের লেখায় বিজাপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাভারনিয়ার গোয়া থেকে বিজাপুর হয়ে গোলকুণ্ডা গিয়েছিলেন মোগল আক্রমণের (১৬৮৬ সাল) আগে। বিজাপুরের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা নিতান্তই সাধারণ। উনি বলছেন যে বিজাপুর একটা বড় শহর যার মধ্যে দেখার কিছু নেই। সেরকম সরকারি বাড়ি বা বাণিজ্য কিছুই নেই। রাজার প্রাসাদটা বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু খুব খারাপভাবে তৈরি। প্রাসাদে যাওয়া খুব শক্ত প্রধানত এর গভীর পরিখার জন্য যার জলে অসংখ্য কুমির আছে। বিজাপুরের রাজার তিনটি ভাল বন্দর আছে—রাজাপুর, দাভোল ও কারেপুট্টাম। শেষেরটা (বিজয়দুর্গ) সব থেকে ভাল—এখানে সমুদ্র পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত চলে এসেছে। পাহাড়ের উপরে একটা দুর্গ আছে যেখানে স্বাভাবিকভাবে জল আসে। রাজা পর্তুগিজদের সঙ্গে ভাব করার ফলে এই দুর্গটির রক্ষণাবেক্ষণ আর করেন না।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিজাপুর রাজ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। যদুনাথ সরকার ১৬৩৬ সাল থেকে দাক্ষিণাত্যে মোগলদের আগ্রাসী ভূমিকার প্রাঞ্জল ইতিহাস লিখেছেন যার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। বার্নিয়ার-এর প্রথম দিকের লেখাতে বিজাপুরের অবস্থা কত খারাপ হয়ে এসেছিল তার বর্ণনা আছে। উনি তখনও বিজাপুরকে স্বাধীন দেখেছেন যার একটা কারণ যে মোগল সৈন্যরা রাজধানীর কাছে আসতে পারছে না। রাজধানীর আশেপাশে কোনও ফসল হয় না। কোনও গাছ পর্যন্ত নেই। পাহাড়ের মধ্যে বিজাপুর প্রায় দুর্ভেদ্য। এ ছাড়া জলেরও অভাব রয়েছে পথে। বার্নিয়ার বলছেন যে শুকনো ও নিষ্ফলা জমির মধ্যে বিজাপুর শহর খুব শক্ত এবং খাবার জল কেবলমাত্র শহরের ভিতরেই পাওয়া যায়। এ সব সত্ত্বেও বিজাপুর পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৬৩৫ সাল নাগাদ মোগলরা পারেন্দা দুর্গ দখল করে বিদর নিয়ে নেয় (১৬৫৩)। বিজাপুরের সুলতানের কোনও ছেলে না থাকায়, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা রানি (গোলকুণ্ডার সুলতানের বোন) একটি ছেলেকে দত্তক নেন। শিবাজি বিজাপুরের বহু জায়গা দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এর ফলে মোগলদের প্রথম কাজ শিবাজিকে পরাজিত করা, ফলে বিজাপুর কিছুদিনের জন্য রেহাই পেয়েছে।

ফরাসি পর্যটক থেভনো বিজাপুরের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি। উনি বলছেন যে মাদুরার নায়ক ও তাঞ্জোরের নায়ক বিজাপুরের অধীনে যদিও নেগাপট্টনম বন্দর প্রথমে পর্তুগিজরা ও পরে ওলন্দাজরা নিয়ে নেয়। দিনেমাররাও ট্রাঙ্কেবার-এ কুঠি বানিয়েছে। বিজাপুরের রাজাকে উনি দাক্ষিণাত্যের সব থেকে পরাক্রান্ত রাজা বলে বলেছেন। এই রাজ্যে বড় বড় কয়েকটি শহর ও বন্দর আছে এবং এঁকে অনেক সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজা বলে বলা হয়। বিজাপুর শহরটির ব্যাসার্ধ প্রায় দশ বা বারো মাইল। দুটো শক্ত দেওয়াল দিয়ে শহরটি ঘেরা যার চারপাশে গভীর পরিখা আছে। শহরের দেওয়ালে বুরুজের উপর বড় বড় কামান বসানো আছে। রাজার প্রাসাদটা শহরের মাঝখানে এবং এর চারপাশেও গভীর পরিখার মধ্যে প্রচুর কুমির রয়েছে। এই শহরের কয়েকটা

শহরতলি আছে যেখানে স্বর্ণকার ও অলংকার ব্যবসায়ীরা থাকে। এই শহরের বাণিজ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই। ওই সময়ে দত্তকপুত্র আলি আদিল শাহ দ্বিতীয় রাজত্ব করছিলেন।

১৬৭৩ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে গোয়া থেকে বিচোলিম হয়ে ফরাসি পর্যটক আবে কারে বিজাপুরে আসেন। বিজাপুরের উপরে ওঁর কাহিনী পর্যটকদের মধ্যে সব থেকে বিস্তৃত যদিও তার মধ্যে বর্ণনা নেই। বিচোলিম থেকে বিজাপুরের সীমান্তে এসে পৌঁছোন পাহাড়ের সরু রাস্তা ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেখানে উনি বাঘ ও বন্য বরাহ দলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। প্রথমে আসেন চাঁদগাদ শহরে (বেলগাঁও জেলার মধ্যে) যেখানে মুসলমান শাসনকর্তা একটা ছোট দুর্গে থাকেন। ওখানে উনি বহু লোককে দেখেছেন গোয়া থেকে শুঁটকি মাছ, নারকোল, আরাক মদ ও অন্যান্য খাবার বিজাপুরে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যেতে। গোয়া থেকে যেতে ওদের প্রায় ত্রিশ দিন লাগে। এদের সঙ্গেই উনি বিজাপুরে যান। পথের গ্রামগুলিতে ফল, দুধ ও বাজরা ধরনের শস্য খেয়েছিলেন। কিন্তু এরা সকলেই তামাক খায়, গাঁজা, আরাক ও তাড়ি ছাড়া। পথে কয়েকটি শহর পেয়েছিলেন যার মধ্যে রায়বাগ শহরের শাসনকর্তা এক ব্রাহ্মণ।

৪ জানুয়ারি বিচোলিম ছেড়ে কারে পালকি করে ১৩ জানুয়ারি বিকেলে বিজাপুর শহরে পৌঁছন। সরাইখানাগুলিতে এত বিদেশি বণিকদের ভিড় থাকায় জায়গা না পেয়ে উনি অন্য জায়গার সন্ধান করতে থাকেন। আর্মেনিয়ান বা পারসিক বণিকদের সঙ্গে মাল বেশি থাকায় ওরা কেউ আসেনি। এর মধ্যে উনি অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই পরিচিত খোজা আবদুল্লার (বিজাপুরের একজন অভিজাত) বাড়িতে আশ্রয় নেন। দুঃখের বিষয় কারে বিজাপুর শহরের কোনও বর্ণনা রেখে যাননি যদিও উনি শহরে বহু দিন ছিলেন। কিন্তু ওঁর বর্ণনার সঙ্গে থেভনোর বর্ণনার তফাত লক্ষ করা যায়। থেভনো বলেছেন বাণিজ্য কিছুই নেই বললেই চলে কিন্তু কারে প্রচুর আর্মেনিয়ান ও পারসিক বণিকদের কথা বলেছেন। সেদিক থেকে তাভারনিয়ার বর্ণনার সঙ্গে কারের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত রয়েছে।

১৬৭৫ সালের পর ইংরেজ পর্যটক জন ফ্রায়ার বিজাপুর সম্বন্ধে লেখেন। ততদিনে বাহলুল খান খাবাস খানের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। সামনে মোগল ও পিছনে শিবাজি—এই নিয়ে বিজাপুর কাল কাটাচ্ছে। বিজাপুর যে পতনের মুখে সেটা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। কিন্তু রাজ্যের যা বর্ণনা উনি দিয়েছেন তার সঙ্গে অন্যান্যদের বক্তব্য মেলে না। ফ্রায়ার বলেছেন যে রাজ্যটি ফসলে পরিপূর্ণ, ধনী এবং সমুদ্রপাড়ে রয়েছে পাহাড় ও জঙ্গল, যেখান থেকে কাঠ ও গবাদি পশু পাওয়া যায়। উপত্যকায় প্রচুর ধান ও নারকোল হয়। কয়েকটি নদী, শহর ও বন্দর আছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের ও পর্যটকদের রচনা থেকে যদুনাথ সরকার ১৬৮৬-৮৭ সালে ঔরংজেবের বিজাপুর জয়ের আগে শহরের একটা ছবি দিয়েছেন যার সারাংশ এখানে দেওয়া যেতে পারে। শোলাপুর থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল রুক্ষ মাটির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দক্ষিণ দিকে চোখে পড়ে বিখ্যাত সাদা গোল গম্বুজ যা মুহম্মদ আদিল শাহর সমাধিসৌধর উপর রয়েছে। জমির উপর দিকে এটি প্রায়

তিনশো ফুট উপরে। এর পরেই চোখে পড়ে বিজাপুর শহর যেখানে বিভিন্ন ধরনের বাড়ি রয়েছে। বহুসংখ্যক মসজিদ, প্রাসাদ ও মিনার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে পির আমিনের সমাধি, যার উপরেও সাদা গম্বুজ রয়েছে। আরও উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে সমাধিস্থান। যার মধ্যে কালো সমাধিসৌধ রয়েছে আইন-উল মুলকের। শহরে বিরাট দেওয়াল আড়াই বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রায় অর্ধচাঁদের মতন। এর পরিখা প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া। যার পরে রয়েছে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু দেওয়াল এবং গড়পড়তা চওড়া প্রায় বিশ ফুটের মতন। দরজাগুলিতে দশটা বুরুজ রয়েছে। এ ছাড়া সারা দেওয়ালে ৯৬টি বুরুজ। দেওয়ালের পিছনে রয়েছে উঁচু বারান্দা যার সামনে রয়েছে পাথরের পরদা যার ফাঁকে ফাঁকে কামান ও বন্দুক বসানো আছে। তিনটি বুরুজই খুব শক্ত। প্রথমটি *শরজি বুরুজ* যেটি ১৬৫৮ সালে তৈরি হয় এবং যার উপর রয়েছে বিখ্যাত কামান *মালিক-ই ময়দান*। সমকালীন ঐতিহাসিক ভীমসেনের *(নক্সাই-দিলখুসা)* মতে এটি তৈরি করেছিলেন নিজাম-উল মুলকের লোক রুমি খান। এটির উপর একটি লেখা রয়েছে যা থেকে একথা জানা যায়। এর পর এটি বিজাপুরের হাতে আসে। ঔরংজেব এর পর নিজের নাম এর উপর খোদাই করে দেন।

দক্ষিণদিকের দেওয়ালে ছিল *লাণ্ডা কাসব বুরুজ* যেটি তৈরি হয়েছিল. ১৫৬২ সালে। এর উপর বিজাপুরের সবথেকে বড় বন্দুক বসানো ছিল। তৃতীয় বুরুজটি তৈরি করেন একজন পর্তুগিজ সেনাপতি ১৫৭৬ সালে এবং এটিই ছিল সব থেকে শক্ত। ঔরংজেব আক্রমণ করেছিলেন লাণ্ডা কাসব বুরুজের বিরুদ্ধে এবং গোলার আঘাতে এর অনেকখানি ভাঙতে সমর্থ হন। এই বুরুজ ও *ফিরিঙ্গি বুরুজ* (তৃতীয় বুরুজ) এর মধ্যে ছিল মঙ্গলি দরওয়াজা যার মধ্য দিয়ে ঔরংজেব ঢুকেছিলেন ও যার নামকরণ তিনি পরে করেছিলেন *ফৎ দরওয়াজা।* এই দরজার কিছু দক্ষিণে, বাইরের সমতল জমিতে ছিল ইকলাস খানের সমাধিসৌধ, যেটি কয়েকবার হাতবদল হয়েছিল। শহরের অন্তত পাঁচটা দরজা এত ভারী ও শক্ত ছিল যে ঔরংজেব সেগুলি আক্রমণ করেননি।

শহরের মধ্যে ছিল কেল্লা। যাকে বলা হত কিল্লা আর্ক। এটি ছিল প্রায় এক মাইল ব্যাসার্ধের এবং এর ভিতরে সুন্দর সুন্দর বাড়ি ছিল। দক্ষিণ ও পূর্বে ছিল কয়েকটি বুরুজ। চারপাশ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা যার বাইরে ছিল পরিখা। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় পরিখা কাটা হয়েছিল যেটা দেওয়ালের গা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এর কারণ সম্ভবত, এদিকের দেওয়াল ছিল নিচু। কিন্তু কেল্লাটির অবস্থান ভাল ছিল না। শহরের সবথেকে নিচু জমির উপর ছিল। এর উত্তর-পশ্চিমে ছিল উঁচু জমি যার উপরে *উপরি বুরুজ* তৈরি করা হয়েছিল। আদিল শাহদের সব দপ্তরখানা ও অন্যান্য বাড়ি ছিল এই কেল্লার মধ্যে।

বহু মাস চেষ্টা করেও মোগলরা বিজাপুর শহরের পরিখা পার হতে পারেনি। কিন্তু শহরের প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় সুলতান সিকান্দার আদিল শাহ দুর্গ সমর্পণ করেন ১২ সেপ্টেম্বর ১৬৮৬ সালে। ১৯ সেপ্টেম্বর ঔরংজেব মঙ্গলি দরওয়াজা দিয়ে সিংহাসনের উপর বসে শহরে ঢোকেন। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে যা নানা রঙের চিত্র

ছিল সেগুলি ইসলাম ধর্মের বিপরীত বলে ঢেকে দেওয়া হয়। একটা রাজ্যের রাজধানী থেকে বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

মোগলবিজয় বিজাপুরকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দু বছর পরে এক মহামারী প্লেগে শহরের অর্ধেক লোক প্রাণ হারায় বা শহর ছেড়ে চলে যায়। কয়েক বছর পরে ভীমসেন বিজাপুরে এসে দেখেন যে বিজাপুর শহর ও তার বিরাট শহরতলি নৌরাসপুর প্রায় জনশূন্য ও ভগ্নদশা। শহরে বিশেষ লোক নেই এবং শহরের অধিকাংশ কুয়োতে আর জল নেই। বোম্বাই গেজেটিয়ারে এই শহরের অন্তিম অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সারি সারি ভেঙে পড়া বাড়ি, বিরাট প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গল যার মধ্যে কয়েকটা বড় বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। শহরের অর্ধেকটাই ভাঙা যার মধ্যে ছাদহীন প্রাসাদ ও দেওয়ালহীন বাড়ি—মাঝে মাঝে এক একটা মসজিদ বা সমাধিসৌধ উঁকি মারে। এরই মধ্যে আদিল শাহিদের সাদা গম্বুজ দাক্ষিণাত্যে এক শতাব্দী ধরে জীবন্ত শহরের প্রাণবন্ত জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সিকান্দার আদিল শাহকে আত্মসমর্পণের সময়ে ঔরংজেব যা করবেন বলেছিলেন করেননি। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় দৌলাতাবাদ দুর্গে যেখানে তিনি সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন গোলকুণ্ডার পরাজিত সুলতান আবুল হাসানকে। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পর, সিকান্দার আদিল শাহ ঔরংজেবের সঙ্গে ছিলেন সাতারা দুর্গ অবরোধের সময় যেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ৩২ বছর বয়সে তেসরা এপ্রিল ১৭০০ সালে। মানুচ্চি বলেছেন যে ঔরংজেব ওঁকে তরমুজের বিষ দিয়ে হত্যা করান। ওঁর শেষ ইচ্ছামতো ওঁকে সমাধি দেওয়া হয় বিজাপুর শহরে ওঁর গুরু শেখ ফাহিমুল্লাহর সমাধির নীচে।

১৬

বুরহানপুর

আনুমানিক ১৪০০ সাল নাগাদ খান্দেশের ফারাকি বংশের নাসির খান তাপ্তি নদীর ধারে বুরহানপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন যেটি চলেছিল প্রায় দুশো বছর। ১৬০০ সাল নাগাদ আকবর বুরহানপুর দখল করলে এই বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। দক্ষিণের বড় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এই শহর এবং মোগলরা একে এতটা গুরুত্ব দিতেন যে হয় কোনও যুবরাজ না হলে উচ্চপদস্থ কোনও অভিজাতকে এর শাসনকর্তা করে পাঠানো হত। বুরহানপুর থেকে তিনটি রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর ভারতে আগ্রা ও দিল্লির সঙ্গে সংযোগ করেছে। এটি দিয়ে কিছু দূর গেলে পাওয়া যায় দুর্ভেদ্য আসির গড় দুর্গ যা ১৮৬৮ সালের আগে মাত্র একবারই জয় করা হয়েছিল। দুর্গটি জমি থেকে প্রায় ৯০০ ফুট উঁচু এবং বুরহানপুর শহরকে সুরক্ষিত করেছে যার ফলে দুর্গের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ নিবিড়। আমির ও বুরহানপুরের মধ্যে প্রায় তিরিশটি গ্রাম আছে যেগুলি এই শহর ও দুর্গের উপর নির্ভরশীল। বুরহানপুরের পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরোলে খান্দেশের পশ্চাদভূমি দিয়ে সুরাটে যাওয়া যায়। এটি দিয়ে সুরাটে যেতে লেগে যেত পনেরো দিন। তৃতীয় পথটি দিয়ে যাওয়া যেত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাতে। এর ফলে বুরহানপুরের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ষষ্ঠদশ শতকের শেষদিকে (১৫৯১ সালের আগে) র‍্যালফ ফিচ গোলকুণ্ডা থেকে বেরার-এর বালাপুর হয়ে বুরহানপুরে আসেন। আশ্চর্যের বিষয় উনি বলছেন যে এটি আকবরের সাম্রাজ্যের অধীনে। এটি ঠিক নয় কারণ বুরহানপুর জয়ের তারিখ আনুমানিক ১৬০০ সাল। ফিচ বলছেন যে এদের গোল, মোটা রূপার টাকা আছে এবং এই রূপা খুব ভাল। এই জায়গাটি চমৎকার, বড় এবং প্রচুর লোক থাকে। বর্ষাকালে ঘোড়ায় চড়ে ছাড়া যাওয়া যায় না কারণ এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায়। বাড়িগুলি অবশ্য খড়ে ছাওয়া। এখানে প্রচুর তুলো আছে এবং রং দেওয়া কাপড় বিক্রি হয়। এ ছাড়া তুলো ও উলের কাপড়ও পাওয়া যায়। প্রচুর সংখ্যায় অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেখেছেন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে। সতীপ্রথারও উল্লেখ করেছেন।

১৬১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে আসেন উইলিয়াম ফিঞ্চ। শহরে তখন এত সৈন্য ছিল যে উনি বাড়ি ভাড়া না করতে পেরে আর্মেনিয়ানদের জায়গায়

তাঁবুতে থাকেন। এর কাছেই দুই ক্রোশের মধ্যে, বাহাদুরপুর শহর। এই দুই শহরের মধ্যে খান খানানের সৈন্যদের তাঁবু পড়েছিল। এর বিপরীত দিকে দাক্ষিণাত্য-সৈন্যরা ছিল। এদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে বুরহানপুর শহর সহজেই তারা নিতে পারত। কিন্তু যথাসময়ে সুলতান পারভিজ ও মানসিংহ প্রচুর সৈন্য নিয়ে এসে পড়ায় শহরটা বেঁচে গিয়েছে। এই শহরটি বিশাল, কিন্তু খারাপভাবে তৈরি। একটা নিচু জমির উপর বলে এর বাতাস ভাল নয় এবং জল খারাপ বলে এটা অস্বাস্থ্যকর। উত্তর-পূর্ব দিকে নদীর ধারে একটা বড় এবং সুরক্ষিত দুর্গ। নদীর দিকে দুর্গের ধারে একটা প্রমাণ আয়তনের পাথরের হাতি বসানো আছে। এর কপালটা লাল রং করা এবং সাধারণ ভারতীয়রা একে পুজো করে। শহর থেকে দু ক্রোশ দূরে খানখানার বাগান যাকে লাল বাগ বলা হয়। বাগান অবধি পথটা খুব সুন্দর, দুপাশে সারি সারি গাছ ছাওয়া করে রেখেছে। এর ভিতরে নানা রকম পথ রয়েছে হাঁটার। চারটি গাছের মধ্যে একটা ছোট চৌকো পুকুর আছে যার চারপাশে দেওয়াল। বাইরে ঢোকার জায়গায় একটা বাড়ি আছে। এখান থেকে উনি ১২ ক্রোশ দূরে বারে (বরগাঁও, বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এই পথে যাবার চার ক্রোশ দূরে পান দুর্ভেদ্য দুর্গ আসিরগড়। একটা বড় পাহাড়ের চূড়োয় এটা অবস্থিত এবং ভিতরে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী থাকতে পারে। উপরে অনেক জায়গা আছে এবং জলাধার আছে। শেষ রাজা বাহাদুর শাহর সময়ে এতে ছিল দুশোটি কামান। আকবর বহু চেষ্টার পর ঘুষ দিয়ে এটি দখল করেন। সৈন্যদের জন্য এ সময়ে বুরহানপুরে থাকার জায়গায় পাওয়া যাচ্ছিল না, তার কথা বলেছেন সমসাময়িক পর্যটক উইলিয়াম হকিন্স। উনি ওঁর পরিচিত এক পাঠান সর্দার, শের খানের বাড়িতে ছিলেন, কারণ শহরে তখন থাকার জায়গা ছিল না। ওখানে উনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের প্রাসাদে দেখাও করেন।

সব থেকে বেশি সময় বোধহয় থাকেন টমাস রো। ১৬১৫ সালের ১৪ নভেম্বর সুরাট থেকে উনি বুরহানপুরে আসেন। উনি বলেছেন সারা পথ (প্রায় ২৩৮ মাইল) খুব খারাপ। কিছু পাওয়া যায় না, শহর বা গ্রাম যা আছে তা সবই মাটির, যার ফলে ভদ্রলোকের থাকার মতো কোনও বাড়ি নেই। শহরের কিছু আগে উনি বাহাদুরপুর বলে একটা গ্রাম পান যেটি গোলাবারুদের গুদাম। নানা রকম পিতলের বন্দুক দেখেছেন কিন্তু খুব ছোট। ওই গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে বুরহানপুর যাবার পথে ওঁর সঙ্গে কোতোয়ালের দেখা হয়। কোতোয়াল ওঁকে সরাইতে নিয়ে আসেন যেখানে ওঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর বাইরেরটা পাথরের। ভিতরে যে চারটি ঘর ওঁকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি উনুনের মতো। উপরটা বড় ও ইটের তৈরি। একটি চিঠিতে রো লিখছেন যে এখানকার ঘরগুলি গোলাকার, দরজা ছাড়া আলো আসার ব্যবস্থা নেই এবং এত ছোট যে দুটো গাড়ির জিনিসপত্র রাখার জায়গা হবে না। উনি কোতোয়ালকে খবর পাঠালেন যে উনি শহরের বাইরে থাকবেন। কিন্তু কোতোয়াল ওঁকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ফস্টার অনুমান করেছেন যে এই সরাইটি কিল্লার কাছে *আকবরি সরাই* যেটি ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এর প্রধান দরজার উপরে যে পারসিক শিলালেখ রয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সরাইটি তৈরি করা সম্পূর্ণ হয় ১৬১৭-১৮ সালে। সুতরাং এটি এর আগেই

একটা সরাই ছিল যেটি পরবর্তীকালে সংস্কার করে বাড়ানো হয়।

সরাইতে অধিকাংশ জিনিসপত্র রেখে, রো একটা সুন্দর বাগানের মধ্যে তাঁবু ফেলে কিছু লোক নিয়ে যান। কোতোয়াল অবশ্য বলেছিলেন যে এটাই শহরের মধ্যে সবথেকে ভাল সরাই। সারা শহরভর্তি যে বাড়িগুলি রয়েছে সেগুলি মাটির কুটির, কেবল যুবরাজ পারভিজ, খান খানান ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমিরের বাড়ি ছাড়া।

কোতোয়ালের সঙ্গে উনি যুবরাজের সঙ্গে দেখা করতে যান। বাইরের উঠোনে প্রায় একশো সুসজ্জিত সৈন্যর সারির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। যুবরাজ ভিতরের উঠোনে বসেছিলেন একটা উঁচু গোল জায়গায়। ওঁর মাথার উপরে একটা সামিয়ানা ছিল, সামনে একটা গালিচা। চারপাশে লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ফস্টার মনে করছেন যে কিল্লার মধ্যে এটি *দেওয়ান-ই আম* যেটি ভগ্ন অবস্থায় আছে। রো বলছেন একটা চিঠিতে যে এই পুরনো ও প্রধান শহরে একটা কিল্লা আর কয়েকটা খারাপ বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কিল্লার দেওয়ালগুলি ছিল এবং দেওয়ান-ই-আমের মধ্যে নানা রঙের ছবির চিহ্নও পাওয়া যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি স্বর্ণকার তাভারনিয়ার বুরহানপুরে আসেন সুরাট থেকে। বুরহানপুরের পাঁচ ক্রোশ আগে বলদেলপুরায় মালভর্তি গাড়িকে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু শুধু লোক থাকলে কিছু দিতে হয় না। উনি বলছেন যে বুরহানপুর একটা বড় শহর, যার অনেকাংশ ভেঙে গিয়েছে। অধিকাংশ বাড়িই মাটির, খড়ে ছাওয়া। শহরের মাঝখানে একটা বড় কিল্লা আছে এবং শাসনকর্তা ওখানেই থাকেন। এই প্রদেশের শাসন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা কেবলমাত্র যুবরাজ বা সম্রাটের ভাইকে ভার দেওয়া হয়। সম্রাট হবার আগে বুরহানপুরে শাসনকর্তা হিসেবে ছিলেন ঔরংজেব। এই শহরে বেশ বড় বাণিজ্য আছে এবং শুধু এই শহরে নয়, সারা প্রদেশে বেশ অনেকখানি মসলিন তৈরি হয়। এগুলি রপ্তানি হয় পারস্য, তুর্কিদেশ, মস্কোভি, পোল্যান্ড, আরবদেশ, বড় কায়রো এবং অন্য জায়গায়। এগুলির কতকগুলি বিভিন্ন রঙে ডাই করা হয় ও লতাপাতা দিয়ে চিত্রিত করা হয়। মেয়েরা এগুলি দিয়ে বোরখা ও বড় রুমাল তৈরি করে। এ ছাড়া বিছানার চাদর ও রুমাল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও অন্য ধরনের সাদা কাপড় আছে যার মধ্যে রুপা বা সোনার পাড় সারা কাপড় জুড়ে রয়েছে। রেশমের উপর সোনা ও রুপার ফুল তোলা কাপড়ও পাওয়া যায়। পোল্যান্ডে যে সব কাপড়ের চাহিদা খুব বেশি, তার মধ্যে রয়েছে এই ধরনের কাপড় যার মধ্যে সোনা ও রুপার জরি দেওয়া রয়েছে তিন-চার ইঞ্চি। বণিককে অবশ্য খুব সাবধানে এই কাপড়গুলি গাঁটরি বাঁধতে হয়, তা না হলে ওই সোনা বা রুপা কালো হয়ে যেতে পারে। সে রকম হলে ওই কাপড় আর বিক্রি হবে না। এ ছাড়াও বুরহানপুরে তাঁতের কাপড় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভীমসেন বুরহানপুরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঔরংজেবের পূর্ববর্তী ইতিহাসের ফাঁকে। উনি বলছেন যে বুরহানপুর একটা সমৃদ্ধশালী জায়গা এবং ভাল শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ তাপ্তি নদীর ধারে। দুর্গ ও প্রাসাদের জমি এই জন্য উঁচু করা হয়েছে। এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে অভিজাত ও বণিকদের বাড়ি। এই দুর্গের সামনে হয়েছে একটা বড় চক, যাকে নানাভাবে সাজানো হয়েছে। দুর্গের

তিনটি দরজাকে বলে *ত্রিপোলিয়া*। দুর্গের মধ্যে ভাল জলের পুকুর রয়েছে। এ ছাড়া দোকান রয়েছে। এখানে বিভিন্ন দেশের মূল্যবান দ্রব্য ধনী ও শিল্পমালিকরা নিয়ে এসেছে। বাজারে পাওয়া যাবে না এরকম কোনও জিনিস এখানে নেই। ইরান, তুরান, রুম, শাম, বল্‌খ, বোখারার মূল্যবান কাপড় এখানে পাওয়া যায়। সব ধরনের ও বিভিন্ন দ্রব্যের কারিগরও শিল্পীরা এই শহরে বসবাস করে। শহরের লোক বাইরে বাগানে যায় মনোরঞ্জনের জন্য। এইসব বাগানে নানা ধরনের উৎসব হয়। নদীর বিপরীত দিকে রয়েছে রাজকীয় *আহুখানা* বা হরিণের বাগান। শহরের চারপাশে বাগান বানানো হয়েছে। শহরের আবহাওয়া ভাল। এমনকী ভিখারিদের জন্যও আবহাওয়া ভাল। পূজা-প্রার্থনার জন্য অনেকগুলি সৌধ করা হয়েছে। বহু জায়গায় বাড়ি আলাদা করে রাখা হয়েছে শস্যর গুদামের জন্য। এখানকার জোয়ার ভাল খেতে। এখানকার অধিবাসীরা মহাজন ও গুজরাটি এবং তাদের খাবার জন্য সবরকম শস্যই পাওয়া যায়। শহরের বাইরে কয়েক্‌টা শহরতলি আছে যেমন রামপুরা, যশবন্তপুরা, বাহাদুরপুরা ইত্যাদি। ওইগুলোর লোকসংখ্যা বড় শহরের লোকসংখ্যার থেকে কিছুটা কম। পরগণাগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পাওয়া যায় ও বড় শিকারও পাওয়া যায়। কাছের কুরারা গ্রামে রাজার শিকার করার জায়গা আলাদা করা আছে যেখানে নীলগাই ও হরিণ শিকার করা যায়। শহর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে আসির দুর্গ যেটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। এটি পুরনো দুর্গ। এখানে প্রচুর আঙুর পাওয়া যায় যেগুলি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় উপহার হিসেবে। এই শহরেই ভীমসেন জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে ভীমসেন সরাই বা অন্যান্য বাড়ি অথবা শহরের রাস্তা সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীর সঙ্গে এটাই ওঁর বর্ণনার তফাত। এই ফারাক আরও বোঝা যাবে যদি আমরা ফরাসি পর্যটক থেভনোর বক্তব্য দেখি যিনি ভীমসেনের সময়েই এসেছিলেন।

থেভনো এসেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্ষাকালে। তখন এত বৃষ্টি পড়ছিল যে শহরের নিচু রাস্তাগুলি জলে পরিপূর্ণ হয়েছিল। উনি বলছেন যে, বুরহানপুর একটা বড় শহর কিন্তু অসমতল জমির উপর তৈরি। কতকগুলি রাস্তা আছে যেগুলি খুব উঁচু, আবার কতকগুলি আছে খুব নিচু। উঁচু রাস্তা থেকে এই নিচু রাস্তাগুলিকে পরিখার মতো লাগে। এই উঁচুনিচু রাস্তা এত বেশি যে কিছুক্ষণ চললেই ক্লান্তি আসে। বাড়িগুলি একেবারে সুন্দর নয় কারণ এদের অধিকাংশই তৈরি হয়েছে মাটি দিয়ে। কিন্তু অনেকগুলি পালিশ করা টালি দিয়ে ঢাকা। এর ফলে ছাদের রং নানারকম এবং নীচে সবুজের সঙ্গে মিশে দেখতে ভাল লাগে। এখানে দুটো সরাইখানা আছে—একটা বিদেশিদের থাকার জন্য ও অন্যটিতে রাজার টাকা রাখা হয় যা প্রদেশ থেকে আসে। যেটি বিদেশিদের জন্য সেটি বড়। জায়গাও বেশি অন্যটার থেকে। এটা চারকোনা এবং এর সামনেটা ময়দানের দিকে। ময়দান বেশ বড়, প্রায় ৫০০ ফুট লম্বা ও ৩৫০ ফুট চওড়া। কিন্তু এটা খুব সুন্দর দেখতে নয়, কারণ এখানে প্রচুর বিচ্ছিরি কুঁড়েঘর আছে যেখান থেকে ফল বিক্রি করা হয়।

ময়দানের দিক দিয়ে দুর্গে ঢুকতে হয়। প্রধান দরজাটা দুটো বড় বুরুজের মধ্যে।

এর দেওয়াল খুব পুরু এবং চারদিকে দেওয়াল যার মধ্যে মধ্যে গোল বুরুজ আছে। এগুলি দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় এবং ব্যাসার্ধ প্রায় ত্রিশ ফুট। এই দুর্গের মধ্যে রাজার প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতরে অনুমতি ছাড়া যাওয়া যায় না। শহরের পুব দিক দিয়ে তাপ্তি নদী যাচ্ছে এবং দুর্গের পুরো একটা দিক নদীর দিকে। ওই ধারের বুরুজগুলো আরও বেশি উঁচু কারণ প্রাসাদের উঁচুতলায় সুন্দর বারান্দা আছে। রাজা যখন বুরহানপুরে আসেন, তখন ওখান থেকে দর্শন দেন ও নদীর মাঝখানে হাতিদের লড়াই উপভোগ করেন। ওই একই জায়গায় একটা বড় আকারের হাতির মূর্তি আছে যার মাথাটা লাল কিন্তু নীচের দিকটা কালো। এর পিছনের দিকটা জলের মধ্যে রয়েছে এবং শরীরটা বাঁ দিকে হেলে রয়েছে। শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় হাতিটি মারা যায়। শাহজাহান একে ভালবাসতেন বলে এটা তৈরি করিয়েছিলেন। হিন্দুরা একে পুজো করে ও রং চড়ায়।

এখানকার লোকেরা সাধারণত তাপ্তি নদীর জল পান করে না কারণ জলের রং কালচে। সাধারণত জল নেওয়া হয় ময়দানের একটা জলাধার থেকে যেখানকার জল দূরের একটা ঝরনা থেকে আসে। ওই ঝরনার জল প্রথমে যায় বিদেশিদের জন্য যে সরাইখানা আছে সেখানে এবং তারপর মাটির নীচে দিয়ে এই জলাধারে। রাত্রে অনেক সময়ে এই জলাধার খালি হয়ে যায় কারণ সারাদিন ধরে প্রচুর লোক এখান থেকে জল নিতে থাকে। কিন্তু রাত্রেই এটা আবার ভর্তি হয়ে যায় এবং জল লোকে পাচ্ছে না এ ঘটনা বিরল। নদীর অপর পারেও অনেকগুলি বাড়ি আছে এবং একে দ্বিতীয় শহর বলা যায়।

এই প্রদেশের সবথেকে বড় বাণিজ্য হচ্ছে তাঁতের কাপড়ের যার অনেকখানিই হয় বুরহানপুরে। অন্যান্য জায়গার মতো রং করা কাপড়ও এখানে বিক্রি হয় কিন্তু সাদা কাপড়কেই মর্যাদা দেওয়া হয় কারণ ওর মধ্যে সোনা ও রূপার সুন্দর জরির মিশ্রণ আছে। এ ছাড়াও প্রচুর ধান ও নীল এখানে হয়।

দুর্গটা আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার কথা বলেছেন জাহাঙ্গিরের সময়ের পর্যটক দ্য লে। উনি বলছেন যে একটা বড় খোলা শহর ছিল এবং এর দুর্গ ছিল না। যুবরাজ খুরম যখন বিদ্রোহ করেন, তখন রাণা রতন একটা মাটির দেওয়াল দিয়ে এটা ঘিরে কয়েকটা জায়গা সুরক্ষিত করেন। ১৬২৬ সালে যখন খানজাহান দাক্ষিণাত্যের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, তখন তিনি লস্কর খানকে আদেশ দেন সারা শহর শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিতে। লোক তখন কম থাকায় এ কাজটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়েছিল। সবটা ধরলে এর ব্যাসার্ধ ১২ ক্রোশের বেশি নয়। এখানে অনেকগুলি বুরুজ আছে কিন্তু সবগুলিই মাটির। তাপ্তি নদী সুরাট থেকে এখানে এসেছে সত্যি কিন্তু নৌ চলাচলের উপযুক্ত নয় কারণ প্রচুর বড় পাহাড় রয়েছে। আগে বাণিজ্য অনেক বেশি ছিল কিন্তু এখন কমে গিয়েছে। এই শহরে মাল প্রচুর পরিমাণে নেওয়া হত যখন খান খানান বা যুবরাজ খুরম (পরবর্তীকালে শাহজাহান) এর শাসনকর্তা ছিলেন। খুরম বহু কারিগর ও শিল্পীকে এখানে আনিয়েছিলেন বেশি পরিমাণে দিনমজুরি দিয়ে। জাহাঙ্গিরের মতোই খুরম ভাল জিনিস চাইতেন, কিন্তু জাহাঙ্গিরের থেকে অনেক বেশি উদার হাতে টাকা দিতেন। ওঁর বিদ্রোহের পর বুরহানপুর দেওয়া

হয় সুলতান পারভিজকে যিনি মদ খেয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করতে চাইতেন না। ইরেজদের এখানে একটা কুঠি আছে প্রধানত উলের কাপড়, সিসে, টিন, সাটিন, ভেলভেট ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য। বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া যায় সেগুলি সবই পাঠিয়ে দেওয়া হয় আগ্রা বা সুরাটে জিনিস কেনার জন্য। স্থানীয় কোনও জিনিস তাদের বাণিজ্যের জন্য কাজে লাগে না। ইংরেজদের কুঠি এখন আর আগের মতো নেই। একজন এজেন্ট আছেন পুরনো জমানো মাল বেচার জন্য।

বুরহানপুর দুর্গের মধ্যে, মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য দুর্গের ইতিহাসের মতোই, নানা রকম ঘটনা ঘটেছিল। দ্য লে বলছেন যে তিনি জাহাঙ্গিরের ছেলে সুলতান খুসরুকে দেখেছিলেন। এর পর উনি বলছেন যে যুবরাজ খুরম ১৬২১ সালে বুরহানপুর দুর্গের মধ্যে খুসরুকে হত্যা করেন। ওকে রাজা নামে এক দাস হত্যা করে যার পর ওর মরদেহ এলাহাবাদে নিয়ে তার মায়ের কবরের পাশে কবর দেওয়া হয়। এ নিয়ে সাম্রাজ্যে একটা সোরগোলও উঠেছিল যদিও ঐতিহাসিকরা প্রমাণ পাননি যে খুরম এই হত্যার পিছনে ছিলেন।

ফারাকি বংশের শেষদিকে বুরহানপুরে দুটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। চতুর্থ আদিল শাহ (রাজা আলি খান) জামা মসজিদ তৈরি করেন ১৫০০ সালে। এর সমসাময়িক ছিল বিবি কা মসজিদ। দ্বিতীয়টি আহমদাবাদের কোনও কোনও মসজিদের মতন। মোগলদের সময়ের প্রাদেশিক শাসনকর্তার একটা সমাধি রয়েছে শাহ নওয়াজ খানের যেটি অনেকখানি গুজরাটি সমাধির মতো। কিন্তু জলের ব্যবস্থাটি করা হয়েছিল মোগলদের সময়ে ১৬১৮ সাল থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে। জল যে জলাধারে এসে পড়ত সেটিকে বলা হত *জালি কারাঞ্জ।* এখান থেকে মাটির টালির নালার সাহায্যে জল শহরে পাঠানো হত। দ্য লে যখন এসেছিলেন তখনও পর্যন্ত এই মাটির নীচের নালি তৈরি করা হয়নি।

বুরহানপুর ও খান্দেশের পশ্চাদভূমি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মারাঠাদের আক্রমণের মুখে পড়ে। ১৬৯৯ সালে রাজা রাম খান্দেশ আক্রমণ করেন। মারাঠাদের অর্ন্তদ্বন্দ্বের মধ্যেও খান্দেশের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। ১৭১৯ সালে মোগলরা মারাঠাদের দাক্ষিণাত্যে চৌথ-এর অধিকার দিতে রাজি হলে গোলমাল কিছুটা কমে। মাঝে মাঝে পেশোয়ার আক্রমণ হলেও, ১৭৩০ সালের অবস্থার উন্নতি হয়।

১৭৫০-এর শেষ দিকে মারাঠারা বুরহানপুর ও আসির দুর্গ নিজেদের দখলে আনে। এরা মোগলদের নিয়ম অনুযায়ী শহরে কর আদায় করতে থাকে। ১৭৬৫ সালের দলিল থেকে অধ্যাপক গর্ডন অনুমান করেছেন যে শহরে তিরিশ লক্ষ টাকার মতো বাণিজ্য হচ্ছিল, যদিও উনি তখনকার অবস্থা বিবেচনা করে এটাকে অনেক বেশি বলেছেন। এ ছাড়া শহরের টাঁকশালও ভালভাবে চলছিল। টাঁকশালের মারাঠা দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে এক বছরে এক লক্ষ দশ হাজার রূপার তোলা থেকে মুদ্রা করা হয়েছিল ও ৪৫,০০০ হাজার পুরনো মুদ্রাকে নতুনভাবে করা হয়েছিল। অন্যান্য পণ্যর বিক্রিও বিশেষ কমেনি যদিও দিল্লি-আগ্রার রাস্তা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বুরহানপুরের অবস্থা, অন্তত বাণিজ্যিক দিক থেকে, মারাঠাদের সময়ে বিশেষ কিছু খারাপ হয়নি বলে অধ্যাপক গর্ডন মনে করছেন যদিও কাছাকাছির

মারাঠা শহরগুলি, যেমন ইন্দোর বা উজ্জয়িনী, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আসছে।

১৭৭৬ সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে মোদাভ আগ্রা থেকে বুরহানপুরে আসেন। পথের অবস্থা তিনি কিছু খারাপ দেখেননি। সারা পথ জুড়ে বাঁধানো কুয়ো থেকে জল তুলে লোকেরা কাজ করছে দেখেছেন। খাড়া পাহাড়ের সরু পথ ধরে মোদাভ যখন সমতল ভূমিতে আসেন, তখন ওর মাঝখানে বুরহানপুর দেখতে পান। এই সমতল ভূমি খুব সুন্দর ও ভাল চাষ হয়। সাতপুরা পাহাড় তিন দিক ঘিরে রয়েছে। গভীর খাদের মধ্য দিয়ে পথ চলে গিয়েছে বুরহানপুর শহরে। এর চারপাশে বাগান ও গাছ। আরও এগোলে দেখা যায়, ইটের ভাল গাঁথনি করা দেওয়াল ভাল অবস্থায় রয়েছে। দিল্লি দরজা বেশ বড় ও পাশে বুরুজ করা। মোদাভ হিন্দুস্থানে এত সুন্দর দেওয়াল এত ভাল অবস্থায় থাকতে দেখেননি। এই দরজা থেকে সুন্দর একটা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে শহরের মধ্য দিয়ে। এটা একটু সরু কিন্তু সোজা। বাড়িগুলোর সামনে বারান্দা রয়েছে।

মোদাভ বলছেন যে ভারতের অন্যান্য শহরের মতোই এই শহরটি বহু আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েক বছর হল মোগলরা মারাঠাদের দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি ছেড়ে দিয়েছে। মারাঠারা প্রথমে ওদের অবিশ্বাস করলেও, পরে ওদের জন্য ছাড়পত্র তৈরি করে দেয়। একটা বাগানের মধ্যে তাঁবুতে মোদাভ ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন।

শহর উত্তর দিকের পাহাড় থেকে আগে খালের সাহায্যে শহরে জল নিয়ে আসা হত। মোদাভ যখন এসেছেন তখন এটা শুকনো যদিও এর খুব ক্ষতি হয়নি। শহরের দক্ষিণে ও দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো তাপ্তি নদী। শহরটি উজ্জয়িনীর মতোই বড় কিন্তু দেওয়াল অনেক ভাল। পাহাড়ের থেকে জল নিয়ে আসার জন্য যা কাজ করা দরকার সেগুলি করা হয়েছিল নদীর পাশ থেকেই। এই কাজগুলি এখনও ভাল অবস্থায় আছে যদিও এর ব্যবহার এখন আর নেই। এইগুলি হচ্ছে বাঁধানো খাল এবং মাঝে মাঝে ভিতরে খিলান করা খালে বাতাস আনার জন্য। মোদাভ মনে করেছেন যে এর সাহায্যে শহরে প্রচুর পরিমাণ জল আনা সম্ভব হয়েছিল। শহরের মধ্যে কয়েকটা ভাগ হয়ে জল শহরের বিভিন্ন দিকে গিয়েছে। এ শহরের জলের ব্যবস্থার কথা বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেও জানা যায়। মধ্যপ্রদেশের গেজেটিয়ারে গ্রাণ্ট বলছেন যে এই জল খাওয়া যেত। আশেপাশে প্রায় আটটি জল আনার খালের ব্যবস্থা উনি দেখেছেন যার মধ্যে দুটি মাটির নীচে ছিল। দক্ষিণের দিকে উতাওলি নদীর উপর বাঁধটি তখনও ছিল। অন্য ছয়টি একসারি কুয়োর মতো যাদের সঙ্গে নীচের জলের নালির যোগ ছিল যেগুলি দিয়ে জল ধরে বাঁধানো খাল দিয়ে শহরে নিয়ে আসত। গ্রান্টের সময় পর্যন্ত একটি (নাম *ফুটা ভাণ্ডার*) শহরের একটা বড় অংশে জল সরবরাহ করছিল। অন্য আরেকটির নাম ছিল *তীরখুটি* যেটি জল নিয়ে যেত *কালবাগ* নামে একটি বাগানে। অন্য তিনটির জল যেত বাহাদুরপুর শহরতলিতে। পুরনো শহরের দেওয়াল দশ মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে যেটি ১৭৩১ সালে নিজাম-উল মুলক সংস্কার করে প্রায় নতুনভাবে তৈরি করান। এ ছাড়া কতকগুলি নতুন বুরুজ ও নয়টি দরজাও উনি করান। ১৭২৩ সালে নিজাম-উল মুলক এখানে আসেন ও ১৭৪৮ সালে এখানেই মারা যান। ১৭৬০ সালে এটি পেশোয়াকে দেওয়া

হয় ও ১৭৭৮ সালে এটি সিন্ধিয়ার হাতে চলে যায়।

মোদাভের মতে বুরহানপুর কখনওই বাণিজ্যিক শহর হিসেবে ছিল না যদিও বিভিন্ন পর্যটকের লেখায় এ কথা পাওয়া যায়। এর কারণ এটি সুরাট-দিল্লির পথের উপরে ও হিন্দুস্তান-দাক্ষিণাত্যের পথের মধ্যে। মোদাভ শহরটি খুবই গরিব বলে অভিহিত করেছেন। শহরের ভিতরে প্রায় কোনও কার্যকলাপ নেই এবং তখন ছিল একেবারে শান্ত। শহরের লোকগুলি বিদেশিদের বিরুদ্ধে নয়, যা সাধারণত ভারতের অন্য শহরে দেখা যায়। শহরের ভিতরে দেখার মতো কোনও বাড়ি নেই। কেবল একটা দুর্গ বা প্রাসাদ রয়েছে যেটি শহরের মাঝখানে রয়েছে। এটার প্রায় ভগ্নদশা, যে অবস্থা তাভারনিয়ার দেখেছিলেন প্রায় ১৩০ বছর আগে। তারপর থেকে এটার আর কোনও সংস্কার হয়নি। এখানকার গবাদি পশুর চেহারা খুব ভাল বলে মোদাভ মন্তব্য করেছেন। তাপ্তি নদীতে যখন জল থাকে তখন সাবধানে নৌকা করে সুরাটে যাওয়া যায়। বুরহানপুরের চারপাশে যে প্রচুর তুলো হয় সেগুলি সুরাটে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই শহরে কাপড় তৈরি করার কাজে লাগানো হয় না। জল না থাকলে শহরের সামনে নদী হেঁটে পার হওয়া যায়।

অধ্যাপক গর্ডনের মত মেনে নিয়েও বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি মারাঠাদের সময়ে হলেও, বুরহানপুর শহরের বিশেষ উন্নতি হয়নি। চেষ্টা বোধহয় করেছিলেন নিজাম। কিন্তু মারাঠা আমলে আশপাশের অন্য শহরগুলি গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন নিতে থাকলে, বুরহানপুরের অবস্থা সীমিত হয়ে যায়। অভিজাতরা চলে যাওয়ার ফলে দুর্গের বা অন্যান্য বাড়ির অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

১৭

বাংলা

১৭.১ রাজমহল

১৫৭৫ সালে দায়ুদ কারনানি বশ্যতা স্বীকার করলে, মুনিম খান গৌড়ে কিছুকাল থাকেন। ওখানে একটা মহামারী শুরু হলে , তিনি তাণ্ডাতে বাংলার রাজধানী সরিয়ে আনেন কিন্তু দশ দিন পরে ২৩ অক্টোবর ১৫৭৫ সালে মারা যান। ১৫৮৮ সালের পর পর্যটক র‍্যালফ ফিচ তাণ্ডা শহরে এসেছিলেন। উনি তখন এখানে তুলো ও তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা দেখেছেন। গঙ্গা এখান থেকে কিছু দূরে চলে যাওয়ায় শহরটি নদী থেকে দূরে হয়ে গিয়েছে। একসময় গঙ্গার প্লাবনে আশেপাশের গ্রামগুলি ডুবে গিয়েছিল।

১৫৯৫ সালের ৭ নভেম্বরে মানসিংহ সুবাদার হবার পর গঙ্গার অপর পারে রাজমহলে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। এর নামকরণ করেন *আকবর-নগর*। প্রধানত নদীর উপর থেকে আক্রমণ এড়ানোর কথা বললেও, মনে হয় যে তাণ্ডার পাড় ক্রমশ নদী ভাঙছিল যার ফলে তাণ্ডা ক্রমশ অনাবাসযোগ্য হয়ে পড়ছিল। এ ছাড়া উত্তর ভারতের সঙ্গে, বিশেষত বিহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য রাজমহল ছিল আরও কাছে। আবুল ফজল *আকবরনামাতে* বলছেন যে খুব তাড়াতাড়ি এখানে একটা সুন্দর শহর গড়ে ওঠে। বাংলার রাজধানী হবার সৌভাগ্য অবশ্য রাজমহলের বেশি দিন হয়নি। ১৬১০ সাল নাগাদ সুবাদার ইসলাম খান রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান ঢাকাতে। ওখান থেকে যুবরাজ শাহসুজা ১৬৩৯ সালে সুবাদার হলে আবার রাজমহলে রাজধানী করেন। ওঁর বাংলা থেকে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ফলে পলায়নের পরে মির জুমলা আবার রাজধানী ঢাকায় সরিয়ে আনেন। রাজধানী আর রাজমহলে ফেরেনি। ১৬১৯ সাল নাগাদ টমাস রো মোগল সরকারি দলিল থেকে রাজ্যগুলির যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে বাংলার রাজমহল ও ঢাকাই বাংলার বড় শহর বলে উল্লেখ করেছেন। ততদিনে রাজধানী ঢাকা চলে গেলেও, রাজমহল ধ্বংস হয়ে যায়নি।

১৬৬৩ সালের ৪ জানুয়ারি ফরাসি স্বর্ণকার তাভারনিয়ার গঙ্গা নদী দিয়ে রাজমহলে আসেন। উনি বলছেন যে শহরটা গঙ্গার ডান দিকে। শহরের বাইরে

থেকে স্থলপথে শহরে ঢুকতে গেলে শহর থেকে প্রায় দু ক্রোশ পর্যন্ত রাস্তা বাঁধানো। ওঁর মতে এটা খুব ভাল শিকারের জায়গা বলে আগেকার দিনের সুবাদাররা এখানে থাকতেন। এ ছাড়া, আগে এখানকার বাণিজ্য খুব বেশি ছিল। কিন্তু গঙ্গা এখন সরে গিয়েছে শহর থেকে এক মাইল দূরে। ফলে শহরটি রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। ঢাকাতে রাজধানী নিয়ে যাবার কারণ হিসেবে বলছেন যে ঢাকার মুখে আরাকান ও পর্তুগিজদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ঢাকাতে রাজধানী সরানো হয়। ফলে বণিকরাও ঢাকাতে চলে যায়। এর কিছু পরে টমাস বাউরি মির জুমলার ঢাকাতে রাজধানী সরানোর কথা বলেছেন কারণ ঢাকা রাজমহলের থেকে সুন্দর ও সুরক্ষিত শহর। রাজমহল এর পরেও পরিত্যক্ত হয়নি কারণ ওখানকার ওমরাহরা ১৬৭৮ সালের পর যুবরাজের **পাটনা** যাবার পথে রাজমহলে মিলিত হয়েছিলেন।

১৬৬৯ সালের শেষদিকে চিকিৎসক নিকোলাস দ্য গ্রাফ বাংলাতে আসেন ও পরের বছর মুকসুদাবাদ হয়ে রাজমহল আসেন। সমকালীন পর্যটকদের বর্ণনার মধ্যে ওঁর বর্ণনাই সবথেকে বিস্তৃত। উনি বলছেন যে মুকসুদাবাদের পরে বেশ কিছু শহর ও গ্রাম পেরিয়ে বড় শহর রাজমহলে আসেন। এটা তখন একটা বড় বাণিজ্যিক শহর। এর পরে ওঁদের নিয়ে যাওয়া হয় মুসলমান শাসনকর্তার কাছে। ইনি ওলন্দাজদের পছন্দ করেন ও নিকোলাসকে শহর ঘুরে দেখার অনুমতি দেন।

রাজমহল শহর ও বুরুজ সমেত দুর্গ গঙ্গার পারে। এখানে গঙ্গা খুব চওড়া। শহরের মধ্যে কয়েকটা সুন্দর সৌধ আছে। এর মধ্যে মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির, একটা বড় বাজার ও নদীর ধারে একটা সুন্দর প্রাসাদ ও মহিলাদের মহল আছে। পাহাড়ের দিকে শহরের শেষভাগে রাজমহলের পুরনো দুর্গ ও পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে পির বোহারের মন্দির। এই শহরেই রয়েছে রাজার টাঁকশাল, যেখানে রূপা গালিয়ে রাজার টাকা ও পয়সা বানানো হয়। ওলন্দাজদের একটা কুঠি ও থাকার বাড়ি আছে। ওলন্দাজদের বাড়ির পিছনে রাজার প্রাসাদ ও যুবরাজ শাহসুজার বাগান। এ ছাড়াও মুসলমান অভিজাতদের কয়েকটা বাড়ি রয়েছে যেগুলি ১৬৫৭-৫৮-র যুদ্ধে অনেকখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

শাহসুজার প্রাসাদের উনি একটা বর্ণনা দিয়েছেন। উনি বলছেন যে একটা সুন্দর বড় বাগানের মধ্যে এই প্রাসাদটি। এটি প্রধানত কাঠের এবং পাথর, কাঠ ও তামার স্তম্ভ দেওয়া। যে ছবিটি উনি দিয়েছেন তার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় বাড়ির মিল আছে। এটি দোতলা ও চারপাশে বারান্দা দিয়ে ঘেরা। বাগানটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও প্রতিটি ভাগেই একটা করে ফোয়ারা আছে। ফোয়ারাগুলি তৈরি হয়েছিল আলাবাস্টার ও মার্বল দিয়ে এবং এগুলির চেহারা কোনওটা সিংহের মতো বা কোনওটা অন্য পশুর মতো। এর ফলে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। উনি বুড়িগঙ্গা পর্যন্ত গিয়েছিলেন যেখান থেকে নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে বুড়িগঙ্গাতে পড়েছে। এ পর্যন্ত কয়েকটা গ্রাম দেখেছেন যেখানে সব ধরনের কারিগর—এমনকী স্বর্ণকার ও লোহার কারিগররা বাস করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্যটক বুখাননের লেখার উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক দানি বলেছেন যে শাহসুজা একটা দুর্গ তৈরি করেছিলেন যার দুটি দরজার

মধ্যে তফাত ছিল এক মাইল। দরজা দুটি ছিল পাথরের কিন্তু ভিতরের বাড়িটা ছিল সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুন্সি শ্যামপরসাদ রাজমহল পর্যবেক্ষণ করে ফারসি ভাষায় একটা বিস্তৃত বর্ণনা দেন যেটা অধ্যাপক দানি গ্রহণ করেছেন। এটা ও বুখাননের বর্ণনা মিলিয়ে কয়েকটা সৌধ-এর বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। শ্যামাপরসাদ বর্ণনা দিয়েছেন শাহসুজার দৌলতখানা, সং-ই দালান, মচ্ছিভবন, আনন্দ সরোবর হ্রদ, হাম্মাম, হাউস (ফোয়ারা), জিলুখানা, দিওয়ান-ই খাস ও দিওয়ান-ই আম-এর। বুখানন বলছেন যে একটা সরাইখানা যেটা আগে প্রাসাদের অন্তর্গত ছিল, ভেঙে পড়েছে। এর মধ্যে দুটি সুন্দর দরজা আছে। পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা উঠোন পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে একটা আটকোনা জলাধার। এর প্রতি দিক ৩২ ফুট লম্বা ও ইটের তৈরি। ইটের তৈরি একটা সরু নালি দিয়ে এখানে জল নিয়ে আসা হত। নালির দুপাশে উঁচু বাঁধানো হাঁটার পথ যেটা দিয়ে উঠোনের ডান দিকে গেলে প্রাসাদের ভিতরে যাওয়া যায়। এই রাস্তায়, জলাধারের কিছুদুরে রয়েছে একটা ছোট দরজা যার ভিতর দিয়ে গেলে আর একটা উঠোনে পড়া যায়। এটি চারকোনা ও প্রাসাদের দুপাশের সৌধ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণমূখী হয়ে উঠোনকে ভাগ করেছে কিন্তু কোনও বাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায় না।

প্রাসাদের বড় উঠোনটির তিনদিকে ইটের দোতলা বাড়ি। এর মধ্যে রয়েছে মাঝখানের বড় বাড়ি যার দুপাশের অংশ এগিয়ে রয়েছে উঠোনের দুপাশে। মাঝখানের বাড়ির সামনে একটা বড় উঠোন আছে যার মাঝখানে একটা চৌকা জলাধার আছে, যার থেকে জল খালে পড়ছে। ওই খাল দিয়ে জল গিয়ে পড়েছে আর একটা আটকোনা জলাধারে যেটা রয়েছে ঢোকার মুখে। এখান থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে প্রথম দরজার কাছে যে আটকোনা জলাধার আছে সেখানে পড়েছে। বড় বাড়িটার দোতলা তিনভাগে বিভক্ত—মাঝখানেরটা বড় ও দুপাশেরগুলি ছোট। তিনটে ঘরের মধ্যে ঢোকবার জন্য উঁচু বড় খিলান আছে। নীচের তলাটি আর একটু খাপছাড়া। প্রত্যেক ঘরই দুভাগে ভাগ করা। মাঝখানের ঘরটি চারভাগ করা দেওয়াল দিয়ে। এর পর মাঝখানের অংশটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভিতরের চেহারাটা আর বিশেষ ধরা যায় না কিন্তু বাইরের প্লাস্টার দেখা যায়। নীচের তলার ঘরগুলি অনেকগুলো ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা, কিন্তু এর অনেকখানি অংশ ভেঙে যাওয়ায় এখন আর বোঝা যায় না। এই বাড়ি থেকে নদী পর্যন্ত আরও অনেক বাড়ি ছিল যেগুলি আর নেই। তবে কয়েকটি বড় বড় খিলান থেকে বোঝা যায় যে ওগুলির সঙ্গে বড় বাড়ির যোগ ছিল। গঙ্গার উপরে একটা উঠোন দেখা যায় যাকে *তখ্‌ত* বলা হয়। এর অনেকখানি অংশই ভেঙে গঙ্গায় পড়ে গিয়েছে। বাড়িরগুলির পুব দিকে একটা ইটে বাঁধানো বড় কুয়ো আছে যেখান থেকে জল তোলা হত প্রাসাদে এবং বড় উঠোনের ফোয়ারার জল আসত। সাধারণ লোকে বলেছিল যে শাহসুজার বাড়ির মেয়েরা এই বাড়িতে থাকত এবং সুজা যখন পালালেন তখন তারা উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দেয়। বুখানন এ গল্প মানেননি। উনি বলছেন এই বড় উঠোনে নানারকম উৎসব করা হত এবং বাড়ির ছাদের কার্নিশে লোহার আংটা লাগানো

রয়েছে যার সঙ্গে সামিয়ানা দিয়ে এই বড় উঠোনকে ঢাকা যেত।

বড় অষ্টকোণাকৃতি প্রথম জলাধারের বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে আর একটা ছোট উঠোন পাওয়া যায় যার বাড়িগুলি প্রায় সবই ভেঙে গিয়েছে। এখান থেকে এগোলে একটা বড় দরজা পাওয়া যায় যাকে বলা হত মোজরাগাহ। এর ভিতরে আর একটা বড় উঠোন রয়েছে যার সামনে উঁচু চত্বরে দরজাসমেত দেওয়ানখানা, এখানে সুলতান তাঁর আমলা নিয়ে সরকারি কাজ করতেন ও বিচার করতেন। যারা ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেত, তারা মোজরাগাহ থেকে সেলাম জানাতে জানাতে আসত। দেওয়ানখানার দেওয়াল তখন পুরোটা ছিল বলে বাড়িটার পুরো চেহারা পাওয়া যায়। ইংরেজরা এর সংস্কার করার ফলে এর খানিকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন এটা একতলা খোলা বারান্দা (গ্যালারি) মতন যার সামনেটা খোলা কিন্তু পিছনে তিনটি ঘর আছে যেগুলি তখন খুব অন্ধকার ছিল। দেওয়ানখানার পুব দিকের লাগোয়া যে ঘর তার প্লাস্টার অক্ষত ছিল। দেওয়ানখানার উঠোনের পুব দিকটা বন্ধ বাড়ি দিয়ে, যেগুলি বড় উঠোনের পশ্চিম দিকে পড়ছে। এর সঙ্গে নদীর যোগ ছিল পুব দিকের সিঁড়ি দিয়ে যেটা নদীতে নেমে গিয়েছে। ডান দিকে, দেওয়ানখানার উঠোনে, ঢুকতে একটা ছোট চৌকো চত্বর পাওয়া যায় যেখানে দেওয়ান বসতেন বলে বলা হয়। এটা হত যখন সুলতান দরবারে বসতেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই বুখানন এটা বিশ্বাস করেননি কারণ এ জায়গার উপর কোনও ছাউনি নেই।

দেওয়ানখানার উঠোনের পুব দিকে কয়েকটি নিচু বাড়ি আছে। এগুলির সঙ্গে দোতলা বাড়ির যোগ ছিল। এর তিনটে বড়ঘর উপরে আছে। দেওয়ানখানার চত্বরের দিকে এর কোনও জানালা নেই কিন্তু এর পিছনে একটা ছোট ঘর যার দরজা দিয়ে ওই চত্বরে যাওয়া যায়। এর সঙ্গে একটা পথ রয়েছে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য। এই পথের বাইরে, দরজার দিকে ও রক্ষীঘরের দিকে, রয়েছে *মোজরাগাহ*। কতকগুলি খিলান রয়েছে সম্ভবত রক্ষীদের থাকবার। বুখানন মনে করছেন যে এই পথ ধরেই যুবরাজ হারেমে যেতেন। এগুলিই ছিল তৃতীয় চত্বর যার পুব দিকটা বন্ধ ছিল দেওয়ানখানার চত্বরের বাড়ি দিয়ে ও পশ্চিমে ওই একই ধরনের বাড়ি ছিল যেগুলি ভেঙে গিয়েছে। ইংরেজরা পশ্চিমের ঘরগুলি ভেঙে তাদের জন্য বাংলো বানিয়েছিল। কিন্তু এর শেষে নদী থেকে দূরে যে বাড়িটি ছিল সেটি রয়েছে। এটা এর বিপরীত দিকের বাড়ির মতন। যদি এটা হারেম হয়, তা হলে চারদিকে ঘেরা বড় পাঁচিল থাকবে। কিন্তু তার কোনও চিহ্ন নেই। নদীর দিকে এই ভিতরকার বাড়ির দুটো বাড়ি আছে। কিন্তু এগুলি এমনভাবে বদলানো হয়েছে যে এখন আর চেনা যায় না। একটা ছোট ঘর (১৮ × ১২ ফুট) ভিতরে দেখা যায়। এর সামনেটা সাদা মার্বল দিয়ে পালিশ করা এবং কালো পাথরের শিলালেখ বসানো। কোণের মিনার বা থাম ঘরের দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা, যেগুলি ইংরেজরা পরে করেছে এবং যার ফলে বাড়িটার সামনের অংশের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভিতরে মার্বল দেওয়ালের কিছু অংশ ছাদ অবধি উঠে গিয়েছে। ইংরেজরা এর ছাদের অংশগুলি সরিয়ে নেওয়ায় শুধুমাত্র কাঠের বিমগুলি রয়েছে। এর এক অংশে ইংরেজরা একটি স্নানাগার বসানোর ফলে বাকি অংশটিও বদলে গিয়েছে। এ ছাড়া তারা সবটা সাদা রং করে

দেবার ফলে দেওয়ালের সাবেকি রং আর নেই। কিন্তু বর্ষার জলে বাইরের এই সাদা রং ধুয়ে গিয়ে দেওয়ালের রঙিন চিত্র ও নানা রঙের এনামেল বেরিয়ে এসেছে। এই ঘর থেকে পূর্বে গেলে নদীর উপরে একটা ছোট বাড়ি দেখা যায়। বলা হয় যে এখানে যুবরাজ মহিলাদের নিয়ে বসতেন। আগে এখানে ছিল তিনটি সরু লম্বা ঘর, যেগুলি ইংরেজরা ভাগ করে পাঁচটি করেছে। মাঝখানের ঘরটার পাশ খোলা। এর ছাদের জন্যে ছোট ছোট থাম ও কালো মার্বল পাথরের খিলান রয়েছে। দু পাশের দুটো ঘর লম্বা ও ছোট জানালা আছে। এগুলি ইংরেজরা কেটে মাটির সঙ্গে সাজিয়ে বড় করে নিয়েছে। এতে অবশ্য বাতাস বেশি আসে। চারপাশে খোলা বারান্দা যেটি মনে হয় পরে করা হয়েছে।

যদিও বাড়িটার নাম এসেছে পাথর থেকে কিন্তু পাথরের ব্যবহার খুব কম। দরজা, জানালা এবং বাড়ির নীচের অংশটিই পাথরে করা। ইংরেজরা এগুলি কেটে নেওয়ার ফলে বাড়িটার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে।

রাজমহলের প্রায় চারমাইল দুরে হাদাফ-এ জামা মসজিদ। ১৫৯২ সালে মান সিংহ এটি তৈরি করেন। প্রবাদ আছে যে এটা প্রথমে তৈরি করা হচ্ছিল মন্দির হিসেবে কিন্তু পরে এটা মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় যদিও এর কোনও প্রমাণ নেই। বুখানন যে ছক দিয়েছেন তার থেকে মনে হয় যে এটা মন্দির করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। বাংলার মসজিদগুলির মধ্যে এটা একটু অন্যরকম। বাইরের দিক থেকে দেখলে এর পরিকল্পনা ফতেপুর সিক্রির জামা মসজিদের মতন। কিন্তু বাংলার বৈশিষ্ট্য রয়েছে আটকোনার মিনার ও ছাদের উপর একাধিক গম্বুজে। বাজার থেকে জামা মসজিদ যাবার পথে আর একটা মসজিদ দেখা যায়। পূর্ব দিকের একটা সুন্দর দরজা দিয়ে একটা চত্বরে ঢোকা যায়। বাইরে পাঁচটা খিলান ছিল যার মাঝখানেরটা বাকিগুলির থেকে বড়। চারটি আটকোনা মিনার মসজিদের চারটি কোণে রয়েছে এবং ছাদে গম্বুজ আছে। ভিতরে একটা বড় ঘর ও দুই পাশের ঘর রয়েছে চারটি দোতলা। এগুলি বোধহয় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এগুলির উপরে চারটি ছোট গম্বুজ দেখা যায়।

হাদাফ-এ জামা মসজিদের কয়েকশো গজ উত্তরে সাহেবগঞ্জ যাবার পথে একটা সাঁকো পড়ে। বলা হয় যে এটা জামা মসজিদের সমসাময়িক। এর ছটা খিলান আছে দশ ফুট অন্তর ও পাঁচটি স্তম্ভ আছে জলের মধ্যে দুপাশে। এর চারটে গোল বুরুজ আছে।

বুখাননের সুজার প্রাসাদের বর্ণনার সঙ্গে নিকোলাসের বর্ণনার মিল নেই। নিকোলাসের বর্ণনার প্রাসাদ ছিল কাঠ ও পাথরের তৈরি। অন্যদিকে ছাদের কাঠের বিম ছাড়া বুখাননের প্রাসাদের কাঠের কথা আর পাওয়া যায় না। সাধারণত বলা হয় যে সুজার কাঠের প্রাসাদ আগুনে পুড়ে যায়।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাদরি জোসেফ টিফেনথালার রাজমহলে এসেছিলেন। উনি বলছেন যে এটা একটা বড় শহর এবং একসময় এটা বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তার কেন্দ্র ছিল। শহরটি দেড় মাইল লম্বা ও আধমাইল চওড়া। এর প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন সম্রাট আকবর নদীর ধারে উত্তর-পূর্ব দিকে। তখন এটা

প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শহরের শাসনকর্তার থাকার বাড়ি আছে যেটা ইট দিয়ে তৈরি। এটা খুব বড় ও সুন্দর। প্রধানত পূর্ব দিকে মুখ করা। এখান থেকে খুব লম্বা একটা রাস্তা শহরতলি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। অধিকাংশ বাড়িই খড়ে ছাওয়া ও চুন লাগানো। কয়েকটা বাড়ি আছে ইট ও প্লাস্টারে করা। শহরের সামনের নদীতে একটা ছোট দ্বীপের মতন আছে। তার থেকে মনে হয় বুখানন এই দ্বিতীয় প্রাসাদটি দেখেছিলেন ও বর্ণনা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে সরকারি দপ্তর চলে গেলেও রাজমহল শহর পরিত্যক্ত হয়ে যায়নি। এর কারণ মনে হয় যে রাজমহলের বাণিজ্য বহুদিন অবধি চলতে থাকে ও এটা বাণিজ্যিক শহর হিসেবে রয়ে যায় যদিও অভিজাতদের বাড়িগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

১৭.২ হুগলি

পণ্ডিতরা নানারকম মত দিয়েছেন কবে এবং কেন হুগলি বন্দরের উত্থান হল। প্রধানত বলা হয়ে থাকে যে সপ্তগ্রামের পলিমাটিতে নদী ভরাট হয়ে যাবার ফলে বড় জাহাজ আর আসতে পারছিল না যার ফলে গঙ্গার উপরে পর্তুগিজ আকবরের কাছ থেকে ১৫৭৯ সালে ফরমান নিয়ে হুগলি বন্দরের প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তগ্রাম তখন অস্ত গিয়েছিল কিনা বলা যায় না কারণ ১৬২০ সালের দুটি ইংরেজি চিঠি থেকে জানা যায় যে সপ্তগ্রামে তখনও বাণিজ্য ছিল। বলা যেতে পারে যে ১৩৬২ সালে মোগলরা হুগলি থেকে পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দিলে, সপ্তগ্রাম থেকে মোগল শুল্কবিভাগ হুগলিতে উঠে আসে ও হুগলির উন্নতি শুরু হয়। এর পরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানি হুগলিতে কুঠি স্থাপন করলে হুগলি বাড়তে থাকে ও ১৬৬৬ সালের আগে পর্যন্ত বাংলায় মোগলদের প্রধান বন্দর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এখানে শুধু শহরের আলোচনা করব, বাণিজ্যের নয়, যদিও বাণিজ্যের জন্য হুগলির উন্নতি হয়েছিল।

১৫৭৯ সালের আগে যে হুগলির পত্তন হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় পর্যটক সিজার ফ্রেডারিকির ১৫৬৭ সালের পর্যবেক্ষণ থেকে। উনি সপ্তগ্রামের কথা বলেছেন কিন্তু হুগলির কোনও উল্লেখ করেনি। ১৫৭৫ সালের ফরাসি পর্যটকের বর্ণনায় সপ্তগ্রাম পাওয়া যায় কিন্তু হুগলির কোনও উল্লেখ নেই। এমনকী ১৫৯৪ সালের পর লেখা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখায় হুগলির উল্লেখ নেই যদিও তিনি বিপরীত দিকের হালিশহর ও গরিফার উল্লেখ করেছেন। এর থেকে মনে হয় যে ফরমান পেলেও পর্তুগিজরা তখনও দুর্গ তৈরি করেনি যার অনুমতি ওই ফরমানের মধ্যে নেই। ফলে বাণিজ্য বাড়লেও শহর গড়ে উঠতে দেরি হয়।

প্রথম যিনি হুগলির কথা বলেন তিনি পর্যটক র‍্যালফ ফিচ। ১৫৮৩ সালের পর যখন তিনি হুগলিতে আসেন তখন বাংলা মোগলদের অধীনে। উনি বলছেন যে পর্তুগিজরা বাংলাতে যে জায়গাতে রয়েছে সেটাই হুগলি। সপ্তগ্রাম থেকে হুগলির

রাস্তা তখন চোরের জায়গা। তখনও তিনি শহর বা দুর্গ কোনওটারই কথা বলেননি। আবুল ফজল *আইন-ই আকবরিতে* হুগলিকে সাতগাঁও সরকারের মধ্যে ফেলেছেন। উনি বলছেন যে দুটোই ইউরোপীয়দের দখলে। হুগলিই এই দুটোর মধ্যে প্রধান। উনি কোনও দুর্গ বা শহরের কথা বলেননি যদিও সমকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে আমরা আগে দেখেছি যে সপ্তগ্রাম বড় শহরে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

সমকালীন খ্রিস্টান পাদরিদের চিঠি থেকে জানা যায় যে অন্তত দুজন জেসুইট পাদরি এসেছিলেন ১৫৬০ সাল নাগাদ। ১৫৯৮ সালে আরও দুজন পাদরি আসেন ও পরের বছর আমরা আরও দুজনের আসার খবর পাই। এর থেকে মনে হয় যে হুগলিতে তখন পর্তুগিজদের গুদাম ছিল বাঁশ ও খড়ের ছাওয়া দেওয়া। এটা হতে পারে যে তাঁরা সপ্তগ্রামে থাকতেন এবং হুগলি বন্দর ব্যবহার করতেন। এটা অস্বাভাবিক নয় কারণ পরবর্তীকালে সমকালীন বাংলাসাহিত্যে দেখা যায় যে ত্রিবেণীতে নৌকা ভিড়িয়ে সপ্তগ্রামে বণিকরা জিনিস কিনছে।

কিন্তু ১৫৯৮ সাল নাগাদ পাদরিদের লেখা থেকে দেখা যায় যে হুগলিতে একাধিক গির্জা ছিল কারণ পাদরি ফার্নানডেস ওখানকার সব থেকে বড় গির্জাতে কাজ করতেন। তাঁরা ওই বছর যখন বিদায় নেন তখন একজন পাদরি গির্জাগুলি ছাড়াও একটি বিদ্যালয় ও একটি হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৫৯৯ সালে অগাস্টাইন পাদরিরা হুগলিতে গির্জার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৭ সালে জেসুইটরা হুগলিতে নদীর ধারে একটা গির্জা বানান। কিন্তু তিন বছর পরে এটিকে, থাকার বাড়ি সমেত, দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ১৬৩২ সালের মোগল আক্রমণে এগুলি ভেঙে গিয়েছিল বলে ধরা হচ্ছে।

১৫৯৮ সালে হুগলির মধ্যের গির্জাটাই ছিল বড় গির্জা এবং বর্তমানে ব্যান্ডেলের উত্তরে ছিল ছোট গির্জা যাকে *মিজেরিকর্ডিয়ার গির্জা* বলা হত। পরবর্তীকালে পাদরি মানরিক বলেছেন যে ১৬৩২ সালে খ্রিস্টানরা মোগল আক্রমণের ফলে বড় গির্জাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ও মোগলরা মাইনের সাহায্যে গির্জাটি উড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালের পরম্পরার মধ্যে অগাস্টাইন গির্জার কোনও উল্লেখ নেই বা মিজেরিকর্ডিয়া গির্জারও কোনও উল্লেখ নেই। ১৬৩২ সালের পর জেসুইটরা পুরনো জায়গায় গির্জা বানানোর দাবি জানাতে থাকে। কেওটার কাছে জেসুইট গির্জা ও কলেজ তৈরি করা হয়। সুতরাং ওই জায়গাতেই ছিল বড় গির্জা। অগাস্টাইন গির্জাও আবার তৈরি করা হয় পরবর্তীকালে।

১৬৪০ সালে হুগলিতে পর্তুগিজদের জমিজমা ফেরত দেওয়া হয় ও পাদরি রডরিগেস একটা গির্জা ও থাকার বাড়ি তৈরি করেন। ১৬৬৩ সালে যখন নিকোলাই মানুচ্চি হুগলিতে এসেছিলেন, তখন তিনি সেখানে খড়ের ছাদ দেওয়া পর্তুগিজ গির্জা দেখেন। উনি ইট ও পাথর দিয়ে গির্জা বানানোর কথা বলেন কিন্তু হুগলির শাসনকর্তা সৈয়দ জালাল অনুমতি দেননি। তিন বছর পরে বার্নিয়ার বলেছেন যে হুগলিতে জেসুইটদের বড় গির্জা আছে। উনি অগাস্টাইন গির্জারও উল্লেখ করেছেন।

১৬৩৩ সালে শাহজাহান হুগলিতে পর্তুগিজদের ৭৭৭ বিঘা জমি ও অন্যান্য অধিকার দিয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালের গোলমালে সাবেকি ফরমানটি নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু এর কপি ছিল যা ১৮২০ সালের পর্তুগিজদের একটি আবেদনের সঙ্গে পাওয়া যায়। ১৬৩৩ সালের ফরমানটির উপর নির্ভর করে বাংলার সুবাদার মির মুহম্মদ আজিম খান একটি সনদ দেন। মনে হয় শাহসুজা যখন সুবাদার ছিলেন, তিনি এটা সমর্থন করেন। কীভাবে অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এই আদেশ এসেছিল ১৬৩৩ সালে তার বর্ণনা গির্জার পরম্পরায় রয়েছে। মানরিকের লেখায় এসব কিছুই পাওয়া যায় না। উনি অগাস্টাইন গির্জারও কোনও উল্লেখ করেননি। ১৭৮৫ সালে পাদরি সেন্ট নিকোলাস ১৬৫০ সালে একটা কনভেন্ট তৈরি করা হয়েছিল বলেছেন। পর্যটক টমাস বাউরি নদীর ধারে একটা গির্জা তৈরি হচ্ছে বলেছেন। এটিই অগাস্টাইন গির্জা যেটি প্রথমে ভাঙা হয় ও ১৬৭০ সালে আবার তৈরি করা হয়। ১৭০৯ সালের এক পাদরির লেখায় এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

হুগলিতে পর্তুগিজ দুর্গ কবে হয়েছিল এটা নিয়ে সন্দেহ আছে। পাদরি কাব্রাল বলেছেন যে পর্তুগিজদের সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। পাদরি মানরিক বলেছেন একটা মাটির দেওয়াল মতন আছে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা বলছেন যে একটা দুর্গ এখানে ছিল যেটি পর্তুগিজরা ১৬০৩ সালে দখল করে। দুর্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পিয়ের দ্যু জারিকের লেখায় যিনি সমকালীন পাদরিদের লেখার উল্লেখ করে ১৬১৮ সালে প্রকাশ করেন। উনি লিখেছেন যে ডোমিনিক কার্ভালো শ্রীপুর থেকে গোলি বা গুলোতে যান যেখানে পর্তুগিজরা বসবাস করে এবং যেখানে একটা ছোট বন্দর আছে। ওখানে মুসলমানরা পর্তুগিজদের ও আরাকান জলদস্যুদের ঠেকানোর জন্য নদীর ধারে একটা দুর্গ বানিয়ে ছিল। ওরা ওখানে চারশো মোগল সৈন্য রেখেছিল। এর ফলে খ্রিস্টানরা নদী দিয়ে যাতায়াত করতে পারছিল না। কার্ভালো ওই দুর্গটিকে দখল করে মোগল সৈন্যদের হত্যা করেন।

এই বর্ণনার সঙ্গে ১৪ জানুয়ারি ১৫৯৯ সালে লেখা পাদরি ফার্নানডেস এর একটা চিঠির বর্ণনা মেলে। উনি বলছেন যে সমুদ্র থেকে গুলাম (হুগলি) যেতে লাগে আট দিন। হুগলি গেজেটিয়ার-এ বলা হয়েছে যে পর্তুগিজরা ১৫৩৭ সালে এখানে এক দুর্গ বানিয়ে চারপাশে পরিখা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই সময়ের পরবর্তী পর্যটকরা কেউই দুর্গের কথা বলেননি। এ ছাড়া ওই পরিখার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পর্তুগিজ ঐতিহাসিক ফেরিয়া ই সোসাও ওই দুর্গের কোনও উল্লেখ করেননি। এমনকী পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরি ওই দুর্গের উল্লেখ করেননি।

১৮০৩ সালে *এশিয়াটিকাতে* বলা হয় যে পর্তুগিজরা ১৫৯৯ সালে হুগলির গোলেঘাট জায়গায় একটি দুর্গ তৈরি করেন। আমরা আগে কার্ভালোর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দেখেছি যে ১৬০৩ সালের আগে পর্তুগিজরা হুগলি দুর্গ দখল করেনি। যদিও হুগলিতে তারা আগেই বসবাস করছিল। ১৬০৮ সালের পরের পর্যটক উইলিয়াম ফিঞ্চ হুগলিতে পর্তুগিজরা অত্যাচার করছে বলেছেন। ষষ্ঠদশ শতকের শেষদিকে ওলন্দাজ পর্যটক লিনসখোটেন বাংলার প্রসঙ্গে বলেছেন যে পর্তুগিজরা এখানে বন্যজন্তুর মতো থাকে যদিও চট্টগ্রামে তাদের বাণিজ্যর প্রশংসা করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবদুল হামিদ লাহোরি হুগলির একটা ছোট বর্ণনা

দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে বাংলার শাসকদের অজ্ঞানতার জন্য ও অমনোযোগিতার ফলে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। ওরা অনেকগুলি বড় বড় বাড়ি তৈরি করে যেগুলিতে ওরা কামান, বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র বসিয়ে সুরক্ষিত করে তোলে। কালক্রমে এটা একটা বড় জায়গা হয়ে যায় এবং বন্দর হুগলি নামে পরিচিতি লাভ করে। এর একদিকে ছিল নদী ও অন্য তিনদিকে ছিল পরিখা যেটা নদীর জলে ভর্তি হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উনি দুর্গের কথা বলেননি এবং দেওয়ালের কথাও বলেননি যার থেকে মনে হতে পারে যে এই পরিখার কিছু অংশ ছিল সরস্বতী নদীর অংশ। উল্লেখযোগ্য যে ১৬১২ সালে প্রকাশিত ইউরোপীয় মানচিত্রে দেখা যায় যে ত্রিবেণীর কাছে সরস্বতী মজে যায়নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর্যটক পাদরি মানরিকের লেখাতেও ওই কথাই পাওয়া যায়। উনি বলছেন যে শহরটা গঙ্গা নদীর উপরে খোলা সমতল জমিতে অবস্থিত। এর চারপাশই খোলা। এর কোনও দেওয়াল নেই। কেবল মাত্র একটা মাটির বাঁধ মতন পর্তুগিজরা করেছে যার কোনও জোর নেই এবং মূল্যহীন। দেওয়াল না থাকলেও এটা যে শহর হয়ে উঠেছিল এটা মানরিকের কথায় পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার পাদরি কাব্রালের লেখার উপর ভিত্তি করে বলছেন পর্তুগিজরা প্রথম দিকে খড়ের ছাউনির মধ্যে হিজলি থেকে আনা নুন বিক্রি করত। কাব্রাল একে ফারসি শব্দের অপভ্রংশ থেকে *চান্দেও-গঞ্জ* বলেছেন। গঞ্জ বলতে এখানে বাজার বোঝায়। যেখানে নুন রাখা হত ওকে বাংলাতে বলত *গোলা* যার থেকে পর্তুগিজরা *ওগোলিম* বা *গুলাম* বলে বলেছে। সেখান থেকে বাঙালি নাম হয়েছে হুগলি।

পর্তুগিজদের এই জায়গা ওদের *এস্তাদা দা ইন্ডিয়া* বা ভারতের পর্তুগিজ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না। যদিও মোগল রাজত্বের মধ্যে তারা ছিল, কিন্তু পর্তুগিজরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিজেরাই চালাত। কাব্রাল বলছেন যে পর্তুগিজ কাপ্তানের কথা সবাই মেনে নিত। এদের মধ্যে পর্তুগালে জন্মেছে এরকম পর্তুগিজরাই ছিলেন শাসকশ্রেণী যার নীচে ছিল মিশ্র পর্তুগিজ ও ভারতীয়দের বংশধররা। এদের তলায় ছিল কালো 'নেটিভ'—দাসশ্রেণীর ভারতীয় যারাই প্রধান কাজগুলি করত। এই পর্তুগিজ কলোনির সঙ্গে আরাকান জলদস্যুদের যোগাযোগ ছিল ফলে ভারতীয়দের জোর করে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করা হত হুগলির বাজারে। কাব্রালের লেখা থেকে দেখা যায় যে এরা সম্রাটকে স্বীকার করে কোনও উপঢৌকন পাঠাত না। ফলে এটা স্বাভাবিক যে শাহজাহান এদের সমূলে উৎখাত করবেন। এ ছাড়া মোগলদের চট্টগ্রাম জয় করা সম্ভব হয়নি যার ফলে বাংলায় মোগলদের কোনও ভাল বন্দর নেই। ১৬৩২ সালে মোগল সুবাদার কাশিম খান হুগলি দখল করেন যার ইতিহাস অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এবং যার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। সরকারও বলেছেন যে এখানে কোনও দুর্গ বা দেওয়াল ছিল না। কয়েকটা গির্জা ও পাকা বাড়ি ছিল যেগুলির উপর পর্তুগিজরা কামান বসিয়েছিল। হুগলি জয়ের পর মোগল শুল্কবিভাগ ও অন্যান্য দপ্তর সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে নিয়ে এলে সপ্তগ্রামের অবনতি হয়। হুগলি জয়ের সুদুরপ্রসারী ফল হয় যে প্রথমে ওলন্দাজ

ও ইংরেজ ও পরে ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি ও বণিকরা হুগলিতে স্থায়ী আস্তানা গাড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে ইউরোপ পর্যটকদের লেখা থেকে একটা বর্ধিষ্ণু শহরের ছবি পাওয়া যায় যার অবনতি শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকে কলকাতার উত্থানে ও বাংলায় ইংরেজ শক্তি কায়েম হবার পর। সুতরাং বাংলায় মোগল শক্তির উত্থান ও পতনের সঙ্গে হুগলির ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

হুগলির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ওলন্দাজ পর্যটক গ্যোতিয়ার স্খুটেন। উনি বাংলায় এসেছিলেন ১৬৬০ সাল নাগাদ। উনি বলছেন যে হুগলি মোটামুটি বিরাট শহর। এর চেহারা লম্বা হওয়ায় দেখতে ভাল লাগে, কারণ এটা গঙ্গার উপরে। রাস্তাগুলি চওড়া কিন্তু বাঁধানো নয়। বেড়ানোর মতো খুব ভাল রাস্তা নেই। দেশের অন্যান্য জায়গার মতোই বাড়িগুলি সুন্দর, আরামদায়ক এবং অসংখ্য ধরনের জিনিসে ভর্তি দোকান। বিশেষত রেশমের কাপড়ের। এ ছাড়াও খুব সুন্দর কাপড় পাওয়া যায় যা ভারতের সব জায়গায় তৈরি হয়। এখানে বহু মুসলমান বণিক আছে যারা বিরাট বাণিজ্য করে। এখানে বিরাট সংখ্যক হিন্দু ও বানিয়ারা আছে যারা মুসলমান শাসনে আরামে রয়েছে। বাজারের বিরাট চকে পাঁচটা মন্দির আছে। এরা ভিন্নমতে বিশ্বাসী। প্রত্যেকটি মন্দিরই তাদের মতাবলম্বী লোকেদের এলাকার শেষে। এই এলাকাগুলি ওদের জন্য আলাদা করা আছে ও বিশেষ ধরনের আলাদা মূর্তি ওই মন্দিরগুলিতে রয়েছে। সব বণিকই, বিদেশি হোক বা শহরের হোক, তাদের মন্দিরের পাশে দোকান করেছে। তাদের মতাবলম্বী লোকেরা ওখান থেকেই জিনিস কেনে। উনি পুরুষ ও মহিলাদের এই সব মন্দিরে ঢুকতে দেখেছেন ও ওখানকার মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে দেখেছেন। এরপর ওরা বাজার করে বাড়ি ফেরে।

ওলন্দাজদের কুঠিটাই চমৎকার যেরকম বাড়ি এখানে আর নেই। একটা বিরাট চকে এটা তৈরি, গঙ্গা নদী থেকে অল্প দূরে। পাছে নদীর পাড় ধুয়ে যায় বা প্লাবনে ভেসে যায় এই ভয়ে এরা গঙ্গার আর কাছে যায়নি। যে কোনও একটা বড় দুর্গর থেকে এটা বড় দেখতে। অন্তত বণিকদের বাড়ির থেকে অনেক বড়। এর পাঁচিলগুলো উঁচুও পাথরে তৈরি যার উপর এটি সুরক্ষিত করা হয়েছে। এগুলোর উপর কামান বসানো এবং কুঠির চারপাশে জলে ভর্তি পরিখা রয়েছে। এটা বিরাট ও ভিতরে অনেক জায়গা আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি ঘর আছে। কোনওটা আধিকারিকের, কোনও কোনওটা আমলাদের যারা পরিষদের সদস্য, আবার কোম্পানির লোকেদের জন্যও আছে। পাথরে তৈরি গুদাম রয়েছে যেখানে যে জিনিস কেনা হচ্ছে, সেগুলো রাখা হয় এবং যেগুলি জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে।

হুগলির চারপাশের গ্রামাঞ্চল খুব সুন্দর। চাষ করা হচ্ছে এরকম জমি রয়েছে। তা ছাড়া সুন্দর বাড়ি, বড় বাগান, পুকুর ও জলাধার আছে স্নান করার জন্য। গ্রামগুলি সুন্দর। পথও ভাল যেগুলি বেড়ানোর জন্যেই করা। ওঁরা যখন ওখানে ছিলেন, তখন ইংরেজরা তাদের নতুন কুঠি বানাচ্ছিল কারণ তাদের আগের কুঠির দেওয়াল গঙ্গার জলে নষ্ট হবার ফলে কুঠিটা ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজরা হুগলিতে প্রথম কুঠি করে ১৬৫০ সালে এবং ১৬৫৭ সালে এটা বঙ্গোপসাগরের

প্রধান কুঠি হয়ে দাঁড়ায়।

তাভারনিয়ার ওলন্দাজ কুঠিতে কয়েকদিন ছিলেন। ওলন্দাজরা জাপান থেকে নানারকম তরকারির বীজ নিয়ে এসে তাদের কুঠির বাগানে লাগিয়েছে। তার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু শহরের কোনও বর্ণনা দেননি।

স্খুটেনের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে হুগলি শহর ও গ্রামাঞ্চলের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে কোনও পাকা বাড়ি ছিল না, সেখানে ভাল বাড়ি হয়েছে গঙ্গার তীর ধরে। আমাদের যে বক্তব্য ছিল যে হুগলি সপ্তগ্রামের দিকে চলে গিয়েছে তার উল্লেখ আর এক পর্যটক জন মার্শাল করেছেন। উনি বলছেন যে হুগলি একটা মস্ত বড় শহর। শহরের একটা বড় অংশ পুরনো সপ্তগ্রাম। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা বিশাল কুঠি করেছে। কিন্তু তাদের কুঠিগুলি গঙ্গার একটা শাখার উপর। ইংরেজ কোম্পানির বণিক স্ট্রেনশাম মাস্টারের বর্ণনায় এর সমর্থন মেলে। উনি নৌকা করে হুগলিতে যাবার দু মাইল আগে ওলন্দাজদের কুঠি দেখেছেন। প্রথমে দেখেছেন ওলন্দাজদের বাগান ও পরে ওদের কুঠি। উনি বলছেন যে ওদের কুঠি খুব বড় একটা বাড়ি, ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের বড় বাড়ির মতো। এটিই ছিল চুঁচুড়া যেটি তখন হুগলির মধ্যে ছিল। তাভারনিয়ার শুধু এইটুকু দেখেছেন বলে শহরের বর্ণনা দেননি।

মাস্টার ওলন্দাজদের বাগান পেরোবার পর একটা জমি দেখেছেন যেটা উনি বলছেন ফরাসি কুঠির জমি। এর দরজাটা তখন তৈরি হয়েছে যদিও জমিটা ছিল তখন (১৬৭৬ সাল) ওলন্দাজদের দখলে। কিছুদিন পরে তিনি হুগলিতে এসে ওলন্দাজ কুঠির বর্ণনা দিয়েছেন। উনি বলছেন এটা বেশ বড় ও দুটো চৌকা বাড়ি জোড়া লাগানো। গুদামটি সম্প্রতি করা হয়েছে। একটা বাড়ির একটা অংশ নদীর দিকে। বাটাভিয়া থেকে কাঠ ও মাদ্রাজ থেকে পাথর এনে এই কুঠি করা হয়েছে। বাগানটি বড় ও সুন্দর ও নানারকম তরকারি করা হয়। কুঠির সঙ্গে লাগানো রয়েছে ভিন্ন জিনিসের কারখানা—ছুতোরদের বাটাভিয়া থেকে আনা কাঠের জন্য। বরানগর থেকে শুয়োরের মাংস নুন দিয়ে নিয়ে আসা হয় ও এখানে কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। এ ছাড়া আছে লোহার কারিগর ও শস্যর গুদাম। এর সঙ্গে আছে বড় একটা ঘর যেখানে তাঁতিরা তাঁত নিয়ে বসে জাহাজের পাল ও দড়ি তৈরি করে। এই সব কারিগরদের অধিকাংশই ভারতীয়। এরা খুব অল্প মাইনেতে কাজ করে—দিনমজুরি পায় দেড় আনা থেকে দু আনার মতো। একজন ওলন্দাজ এদের খবরদারি করার জন্য আছেন। এদের কুঠির পাশের জমি ও শহরের ওই অংশ নবাবের, ওরা ইজারা নিয়েছে। বাটাভিয়া এই ইজারা ত্যাগ করে নবাবের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা নেবার কথা বললে হুগলির শাসনকর্তা মালিক জিন্দি কোম্পানির উকিল ও বেনিয়ানের আত্মীয় পরিজনকে বন্দি করেন। এর ফলে এদের বাণিজ্য তখনকার মতো বন্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজ কোম্পানির কিছু লোক শহরে ও কিছু লোক বাইরে থাকত। কোম্পানির লোক নয়, এমন একজন ইংরেজ, বুন নর্টন, শহরে থাকত। ওর প্রচুর দেনা হয়ে যাওয়ায় শহরের বাইরে যেতে পারছিল না যার ফলে ইংরেজ কোম্পানি নিয়ম করে

যে বাইরের ইংরেজ মাদ্রাজ ও মসুলিপত্তম ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারবে না।

ইংরেজ কোম্পানির জমি নদীর পাশে। এটাকে ঘিরে ফেলে বাংলো বা বাড়ি তৈরি করা হবে ঠিক হচ্ছিল কোম্পানির লোকজনদের জন্য। যারা বাইরে থাকছে তাদের সকলকে এখানে নিয়ে আসা হবে। তারা তাদের বাড়ি বানিয়ে নিতে পারবে। নদীর ধারে পুরনো কুঠিকে গুদাম করা হবে ঠিক হল। নদীর ধারে আর একটা দেওয়াল তুলে প্লাবনের হাত থেকে বাঁচাবে। নতুন কুঠিতে পাকা বাড়ি করা হবে দোতলা যার ফলে বহু গাছ কাটতে হবে।

হুগলির সুবিধের কথা মাস্টার বলেছেন। অনেক দূর থেকে নদী দিয়ে মাল যাতায়াত করে। কখনও কখনও আগ্রা পর্যন্ত যায়। আগে এটি ছিল পর্তুগিজদের হাতে যখন বছরে প্রায় একশোটা জাহাজ মালয় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেত। মুসলমানরা এটি নিয়ে নেবার পর, এর বাণিজ্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। এটি নবাব শায়েস্তা খানের জায়গির হবার ফলে ওঁর লোকেরা শহরের কর্তা। এরা সাধারণ লোক ও বণিকদের উপর অত্যাচার করে। এই আমলারা সমস্ত জিনিসই তাদের একচেটিয়া করে নিয়েছে যার মধ্যে বেত, আগুনের কাঠ, খড় ইত্যাদিও পড়ে। এই আমলারা বিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বছরে হিন্দু বণিকদের মধ্যে ভাগ করে দেয় ও বছরের শেষে এদের ওই টাকা প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সুদ সমেত দিতে হয়। কখনও কখনও শাসনকর্তা জিনিসগুলি সস্তা দরে কিনে প্রায় শতকরা দশ কি পনেরো ভাগ বেশি দামে বিক্রি করে। পর্তুগিজদের বাণিজ্য আর নেই বললেই চলে। তাদের অধিকাংশই মোগলদের সৈন্য হিসেবে কাজ করে।

সমসাময়িক পর্যটক টমাস বাউরির লেখাতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। উনি বলছেন যে শহরটা সব জায়গায় একরকম নয়, কিন্তু কয়েকটা জায়গা খুব সুন্দর যেখানে রাজ্যের কয়েকজন খুব ধনী বণিকরা বাস করে। ওড়িশা, বাংলা ও পাটনার সব ধরনের জিনিস এখানে এনে এর সাধারণ বাজারে বিক্রি হয়। একেই সব থেকে বড় বাজার বলে। এ ছাড়া আরও বাজার আছে যেখানে তাঁতের কাপড় ও খাবার দাবার বিক্রি হয়। ওলন্দাজ কুঠি ইংরেজ কুঠির থেকে প্রায় এক মাইল নীচে। ওই কুঠি একটা সমতল জমির উপর এবং ওদের বাড়িগুলি খুব সুন্দর যেগুলি এশিয়ার কুঠিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ওদেরও একটা পুরনো কুঠি ছিল যেটা ইংরেজ কুঠির সঙ্গে লাগোয়া। এই দুটি পাশাপাশি কুঠি ছিল নদীর বিশ ফুটের কাছে। এখানে নদী শুকনো জমির থেকে কিছু উঁচু হয়ে আসছিল যার ফলে একবার ভয়ংকর প্লাবনে ওলন্দাজদের কুঠি ভেসে যায়। ওখানে এখন ইংরেজদের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজ কুঠিও ভেসে যেত কিন্তু তখন হঠাৎ প্লাবন কমে যায়। ফলে ওরা বেঁচে যায়। ইংরেজরা এর পরে আরও সিকি মাইল দূরে তাদের নতুন কুঠি বানায়।

বাউরি বলছেন যে বেশ বেশি সংখ্যায় পর্তুগিজ বাংলাতে আছে, বিশেষত হুগলি নদীর মোহনায়। এদের মধ্যে পর্তুগালে জন্ম যেমন আছে, ভারতে জন্মও আছে। এরা একটা বড় শহরে থাকে, ইংরেজ কুঠি থেকে প্রায় এক মাইল উপরে। এর নাম ব্যান্ডেল। এই শহরটি দুই মাইল ব্যাসার্ধ এবং ওখানে অনেক পুরুষ, মহিলা ও শিশু আছে। এদের অধিকাংশই খুব গরিব কিন্তু কাজে খুব পরিশ্রমী এবং সৎ পথে জীবন

কাটাতে চায়। সাধারণত এরা তাঁত ও রেশমের মোজা বোনে, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের জন্য রুটি বানায় যেগুলো ওরা বিভিন্ন বাড়িতে বিক্রি করে। এ ছাড়া তাদের জাহাজের জন্য রুটি বানায়। এরা ভাল মিষ্টি ও আচার বানায় এবং এদের অনেকে জাহাজে কাজ করে। প্রায় বিশ হাজার পর্তুগিজ বাংলাতে আছে যাদের অধিকাংশই থাকে হুগলিতে। এরা ১৬৭৬ সালে বাঁধ ও পাথর দিয়ে একটা নতুন গির্জা বানানোর জন্য পুরনো গির্জা ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু হুগলির শাসনকর্তা নতুন গির্জা বানানোর অনুমতি দেননি। হুগলিতে সব কিছুই খুব সস্তা। একটা খুব ভাল গোরু চার শিলিং ছয় পেন্সে পাওয়া যায় যেটা মোগলদের দু টাকার সমান। এক টাকায় প্রায় পঞ্চাশটা মুরগি পাওয়া যায়। মাছও খুব সস্তা ও প্রচুর পাওয়া যায়। কাঠ খুব সস্তা এবং ভাল। সব ধরনের কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে বিদেশি এখানে থাকে। নিকোলাই মানুচ্চি হুগলিতে অগাস্টাইনদের গির্জার কথা বলেছেন যাদের পাদরিকে উনি দেখতে গিয়েছিলেন। মনে হয় এটা ব্যান্ডেলের মধ্যে কারণ উনি বলছেন যে এখানে অনেক ধনী পর্তুগিজরা আছে। এরাই একমাত্র নুনের বাণিজ্য করার অধিকারী।

যদিও এঁরা কেউই হুগলিতে দুর্গের কথা বলেননি, কিন্তু ওখানে যে দুর্গ ছিল, সেটা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের সময়ে জানা যায়। বিদ্রোহীরা হুগলি দুর্গ দখল করেছিল কয়েকদিনের জন্য। পরে ওলন্দাজরা ওদের হঠিয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা এর পরে ব্যান্ডলের মধ্য দিয়ে গিয়ে দুর্গ আক্রমণ করার চেষ্টা করলে, স্থানীয় পর্তুগিজরা বিদ্রোহীদের হঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানি তাদের কুঠি শক্ত পাঁচিল দিয়ে ঘিরে কামান বসিয়ে নেয়। ফরাসিরা প্রথমে ছিল ব্যান্ডেলে, পরে তারা চন্দননগরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কুঠি তৈরি করে। এ সব এলাকাকে তখন হুগলির মধ্যে ধরা হত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একশো বছরের মধ্যে হুগলির প্রসার হয়েছে অনেকখানি। একদিকে যেমন পুরনো সপ্তগ্রামের অনেকখানি হুগলির মধ্যে চলে এসেছে অন্যদিকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কুঠি বসানোর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এর ফলে ব্যান্ডেল হুগলির শহরতলিতে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে পর্তুগিজরা জাহাজগুলির কাজকর্ম ও ইউরোপীয়দের খাবারদাবার এর প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাতের দশকের শেষ দিকে হুগলিতে এসেছিলেন ফরাসি বণিক লেস্ত্রা। উনি প্রথমেই বলছেন যে ওলন্দাজদের ওখানে একটা কুঠি আছে যেখানে তারা ভাল কাজ করে। গঙ্গার মোহানা থেকে তিরিশ লিগ দূরে হলেও, এটা ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের একটি। এই বাণিজ্যের বিশালতা ও দৌলত বিস্ময়ের বস্তু। ওলন্দাজদের কুঠির প্রায় দু মাইল দূরে ইংরেজদের কুঠি আছে একটু উপরের দিকে। উল্লেখযোগ্য যে গঙ্গার মোহানায় বড় জাহাজ রেখে, ওঁরা নৌকো করে গিয়েছিলেন কারণ নদীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চড়া পড়ে জাহাজ ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬৭২ সালে ওলন্দাজরা কয়েকটা জাহাজ এভাবে হারিয়েছিল। ওই সব জায়গায় ওরা নীচে লোহার শিকল দিয়ে কাঠ বেঁধে রেখেছে। ছশো টনের জাহাজই সহজভাবে

যেতে পারবে না।

শহরটা গঙ্গার ধারে এমন এক জায়গায় যেখানকার বাতাস ও আবহাওয়া ভাল। এখানে সব কিছুই পাওয়া যায় এবং খাবার খুব সস্তা। চারপাশের জায়গা খুব সুন্দর এবং খুব উর্বর। এখানে লেবুর জঙ্গল এবং ফলগুলি খেতে চমৎকার। চিনি এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রচুর গবাদি পশু আছে যার সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় বিশ হাজার হবে। এ জন্য আশেপাশের সব শহরে প্রচুর মাখন, পনির ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায়। অন্যান্য জন্তু আছে যার মধ্যে খরগোশ, হরিণ এমনকী হাতির দলকেও দেখা যায়। বড় বড় মুরগি আছে এবং জঙ্গলে নানা ধরনের প্রচুর বাঁদর আছে। এ ছাড়া বাঘ ও চিতাবাঘ আছে যারা নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে আসে এবং পাশের বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নৌকোর উপর থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়।

ওলন্দাজ কোম্পানির আধিকারিকের আদেশমতো এখানে শিকার প্রায় করা হয় না। উনি প্রায় রাজার সমান এবং প্রচুর ধনদৌলত সংগ্রহ করেছেন। এমনকী গঙ্গায় মাছ ধরলেও উনি তাদের কাছ থেকে কিছু নেন। এখানে সব কিছুরই দাম অল্প, বিশেষত গবাদি পশু খুব ভাল দামে পাওয়া যায়। ওলন্দাজদের জাহাজগুলি এখান থেকে সব খাবার নিয়ে নেয়। কয়েকটি মাঠে ইউরোপের মতন করে গমের চাষ হয়। নানা ধরনের কাপড়ের জিনিস এখানে তৈরি হয়। মুসলমানরা ভাল জরির কাজ করে। এখান মসলিনের কাজ খুব ভাল এবং তুর্কি দেশের মতো গালিচা তৈরি করা হয় যেগুলি ফরাসিদেশে চোদ্দ একুতে (তখন এক একুতে দুই সিক্কা টাকা) বিক্রি হয়, সেগুলির দাম এখানে মাত্র চার। এখানকার চটি জুতো পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভাল। কিন্তু এগুলি বৃষ্টির মধ্যে বাইরে পড়া যায় না, ঘরের মধ্যে আরামে পরা যায়। ওলন্দাজদের জাহাজের নাবিক ও কাপ্তানরা এখান থেকে জিনিস কিনে বাটাভিয়াতে বেশি দামে বিক্রি করে।

এখানকার লোকেরা সরকারি মনোভাবসম্পন্ন। এরা জাহাজে এসে মাল বিক্রি করতে চায়, কিন্তু এদের দাম অনেক বেশি। এরা অবশ্য খুব ভাল জিনিস নিয়ে আসে। খারাপ কিছু প্রায় পাওয়া যায় না। বড়লোকের বহুসংখ্যক দাস আছে যেগুলি তারা ঘোড়ার মতো বিক্রি করে। গরিবরা এদের কাজ করে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক টাকা পায়। কিন্তু কারওকে হত্যা করার ক্ষমতা এদের নেই। গরিবরা অনেক সময়ে তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের, এমনকী স্ত্রীকেও, বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। অনেক সময়ে বড় হলে এরা বাবা-মায়ের কাছে চলে আসে। মাত্র ত্রিশ সোল মাসে দিলে একটি মেয়ে পাওয়া যায় যে একাধারে স্ত্রীর মতন ও অন্যধারে দাসীর মতন। যে সব লোক গঙ্গার তীরে বাস করে, তারা মনে করে যে নদী পুণ্যময়। গঙ্গার ধারের লোকেরা মারা গেলে তাদের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। দিনে দুবার এরা গঙ্গায় স্নান করে। এখানে কড়ি মুদ্রা হিসেবে চলে। এ ছাড়া রুপোর টাকা ও সোনার মোহরও রয়েছে।

হুগলির ঐশ্বর্য অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ অবধি চলতে থাকে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে পর্যটক আলেকজান্ডার হ্যামিলটন হুগলিকে বাংলার প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। ছোট ছোট নৌকো আশেপাশের

জায়গায় জাল নিয়ে যাওয়া ছাড়াও, প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি জাহাজ বছরে আসে।

১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধের পর যখন ইংরেজদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে, তখন কলকাতার উত্থান তরান্বিত হয়। হুগলির অবস্থাও খারাপ হতে থাকে। পাদরি জোসেফ টিফেনথালার এই সময়ের কিছু পরে এসেছিলেন। তিনি বলছেন যে শহরটা একসময় লোকে ভর্তি ছিল। প্রচুর সংখ্যায় পর্তুগিজরা থাকত। এর সুন্দর প্রাসাদ ও সুন্দর সুন্দর বাড়ি ছিল। এখন শহরটা প্রায় পরিত্যক্ত। এর দুর্গটি একসময় পুরনো স্থাপত্যের ভিত্তিতে তৈরি এবং এখন একেবারে পরিত্যক্ত। ওখানে এখন কোনও সৈন্য নেই। ওই নদীর উত্তর পূর্ব দিকে অগাস্টাইনদের একটা গির্জা ও একটা কনভেন্ট দেখা যায়। ওই একই দিকে আরও কিছুদুর এগোলে যদি পশ্চিমে বাঁক নেওয়া যায়, তা হলে পাওয়া যায় সেন্ট ভিয়ার্জের গির্জা। কিন্তু এখন এটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল মাত্র জেসুইটরা এখানে থাকে। জোয়ার হুগলি অবধি এলেও বিশেষ বোঝা যায় না, যতটা পাওয়া যায় চন্দননগর ও চুঁচুড়া থেকে। সত্তরের দশকে মোদাভ যখন এসেছিলেন তখন তিনিও লক্ষ করেছেন যে জোয়ার আর হুগলি অবধি আসছে না। কলকাতার উপরে আর বিশেষ যায় না। বাংলার শহরগুলির যে উল্লেখ তিনি করেছেন তার মধ্যে হুগলি নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে হুগলি ছেড়ে ধনী ব্যক্তিরা কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। তখন থেকেই হুগলির পতনের শুরু হলেও, ওই ধাক্কা হুগলি কাটিয়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু ১৭১৭ সালে সম্রাট ফারুখশিয়ার ইংরেজদের বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে দিলে বণিকরা কলকাতায় চলে আসতে থাকে। এর কিছু আগে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের উত্থান শুরু হয় ও হুগলি পড়তে থাকে। ইংরেজদের আগ্রাসি ভূমিকার ফলে বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা। হুগলির পতন তরান্বিত হয়।

১৭৬৬ সাল থেকে ১৭৮৮ সালের মধ্যে গোলাম হোসেন সলিম ইংরেজ আমলাদের কথায় *রিয়াজ-উস সালাতিন* লেখেন। এতে তিনি হুগলির উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ছবি এঁকেছেন। উনি বলছেন যে সপ্তগ্রামের নদী পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাবার ফলে সপ্তগ্রাম ধ্বংস হয় ও হুগলি জনবহুল হয়ে উঠে। মুর্শিদকুলি খানের সময়ে তিনি ইংরেজ, চিন, পারস্য ও তুরানি সওদাগরদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতেন। তিনি এদের উপর কোনও অত্যাচার করেননি। সেই জন্য তাঁর আমলে হুগলি বন্দর পূর্বাপেক্ষা অধিক জনবহুল হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের জাহাজের মালিকরা এখানে বাস করতেন। কোনও প্রকার গম্বুজ, বাজারের জন্য অট্টালিকা অথবা দুর্গ ও গড় তৈরি করা ইংরেজদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এরপর যখন ফৌজদারদের অত্যাচার বেড়ে যায় তখন হুগলি বন্দরের অবনতি হয়। ইংরেজদের উদারতা, নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা ও শুল্কের হার কম হওয়ায় কলকাতা জনবহুল হয়ে ওঠে।

বর্তমান গবেষণায় মুর্শিদকুলি খানের জমিদার ও বণিকদের উপর অত্যাচারের

কথা জানা গিয়েছে। সুতরাং গোলাম হোসেনের বক্তব্য, যা ইংরেজ কোম্পানির আমলাদের প্ররোচনায় লেখা হয়েছিল, তা মানা যায় না। হুগলি বন্দর-শহরের ইতিহাসের ধারা আরও গভীরে—এর কার্যকারণ শুধু ফৌজদারের অত্যাচারের ফল নয়।

১৭.৩ ঢাকা

আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরিতে* ঢাকা জেলার মধ্যে দুটি সরকারের কথা বলেছেন—বাজুহা ও সোনারগাঁও। ১৭২২ সালে সুবাদার মুর্শিদকুলি খান সরকারগুলিকে তেরোটি চাকলাতে ভাগ করেন, যার মধ্যে ছিল চাকলা জাহাঙ্গির নগর। এর মধ্যে ছিল সরকার বাজুহা, মাহমুদাবাদ, সোনারগাঁও, বাকলা, ফতাবাদ ও ঘোরাঘাট-এর পূর্ব দিক। ইংরেজরা পরে এর বদল করেন।

ঢাকার নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পরম্পরা অনুযায়ী বলা যায় যে ঢাক গাছ থেকেই নাম এসেছে, আর একটা পরম্পরা ছিল যে দুর্গা এখানে ঢাকা ছিলেন। আবার বলা হয় যে ইসলাম খান ঢাক বাজিয়ে শহর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান যুগের কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করছেন যে নামটি এসেছে পর্যবেক্ষণের উঁচু জায়গা থেকে। কিন্তু ঢাকা শহরটি কোনও উঁচু জায়গায় নেই যে এটা একটা পর্যবেক্ষণের জায়গা হবে। সুবাদার ইসলাম খান এর নাম বদলে জাহাঙ্গিরনগর করলেও পুরনো নাম চলতে থাকে।

বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরী নদী থেকে বেরিয়ে এসে আবার পরে ওই নদীর জলে মিলিত হয়েছে। ঢাকা শহর বুড়িগঙ্গার উত্তর পাড়ে ছিল। ১৯৩৬ সালের একটা প্রবন্ধে ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালি লিখছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বুড়িগঙ্গা দক্ষিণ-পূর্বে এরকম হঠাৎ বাঁক নেয়নি। ফলে দুই নদীর তখন সংযোগ ছিল না এবং দলুই নদী খিজিরপুরের কাছে লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে *বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবির* লেখক মির্জা নাথান, যিনি ওই সময় ওখানে ছিলেন, বুড়িগঙ্গাকে দলুই নদী বলে উল্লেখ করেছেন।

ঢাকা শহর মোগলদের সময়ে উঠলেও, তার আগে ওখানে জনবসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর হরিশঙ্করের মূর্তি ও সপ্তম শতাব্দীর গুপ্তযুগের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। সুলতানি যুগের প্রথম শিলালেখ পাওয়া যায় ১৪৬০ সালে বীরভূম অঞ্চলে যেখানে *ঢাকাক্কা* কথাটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেটাই এই ঢাকা কিনা এ নিয়ে সন্দেহ আছে। ১৬১৫ সালের জোয়াও দ্য বারোসের রেখাচিত্রে ঢাকা দেখানো হয়েছে যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে এর আগেই শহরের প্রতিষ্ঠা ছিল। উল্লেখযোগ্য যে আবুল ফজল *আকবরনামাতে* জমিদারদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধের বৃত্তান্তের মধ্যে কয়েকবার ঢাকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তখন উনি একে

থানা হিসেবে বলছেন এবং এখানে একজন থানাদার বসানো হয়েছিল তার কথাও বলেছেন। এটাই শহরের প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্যটক ঢাকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওঁর ঢাকা এ ঢাকা নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঢাকা মোগল রাজধানী হয়ে যায় সুবা বাংলার। তখন থেকেই ঢাকার উত্থান ধরা যেতে পারে। কিন্তু মোগলরা রাজমহল ছেড়ে কেন এবং কবে ঢাকায় এল এ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। ১৮১৩ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট বলেছেন যে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের ঠেকানোর জন্যই রাজধানী সরিয়ে আনা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে ঐতিহাসিক সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ ছাড়াও বলেছেন যে ভাটির জমিদারদের দমন করার জন্য এখানে রাজধানী করা হয়। মির্জা নাথান ভাটির জমিদারদের, বিশেষত মুসা খান ও ওসমান খানের বিদ্রোহের কারণের জন্য সরানো হয়েছিল বলেছেন কিন্তু মগ ও পর্তুগিজদের কথা বলেননি। সরানোর তারিখ নিয়ে মতভেদ ছিল কিন্তু এখন সেটা নিরসন হয়েছে। সমকালীন ফারসি আকরের উপর ভিত্তি করে, ঐতিহাসিক সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলছেন যে ইসলাম খান সুবাদার হন ১৬০৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে এবং ঢাকাতে পৌঁছোন ১৬১০ সালের মাঝামাঝি। তবে উনি বলেছেন যে রাজধানী সরাতে অনেক সময় লেগেছিল। একদিনে হয়নি। রাজনৈতিক ও সামরিক কারণের জন্য ওঁকে বহুদিন ওখানে থাকতে হয়েছিল, ফলে সাময়িক আস্তানা ধীরে ধীরে রাজধানীতে পরিবর্তিত হয়। উনি ওখানে আসার পরে ওই জায়গার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গিরনগর, কিন্তু সরকারিভাবে সেটা স্বীকৃতি পায় বিদ্রোহী ওসমানের মৃত্যুর পর। ওঁর মতের সমর্থন করেন ঐতিহাসিক ভট্টশালি।

বাহারিস্তান-এর ইংরেজি অনুবাদের লেখক বলেছেন যে ইসলাম খান ১৬০৮ সালের জুলাই মাসে ঢাকা পৌঁছলে ওটাই রাজধানী হয়ে যায়। ঐতিহাসিক দানি এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আবদুল করিম দেখাচ্ছেন যে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। উনি সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত গ্রহণ করেছেন। ভট্টাচার্য *বাহারিস্তান*-এর তারিখ গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত দিয়েছেন। বরঞ্চ উনি বলেছেন যে জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনীতে ইসলাম খানের সুবাদার পদে নিয়োগের তারিখ হচ্ছে ১৬০৮ সাল এবং উনি ১৬১০ সালের জুলাই মাসে ঢাকা পৌঁছোন।

কিন্তু ভট্টাচার্যের মত যে রাজধানী ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, এর পিছনে তথ্য নেই। সুবাদারের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সামরিক ও অসামরিক শাসনযন্ত্র এসেছিল। ইসলাম খানের সঙ্গেই ঢাকায় এসেছিলেন দেওয়ান-ই সুবা ও বক্সি-সুবা। এদের আসার আগেই ইসলাম খান লোক পাঠিয়েছিলেন ঢাকার দুর্গের সংস্কারের জন্য। এমনকী ইসলাম খান আসার আগেই, মির্জা নাথান জায়গাটিকে ঢাকা নামে অভিহিত করেছেন। ইসলাম খান আসার পরে উনি একে বলছেন জাহাঙ্গিরনগর। জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনীতে একে প্রথমে ঢাকা বললেও পরে একে জাহাঙ্গিরনগর বলেছেন। সুতরাং ১৬১০ সালের মাঝামাঝি ইসলাম খান এখানে আস্তানা গাড়লে এটি রাজধানী হয়ে যায়।

ঢাকা মোগলদের সব সময়টায় বাংলার রাজধানী ছিল না। ১৬৩৯ সালে যুবরাজ

শাহ্ সুজা সুবাদার হলে ১৬৪০ সালের মধ্যে রাজধানী রাজমহলে সরিয়ে নিয়ে যান। পাদরি মানরিক যখন ১৬৪২ সালে আসেন তখন রাজধানী রাজমহলে। শাহ্সুজার আরাকানে পালানোর পরে, মির জুমলা ঢাকাতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। ১৭১৫-১৬ সালে মুর্শিদকুলি খান সুবাদার হলে পর, রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরানো হয়। কিন্তু মনে হয় এর আগেই রাজধানী সরানো হয়েছিল। ১৭১৪ সালে যখন বিদ্রোহী সীতারাম রায়ের পরিবারবর্গকে ধরা হয়, তখন তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদে। ঢাকা থেকে রাজধানী সরানো হলেও সুবাদারের পক্ষ থেকে ওখানে ছিলেন একজন নায়েব—নাজিম, যিনি ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা শাসন করেছেন।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইসলাম খানের সময়ে প্রথম যে সরকারি বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় সমকালীন *বাহারিস্তানে*, সেটা একটা দুর্গ। কিন্তু অন্যান্য দফতরের জন্য আরও বাড়ি করা হয়েছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় দুর্গের আশেপাশের রাস্তা বা এলাকার নামকরণের মধ্যে দিয়ে। পাওয়া যায় উর্দু রাস্তা, যেটি প্রধানত সৈন্যদের জন্য ব্যবহার করা হত এবং যেটি মোগল দিল্লির দুর্গের পাশেও পাওয়া যায়। এ ছাড়া রয়েছে দেওয়ান বাজার, বক্সি বাজার, মোগলতলি, পিলখানা (হাতির আস্তাবল), আতসখানা (কামান বন্দুক তৈরির বা গুদামের এলাকা), মাহুততলি ইত্যাদি। এর থেকে মনে হয় যে এইসব এলাকাগুলিতে বিভিন্ন আমলা ও তাদের বিভাগগুলি ছিল। এ ছাড়াও পাওয়া যায় কায়েততলি যেখানে কায়স্থরা থাকতেন। এরা প্রধানত বিভিন্ন বিভাগে কেরানির কাজ করতেন। সুতরাং সরকারি চাহিদার ফলে ঢাকার প্রথম দিকে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল জমিদার শ্রেণী ও ব্যাপারিরা। সমকালীন *বাহারিস্তানে* বলা হয়েছে যে কীভাবে ব্যাপারিদের নৌকাগুলি মোগল সৈন্যদের পিছনে পিছনে আসছে। মোগল শহরের প্রথা অনুযায়ী বিচার বিভাগ এখানেই ছিল এবং কোতোয়াল ও মহতাসিব শহরের কাজ দেখতে শুরু করেন।

ইসলাম খানের সময় শহরটার চেহারা কীরকম ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় *বাহারিস্তান* থেকে কারণ এর লেখক মির্জা নাথান কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন। মির্জা নাথান ও তাঁর বাবা ইহতিমাম খান ১৬১০ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় বেগ মুরাদ খানের দুর্গের কাছে আসেন। এখানেই দলুই নদীর সঙ্গে বুড়িগঙ্গার সংযোগ হয়েছে। একটা দুর্গ ছিল মির্জা নাথানের ও অন্যটি ছিল ওঁর বাবা ইহতিমাম খানের অধীনে। মির্জা নাথান ভুলবশত বলছেন যে শহরটা ছিল দলুই নদীর উপরে। নদীটা শহরে যাবার আগে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটা শাখা খিজিরপুরে লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ও অন্যটি ওই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে আরও উপরে দেমরার কাছে। সুবাদার ইসলাম খানের কাছে যাবার পথে মাঝামাঝি জায়গায় মির্জা নাথান একটা পাকুর গাছ দেখতেন। এটিই পুরনো ঢাকা ও নতুন ঢাকার সামানায় ছিল এবং মির্জা নাথানের বাড়ি থেকে ইসলাম খানের দুর্গের পথের মাঝখানে ছিল।

বর্তমানে ঐতিহাসিকরা ওই জায়গাটাকে শনাক্ত করেছেন। ওই জায়গার নাম ছিল পাকুরতলি যা বর্তমানে বাবুবাজার। পুরনো ঢাকা ছিল সদরঘাট পর্যন্ত। ইসলাম

খানের পুরনো দুর্গ বর্তমান জেল এলাকায় ছিল বলে ধরা হচ্ছে। ঐতিহাসিক ভট্টশালি মনে করেছেন যে মির্জা নাথান তাঁর অধীনে যে দুর্গ ছিল, সেখানেই বাস করতেন। কিন্তু ওঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় যে উনি পূর্ব দিকের কোথাও বাস করতেন ওই দুর্গে নয়। শহরটা বেগ মুরাদ খানের দুর্গের দিকে প্রসারিত হয় বেশ কিছুকাল পরে। এ ছাড়াও, অন্য এক জায়গায় মির্জা নাথান বলছেন যে তিনি নদীর ধারে নিজের বাড়িতে বাস করতেন। এই বাড়িতে তিনি কয়েকটা খানাপিনার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এর থেকে মনে হয় যে উনি বেগ মুরাদ খানের দুর্গের পশ্চিমে বাস করতেন।

শহরটা তখন পশ্চিমের চকবাজার থেকে পুবে সদরঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলরা শহরের পশ্চিম দিকটায় জনবসতি করতে চেষ্টা করে। নদীর ধার ধরে স্বভাবতই শহরটা বাড়ছিল। উত্তরে হয়তো কিছুটা বেড়েছিল কিন্তু এর সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।

ইসলাম খান ঢাকায় আসার পর তিন বছর বেঁচে ছিলেন। ফলে শহরের বিস্তার করার সুযোগ তিনি বিশেষ পাননি। *বাহারিস্তান* শুধু দুর্গ ও চাঁদনিঘাটের কথা বলেছে ইসলাম খানের সময়ে। মনে করা হচ্ছে যে বাদশাহি বাজার (বর্তমান চকবাজার) তখন ছিল। কিন্তু ওখানকার দোকানগুলি তৈরি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। দুর্গের পশ্চিমে ছিল উর্দুবাজার প্রধানত সৈন্যদের জন্য। একটি এলাকাকে *ইসলামপুর* বলা হয় ও একটি মসজিদের নাম *ইসলাম খান কি মসজিদ*। কিন্তু অধ্যাপক দানি দেখিয়েছেন যে ওই মসজিদটি ইসলাম খানের পরে তৈরি করা হয়েছিল। ওই রাস্তা ও মসজিদটা পুরনো ঢাকা এলাকার মধ্যে পড়ে। তবে ইসলাম খানের বাড়ি থেকে মসজিদটা ছিল বেশ দূরে। ইসলাম খানের একটা কাজের মধ্যে ছিল যে উনি দলুই নদী ও বুড়িগঙ্গার মধ্যে একটা খাল কেটে দুটি নদীর সংযোগ করান তাঁতীবাজার-মালিতলা এলাকায়। এটাই ওই পাকুরতলির পাকুর গাছের কাছে পড়ে নতুন ঢাকা ও পুরনো ঢাকাকে সমানভাবে বিভক্ত করেছিল। ঐতিহাসিক ভট্টশালি বলছেন যে ইসলামের খানের শহরের সুরক্ষার জন্য ওই খাল কাটা হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় যে চাঁদনিঘাট থেকে লাক্ষ্যা নদীতে সৈন্য পাঠানোর জন্য এটা করা হয়েছিল।

ঢাকা রাজধানী হবার পর বহু রাজনৈতিক উত্থানপতনের সাক্ষী হয়েছে। ইসলাম খান মারা যাবার এক বছর আগে বিদ্রোহী ওসমান খানের ভাই ও ছেলেকে নিয়ে বিজয়ী সেনাপতি শোভাযাত্রা করে ঢাকায় আসে। ইসলাম খানের মৃত্যুর পর ওঁর ভাই কাসেম খান সুবাদার হন। উনি ছিলেন অত্যন্ত অযোগ্য এবং ওঁর সময়ে আরাকানি ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ বেড়ে যায়। এর পরের সুবাদার ইব্রাহিম খান (নুরজাহানের ভাই) শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন। ওঁর চার বছরের শাসনকালে বাংলায় শান্তি থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। নুরজাহানের কাছে ঢাকাই মসলিন, যার বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুল করিম, ও অন্যান্য কাপড় নিয়মিত পাঠানো হত। কিন্তু শাহজাহান (তখন যুবরাজ খুরম) বিদ্রোহ করে বাংলায় এলে তেলিয়াঘরির যুদ্ধে ইব্রাহিম খান মারা যান। শাহজাহান এর পরে নৌকো করে ঢাকায় এলে শহরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ইব্রাহিম খানের ভাইপো, যিনি শহরের

সাময়িক অধিকর্তা ছিলেন, ওঁকে অভ্যর্থনা জানান। এখান থেকে শাহজাহান প্রচুর হাতি, ঘোড়া ও কম করে চল্লিশ লাখ টাকা কোষাগার থেকে পান। শাহজাহান শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে গেলে দরাব খান ওঁর শাসনকর্তা হিসেবে থাকেন। ওঁর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গির খানাজাদ খানকে শাসনকর্তা করে পাঠান। বলা হয় যে এক বছরে উনি আগ্রাতে চব্বিশ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন। এর পরে আসেন মুকারম খান যিনি ঢাকার সামনে রাতে নৌবহরে দ্বীপ জ্বালিয়ে উৎসব করার সময় জলে ডুবে মারা যান। পরবর্তীকালে পরাজিত নায়কের মতো শাহসুজা ঢাকাতে এসেছিলেন; ফলে এখানে তাঁর অভ্যর্থনা যুবরাজ খুরমের মতো হয়নি। মির জুমলা তিন বছর সুবাদার ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রায় সবটা সময়ই চলে যায় কোচবিহার ও আসামে যুদ্ধ করতে।

১৬৪০ সাল নাগাদ থেকে বিদেশিদের লেখা থেকে ঢাকা শহরের উন্নতি ও প্রসার লক্ষ করা যায়। পাদরি মানরিক ১৬৪০ সালে ঢাকায় এসেছিলেন। উনি বলছেন যে এটাই বাংলার প্রধান শহর। এটা নদীর ধারে একটা চওড়া ও সুন্দর সমতল জমির উপর। শহরটা দেড় লিগ পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে চলে গিয়েছে। একদিকের শেষে রয়েছে নারিন্দা ও ফুলবাড়িয়া যার পরে রয়েছে মানেশ্বর শহরতলি যেখানে খ্রিস্টানরা বাস করে। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে ১৬১০ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যেকার তিরিশ বছরে শহরটা দুগুণ বেড়ে গিয়েছে। সব থেকে বেশি বেড়েছে পশ্চিম দিকে। পুব দিকে সেরকম কোনও প্রসার নেই। যেটা উল্লেখযোগ্য মানরিকের বর্ণনায় সেটি হল যে উত্তর দিকে শহর বাড়ছে ফুলবাড়িয়া (বর্তমান রেলস্টেশন) পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওদিকেই ছিল সরকারি দপ্তরখানা ও ঘাঁটি। সুতরাং ওদিকে বাড়ছে প্রধানত সরকারি চাহিদার ফলে।

কিন্তু মানরিক শহরের এই উন্নতির অন্য কারণ দেখাচ্ছেন যেটা অগ্রাহ্য করা যায় না। উনি বলছেন যে এই শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিদেশিরা এখানে আসে এখানকার পণ্য কিনতে। এর ফলেই শহরের দৌলত অনেকখানি বেড়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে উনি বলছেন যে প্রচুর পরিমাণ মুদ্রা ক্ষত্রিদের বাড়িতে থাকে। এগুলি এত বেশি যে গোনা যায় না এবং এগুলি ওজন করে হিসেব করতে হয়। মানরিক শহরতলিসুদ্ধ লোকসংখ্যা ধরেছেন দু লাখের বেশি, যার হিসেব আমরা পরে দেখব। উনি বলেছেন বাইরের থেকে বহু লোক আসে প্রধানত বাণিজ্যের জন্য। কেউ বা আসে সৈন্য দলে যোগ দেবার জন্য। এর বাজারে সব ধরনের পণ্য ও খাবার পাওয়া যায়।

১৬৬৬-৬৭ সাল নাগাদ থেভনো ঢাকার বর্ণনা দিয়েছেন। উনি বলেছেন এটাই বাংলার রাজধানী এবং গঙ্গার উপরে। শহরটা খুব সরু এবং নদীর ধার ধরে দেড় লিগ মতন লম্বা। অধিকাংশ বাড়িই মাটির। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কুঠিগুলি পাকা কারণ তাদের মাল সুরক্ষিত করার জন্য তারা প্রচুর খরচ করেছে। অগাস্টাইনরা এখানে একটা মঠ তৈরি করেছে। জোয়ার ঢাকা পর্যন্ত আসে। সুতরাং ঢাকায় বড় জাহাজ যা তৈরি হয় সেগুলি বঙ্গোপসাগরে যেতে পারে। ওলন্দাজরা এখানে ভাল বাণিজ্য করে।

থেভনোর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে ১৬৪০ সালের পর শহরটা বেশি বাড়েনি।

মাটির বাড়ির সংখ্যা বেশি হওয়ায় শহরের যতটা উন্নতির কথা ছিল, ততটা হয়নি। কিন্তু এই বর্ণনা কতটা খাঁটি সেটা বলা শক্ত।

১৬৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাভারনিয়ার ঢাকায় এসেছিলেন। ওঁর বর্ণনায় ঢাকার নদী ও কয়েকটা জায়গার কথা পাওয়া যায় যার থেকে ঢাকায় আসা যাওয়ার পথ ও আশেপাশের জায়গাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। তাভারনিয়ার আসছিলেন রাজমহল থেকে। ১১ জানুয়ারি নাগাদ তিনি গঙ্গার তিনটে ভাগের মুখে এসেছিলেন। এর একটা শাখা ঢাকাতে গিয়েছে। এর মুখে ওঁরা যাত্রাপুর বলে একটা গ্রামে ছিলেন যেটা বিশ ক্রোশ দূরে ঢাকা থেকে। এখান থেকে জলপথে ঢাকাতে যাওয়া যায়। ১৩ জানুয়ারি ওঁরা ঢাকার দু ক্রোশ দূরে লাক্ষ্যা নদীতে আসেন। দুই নদীর সংযোগস্থলের বিপরীত দিকে একটি দুর্গ আছে। এর আধক্রোশ নীচে পাগলা নদী যার উপর একটা পাথরের সাঁকো মির জুমলা তৈরি করেছিলেন। এর আধক্রোশ দূরে কদমতলি যার উপর একটা ইটের সাঁকো আছে। এর দুপাশের মিনারে গাঁথা ছিল মানুষের মাথা। এরা চোর এবং ধরা পড়েছে।

ঢাকা একটা বড় শহর যেখানে লোকেরা তাদের বাড়ি গঙ্গার ধারে করবার চেষ্টা করছে। এ শহরটা প্রায় দু ক্রোশ লম্বা। শেষ ইটের সাঁকো থেকে ঢাকা পর্যন্ত পরপর বাড়ি চলে গিয়েছে। বাড়িগুলি একটার থেকে আরেকটা আলাদা এবং এগুলিতে প্রধানত ছুতোররা থাকে যারা জাহাজ ও অন্যান্য নৌকো তৈরি করে। এই বাড়িগুলি অবশ্য খুব সাধারণ কুঁড়েঘর, বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরি। ঢাকা শহরের মধ্যের বাড়িগুলি এর থেকে খুব ভাল নয়। ঢাকার শাসনকর্তার বাড়ির চারপাশে উঁচু দেওয়াল যার মাঝখানে একটা খারাপ বাড়ি আছে। কাঠ দিয়ে তৈরি। এই দেওয়ালের মধ্যেই শাসনকর্তা একটা তাঁবুতে থাকেন। ওলন্দাজ ও ইংরেজরা তাদের পণ্যের সুরক্ষার জন্য শক্ত বাড়ি তৈরি করেছে। অগাস্টাইন পাদরিদের গির্জাটিও ইটের তৈরি এবং এর স্থাপত্যর কাজ খুব সুন্দর। ওই সময় শায়েস্তা খান ছিলেন শাসনকর্তা।

ইসলাম খান সাজাদপুর থেকে ইছামতী দিয়ে এসেছিলেন। ঢাকা থেকে যাতায়াত করার এটাই ছিল প্রধান পথ। বুড়িগঙ্গার ধলেশ্বরীর মুখ তখনও তৈরি হয়নি। এটা পরিষ্কার দেখা যায় সমকালীন ইউরোপীয় ভান ডেন ব্রুকের রেখাচিত্রে। তাভারনিয়ার পথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে এই রেখাচিত্রের মিল আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনেলের মানচিত্র যখন তৈরি করা হয়, তখন ইছামতীর এই অংশটা শুকিয়ে গিয়েছে যদিও এর চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। ব্রুক-এর রেখাচিত্রে কাত্রাবার যে জায়গাটা দেখাচ্ছে সেটি বর্তমান দেওয়ানবাগ বা মুনওয়ার খানের বাগ। উল্লেখযোগ্য যে এই রেখাচিত্রে যে নদীর উপর ঢাকা রয়েছে, সেটি পড়েছিল লাক্ষ্যা নদীতে ধলেশ্বরী নদীতে নয়। তাভারনিয়ারের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে উনি এই পথ ধরেই এসেছিলেন। উনি ধলেশ্বরীর পথ দিয়ে যেতেন যদি ওই পথ খোলা থাকত। সুতরাং তাভারনিয়ারের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় ও মোটামুটি ঠিক বলে ধরা যেতে পারে। দুটি নদীর সংযোগস্থলের দুর্গটি হাজিগঞ্জ বা খিজিরপুরের দুর্গ। লাক্ষ্যা নদীর অপর পারে ছিল সোনাকান্দার দুর্গ। দুটি দুর্গেরই ধ্বংসাবশেষ আছে। সিহাবুদ্দিন তালিশও বলেছেন যে ঢাকার একটাই পথ ছিল খিজিরপুর হয়ে। ১৬৬৪ সালে যখন শায়েস্তা

খান আসেন, তখন শীতকালে এই পথটি শুকিয়ে গিয়েছিল। ধলেশ্বরীর পথ খুলে যায় যখন ১৭৮০ সালের আগে ব্রহ্মপুত্র যমুনায় এসে পড়েছিল। ১৬২৫ সাল নাগাদ মগরা যখন ঢাকা লুঠ করে, তখন অধিবাসীরা দলুই নদীর উপরে বাঁশের সাঁকো দিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছিলেন।

১৬৪০ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে ঢাকা বেশি বাড়েনি এটা দেখা যায়। এর কারণ যে শাহসুজা সুবাদার হবার পর ঢাকা থেকে রাজধানী রাজমহল সরিয়ে নিয়ে যান। মির জুমলা ১৬৫৯ সালে ঢাকায় রাজধানী নিয়ে এলেও উনি ওখানে ছিলেন না। ফলে সরকারি চাহিদা ছিল না এবং ঢাকার প্রসারও একরকম বন্ধ ছিল। মির জুমলার তিন বছরের শাসনকালে ঢাকায় এসেছিলেন নিকোলাই মানুচ্চি। উনি রাজমহল থেকে নদীপথে আসেন তবে পথের বর্ণনা দেননি। তখন রাজমহল পরিত্যক্ত হলেও শাহসুজার গোলন্দাজ বাহিনির অধ্যক্ষ মির্জা জানি ছিলেন রাজমহলের শাসনকর্তা। ঢাকায় যখন মানুচ্চি আসেন তখন মির জুমলা আসামের যুদ্ধে গিয়েছেন। উনি বলছেন যে ঢাকা শহর বড় বা শক্ত নয় তবে এখানে বহু লোক বাস করে।

এখানকার বাড়িগুলি প্রায় সবই খড়ের। ওই সময় ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কুঠি ছিল। এখানে অনেক খ্রিস্টান বাস করে যার মধ্যে সাদা ও কালো পর্তুগিজ রয়েছে। অগাস্টাইনদের একটা গির্জা আছে। মির জুমলা একজন ইংরেজকে মাসে পাঁচশো টাকা দিয়ে রেখেছিলেন যে নদীর ধারে নৌকা বানাত ও জলযুদ্ধের জন্য গোলাবারুদ তৈরি করত।

১৬৬৯ সালের পর আসেন টমাস বাউরি যিনি একাধারে বণিক ও নাবিক। উনি বলছেন যে ঢাকা খুব বড় জায়গা নিয়ে শহর কিন্তু এটা নিচু জলাভূমির উপর। ফলে এর জল পরিষ্কার নয়। কিন্তু এর সামনে বড় একটা নদী আছে যেটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে যাচ্ছে। এই নদীতে ছশো টনের জাহাজ পর্যন্ত আসতে পারে এবং এই নদী যেহেতু গঙ্গার একটা শাখা, সেহেতু এর জল খুব ভাল। কিন্তু শহরটা প্রায় চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে ফলে যারা দূরে থাকে তাদের পক্ষে এই জল নিয়ে যাওয়া কষ্টকর।

শহরটা বড় হলেও চমৎকার। এর মধ্যে চমৎকার বাড়ি ও বহু লোক আছে। একটা বড় সৈন্যদলকে মাহিনা দিয়ে এখানে রাখা হয়। এর সঙ্গে রয়েছে বিরাট বিরাট অনেক হাতি যেগুলি প্রাসাদের কাছে রাখা হয়। এ ছাড়াও এখানকার বড় ধনী লোকেরা অনেক হাতি রাখে এবং তার সঙ্গে সৈন্য। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কুঠি আছে কিন্তু এদের লগ্নি খুব কম। অন্যদিক দিয়ে এদের গুরুত্ব বেশি কারণ এরা সুবাদারের দরবারের কাছে থাকে।

বাউরি মনে হয় সত্তরের শেষ দিকে এসেছিলেন, সম্ভবত ১৬৭৮ সালের পর। ততদিনে ঢাকা শহর নদীর উত্তর দিকে বারো মাইল দূরে টঙ্গি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ঢাকার এই তাড়াতাড়ি উন্নতির কারণ শায়েস্তা খানের তৎপরতা। ঢাকার যে প্রাসাদের কথা বাউড়ি বলেছেন সেটি মনে হয় লালবাগ দুর্গ, যেটি আজম খান ১৬৭৮ সালে তৈরি করেন। দুর্গ অসমাপ্ত রেখে তিনি চলে গেলেও শায়েস্তা খান এটি সমাপ্ত করেননি। বাউড়ির লেখা থেকে মনে হয় যে শায়েস্তা খান তখন ওই প্রাসাদে ছিলেন।

ইংরেজদের কুঠি শুরু হয় ১৬৬৬ সালে। এটি প্রথমে ছিল তেজগাঁওতে। নদী থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। কিন্তু প্রথম থেকেই ইংরেজ কোম্পানির আমলারা বলতে থাকে জায়গাটা বাণিজ্যের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এটা দরবারের থেকে তিন মাইল দূরে। কিন্তু শুল্কবিভাগ ও নদীর ধার থেকে অনেক দূরে বলে হেজেস অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি ১৬৬৮ সালের আগে এই কুঠিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়নি।

১৬৭০ সালে কাজ ভালভাবে হতে থাকে যখন জন স্মিথ এর প্রধান ছিলেন। ইংরেজ কুঠিটা ছিল ছোট এবং তখন বাণিজ্যে সেরকম লগ্নি ছিল না। সম্ভবত জেমস হার্ট নামে একজন বণিকের ব্যক্তিগত বাড়ি ছিল । ওই ব্যবসা ঢাকাতে ভাল চলেনি। হার্ট এর আগে নবাবের এক সিপাহিকে ওই বাড়ি বিক্রি করেছিলেন এবং ১৬৮২ সালে ওই সিপাহি বাড়ি বিক্রির কাগজপত্র নিয়ে হাজির হয়। দেখা যায় যে দলিলটি পর্তুগিজে লেখা এবং ১৬৫৮ সালে হার্ট-এর কাছ থেকে সিপাহি এটি কিনেছিল। ইংরেজরা কোতোয়ালকে ডাকলে, সে সিপাহিকে ভয় দেখায় যার ফলে সিপাহি পালিয়ে যায়। ১৬৯০ সালে ইঙ্গ মোগল যুদ্ধের সময় ঢাকা কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭২৩ সালে মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারির সময়ে আবার ওই কুঠির কাজকর্ম শুরু হয়।

১৬৬৩ সালের মধ্যে ওলন্দাজরা ঢাকায় কুঠি বানায়। ওরা প্রথমে তেজগাঁওতে কুঠি করে। কিন্তু নানা কারণে ওখানে অসুবিধে হলে তারা বুড়িগঙ্গার ধারে আরেকটা কুঠি করে পরে যেখানে মিটফোর্ড হাসপাতাল করা হয়। ফরাসিদের নৌকা ঢাকাতে প্রথম আসে ১৬৮২ সালে এবং ওরাও ওখানে কুঠি করে। গ্রেগয়ার বুতে এর কর্তা হন। এরাও তেজগাঁওতে একটি কুঠি ও নদীর ধারে আরও একটি কুঠি করে যেটি পরে আহসান মঞ্জিলে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৭৩০ সালে দুপ্লেক্স বাংলায় আসার পর তাদের বাণিজ্য জোরদার হয়। ১৭৪৭ সাল নাগাদ ফরাসিরা এখান থেকে তিন লাখ টাকার মতো পণ্য কিনত। কোম্পানি ফরাসগঞ্জে জমিও কেনে। এটি তখন ছিল ঢাকা শহরের পূর্ব সীমানা। পলাশি যুদ্ধের পর ফরাসিদের বাণিজ্য পড়তে থাকে এবং ১৭৭৪ সাল নাগাদ তাদের কুঠি বন্ধ করে দেয়।

দেখা যাচ্ছে যে ঔরংজেবের সময়ের প্রথমদিকে ঢাকা শহর উত্তর দিকে বাড়ছিল। উত্তর দিকে শহরের সীমানা নির্দিষ্ট করার জন্য মির জুমলা একটা দরজা তৈরি করে দেন যেটি পরবর্তীকালে রমনা দরজা নামে অভিহিত হত। এর পরে এটি ধ্বংস হয়ে যায় ও ১৯৬১ সালে পুনর্নির্মাণ করা হয়। বর্তমান হাইকোর্ট বাড়ির পশ্চিম দিকে এটি আছে।

শহরের মাঝখানের জায়গা অবশ্য কিছু আগে থেকে ভর্তি হতে থাকে। ১৬৪৫ সালে শাহসুজার দেওয়ান নদীর ধারে চকবাজারের দক্ষিণে একটা বাড়ি করেন যাকে বলা হয় *বরা কাটরা।* এটিতে যুবরাজের থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি থাকতেন রাজমহলে। ফলে এটি তিনি তাঁর দেওয়ানকে দান করেন। তবে আরাকানে পালানোর আগে সুজা ও তাঁর পরিবারবর্গ কোথায় ছিলেন জানা যায় না। মির আবদুল কাসিম একটি ইদগা তৈরি করেন পিলখানার উত্তরে। জায়গাটি এখনও ইদগা

নামে পরিচিত। পিলখানার উত্তরে তখনও আর কোনও সৌধ হয়নি। মনে হয় উত্তরের মাঠে সৈন্যদের জড়ো করার জায়গা ছিল। ১৬৬১ সালে চকবাজারের পূর্বে মুহম্মদ মুকিম, যিনি নওয়ারার দারোগা ছিলেন, একটা কাটরা করে দেন যেটা *মুকিম কাটরা* বলে পরিচিত। মির জুমলা অবশ্য দুটি রাস্তা করেছিলেন সাঁকো সুদ্ধ। একটা টঙ্গির মধ্য দিয়ে উত্তরে চলে গিয়েছে। এখানে উনি টঙ্গির উপর একটা সাঁকো করে দেন। অন্যটি দক্ষিণে খিজিরপুর দিয়ে চলে গিয়েছে। এই পথে পাগলা নদীর উপর একটা সাঁকো উনি করেছিলেন যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। তাভারনিয়ার এই পথ ধরেই এসেছিলেন। এর আলোচনাও আগে করা হয়েছে।

ঢাকার স্বর্ণময় যুগ শায়েস্তা খানের শাসনকালে। ওঁর প্রথম নিয়োগ হয়েছিল ১৬৬০ সালে। ওই সময়ের পর্যটকদের লেখা আমরা আগে দেখেছি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ঢাকার প্রসার শেষ শিখরে পৌঁছায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজধানী মুর্শিদাবাদে চলে গেলে ঢাকার প্রসার কমে যায়। এর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ অংশের গুরুত্ব অনেক কম ছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে মোগলদের দপ্তর ছিল ইসলাম খানের দুর্গের কাছে। তা ছাড়া মিরপুর এলাকায় শাহ বন্দরদের দপ্তর থাকায় বাণিজ্যিক কাজকর্ম ওখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোক ও অভিজাতরা সবসময়ে চাইতেন নদীর পারে থাকতে। ফলে নদীর পাড় ধরে লম্বা শহর গড়ে উঠে। এমনকী ১৭৮০ সালে মেজর রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে মির জুমলার দরজার উত্তর দিকে বাগান ও গাছে ভর্তি। সুতরাং নদীর পাড় ধরেই যে জনবসতি ও মসজিদগুলি হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শায়েস্তা খানের সময় বাড়ি তৈরির যজ্ঞ শুরু হয়। বাবুবাজারের কাছে উনি পাঁচিলে ঘেরা একটা কাঠের প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন যেটির উল্লেখ তাভারনিয়ার করেছেন। এখন আর নেই। কিন্তু ওঁর মসজিদ ওই এলাকাতে রয়েছে। ১৬৭৬ সালে শায়েস্তা খান চকবাজার মসজিদ ও ১৬৬৩ সালে ছোট কাটরা তৈরি করেছিলেন। এ ছাড়া শায়েস্তা খান সাত গম্বুজ মসজিদ করেছিলেন। এর কাছেই ছিল দারা বেগমের সমাধি ও আলকুরির মসজিদ। উত্তরে মির জুমলার দরজা পেরিয়ে পাণ্ডু নদীর উপর একটা সাঁকো করেছিলেন খোজা অম্বর নামে এক বণিক। এটি এখন আর নেই। নারিন্দা সাঁকো নামে আর একটি সাঁকো করে দেন আর এক জন বণিক।

ঢাকার *লালবাগ* দুর্গ নদীর ধারে এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে। লালবাগ নামকরণ কেন হয়েছিল সেটা বলা শক্ত। মনে করা হয় যে আগে ওই নামে একটা বাগান ছিল যার কিছুটা সমর্থন মেলে ওই এলাকার নামকরণ থেকে। জায়গাটিকে বলা হত *কাশেরহাট্টা* বা প্রাসাদ বাজার। এটি তৈরি করা হয় আনুমানিক ১৬৭৮ সালে এবং একটা সময়ে একে *আওরঙ্গাবাদ* দুর্গ বলা হত। যুবরাজ মুহম্মদ আজম এটি তৈরি করেছিলেন। ইংরেজ বণিক উইলিয়াম হেজেস-এর ডায়েরি থেকে জানা যাচ্ছে যে নবাব শায়েস্তা খান এর প্রাসাদে বাস করছিলেন। দুর্গের অনেকাংশ ভাঙা হলেও এর দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটি আছে যেটি অনেকখানি পশ্চিমে চলে গিয়েছে অভগ্ন অবস্থায়। এর দক্ষিণ দিকের দরজা রয়েছে। উত্তর দিকের দুটি দরজার মধ্যে এখন একটি আছে। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ঝুলানো বুরুজ দেখা যায় যার ভিতরের

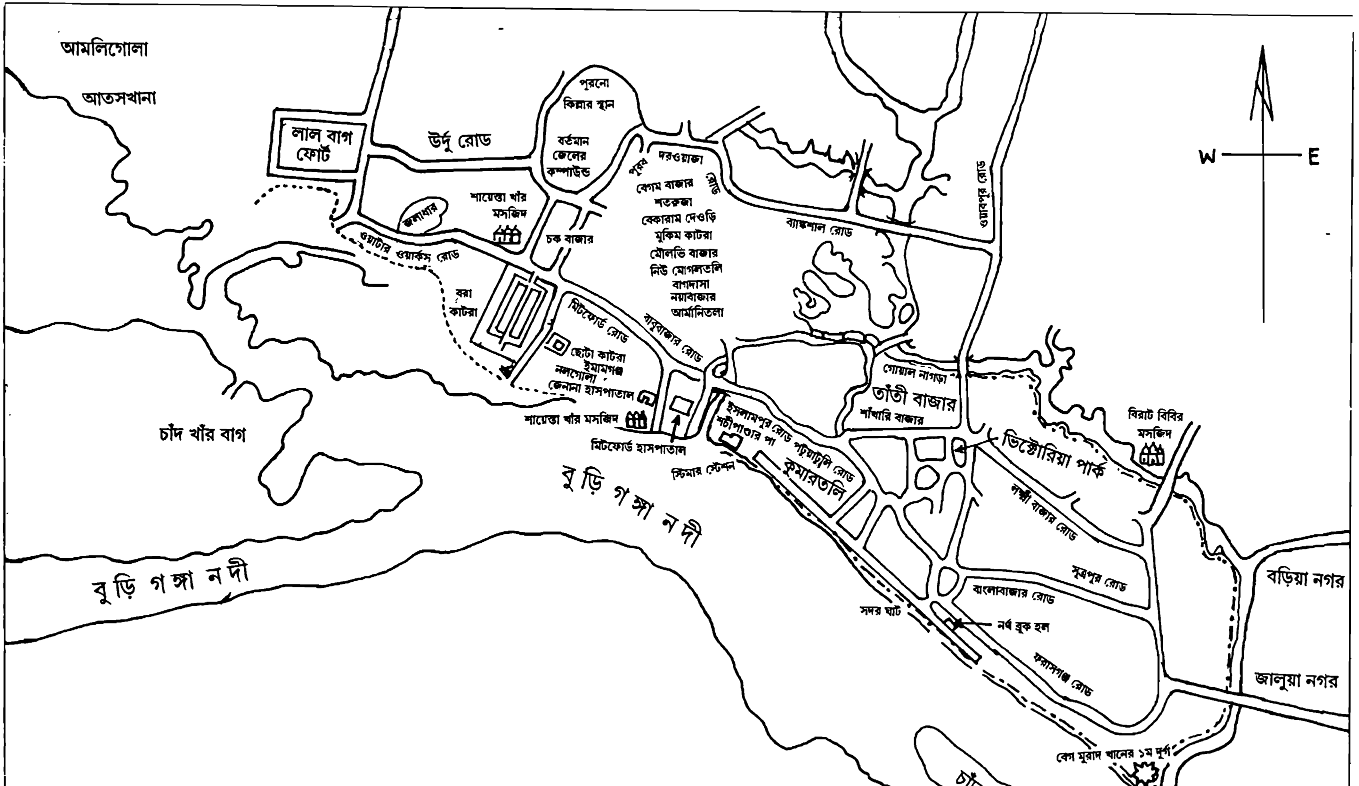
আমলিগোলা
আতসখানা
লাল বাগ ফোর্ট
উর্দু রোড
পুরনো কিল্লার স্থান
বর্তমান জেলের কম্পাউন্ড
পূরব দরওয়াজা রোড
বেগম বাজার
শতরুজা
বেকারাম দেওড়ি
মুকিম কাটরা
মৌলভি বাজার
নিউ মোগলতলি
বাগদাসা
নয়াবাজার
আর্মানিতলা
ব্যাঙ্কশাল রোড
নবাবপুর রোড
W
E
জলাধার
শায়েস্তা খাঁর মসজিদ
চক বাজার
ওয়াটার ওয়ার্কস রোড
বড়া কাটরা
মিটফোর্ড রোড
বাবুবাজার রোড
ছোটো কাটরা
ইমামগঞ্জ
নলগোলা
জেনানা হাসপাতাল
শায়েস্তা খাঁর মসজিদ
মিটফোর্ড হাসপাতাল
চাঁদ খাঁর বাগ
গোয়াল নাগড়া
তাঁতী বাজার
শাঁখারি বাজার
ইসলামপুর রোড
শচীপাওার পা
পটুয়াটুলি রোড
কুমারতলি
স্টিমার স্টেশন
ভিক্টোরিয়া পার্ক
বিরাট বিবির মসজিদ
লক্ষ্মী বাজার রোড
সূত্রপুর রোড
বাংলাবাজার রোড
সদর ঘাট
নর্থ ব্রুক হল
ফরাসগঞ্জ রোড
বুড়ি গঙ্গা নদী
বুড়ি গঙ্গা নদী
বড়িয়া নগর
জালুয়া নগর
বেগ মুরাদ খানের ১ম দুর্গ
চাঁদ
বেগ মুরাদ খানের ২য় দুর্গ

প্রাক মোগল ও মোগল যুগের ঢাকার মানচিত্র

দিকে মাটি ফেলে দেওয়াল সমান উঁচু করা হয়েছে। এই মাটির নীচে একটা ছোট ঘরের নিদর্শন পাওয়া যায় যেটি দিয়ে নদীর ধারের বুরুজে যাওয়া যায়। ঘরে ঢোকবার মুখের মুখটা কারুকার্য করা। দক্ষিণ দিকের দরজার কাছের বুরুজটি বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছে। এর মাটি সরিয়ে একটা পথ পাওয়া যায় যার সাহায্যে সৈন্যরা অন্য বুরুজে যেতে পারত। নদীর দিকের দেওয়ালে দোতলা তৈরি করা হয়েছিল যার বহু দরজা আছে। কেন এই ধরনের খোলা দরজাগুলি ছিল দুর্গের দেওয়ালে সেটা বোঝা যায় না। অধ্যাপক দানি ধরেছেন যে এই দক্ষিণের দরজাই ছিল প্রধান দরজা। এর থেকে কিছু দূরে উত্তরের দরজার পথে একটা বাঁধানো জলাধার পাওয়া যায়। এর কিছু পশ্চিমে একটা দোতলা বাড়ি দেখা যায় থাকে দরবারকক্ষ বলে ধরা হচ্ছে। এর এক দিকে কিছু ভাঙাচোরা বাড়ি আছে যাকে হাম্মাম বলে মনে করা হয়।

লালবাগ দুর্গের মধ্যে বিবি পারির সমাধির পশ্চিমে একটা তিন গম্বুজ মসজিদ আছে। পরম্পরা এই যে যুবরাজ মুহম্মদ আজম এটি তৈরি করেছিলেন। বলা হয় উনি শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য একটা ছাদ দেওয়া হলঘর তৈরি করেছিলেন যাকে *হোসেনি দালান* বলা হয়। এখানেই মহরম পালন করা হত। লালবাগ দুর্গের মধ্যে একটি সমাধিকে বিবি পারির সমাধি বলে অভিহিত করা হয়। বিবি কে ছিলেন বলা শক্ত। পরম্পরা এই যে উনি ছিলেন শায়েস্তা খানের মেয়ে এবং উনিই এই সমাধি করে দেন। এর আগে সমাধির চারপাশে জলাধার ছিল যার মাঝখানে ছিল ফোয়ারা। দক্ষিণ দিকে আরও তিনটি সমাধি রয়েছে। আটকোনা মিনার রয়েছে চার কোণে। গম্বুজগুলি এক সময়ে ছিল তামার পাতে মোড়া। ভিতরে নয়টি ঘর আছে এবং মাঝখানের ঘরটিতেই সমাধি রয়েছে। স্থাপত্যের দিক থেকে এটা পারসিক রীতির কাছাকাছি যেটা আগ্রা ও দিল্লি হয়ে বাংলায় এসেছে। বাংলায় অবশ্য এই রীতি নতুন। দরজায় হিন্দু রীতির নিদর্শন আছে।

যুবরাজ আজিমুদ্দিন (পরে আজিমউশ্বান) লালবাগ দুর্গের দক্ষিণে পোস্তাতে একটা প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন যেটি নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। ১৬৯০ সালে সুবাদার ইব্রাহিম খান একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন যার ধ্বংসাবশেষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল। লালবাগ দুর্গের কাছে ফারুকশিয়ার একটা মসজিদ করেন ও বেগমবাজারে মুর্শিদকুলি খান একটা মসজিদ করে দেন। ইংরেজ বণিক মাস্টার ১৬৭৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন তিনি শায়েস্তা খানের সঙ্গে দেখা করেন। তখন তিনি তাঁর দরবারকক্ষ ও রংমহলের উল্লেখ করেছিলেন। মনে হয় এটাই ছিল বড় কাটরার বাড়ি কারণ লালবাগ দুর্গ তখন তৈরি হয়নি। এই দরবারকক্ষই ছিল রংমহল যেখানে নবাব সাধারণ লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন ও বিচার করতেন। পর্তুগিজ বণিকের অভিযোগ ছিল ইংরেজদের বিপক্ষে এবং এই অভিযোগের সুরাহা করার জন্য মাস্টার প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন ইংরেজ কোম্পানির পক্ষ থেকে। যে সব আমলার নাম করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আচারাহ (রোজার মুনসি) ভগবান দাস (মুৎসুদ্দি বা কেরানি), সিব্রাম (মুৎসুদ্দি), মাহমুদ (ইনি এক জন শরাফ কিন্তু রংমহলের মিরদা বা সারজেন্ট), রায় নন্দন লাল (দেওয়ান), মিরতুজাক (রংমহলের আমলা), নবাবের স্ত্রী (ওঁর মহালে দু হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল),

বুজুর্গ উমেদ খান (নবাবের ছেলে), ওঁর দেওয়ান, নবাবের জাসওয়াল (দেহরক্ষী), বালি দত্ত, নবাবের রইস ও চোবেদার, কাজি ও মুন্সিফ, দরবারের চোবদার ও মিরদারগণ ইত্যাদি। এ ছাড়া মালিক কাসেমকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। এর থেকে নবাবের কাজকর্মের একটা ছবি পাওয়া যায়। এর পরেও ছিল শহরের কোতোয়াল ও আমিন। মোগল শাসনযন্ত্র যে পুরো নিয়মে চলছিল তারও ছবি পাওয়া যায়।

ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী সরে গেলে ঢাকায় শাসন করতে থাকেন নায়েব নাজিমরা। ঢাকার পুরনো জৌলুষ চলে গেলেও শহরে বাণিজ্যিক কাজকর্মের ঘাটতি হয়নি। এর প্রসার শুধু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৬৩ সালে ইংরেজরা লালবাগ দুর্গে থাকতে শুরু করে এবং নায়েব নাজিমরা থাকতেন *বরা কাটরাতে*। ইংরেজরাও কিছু কিছু সৌধ তৈরি করতে শুরু করে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ঢাকায় এসেছিলেন মোদাভ। উনি বলছেন যে ঢাকা তার মহল্লাগুলি নিয়ে সুন্দর। এখান থেকে সবথেকে বেশি ও সবথেকে সুন্দর মসলিন কাপড় নেওয়া হয় যেটা বাংলার বাণিজ্যের প্রধান বিষয়। অন্যান্য জায়গার সঙ্গে তুলনা করলে এই জায়গাটা কোনও কোনও দিক থেকে নতুন। এদিকে ঝড় আসেনি। সুতরাং এর চাষ ও শিল্প মার খায়নি। দিনেমার ছাড়া বাকি ইউরোপীয়রা যারা বাংলায় আছে এখানে কুঠি রেখেছে। অন্যান্য জায়গার মতো ফরাসিদের কুঠি ধ্বংস করা হয়নি। কারণ ঢাকায় ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ উদার মনের মানুষ যিনি মনে করতেন যে এই ধরনের কাজ করা ভাল লোকের উপযুক্ত নয়। মোদাভ ঢাকায় থাকতে থাকতেই ঢাকায় ফরাসিদের কুঠি পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং এমনভাবে, যেটা এড়ানো উচিত ছিল। ফরাসিদের কুঠির একটি দাসকে নিয়ে এক বিচার হলে ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওই দাসকে ধরে খুব বেশি শাস্তি দেন। এর পরে ইংরেজরা বিচার ব্যবস্থার কয়েকটা নিয়ম প্রকাশ করলে চন্দননগর থেকে ফরাসি কুঠির প্রধান তার বিরুদ্ধে মত দেন। ওলন্দাজরা ইংরেজদের পক্ষে থাকে। চন্দননগরের আপিল কলকাতা গ্রহণ না করলে চন্দননগর ঢাকার কুঠি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকী চন্দননগর নির্দেশ দেয় যে কুঠির চাবি ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষর হাতে দিয়ে দেবার জন্য। চন্দননগর এই বিষয়ের উপরে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্যারিস রাজি হয়নি।

ঢাকাতে মোগল নাম পাওয়া যায় পূর্বে বাবুবাজার (পাকুরতলি)-এ ইসলাম খানের খাল থেকে পশ্চিমে জাফরাবাদ পর্যন্ত। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা ও উত্তরে মির জুমলার দরজা পর্যন্তও এই ধরনের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দুটি ঘাটের নামও মোগলদের যুগের যেমন *চাঁদনি* ও *সওয়ারি*। এই এলাকা মোগলদের সময় থেকে উন্নত হয় ও বিস্তার লাভ করে। কেবল *ঢাকেশ্বরী* মন্দিরের নাম মনে হয় প্রাক্-মোগল যুগের। মির্জা নাথানের পুরনো ঢাকার পূর্বে নামগুলি বোঝায় অ-মুসলমান বা হিন্দু পেশাগত লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ। কিছু কারিগর শ্রেণীরও নাম পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশ নামের সঙ্গে গঞ্জ, বাজার, পুর বা তলি লাগানো যেগুলি মোগলদের সঙ্গে সম্পর্ক মনে করায়। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে মোগলরা আসার পরেই এই জায়গাগুলি উন্নত হতে শুরু করেছে। রাজধানী হবার পর ঢাকা শহরে

বিদেশি বণিক প্রচুর সংখ্যায় আসতে থাকে যাদের মধ্যে মোগল, পাঠান, উত্তর ভারতের হিন্দু ও আর্মেনিয়ানরা রয়েছে। এরা সাধারণত পশ্চিমে মিরপুরে থাকত যেখানে শাহ্ বন্দর-এর দপ্তর ছিল। কিছু লোক পূর্ব দিকেও গিয়েছিল যেখানে পেশাগত লোক ও কারিগররা ছিল। কুমারতলি, ফরাসগঞ্জ, রোকুনপুর ইত্যাদি নামের মধ্যে এদের পরিচয় মেলে। আর্মানিতোলাকে সহজেই বলা যায় আর্মেনিয়ানদের এলাকা। জিন্দাবাহার লেন প্রথম দিকে ছিল গণিকাদের এলাকা।

ঢাকার জন্যসংখ্যা কত ছিল তার কয়েকটি মাত্র আনুমানিক হিসেব পাওয়া যায়। ১৬৪০ সালে পাদরি মানরিকের অনুমানই ছিল প্রথম। উনি বলছেন যে শহর ও শহরতলি মিলিয়ে এই সংখ্যা হবে দু লাখ। ১৭৮৬ সালে ঢাকা কলেক্টর ওই একই সংখ্যা দেন। ১৮০০ সালে জন টেইলর, যিনি ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যিক আধিকারিক ছিলেন, দু লাখ জনসংখ্যার কথা বলেছেন। বলা দরকার যে মানরিকের ও ১৭৮৬ সালের পরিসংখ্যান নিতান্তই আনুমানিক। একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংখ্যা হল ১৮০০ সালের কারণ টেইলর কোতোয়ালি থানার দলিল থেকে এটি করেছেন।

জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে বাংলার রাজধানীতে পঞ্চাশ হাজার লোক আছে। উনি প্রধানত বুঝিয়েছেন সরকারি লোকদের—অর্থাৎ সৈন্যসামন্ত ও আমলাদের। মির্জা নাথান বাংলার রাজধানীতে যে সব মনসবদার ছিলেন তাদের তালিকা ও সৈন্যদের সংখ্যা দিয়েছেন। এর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ হাজার। এর সঙ্গে নিচু স্তরের আমলা ও অন্যান্য লোকজনদের ধরলে প্রায় পঞ্চাশ বা ষাট হাজার লোক হবে। প্রথম দিকে মোগল ঢাকাতে এই সংখ্যা সরকারি লোকেদের সংখ্যা বলে ধরা যেতে পারে। এর সঙ্গে স্থানীয় লোক ও ব্যবসায়ী, বণিক ইত্যাদি ধরলে মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। কম করে ধরলে দাঁড়াবে এক লাখ।

১৬৪০ সাল নাগাদ শহরটা দ্বিগুণ হয়ে যায় যার ফলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে প্রায় দু লক্ষ যা পাদরি মানরিক বলেছেন। শায়েস্তা খানের সময়ে শহরের আরও উন্নতি ও প্রসার হলে মনে করা যায় যে শহরটা প্রায় চারগুণ বেড়েছিল। সুতরাং রাজধানী সরানোর আগে পর্যন্ত শহরের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখে পৌঁছেছিল এটা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। রাজধানী সরে গেলে এই সংখ্যা কমে দু লক্ষে দাঁড়ায়।

রাজধানী সরে গেলেও এই শহরের শাসনকর্তার পদ ছিল অত্যন্ত লোভনীয়। উত্তরের গারো পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল এর সীমানা। সুবাদার মুর্শিদকুলি খান এর ভার দেন মির্জা লুৎফুল্লার হাতে, যিনি তাঁর নাতনিকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা ছিল প্রধানত মির হাবিবের হাতে যিনি পারস্যের সিরাজ শহর থেকে এসেছিলেন। উনি নিরক্ষর ছিলেন বলে বলা হয় কিন্তু ত্রিপুরা দখল করেন। সুজাউদ্দিনের সুবাদারির সময়ে উনি উড়িষ্যাতে চলে যান এবং ওঁর জায়গাতে পাঠানো হয় ওঁর ছেলে সরফরাজ খানকে। এঁর সঙ্গে ছিল দুজন সহকারী—যশোবন্ত রায় ও সৈয়দ গালিব আলি খান। মির হাবিব আগে বাণিজ্যে যে একচেটিয়া বন্দোবস্ত করেছিলেন, ওঁরা তা বাতিল করে দিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে শুরু করে। চালের দাম এক টাকায় ৩২ সের হওয়ার ফলে শায়েস্তা খান যে শহরের পশ্চিম দিকের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন তা খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু

ওই উন্নতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সৈয়দ গালিব আলির জায়গায় আসেন মুরাদ আলি তাঁর সহকারী রাজবল্লভকে নিয়ে। মুরাদ আলি ছিলেন নাফিসা বেগমের জামাই। নাফিসা বেগম ছিলেন মুর্শিদকুলির নাতনি। মুরাদ আলি ও রাজবল্লভের অত্যাচারের ফলে যশোবন্ত রায় কাজ ছেড়ে চলে যান।

আলিবর্দি খান নবাব হলে পর উনি তাঁর ভাইপো এবং জামাই শমৎ জং নওয়ারিস মুহম্মদকে ঢাকায় পাঠান। ওঁর সঙ্গে সরফরাজ খানের বিধবা পত্নী ও তার দুই ছেলেকে নজরবন্দি করে রাখার জন্যও পাঠানো হয়। বহুদিন এঁরা শান্তিতে ছিলেন ইব্রাহিম খানের তৈরি নদীর ডানধারে জাঞ্জিরা প্রাসাদে। ওখানেই সরফরাজ খানের বোন নাফিসা বেগমকেও পাঠানো হয়েছিল। কাহিনী আছে যে নওয়ারিস মুহম্মদ ওঁকে কখনও চোখে দেখেননি। কারণ নাফিসা সব সময়ই পরদার আড়াল থেকে কথা বলতেন। উনি তাঁর মৃত ভাইয়ের ছেলে আগা বাবার দেখাশোনা করতেন।

নওয়ারিস মুহম্মদ অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। ওঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন আলিবর্দির নাতি সিরাজউদ্দৌল্লাহ। নওয়ারিস মুর্শিদাবাদে মন্ত্রী করেছিলেন হোসেন আলি খানকে এবং তার ভাইপো হোসেন উদ্দিন খানকে ঢাকার কাজ দেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এর সঙ্গে এক জমিদারের ছেলে, আগা সাদেকের গোলমাল হয়। সাদেক মুর্শিদাবাদে গেলে বিচার পাবার আশায় হোসেন আলি খান ওকে জেলে পাঠান। সিরাজের সাহায্যে উনি জেল থেকে বেরিয়ে ঢাকায় আসেন। ওখানে ওঁর বাবার সহায়তায় একদল লোক নিয়ে হোসেন উদ্দিন খানকে রাতে হত্যা করেন। কিন্তু সকালে ঢাকা শহরের লোকেরা সমবেত হয়ে প্রাসাদ ঘিরে ফেলে। আগা সাদেক প্রাণ নিয়ে পালালেও তার বাবা মারা যান। এর কিছু দিন পরে হোসেনকুলি খানও মারা যান যার জন্য সিরাজকে দায়ি করা হয়।

নওয়ারিস মুহম্মদ তখন রাজবল্লভকে ঢাকার শাসনভার দেন। রাজবল্লভ আগা সাদেকের জমিদারি ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। বলা হয় যে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজবল্লভ প্রায় দু কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন নিজের জন্য। আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ রাজবল্লভের কাছ থেকে ওই টাকা চাইলে রাজবল্লভ গোপনে শহর ত্যাগ করেন ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় নেবার জন্য। দৌলত দিতে অস্বীকার করায় সিরাজ কলকাতা আমন্ত্রণ করেন।

নবাব যশরৎ খান ঢাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কলকাতার পতন হলে পর ঢাকার কুঠির ইংরাজরা ফরাসিদের কাছে এক বস্ত্রে পালিয়ে আসে। প্রায় দু মাস ইংরেজরা ফরাসি কুঠিতে তাদের আতিথ্য উপভোগ করেছিল। এরপর ফরাসি কুঠিয়াল ল-এর সহায়তায় তারা জাহাজে উঠবার অনুমতি পায় সিরাজের কাছ থেকে। ইংরেজদের ঢাকার কুঠি বাজেয়াপ্ত করা হয়। একটা ফরাসি জাহাজে করে তারা ফলতাতে পালায়।

কলকাতা দখল করার দু মাস পরে ইংরেজরা ঢাকাতে এসে তাদের কুঠির দখল নেয়। কিন্তু ঢাকার নবাব যশরৎ খান তাদের বিভিন্ন দাবি মানতে রাজি হন না। সিরাজ অবশ্য বাণিজ্য করার পরওয়ানা দেন। ঢাকায় ইংরেজরা তাদের মূল্যবান জিনিস লাখিপুরে একটা জাহাজে রেখে দেন। পলাশি যুদ্ধের পর ফরাসিরা ঢাকার কুঠি ছেড়ে

পণ্ডিচেরি চলে যায়।

পলাশি যুদ্ধের পর সিরাজের পরিবারবর্গকে ঢাকার জাঞ্জিরা প্রাসাদে পাঠানো হয় যেখানে সরফরাজ খান-এর পরিবারবর্গ ছিলেন। সিরাজ মতিঝিল প্রাসাদ লুঠ করে নওয়ারিস মুহম্মদ-এর স্ত্রী ও আলিবর্দির মেয়ে ঘসেটি বেগমকেও ঢাকাতে জাঞ্জিরা প্রাসাদে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন বাদে ওখানে আমিনা বেগমকে (আলিবর্দির মেয়ে) পাঠানো হয়। উনি সৈয়দ মুহম্মদকে বিবাহ করেছিলেন। আফগানরা ওঁর স্বামীকে মেরে ফেললে উনি মুর্শিদাবাদে ছিলেন। ওঁর ছেলে সিরাজের মৃত্যু হলে ওঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মিরজাফরের ছেলে মিরন সিরাজের আত্মীয়স্বজনকে ঢাকার সামনে নৌকাডুবি করে হত্যা করেন।

নবাব যশরৎ খান তাঁর মৃত্যুর (১৭৮১) আগে পর্যন্ত নায়েব নাজিম ছিলেন। কিন্তু দেওয়ানি পাবার পর ইংরেজ আমলারা ঢাকায় আসে। যশরৎ খান ঢাকার প্রাসাদ ছেড়ে নিমতলি কোঠিতে থাকতে শুরু করেন। এই বাড়ির শুধু পশ্চিমের দরজার কিছু অংশ ও বরাদরি (যেখানে দরবার বসত) অবশিষ্ট আছে। কাছেই হোসেনি দালানে শেষ চার নায়েব নাজিমের মৃতদেহ রয়েছে। ১৮৪৩ সালে গাজিউদ্দিন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ইংরেজ কোম্পানি ঢাকার শাসনভার নিয়ে নেয়।

১৭.৪ মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ঢাকা থেকে রাজধানী সরে আসে মুর্শিদাবাদে। কোন সময়ে এই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল সেটা নির্ধারণ করা যায়নি, কিন্তু ১৭১৬ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার হলে রাজধানী সরানো হয়ে থাকে বলে ধরা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের লেখক এই শহরের সূচনার কথা বলেছেন। গোলাম হোসেন তাঁর বইতে বলেছেন যে মাখসুস খান নামে এক বণিক এখানে একটা সরাই করে দেন। আবুল ফজল বাংলার সুবাদার সৈদ খানের ভাই বলে এক মাখসুস খানের উল্লেখ করেছেন। আকবরের সময়ের এক মাখসুস খান পাটনার বিপরীত দিকে হাজিপুরে একটা পাথরের মসজিদ নির্মাণ করে দেন। আবুল ফজলের এই মাখসুস খান বণিক ছিলেন বলে জানা যায় না। অন্তত আবুল ফজল তাঁকে অভিজাতদের তালিকার মধ্যে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি অভিজাত হলেও সরাই করতে পারবেন না, এরকম কোনও কথা নেই। শাহজাহানাবাদের অধিকাংশ সরাই রাজপরিবারের বা অভিজাতদের তৈরি করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাদরি টিফেনথালার বলেছেন যে আকবরের সময়ে এই শহরের প্রতিষ্ঠা হয়।

তবাকৎ-ই-আকবরির লেখক নিজামুদ্দিন বলেছেন যে আকবরের সময়ে ৩২০০ কসবা ছিল যেগুলিকে ছোট বাজার-শহর বলে ধরা যেতে পারে। অন্তত সমৃদ্ধির দিক

দিয়ে ও জনসংখ্যায় এগুলি ছিল গ্রামের উপরের স্তরে। মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলার মধ্যে কসবা বাহাদুরপুর ও রানিনগর থানার মধ্যে ছিল কসবা গোয়াস। এদের উল্লেখ সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাঁচা রেশম ও রেশম শিল্পের জন্য এই দুটি জায়গা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বিখ্যাত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মেজর রেনেল যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ভাগীরথীর প্রধান প্রবাহপথ ছিল পদ্মা। সূতি থেকে এই প্রবাহ আলাদা হয়ে গিয়েছে। যে প্রবাহপথটি হুগলির দিকে নেমে এসেছিল, তার উপরই মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার। ভগবানগোলা বড় শাখাটিতে ছিল বলে এর বাণিজ্য গড়ে উঠতে থাকে। কবে থেকে এই শাখার প্রবাহ পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল বলা সম্ভব নয়। এক ভৌগোলিক বলছেন যে এর ফলে গঙ্গা ও জলঙ্গির জল কমে যেতে থাকে। আমরা আগে দেখেছি যে রাঢ় অঞ্চলে কয়েকটি ছোট শহর গড়ে উঠতে থাকে গৌড়-এর পতনের পর থেকেই। গঙ্গার পশ্চিম পাড় অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল মোগল-পাঠান যুদ্ধের পরেও। ১৬৩২ সালে হুগলি থেকে পর্তুগিজ বিতাড়িত হলে পর ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি বসাতে থাকে। এরা উত্তরবঙ্গ থেকে রেশম ও তাঁতের কাপড় নিয়ে আসতে থাকে যার ফলে উত্তরবঙ্গে একটা শুল্ক দপ্তর বসানো মোগলদের পক্ষে জরুরি হয়েছিল। কিন্তু শহর গড়ে উঠতে গেলে অন্তত নদীর ধারে বড় ঘাট বা ছোট বন্দর-এর প্রয়োজন যেখানে মাল ওঠানো নামানো করা যাবে। উত্তর বাংলার পক্ষে যার সঙ্গে উত্তরভারতের যোগাযোগ, এই কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। দক্ষিণ বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের এই সমস্যার সমাধান মোগলযুগে হয়নি। নদীপথে যাতায়াত সহজ ছিল কিন্তু নদীতে সব সময় বিশেষত শীতকালে জল থাকত না। ফলে স্থলপথের ব্যবহার করা হত। এ সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয় মুর্শিদাবাদের আগেই কাশিমবাজারের আবির্ভাব হয়েছিল যেখানে বণিক ও ব্যবসায়ীরা ভিড় করছিল। নদী এখানে অশ্বক্ষুর চেহারা নেওয়ায় এটা একটা দ্বীপ-এর মতন হয়েছিল যেখানে নদী দিয়ে যাতায়াত সহজ ছিল। অন্য সময়ে জলঙ্গি নদীর জল শুকিয়ে যাবার ফলে স্থলপথে কিছু সময় যাতায়াত করতে হত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যটক থেভনো বাংলার শহরগুলির মধ্যে কাশিমবাজারের উল্লেখ করেছেন, মুর্শিদাবাদ করেননি। উনি কাশিমবাজার, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম ও পাটনার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন যে এই শহরগুলি খুবই ধনী। এর থেকে মনে হয় যে মুর্শিদাবাদের তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি, কিন্তু কাশিমবাজার তখন শহরে পরিণত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে থেভনো প্রধানত বাণিজ্যিক বন্দরগুলির সঙ্গে কাশিমবাজারকে সমগোত্রীয় হিসেবে ধরেছেন। বার্নিয়ার প্রায় ওই একই সময়ে কাশিমবাজারের রেশম উৎপাদনের কথা বলেছেন। উনি বলছেন যে ওলন্দাজ কোম্পানি তাদের কুঠিতে সাত থেকে আটশো ভারতীয় কারিগর রেখেছে। ইংরেজরা ও অন্যান্য বণিকরা এর থেকে কম রেখেছে। ১৬৬৮ সালের দশই মার্চ সুরাট ছেড়ে দেশে ফিরবার আগে বার্নিয়ার একটি প্রতিবেদন লেখেন ফরাসি আধিকারিক ক্যারন-এর কাছে। এতে উনি ফরাসিরা কীভাবে বাংলায় কুঠি বসাবে এবং কোথায়, সে সম্বন্ধে তথ্য দিচ্ছেন। উনি বলছেন যে পাটনা থেকে

সাত/আট দিন চলার পর রাজমহল পড়ে যেখানে শায়েস্তা খান বা তার ছেলে থাকবে। এখান থেকে সোজা পথ হল স্থলপথে মাকসুদাবাদ বা কাশিমবাজার যাওয়া। উনি বলছেন যে কাশিমবাজারে প্রথম কুঠি বসানো উচিত। যদিও ওঁর চিঠিতে আগে উনি লিখেছিলেন যে ওলন্দাজদের প্রধান কুঠি হুগলিতে, তবুও প্রথম কুঠি কাশিমবাজারে বসানো উচিত। কারণ এই জায়গাই সব ধরনের রেশম ও অন্যান্য পণ্যের মিলনক্ষেত্র। হুগলিতে বড় জাহাজ আসে। কাশিমবাজার থেকে স্থলপথে যেতে তিন দিন লাগে। এ ছাড়া একটা ছোট খাল আছে যেখান দিয়ে ছোট নৌকো করে যাওয়া যায়। কেবল একটাই অসুবিধে আছে তাদের যারা প্রথমে যাবে, কারণ সুরাটের মতো কোনও বাড়ি এখানে পাওয়া যায় না। বৃষ্টি শেষ হবার পর ঘরের ছাদ খড় দিয়ে ছাইতে হয়। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা অবশ্য পাকা বাড়ি করে আগুনের হাত থেকে বেঁচেছে।

কবে থেকে কাশিমবাজার রেশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল বলা যায় না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি এখানে কুঠি বানিয়েছিল। ১৬৫৮ সালে ইংরেজরা একজন প্রতিনিধি এখানে রাখে। দশ বছরের মধ্যে এখানকার বাণিজ্যের এরকম অভাবনীয় উন্নতি হয় যে বাংলার পরিষদের এক সদস্যকে কাশিমবাজারের প্রধান করে পাঠায়। ১৬৫৮ সালে ইংরেজরা তাদের কুঠি তৈরি করে। ১৬৪৫ সাল থেকেই ওলন্দাজরা পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠি বসানোর কথা ভাবছিল। বাটাভিয়া থেকে আমস্টারডামে লেখা (২৪ জানুয়ারি ১৬৫২) এক চিঠি থেকে জানা যায় যে পিপলি, বালাসোর, পাটনা, কাশিমবাজার ও হুগলিতে ওলন্দাজদের কুঠি রয়েছে। বাংলার প্রধান কুঠিয়াল প্রথমে কাশিমবাজারের কুঠি করবেন বলে স্থির করলেও, কিছুদিন পরে তিনি মত পরিবর্তন করে হুগলি কুঠিকে প্রধান কুঠি করেন। ১৬৮০ সালের পর থেকে কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠির কুঠিয়ালকে বাংলায় দ্বিতীয় বলে কোম্পানি স্থির করে। কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদের ফৌজদারের সঙ্গে ওলন্দাজদের গোলমাল লেগেই থাকে। ১৬৫৩ সালে যুবরাজ শাহসুজা (সুবাদার) মুর্শিদাবাদের ফৌজদারকে আদেশ দেন যে ওলন্দাজ কোম্পানি কাশিমবাজার থেকে মাত্র হাজার গাঁটরি কাঁচা রেশম বিনা শুল্কে নিতে পারবে। কিছুকাল পরে অবশ্য উনি এই আদেশ তুলে নেন। ১৬৬১ সালে মির জুমলার সুবাদারির সময় কাশিমবাজার সুবাদারের জায়গির ছিল। ওই সময়ে কোম্পানি কোনও *রাহাদারি* দিত না, ফলে ভারতীয় বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। এরা দিল্লিতে আবেদন করে ও মির জুমলা ভারতীয় বণিকদের পক্ষ নেন। ১৬৬২ সালের প্রথম দিকে সম্রাট হাজার গাঁটরি অবধি কাঁচা রেশম বিনা শুল্কে রপ্তানি করার আদেশ দেন। কোম্পানি অক্টোবর ১৬৬২ সালে এর বিরুদ্ধে সম্রাটের আদেশ আনলে ফৌজদার বালচাঁদ কাশিমবাজারের ক্ষেত্রে মানতে অস্বীকার করে। প্রচুর উৎকোচ দিলে তিনি রাজি হন। কিন্তু এসত্ত্বেও পাটনা থেকে হুগলির মধ্যে মাল বোঝাই নৌকো আটক করা হয়েছে শুল্কের জন্য। প্রধানত কাশিমবাজারের উত্তরে বালাঘাটে এই সব নৌকো আটক করা হত।

কাশিমবাজার সম্ভবত আগে মাসুমা বাজার নামে পরিচিত ছিল। হুগলি দুর্গ থেকে

পর্তুগিজদের হটিয়ে দিয়ে, প্রবাদ আছে, যে কাশিম খান কয়েকটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে মাসুমা বাজারে রাখেন যার পর এর নাম হয় কাশিমবাজার। মানুচ্চি লিখেছেন যে কাশিম খান কয়েকটি পর্তুগিজ মহিলাকে অপহরণ করেছিলেন। কারওর কারওর ধারণা যে কাশিমবাজার নাম কাশিম খানের থেকেই এসেছে।

নিকোলাই মানুচ্চি হুগলি থেকে তিনদিনের পথ ধরে কাশিমবাজার এসেছিলেন। গঙ্গার উপরে এই গ্রামে তিনটি কোম্পানির কুঠি আছে—ফরাসি, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের। এখানে খুব ভাল টুকরো কাপড় আর সাদা কাপড় করা হয়। মানুচ্চির লেখায় দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যদিও একে গ্রাম বলাটা হয়তো হুগলির তুলনায় যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। সাধারণত বলা হয় যে মানুচ্চি কাশিমবাজারে এসেছিলেন ১৬৬১ থেকে ১৬৬৪ সালের মধ্যে। কিন্তু ফরাসি কুঠির উল্লেখ করায় মনে হয় উনি অনেক পরে এসেছিলেন। কারণ ফরাসিরা প্রথম সুরাটে আসে ১৬৬৬ সালে এবং আমরা আগে বার্নিয়ার-এর ১৬৬৮ সালের একটি চিঠির উল্লেখ করেছি যার থেকে পরিষ্কার যে কাশিমবাজারে বা বাংলায় তখনও ফরাসিরা আসেনি। তবে পরে এলেও কাশিমবাজার এই চেহারা ছাড়িয়ে উপরে উঠতে পারেনি—বরং মুর্শিদাবাদের কয়েক মাইল দূরে বলে এর বন্দর শহরতলি হিসেবে রয়ে গেল। কিন্তু সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের উল্লেখ না করাটা আশ্চর্যজনক।

রাজমহল থেকে কাশিমবাজার যে জলপথে সবসময় যাওয়া যায় না তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাভারনিয়ার-এর লেখায় যিনি ১৬৬১ সালের প্রথম দিকে এসেছিলেন। তাভারনিয়ার রাজমহল থেকে জলপথে ঢাকা চলে যান। কিন্তু তাঁর সঙ্গী বার্নিয়ার রাজমহল থেকে স্থলপথে কাশিমবাজার হয়ে হুগলি যান। সূতির সামানে বিরাট চড়া পড়ে থাকায় জলপথে যাওয়া সম্ভব হয়নি। নদী যে প্রধানত পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল এটা খুব পরিষ্কার। ঢাকা থেকে সবটা পথ তাভারনিয়ার নদীপথে কাশিমবাজার যেতে পারেননি। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৬৬৬ তাভারনিয়ার কাশিমবাজারে এসে ওলন্দাজদের অতিথি হয়েছিলেন। ওদের একটা পালকি নিয়ে উনি তিন ক্রোশ দূরে মুর্শিদাবাদ শহরে আসেন, যাকে উনি বড় শহর বলে বলেছেন। এখানে শায়েস্তা খানের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ওখান থেকে বড় নৌকো করে নদীয়া যেতে ওঁর তখন কোনও অসুবিধে হয়নি। অন্যত্র, উনি কাশিমবাজারকে একটা গ্রাম বলেছেন। এখান থেকে বাইশ হাজার গাঁটরি রেশম (বার্ষিক) পাওয়া যায়। এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ওলন্দাজরা নিয়ে জাপান বা হল্যান্ডে পাঠায়। ওরা আরও বেশি নিতে চায়, কিন্তু অন্যান্য এশিয়ান ও ভারতীয় বণিকরা ওদের বিপক্ষে থাকায় ওরা আর বেশি নিতে পারেনি। অধিকাংশ রেশমই গুজরাটে আসে প্রধানত আহমদাবাদ ও সুরাটে যেখানে ওগুলি দিয়ে কাপড় তৈরি হয়।

১৬৬৯ সালের জুন মাসে ওলন্দাজ ডাক্তার নিকোলাস দ্য গ্রাফ জলপথে হুগলি থেকে কাশিমবাজারে আসেন। ওখান থেকে কিছু দূরে উনি মুখসুদাবাদে যান। এটি প্রায় ছয় মাইল দূরে কাশিমবাজার থেকে। কাশিমবাজার থেকে যাবার পথে কতকগুলি খারাপ গ্রাম দেখেছেন। উনি বলছেন যে মুখসুদাবাদ সুন্দর বাণিজ্যিক শহর এবং মোটামুটি বড়। এখানে কোনও দেওয়াল নেই কিন্তু একটা ভাল ঢাকা

বাজার আছে, যার মধ্যে অনেকগুলি স্তম্ভ রয়েছে। শাসনকর্তার ভাল বাড়ি আছে গঙ্গার উপরে বাগান সমেত। এ নদী অবশ্য বড় নদীর একটা শাখা মাত্র। শহরে প্রচুর লোক থাকে এবং জরির কাজ করা কাপড়ের ব্যবসা ভাল। এ ছাড়া জরির কাজ করা রেশমের কাপড়ও পাওয়া যায়। ওখান থেকে কয়েকটা ছোট শহর ও সুন্দর গ্রাম পেরিয়ে উনি রাজমহলে গিয়েছিলেন।

মুখসুদাবাদ সম্পর্কে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংরেজদের চিঠি আছে। তারা ওখানে লোক পাঠিয়ে কাপড় কেনা যায় কিনা পরিকল্পনা করছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের ছয়ের দশক থেকেই বলা হচ্ছে যে এটা একটা বড় শহর। ওই সঙ্গে কাশিমবাজার একটা গ্রামই রয়ে গেল—প্রধানত রেশম উৎপাদনের জায়গা হিসেবে। বন্দর হিসেবে কাশিমবাজারের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখান থেকে হুগলি যাবার অসুবিধে না থাকায়, এর উৎপাদন হুগলি দিয়েই যেত।

দ্য গ্রাফ-এর প্রায় দশ বছর বাদে হুগলি থেকে জলপথে আসেন টমাস বাউড়ি। উনি কাশিমবাজারকে বিখ্যাত ও সুন্দর শহর বলে অভিহিত করেছেন প্রধানত এর বিরাট বাণিজ্যের জন্য। এখানে প্রচুর সংখ্যায় বড় ধনী বণিকরা থাকে এবং এ জায়গাটাই একমাত্র বাজার যেখানে সারা রাজ্যের সব জিনিস কেনাবেচা হয়। উনি বলছেন যে কাশেম মানে একটা বাজার বা প্রধান। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা অবশ্য এটা স্বীকার করেন না। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের এখানে বড় কুঠি আছে কিন্তু ওলন্দাজদের তুলনায় ইংরেজদের বাণিজ্য বেশি এবং কুঠিও বড়। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক আর একজন ইংরেজ পরিব্রাজক জন মার্শাল বলেছেন যে, ওলন্দাজ কুঠি ইটের এবং বিরাট বড়। এর সুন্দর একটা বাগান আছে এবং এটা ইংরেজ কুঠি থেকে এক মাইল দুরে। ইংরেজরা তাদের কুঠিতে প্রচুর কারিগর রাখে এবং এখানে রেশম কালো রং করা হয়। এই শহরের কিছু উপরে একদল ব্রাহ্মণ বাস করে। এরা এখান থেকে মার্তাবান বোতলে করে গঙ্গার জল ও মাটি দেশে বিদেশে পাঠায়।

বাউড়ি ফরাসি কুঠির উল্লেখ করেননি। ১৬৭৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, ইংরেজ কোম্পানির বণিক মাস্টার কাশিমবাজারে আসেন হুগলি থেকে জলপথে। উনি বলছেন যে নদীর ধারে, শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গা ফরাসি কুঠির জন্য রাখা হয়েছে। এটিই সম্ভবত সৈদাবাদ যেখানে পরে ফরাসি কুঠি তৈরি হয়েছিল। ওখান থেকে উনি মুখসুদাবাদের শাসনকর্তা বালচাঁদ রাই-এর কাছে লোক পাঠান। যেহেতু কোম্পানির টাকা আসছিল, সেজন্য বালচাঁদ মুখসুখাবাদ থেকে বণিকদের পাঠান।

তিনি কাশিমবাজারে ছিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে নদীর জল ভীষণভাবে কমতে থাকে। এই শহরের চারপাশে তুঁত গাছ এত বোনা হয় যে খুব বেশি গুটিপোকার রেশম হয়। শহরটা উনি বলেছেন যে, দুই মাইল লম্বা। কয়েকটা রাস্তায় যেখানে বাজার আছে, সেখানে এত সরু যে একটা পালকি যাওয়া শক্ত। শান্তিপুরের সঙ্গে কাশিমবাজারের জলপথে যোগাযোগ ছিল। মাস্টার ওই পথে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন। বালচাঁদ রাই-এর কথা ইংরেজ বণিক হেজেসও বলেছেন। মনে হয় ১৬৭০-এর শেষ দিকে মুর্শিদাবাদে একটা টাঁকশাল হয়, যার একটি মুদ্রা (৬ অক্টোবর ১৬৭৯) পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বাউড়ির বক্তব্য থেকে মনে করা যায় যে

এর বছর চারেক আগেই মুখসুদাবাদে টাঁকশাল হয়েছিল। ফলে কাশিমবাজার বাণিজ্যিক শহর হলেও এটি ছিল মুখসুদাবাদের অধীন। এখানকার ফৌজদার এর দেখাশোনা করতেন। কাশিমবাজার বন্দর হিসেবে বড় ছিল বলে মনে হয় না, কারণ এখানে কোনও শাহবন্দর বা মুৎসুদ্দির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং মুর্শিদাবাদের প্রায় শহরতলি হিসেবে কাশিমবাজার কাজ করছিল প্রধানত উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের কুঠি থাকার ফলে বণিকরাও বসবাস করতে শুরু করে, যার উল্লেখ আমরা পাই সত্তরের দশকের গোড়ার থেকে। অন্যদিকে মুখসুদাবাদে থাকত ফৌজদার ও কিছু রাজপুরুষ এবং এ শহরের নিজস্ব বাণিজ্য গড়ে উঠলেও, এটা ছিল প্রধানত সরকারি শাসনকেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য যে এর চারপাশে নানাধরনের গঞ্জ গড়ে ওঠে, যার মধ্যে তিন মাইল দূরে জিয়াগঞ্জের উল্লেখ করা যায়। এটা ছিল প্রধানত তাঁতের কাপড়, চিনি ও শস্যের বিক্রয়কেন্দ্র, যার সঙ্গে একদিকে পাটনা ও অন্যদিকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। জিয়াগঞ্জের বিপরীত দিকে ছিল আজিমগঞ্জ যেখানে দক্ষিণ ভারতের বণিকরা আসত। কিন্তু এসব গঞ্জ বড় হতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। যেমন আজিমগঞ্জের উত্তরে ছিল জঙ্গিপুর যেটি রেশম ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। ইংরেজরা ১৭৭৩ সালে এখানে কুঠি বসায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই মুখসুদাবাদ ক্রমাগত বড় শহরে পরিণত হচ্ছিল।

১৬৯০ সালের পর থেকে অপ্রকাশিত ফরাসি চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, দেওয়ান কাফায়েৎ খান মুখসুদাবাদেই থাকছেন। সুবাদার ইব্রাহিম খান যে ১৬৯০-এর পর থেকে মুখসুদাবাদে ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ফরাসি আধিকারিক হুগলি থেকে গ্রেগয়ার বুতেকে পাঠিয়েছিলেন মুখসুদাবাদে ফরমান পাবার জন্য। ১৬৯৫ সালে নবাব ইব্রাহিম খান ফরাসিদের পরওয়ানা দিয়েছিলেন মুখসুদাবাদ থেকেই। অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খান বাংলায় আসার প্রায় দশ বছর আগে থেকেই সুবাদার ও দেওয়ান মুখসুদাবাদে ছিলেন। ফলে গোলাম হোসেনের লেখার উপর ভিত্তি করে যে বলা হয়, মুখসুদাবাদ বাড়তে শুরু করল মুর্শিদকুলি খান দেওয়ানি বিভাগ ১৭০৪ সালে সরিয়ে নিয়ে যাবার পর, সে তথ্য সম্পূর্ণ মানা যায় না। এর পরও, ১৬৯৬ সালে মুখসুদাবাদ থেকে দেওয়ান কাফায়েৎ খান ফরাসিদের একটা পরওয়ানা দেন। ফরাসি চিঠি থেকে মনে হয় রাজমহলে একটা টাঁকশাল বসানো হয়েছিল সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে। কারণ ১৭০১ সালে এই টাঁকশাল নতুন সুবাদার যুবরাজ আজিমউদ্দিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ১৭০১ পর্যন্ত এই টাঁকশাল বন্ধ ছিল। এর পরে স্থানীয় শরফরা বহু টাকা দিয়ে এই টাঁকশাল খোলে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মেদিনীপুরের ছোট জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ করেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর রহিম খান নায়ক হয়ে রাজমহল, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার দখল করেছিলেন। এই জায়গাগুলি লুঠ করে এরা বহু টাকা পায়। ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা কাশিমবাজারের কুঠি পরিত্যাগ করে দক্ষিণবঙ্গে চলে যায়। এই শহরগুলিতে বিদ্রোহীরা তাদের নিজেদের শাসনকর্তা রেখেছিল। এদের অত্যাচারের ফলে ওখানকার বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যুবরাজ আজিমউদ্দিন

সুবাদার হয়ে এসেও ওই ধরনের অত্যাচার চালাতে থাকেন। দেওয়ান মুর্শিদকুলি ১৭০১ সালে এসে বহুদিন এদিকে ছিলেন। বিদ্রোহ শান্ত হলে আবার এদিকের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে থাকে এবং দেওয়ান সম্ভবত স্থায়ী শুল্কবিভাগ মুখসুদাবাদে বসান। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল থেকে ওই নামে প্রথম মুদ্রা ১৭০৪ সালে বের হয়। মনে হয় এর আগেই উনি ওখানে গিয়েছিলেন। ১৭০৩ সালের ফরাসি চিঠি থেকে জানা যায় যে, দেওয়ান মুখসুদাবাদে গিয়েছেন। ফরাসি চিঠিপত্রে দেওয়ান ও সুবাদারের মনোমালিন্যর কথা পাওয়া যায় না। বরং বলা হচ্ছে যে এরা দুজনে একজোট হয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলির কাছ থেকে টাকা চাইছে। এর ফলে অল্প সময়ের জন্য ইংরেজরা কাশিমবাজার ছেড়ে চলে যায়। উল্লেখযোগ্য যে ফরাসিরা বলছে যে, কাশিমবাজারের শুল্ক ইজারা দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়ান বিদেশি কোম্পানিগুলিকে চাপ দিচ্ছেন যাতে তারা ওখানে শুল্ক দেয়। যুবরাজও ওই সময় রাজমহলে আসছেন।

১৭০৪ সালের ফরাসি চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে যে কাশিমবাজারে একটি টাঁকশাল অক্টোবর নাগাদ চালু হয়েছে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি ওইখানে শুল্ক দিচ্ছে। কিন্তু ১৭০৫ সালের আগেই এই টাঁকশাল বন্ধ করে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল খোলা হয়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় উল্লিখিত মুদ্রায়। দেওয়ান অবশ্য ওইসময়ে উড়িষ্যা গিয়েছিলেন বিদ্রোহী জমিদারদের শায়েস্তা করার জন্য। সুতরাং বলা যায় যে, কোনও ঝগড়ার ফলেই শুল্কবিভাগ মুর্শিদাবাদে সরেনি। উত্তরবাংলায় অভাবনীয় বাণিজ্যিক উন্নতির জন্যই প্রধান শুল্কবিভাগ মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। মুর্শিদকুলি কিছু সময়ে উপ-সুবাদার ছিলেন ও ১৭১৬ সালের পর সুবাদার হন। মনে করা হয় যে ওই সময়ের পর থেকে তিনি মুর্শিদাবাদে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ১৭১৪ সালে সীতারাম রায়-এর বিদ্রোহের সময় থেকেই মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী ছিল। মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা—ফলে মুর্শিদাবাদে রাজধানী সরানো হয়েছিল তাঁর সুবাদার হবার আগেই। বিদ্রোহী সীতারাম রায়কে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছিল এবং ওখানেই ওঁর মৃত্যু হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ততদিনে মুর্শিদাবাদ শহর অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। বহু অভিজাত ও বণিক এখানে বসবাস করতে শুরু করেছে।

রিয়াজ-এর লেখক বলেছেন যে, যুবরাজ আজিমউদ্দিন মুঙ্গেরে চলে গেলে মুর্শিদকুলি খান বাদশাহের কাছে যান ও ফিরে এসে শহরের নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। সেখানে একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু বাদশাহ তখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, এটা মনে করা যায় যে, মুর্শিদকুলি ওখানেই গিয়েছিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলিকে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয় ১৭০৮-০৯ সালে যখন ঔরংজেবের মৃত্যু হয়েছে। ফিরে এসে উনি মুর্শিদাবাদ শহরের উন্নতি করেন। এর থেকে মনে হয়, ১৭১০-এর পর থেকে শহরের উন্নতি হতে শুরু হয়েছিল। ১৭০৫-এর আগে এক ফরাসি পর্যটক এসেছিলেন। তিনি কাশিমবাজারে প্রচুর রেশম পাওয়া যায় এটাই বলেছেন।

মুর্শিদকুলি খান হজরত মুহম্মদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মাহি নগর থেকে লালবাগ পর্যন্ত সমগ্র নদীতীর প্রদীপের আলোয় সাজিয়ে দিতেন। এসব জ্বালানোর

জন্য রিয়াজ-এর লেখক বলছেন যে, এক লক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। জীবনের শেষ দিকে মুর্শিদকুলি শহরের পুব দিকের মাঠে খাসজমিতে একটা খাজাঞ্চিখানা, একটা কাটরা, একটা জামা মসজিদ, একটা স্তম্ভ, একটা হাউস ও বড় কূপ তৈরি করেছিলেন। এই মসজিদের সিঁড়ির নীচে নিজের কবরের স্থান নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন।

মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান নবাব হলেন। তাঁর ছেলে সরফরাজ খান দুর্গ থেকে চলে গিয়ে নকতাখালিতে নিজের বাড়িতে বাস করতে থাকেন। মুর্শিদকুলির তৈরি সরকারি বাড়িগুলি ভেঙে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, একটা অস্ত্রাগার, একটা উঁচু সিংহদরজা, একটা দিওয়ানখানা, একটা আম দরবার, একটা খিলাওতখানা, হারেম, জলুসখানা, কাছারি ও ফরমান বাড়ি তৈরি করান। রিয়াজ-এর লেখক বলছেন যে, সুজাউদ্দিন ভাগীরথী নদীর তীরে দেহপাড়ায় একটা মসজিদ ও বাগান তৈরি করেন। বাগানটির মধ্যে ছিল জাঁকালো প্রাসাদ, অসংখ্য খাল ও ফোয়ারা। এর ফলে বাগানটি এত সুন্দর হয়েছিল যে প্রহরীরা অভিযোগ করে যে পরীরা এই বাগানে আসত। সুজা তখন মাটি চাপা দিয়ে বাগান বন্ধ করে দেন।

সুজার মৃত্যুর পর সরফরাজ খান নবাব হন ও তাঁকে হত্যা করে আলিবর্দি খান কীভাবে সিংহাসনে বসেন সে কথা সকলেরই জানা। ওঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌল্লা নবাব হন ও পলাশির মাঠে ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। মিরজাফর নবাব হন।

রবার্ট ক্লাইভ চন্দননগর দখল করার পর এবং পলাশির যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন ফরাসি পণ্ডিত আঙ্কতিল দুপেরঁ। উনি ১৭৫৭ সালের ৫ মে থেকে ১৫ মে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। উনি বলছেন যে, এই শহরে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর মিশ্র খ্রিস্টান অর্থাৎ মিশ্র বিবাহের ফল। শহরটা বিরাট। ওরাই ওঁকে একজন যুবক পর্তুগিজ অগাস্টাইন পাদরির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যিনি আগে ছিলেন কাশিমবাজারে। ওঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে উনি একজন ফরাসির কাছে যান যিনি মুখসুদাবাদে বাড়ি করেছেন। যখন চন্দননগরের পতনের পর ফরাসিরা কাশিমবাজারে পালিয়ে আসেন উনিও এসেছিলেন। কিন্তু মুখসুদাবাদের মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকায় উনি (নাম শাঁজিয়াক) এই শহরে চলে আসেন। মুর্শিদাবাদের ধর্মীয় প্রধান এঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার নবাব ওঁকে একটা চাকরি দেন। শাঁজিয়াক খোজা লতিফ নামে এক মোগল আমলাকে চেনেন যিনি মতিঝিলের দিকে একটু দূরের এলাকায় থাকতেন। এত বড় জায়গা নিয়ে এই মোগল ছিলেন যে ওঁর জায়গাতেই প্রায় চার-পাঁচ হাজার লোক থাকতে পারবে। উল্লেখযোগ্য যে, ওই মোগল আঙ্কতিলের পিস্তল নিয়ে নিয়েছিল। যদিও চন্দননগরের পতনের পর ইংরেজ সৈন্যরা এসেছিল, কিন্তু এঁর লেখায় শহরের মধ্যে কোনও উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যায়নি। শুধু মন্তব্য করেছেন যে, এই মোগল রাজনীতির জন্য নবাবের সঙ্গে ওই অভিজাত আছে কিন্তু তার প্রতি কোনও সমর্থন নেই।

সিরাজের পতনের পর মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন পাদরি জোসেফ টিফেনথালার।

উনিই বোধহয় মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। উনি বলছেন যে মুর্শিদাবাদ এখনও বাংলার রাজধানী। গঙ্গা নদীর উপরে এটা একটা বিরাট বড় শহর। বামিনিয়ান থেকে লালবাগ পর্যন্ত এটা চলে গিয়েছে প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা। নদীর ধার থেকে আখরপুর পর্যন্ত এটা চওড়া—বোধহয় দুই-তিন মাইল হবে, তবে লম্বার থেকে ছোট। নদীর বিপরীত দিকে মাহিনগর। অসিমগান শহরতলি থেকে এটার শুরু এবং চলে গিয়েছে লম্বা হয়ে সিরাজউদ্দৌল্লার সমাধি পর্যন্ত। এটা চওড়ায় হবে প্রায় দেড় মাইল। এই দুটো বড় শহরে অসংখ্য বাড়ি আছে যেগুলি ইট ও চুনের তৈরি। এর সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য বাগান ও তার ভিতরে সুদৃশ্য বাড়ি। এগুলির মধ্যে রয়েছে চুন দেওয়া বাড়ি যেগুলির সংখ্যা ধনীদের বাড়ির সংখ্যার থেকে বেশি। এই দুটি শহরে রয়েছে অনেকগুলি শহরতলি যাদের প্রতিটির নাম রয়েছে এবং যেগুলি শহরদুটিকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছে। এই দুটো শহরের মাঝখানে শান্তভাবে বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী যার উপর অসংখ্য বজরা ও নৌকা।

পুরনো মানচিত্রকর বার্থালোমিয় প্লেস্তিদ মুর্শিদাবাদকে দুটি নদীর মাঝখানে রেখেছেন এবং দুটি নদীতেই সমান জল আছে দেখিয়েছেন। কিন্তু এখন নদী দুটি শহরের মাঝখানে। গঙ্গার এই শাখা অবশ্য শান্ত। বাংলার নবাবের প্রাসাদ শহরে শেষে। ওই জায়গাকে বলে কোলেরিয়া। এর থেকে এক মাইল দূরে বাঁ দিকে একটা বিরাট ও আশ্চর্য প্রাসাদ যার চারপাশে পুকুর দিয়ে ঘেরা। একে বলে মতিঝিল। আর একটা প্রাসাদও নদীর উপর দেখা যায় যাকে হীরাঝিল বলে। নদী থেকে কিছু দূরে মুর্শিদাবাদে ওলন্দাজদের একটা বড় ও সুন্দর কুঠি আছে।

মুর্শিদাবাদের তিন মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নদীর উপর রয়েছে কাশিমবাজার। এ জায়গাটা বাণিজ্যর জায়গা। ইংরেজরা এখানে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী একটা দুর্গ তৈরি করেছে। ওখানে ওরা তাদের মাল গুদাম করে রাখে। আরও একটু দূরে গেলে কালকাপুরের শহর দেখা যায় যেখানে ওলন্দাজদের বিশাল ও সুন্দর বাড়ি রয়েছে। ওখান থেকেই ওলন্দাজরা বাণিজ্য করে।

এর পূর্ব দিকে সৈদাবাদ যেখানে বেশি সংখ্যায় আর্মেনিয়ান বণিকরা থাকে সুন্দর বাড়িতে ও বাণিজ্য করে। ফরাসিরাও নদীর উপর তাদের কুঠি করেছে। এই তিনটি শহরই পরস্পর লাগোয়া।

এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে সত্তর-আশি বছরের মধ্যে এই এলাকায় নগরজীবন খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছে। তিনটি শহর তৈরি হওয়া ছাড়াও, শহরের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ শহর শুধু নদীর অপর পারে চলে গিয়েছে তাই নয়, এগিয়ে এসে প্রায় কাশিমবাজারের সঙ্গে মিশেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই দুটির মধ্যে যে খারাপ গ্রামগুলি দেখা গিয়েছিল, সেগুলি আর নেই। কাশিমবাজার গ্রাম থেকে শহরে উন্নীত হয়ে তার শহরতলিতে বিস্তার লাভ করেছে। তবে রিয়াজের লেখক বলেছিলেন যে মতিঝিলে সিরাজের সৈন্যদল ঘসেটি বেগমের বাড়ি লুঠ করে বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। সেটা অন্তত মতিঝিলের প্রাসাদ নয়। এমন হতে পারে যে ঘসেটি বেগমের আলাদা বাড়ি ছিল এবং উনি প্রাসাদে থাকতেন না।

১৭৭৩ সাল থেকে ১৭৭৬ সালের মধ্যে মোদাভ বাংলায় আসেন। উনি বলছেন

যে নদীর উপরে গেলে বাতাস ভাল পাওয়া যায় এবং প্রধানত সেই কারণেই ঢাকা শহর ছেড়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই ধরনের একটা চিন্তা ইউরোপীয়দের মধ্যে বহুদিন থেকে ছিল। ১৭০৫ সালে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন বলেছেন যে কলকাতার ইংরেজরা উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াকে পছন্দ করতেন। উনি কাশিমবাজার সম্পর্কে বলেছেন যে শহরটা বড় এবং বহু বণিক আসে যার ফলে জায়গাটার দৌলত বেড়ে যায়। চারপাশের জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর এবং লোকেরা পরিশ্রমী।

মোদাভ বলছেন যে সুবাদার রাজধানী সরিয়ে আনার ফলেই মুর্শিদাবাদের উন্নতি হয়েছে। শহরটা নদীর ধার দিয়ে দু মাইলের উপর লম্বা। এর কেবল একটাই রাস্তা আছে যার শেষে রয়েছে চক। চারপাশ ঢাকা প্রায় গোলাকার এই জায়গা যেখানে বণিকরা প্রতি সন্ধ্যায় জড়ো হয়। নবাবের বাড়ি নদীর ধারে। এই বাড়ির মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু নেই এবং এই শহরেও কিছু নেই যা বলবার মতো। শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে নবাবের কতকগুলি বাড়ি আছে। উনি তিনটি প্রধান বাড়ি দেখেছিলেন। একটা শহরের দরজার ধারে যাকে মতিঝিল বলা হয়। একটা কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে এটা বসানো এবং এর চারপাশের বাঁশঝাড় সুন্দর দৃশ্য করে তোলে। পলাশির বাড়িটি হুগলি যাবার পথে প্রায় এগারো ক্রোশ দূরে। এখানেই ইংরেজরা নবাবকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। এই বাড়িটির পরেই আমবাগান যেটা প্রায় দু মাইল ধরে বিস্তৃত। এই বাগানে সারি দিয়ে আমগাছ লাগানো হয়েছে। এত বড় আমবাগান উনি আর কোথাও দেখেননি।

রেশমের কাপড় তৈরি করার জন্য কাশিমবাজার বিখ্যাত বলে মোদাভ বলছেন। গঙ্গার দুটি শাখা একটা দ্বীপ করেছে যেটার বিস্তার দশ/বারো মাইল। এর প্রায় সব জায়গায় গুটি পোকার জন্য তুঁতগাছ লাগানো। ওলন্দাজ ও ফরাসিদের কুঠি আছে কাশিমবাজারে। অবশ্য দুটি কুঠিই দুটি আলাদা এলাকায়, যাদের নামও আলাদা। দুটি কুঠির মধ্যে প্রায় দুই মাইলের তফাত। কালকাপুরে ওলন্দাজদের বাড়ি আছে। ওই এলাকায় প্রায় ত্রিশটি আর্মেনিয়ান পরিবার রয়েছে। ফরাসিদের কুঠি রয়েছে সৈদাবাদে। এটা একটা ছোট বাজার শহর এবং দু হাজার টাকা বার্ষিক খাজনা পাওয়া যায়। ফরাসিদের কুঠিটা ছিল বড় ও প্রচুর জায়গা নিয়ে। কিন্তু ইংরেজরা এই কুঠি ভেঙে দিয়েছে। ফরাসিদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এই সময়ে ওই শহরের একটা ব্যক্তিগত বাড়িতে ছিলেন। ইংরেজদের পুরনো কুঠি রয়েছে কাশিমবাজারে। ওলন্দাজদের মতন কতগুলি বাড়ি ইংরেজদেরও দেখা যায়। এখানেই ওরা সব রেশম জড়ো করে।

কাশিমবাজারে রেশম ছাড়াও অন্যান্য ধরনের কাপড় তৈরি হয়। এ ছাড়াও নানা ধরনের খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয় যেগুলি কলকাতাতে ভাল দামে বিক্রি হয়। কাশিমবাজার নির্দেশমাফিক পণ্য তৈরি করতে খুব ভাল পারে। কাশিমবাজারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ময়দাপুরে ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ একটা নতুন বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। ওই সময়ে মিডলটন ছিলেন ওই কুঠির অধ্যক্ষ।

একদিকে মোদাভ কপর্দকহীন ইংরেজরা কলকাতায় এসে কীভাবে ধনী হল, তার

বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি ওই সময়ের নবাবের (মুবারকউদ্দৌল্লা) অবস্থার কত পরিবর্তন হয়েছে সেটাও বলেছেন। মোদাভ নবাবের সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখসুদাবাদের প্রাসাদে গিয়েছিলেন। এটি অবশ্য বর্তমানের প্রাসাদ নয় যেটি তৈরি হয়েছিল ১৮৩০ সালের পর এবং যেটি তৈরির সময় গিয়েছিলেন ফেন নামে এক ইংরেজ মহিলা। মোদাভ যুবক নবাবের দেখা পান—বয়স ওঁর মতে ষোলো কি সতেরো বছর। ইংরেজরা ওঁর সঙ্গে কীরকম খারাপ ব্যবহার করছে তাও বলেছেন। ইংরেজরা ওঁর আয় শুধু কমিয়ে দিয়েছে তাই নয় ওঁর ওই আয়ের একটা বড় অংশ নানাভাবে ইংরেজরা নেয়—কেউ সেনাপতি যদিও কোনও সৈন্য নেই, কেউ বা অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি। একজন ইংরেজ শিক্ষক নবাবকে ইংরেজি শেখায়।

১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি পাবার পর এটা স্থির হয় যে কোম্পানি নিজামতের জন্য ৫৩ লক্ষ টাকার উপরে দেবে। এক বছরের মধ্যেই কোম্পানি এটি ৪১ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনে যদিও নবাবরা ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। ১৭৭০ সালে আর একটা চুক্তির মাধ্যমে ওই টাকা কমিয়ে আনা হয় ৩১ লাখে। বলা বাহুল্য এই টাকার মধ্যে সব সময়েই ছিল সৈন্য ও অন্যান্য আমলাদের বেতন। ১৭৭২ সালে নবাবের ব্যক্তিগত খরচ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং মোদাভ যখন গিয়েছেন তখন মুর্শিদাবাদের নবাবের ও তাঁর আমলাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এর প্রভাব পড়ে মুর্শিদাবাদ শহরের উপর। আগেকার যে অভিজাতরা অকাতরে অর্থব্যয় করতেন পোশাক, হাতি, ঘোড়া, বাড়ি ও অন্যান্য উৎসবে তা এখন বন্ধ হয়ে গেল। নবাব মুবারকউদ্দৌল্লা পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য বাড়ি ও জমি বিক্রি করে ঋণের হাত থেকে বাঁচেন। ১৮০২ সালে যখন ভ্যালেন্সিয়া নবাব নাসির-উল-মুলকের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি দেখেন যে সুসজ্জিত নবাব বহুমূল্য হীরা, মুক্তা ইত্যাদি পরে আছেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে ওগুলি সবই ধার করা।

১৭৭২ সালে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ থেকে দেওয়ানি ও খালসা দপ্তরগুলি কলকাতায় সরিয়ে আনে। এর ফলে বহু পদে কলকাতার লোক নিয়োগ হয় যারা আগে ছিল মুর্শিদাবাদের। এ ছাড়াও জমিদাররা ও ধনী ব্যবসায়ীরা ক্রমশ কলকাতার দিকে আকৃষ্ট হন, কলকাতায় তাদের উকিল রাখেন, যারা আগে ছিল মুর্শিদাবাদে। এর সঙ্গে টাঁকশালও মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরিয়ে নিয়ে এলে মুর্শিদাবাদের শরফ ও অন্যান্য বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হেস্টিংস এর সঙ্গে কলকাতায় সরিয়ে নিয়ে আসেন সদর দেওয়ানি আদালত। নবাব শুধু ফৌজদারি আদালতেই তাঁর অধিকার খাটান। নবাবের সৈন্যদলের পরিবর্তে এখন ভার নেয় কোম্পানির সৈন্যদল। এ সবের ফলে মুর্শিদাবাদের বিত্তবানরা ও জমিদাররা, এমনকী ছোট ব্যবসায়ীরা, মুর্শিদাবাদে ব্যবসা চালানোর কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ যা একদিন ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র, ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের চিঠিপত্রে দেখা যায় যে নবাবের অধিকার শুধু কিল্লার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৭.৫ চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নাম কোথা থেকে এল এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে পির বদর শাহ প্রথম যখন এখানে নামেন তখন জিন ও পরীদের দূর করার জন্য ছাটি (প্রদীপ) জ্বালিয়েছিলেন যার থেকে এই নাম হয়েছে। শরৎচন্দ্র দাস মত দিয়েছেন বৌদ্ধ চৈত্যগ্রাম থেকে অপভ্রংশে এই নাম হয়েছে। উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ সালে এসে বলেছিলেন যে সংস্কৃত ছটক, যেটি একটি ছোট পাখি, থেকে এই নাম হয়েছে। বিদগ্ধ পণ্ডিত সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি মনে করতেন যে অনার্য নাম চবতি গ্রাম থেকে এটি এসেছে। হেনরি ইউল বলেছেন যে এটি সংস্কৃত চতুরগ্রাম-এর অপভ্রংশ। ফরাসি পণ্ডিত বারনুয়ি বলেছেন যে আরবি শব্দ *শাট* ও *গঙ্গা* থেকে *জাম*-এর মিশ্রণে এর উৎপত্তি। ওঁর মতে গঙ্গার মোহানায় ছিল বলে আরবরা এই নাম দিয়েছিল। আরবদের লেখায় *শাতিগ্রাম* শব্দটি পাওয়া যায়। এর থেকে পরিষ্কার যে আরবদের কাছে চট্টগ্রাম অজানা ছিল না। মহেন্দ্র দেব ও দনুজমর্দন দেবের মুদ্রায় শাতিগ্রাম পাওয়া যায়, যেটি ছিল টাঁকশাল শহর। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে শাতিগ্রাম নামটি ছিল এটা পরিষ্কার। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে মৌলানা মুজফর শাহ্ বলকির চিঠিতে শাতগাঁওকে একটা বন্দর বলা হয়েছে যেখান থেকে জাহাজ আরব দেশে যায়। কিন্তু কবে থেকে এই নাম চট্টগ্রাম-এ পরিণত হল, এটা বলা শক্ত। ইবন বতুতার সুদকাওয়াকে যদি চট্টগ্রাম ধরা যায় তা হলে বলা যায় যে আরবি নাম শাতিগ্রাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েনি। এমনকী প্রথম দিকের আরব ভৌগোলিকরাও শাতিগ্রাম ব্যবহার করেননি। এরা পূর্ব দিকের উপকূলে রহিমি বলে এক বন্দরের কথা বলেছেন যেটি রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে চট্টগ্রাম-এর বৌদ্ধ নাম।

আরব ভৌগোলিকেদের মধ্যে খুরদবাহ ও আল-ইদ্রিসি বলেছেন যে এই অঞ্চলে একটিই মাত্র বন্দর আছে যাকে ওঁরা *সমন্দর* বলেছেন যার থেকে বোঝা যায় যে শাতিগ্রাম নামটি ওঁদের অজানা ছিল। আরাকানি ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে দশম শতাব্দীর আরাকানি রাজা বাংলা জয় করে যে জায়গায় পাথরের স্তম্ভ বিজয়চিহ্ন হিসেবে বসিয়েছিলেন তার নাম দ্বেত-তা-গং। মনে করা হচ্ছে যে এই নাম থেকেই বাংলা শব্দ চট্টগ্রাম এসেছে। তিব্বতি পণ্ডিত অতীশ (৯৮০-১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন যে বাংলার সীমান্তে *চণ্ডিলা গ্রাম* বলে একটি জায়গা আছে। ষোড়শ শতাব্দীর একটি আরাকানি শিলালেখে এই নামটি পাওয়া যায়। এর পরেও নামের নানারকম বিকৃতি ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের লেখায় দেখা যায়।

মৌর্য যুগ ও গুপ্ত যুগে চট্টগ্রামের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা বলা যায় না। লামা তারানাথের ইতিহাস থেকে পাল যুগের আগের রাজার সময়ে ওঁর রাজধানী ছিল শাতিগ্রাম বলে জানা যায়। ওই সময়ে রাজা ছিলেন বলাচন্দ্রর নাতি গোপীচন্দ্র যাঁর তামার দানপত্র ও কবিতা পাওয়া গিয়েছে। একে সপ্তম শতাব্দীর শেষকালে রাখা হয়েছে। পালরাজারা এর পরে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের স্থলাভিষিক্ত হলেও এঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল দক্ষিণবঙ্গে যার বর্ণনা আমরা সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম* থেকে পাই।

কিন্তু নানা সূত্র থেকে এটা মনে হয় যে চট্টগ্রাম ও সমগ্র বঙ্গের উপকূল পালসাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। আরব ভৌগোলিকদের রচনায় যে হরিকেলের কথা পাওয়া যায়, তাকেই বর্তমান চট্টগ্রাম প্রদেশের মধ্যে ফেলা যায়, যদিও হরিকেলের রাজধানী বর্ধমানপুর-এর সনাক্তকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এস. বি. কানুনগো, বিশদ আলোচনার পর, চট্টগ্রামের কাছে সমুদ্রতীরে বরুধান বলে গ্রামের সঙ্গে এক বলে ধরেছেন। এর পরে বর্মা ও আরাকানের রাজবংশ এই উপকূল দখল করে রেখেছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজাদের আক্রমণের আগে চট্টগ্রামের ইতিহাস খুব স্বচ্ছ নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক সিহাবুদ্দিন তালিশ লিখেছেন যে ফকরুদ্দিন চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ দখল করে শ্রীপুর-এর বিপরীত দিকে চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম অবধি এক বড় বাঁধ করেছিলেন। ওঁর সময়ে মসজিদ ও সমাধিগুলি চট্টগ্রামে হয়। ইবন বতুতা বলেছেন যে সুদকাওয়ান-এর সুলতান ছিলেন ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ, যার ফলে সুদকাওয়ান ও চট্টগ্রাম অভিন্ন বলে ধরা হয়। মুবারক শাহ ছিলেন সোনারগাঁওর সুলতান। এরও সমর্থন মেলে শামসুদ্দিন আফিফ-এর রচনায়। এ সবের থেকে মনে করা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুসলমান সুলতান চট্টগ্রাম দখল করেন। ইবন বতুতার লেখা ও মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে ১৩৩৮ সাল নাগাদ চট্টগ্রাম দখল হয়। চট্টগ্রাম কার দখলে ছিল এই আক্রমণের আগে, সেটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। ত্রিপুরা ও আরাকানের ইতিহাস থেকে মনে হয় যে এর আগে কোনও দুর্বল রাজা রাজত্ব করছিল যাকে হঠিয়ে দিয়ে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম দখল করেন। এই দখলের ফলে চট্টগ্রাম বাংলার শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবং এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনেকখানি বদলে গেল। ১৩৫২ সালের আগে সুলতান ইলিয়াস শাহ চট্টগ্রাম দখল করে একটা শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

১৪০৬ সালে আরাকানের রাজ্যচ্যুত রাজা মেঙ সাও মুন পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। তখন এটি ছিল সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের দখলে। এর পরে রাজা গণেশের দখলে এটি আসে। গণেশের বংশের শেষ রাজা শামসুদ্দিন আহমদ আততায়ীর হাতে নিহত হন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বাংলার সুলতান হন। তাঁর ১৪৩৮-৩৯ সালের মুদ্রা চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে। এর আগে চিনা প্রতিনিধিরা চট্টগ্রামে এসে গৌড়ে যান। আরাকানি ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে আরাকানি রাজা মেন খারি চট্টগ্রামের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। ওঁর ছেলে বা সা ফু চট্টগ্রাম শহরও দখল করেন। ১৪৬০ সালের মুদ্রা থেকে এর সমর্থন মেলে। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ যার সময়ে চট্টগ্রামের উত্তর অংশটি ওঁর দখলে ছিল। ১৪৭৪ সালের একটি মসজিদের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন রাস্তি খান। বারবাক শাহের ছেলের একটা শিলালেখ একটি মসজিদের দেওয়ালে পাওয়া যায়। এটি রাস্তি খানের মসজিদ থেকে দুই মাইল দূরে। এ সব থেকে মনে করা যেতে পারে চট্টগ্রাম শহর ছিল আরাকানদের দখলে এবং গ্রামাঞ্চল ছিল বাংলার সুলতানদের দখলে। বা সা ফু-র মৃত্যু হয় ১৪৮২ সালে এবং ওই সময় থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত নানা ধরনের চক্রান্ত, অনাচার ও অত্যাচারের ইতিহাসের সাক্ষী ছিল চট্টগ্রাম।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩ সালে সুলতান হয়ে চট্টগ্রাম নিজের

দখলে এনেছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস *রাজমালার* লেখক ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে আলাউদ্দিনের লড়াই-এর কথা বলেছেন। এতে বলা হচ্ছে যে ধন্যমাণিক্য ১৫১৩ সালে চট্টগ্রাম দখল করে সোনার মুদ্রা বের করেন। সুতরাং এর আগে হোসেন শাহ চট্টগ্রাম নিজের দখলে রেখেছিলেন। কিন্তু কবে চট্টগ্রাম ওঁর দখলে আসে, সেটা বলা যায় না। তবে হোসেন শাহ গৌর মল্লিককে সেনাপতি করে সৈন্য পাঠালে, চট্টগ্রাম আবার বাংলার দখলে আসে। কিন্তু ধন্যমাণিক্য দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে চট্টগ্রাম আবার দখল করেন। এর পরে ধন্যমাণিক্য আরাকান দখল করে ওখানে একটা দুর্গ তৈরি করেন।

১৫১৭ সালের পর যখন পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসে, এর শাসনকর্তা ছিলেন একজন মুসলমান। এর থেকে মনে করা হচ্ছে যে চট্টগ্রাম তখন বাংলার সুলতানের অধীনে ছিল যদিও পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পর্তুগিজ ঐতিহাসিক জোয়াও দ্য বারোস বলেছেন যে আরাকান রাজ্যও বাংলার অধীনে ছিল। তাঁর যে মানচিত্র পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে চট্টগ্রাম ও তার পাহাড় এবং আরাকানের এক অংশ বাংলার অধীনে রয়েছে। সমকালীন কবি দৌলত ওয়াজির বাহরাম খান-এর কবিতায় দেখা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উজির হামিদ খাঁকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা করেছিলেন। এর থেকে মনে হয় যে ১৫১৬ সালের কোনও সময়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ চট্টগ্রাম পুনঃদখল করেন। ১৫২১ সালে পর্তুগিজ ব্রিটো যখন চট্টগ্রামে আসেন, তখন সেটা বাংলার সুলতান নসরৎ শাহর অধীনে ছিল। এটা ওঁর লেখা থেকে পরিষ্কার যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫২১ সালের আগেই মারা গিয়েছিলেন এবং ওঁর ছেলে সুলতান নসরৎ শাহ সুলতান ছিলেন যাঁর কর্তৃত্ব চট্টগ্রামের উপর ছিল।

পরবর্তীকালের পর্তুগিজরা চট্টগ্রামকে *পোর্টো গ্রান্ডো* বলেছেন ও সপ্তগ্রামকে *পোর্টো পিকোনো* বলে অভিহিত করেছেন। ১৫১৮ সালে পর্তুগিজদের একটা চিঠিতে চট্টগ্রামের অবস্থান বলা আছে। সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে বারো কিলোমিটার দূরে এই বন্দর-শহর একটি নদীর উপর অবস্থিত। দুভার্গ্যের বিষয় উনি লেখেননি যে কোন নদীর উপর এটা ছিল। কেবল এটুকু জানা যায় যে মোহানার উত্তর দিকে এটা ছিল। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের গৌড়ে নিয়ে যাবার জন্য রাজা লোক পাঠিয়েছিলেন।

পর্তুগিজদের সঙ্গে চট্টগ্রামের শাসকদের যে গোলমাল চলেছিল, তার বর্ণনা সমকালীন ও পরবর্তী ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন। এর ফলে চট্টগ্রাম শহরের অনেক ক্ষতি হয় প্রধানত জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণের ফলে। সুতরাং সুলতানি চট্টগ্রামের অনেকখানিই আজ আর নেই। এ ছাড়া যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ হয়নি বলে প্রাচীন চট্টগ্রামের চেহারা খুঁজে পাওয়া শক্ত।

শের খান ১৫৩৮ সালে গৌড় দখল করে নোগাজিলকে চট্টগ্রামে পাঠান। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে পর্তুগিজরা গিয়াসুদ্দিন মাহমুদকে সাহায্য না পাঠাতে পারে। এর আগে মাহমুদ পর্তুগিজদের সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে শুল্ক বিভাগের অধিকার দিয়েছেন যার ফলে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে থাকতে শুরু করেছিল। নোগাজিল কীভাবে চট্টগ্রামে

এলেন জানা যায় না, তবে মাহমুদ-এর শাসনকর্তাকে সরিয়ে উনি চট্টগ্রাম শহর দখল করেন। এর পরে হুমায়ুন গৌড় দখল করে চট্টগ্রামও দখল করে নেন। মনে হয় বন্দরটা তখন পর্যন্ত পর্তুগিজ শুল্ককর্তা ও মাহমুদ-এর শাসনকর্তার হাতে ছিল। গোয়া থেকে প্রচুর জাহাজের বহর এলে নোগাজিল বন্দি হন কিন্তু পরে পালাতে সমর্থ হন। এই অবস্থায় মিন বিন আরাকান রাজ, চট্টগ্রাম দখল করে নেন। সম্ভবত ১৫৩৯ সালের শেষ দিকে আরাকানরা চট্টগ্রাম বন্দর ও শহর দখল করে নেয়। এর পরে পাঠান, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে থাকে যার ফলে চট্টগ্রামের বহুবার হাত বদল হয়। ১৫৬৮ সালে সুলেমান কাররানি চট্টগ্রাম দখল করে রাখে।

১৫৭৫ সালের পর যখন ফরাসি পর্যটক ভিনসেন্ট ল্য ব্লঁ বাংলায় আসেন তখন মোগলরা বাংলা দখল করেছে। উনি একদল বণিকের সঙ্গে *কাস্তিগান* বা *শাতিগান* (চট্টগ্রাম)-এ যান। ওখানে তখন কয়েকটা পর্তুগিজ জাহাজ এসেছিল। ওদের সঙ্গে সোনা, রুপোর বাণিজ্য করে লাভ করেন। উনি বলছেন যে শাতিগান আরাকানের রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। আরাকান রাজার নৌবহর শক্তিশালী ও পেগু সবে জয় করেছে। উনি চট্টগ্রামকে বলছেন একটা সামুদ্রিক বন্দর যেটা মগদের ধনীরাজ্যের মধ্যে পড়ে। এর থেকে মনে হয় অমরমাণিক্য চট্টগ্রাম দখলের আগে অল্প সময়ের জন্য চট্টগ্রাম আবার আরাকানের হাতে যায়। ১৫৮৩ সালের পর যখন পর্যটক র‍্যালফ ফিচ আসেন তখন চট্টগ্রাম ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের দখলে। উনি বলছেন এই বন্দর নিয়ে মোগল, মগ ও ত্রিপুরার মধ্যে ক্রমাগত লড়াই চলছিল। ১৫৮১ সালের আগে এসেছিলেন সিজার ফ্রেডারিক। উনি প্রধানত সন্দীপের কথা বলেছেন কিন্তু চট্টগ্রামের কথা প্রসঙ্গত উঠেছে। চট্টগ্রাম ও সন্দীপ তখন বাংলার সুলতানদের দখলে ছিল। উনি বলছেন যে বিরাট বন্দর চট্টগ্রাম থেকে প্রচুর চাল, নানা ধরনের কাপড়, চিনি ও টাকা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বণিকরা নিয়ে যেত।

টোডরমল্ল ১৫৮২ সালে যে বন্দোবস্ত করেছিলেন, আবুল ফজলের লেখা থেকে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে এই বন্দোবস্ত প্রধানত পাঠান আমলের। কারণ ওই সময়ে চট্টগ্রাম মোগলদের হাতে ছিল না। চট্টগ্রাম ছিল একটা সরকার যার পাঁচটি মহল ছিল প্রধানত শুল্ক ও খাজনার জন্য ভাগ করা। এর মধ্যে দুটি ছিল শুল্ক মহল যার একটি ছিল নুনের উপর শুল্কর জন্য। শুল্কর জন্য বিখ্যাত ছিল সন্দীপ এবং ওখানকার শুল্ক উৎপাদন ও বাণিজ্য এর মধ্যে পড়ত। চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর ছিল একটি আলাদা মহল। এর জন্য সামরিক ও অসামরিক শাসনকর্তা ছিলেন। এ ছাড়াও নিচুস্তরের আমলারা ছিলেন। যার মধ্যে কাজি (পর্তুগিজ দলিলে *ওয়াজিল)* ছিলেন প্রধান। এ ছাড়া শুল্কবিভাগের আমলাদের কথা পাওয়া যায় হোসেন শাহি আমলে। প্রধানত বাণিজ্যর জন্যই যে শহরটি গড়ে উঠেছে এবং বাণিজ্যর উপর নির্ভরশীল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রাম নিয়ে ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকে। ১৫৮৮ সালে আরাকান রাজ সিকান্দার শাহ ত্রিপুরাকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেয়। ত্রিপুরা আর কোনওদিন চট্টগ্রাম পায়নি। এরপরের ইতিহাস আরাকান ও পর্তুগিজ সংঘর্ষ।

১৬০২ সালে পর্তুগিজ কর্ভালো সন্দীপ দখল করলে পরের বছর আরাকানরা ওদের হটিয়ে দেয়। আরাকান রাজ্যের মধ্যে সব পর্তুগিজকে হত্যা করা হলে চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের জোর অনেকটা কমে যায়। কিন্তু ১৬০৯ সালে পর্তুগিজ নুন ব্যবসায়ী গনজালেস সন্দীপ আবার দখল করেন যার ফলে চট্টগ্রামে আরাকানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। আরাকানরাজ সেলিম শাহ তাঁর ভাইপো আলামাঞ্জাকে চট্টগ্রামের শাসক করলে, আলামাঞ্জা চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকেন। কিন্তু ১৬১২ সালে হোসেন শাহ আরাকানের রাজা হয়ে চট্টগ্রামে পর্তুগিজ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন। তিনি বিশাল নৌবহর পাঠিয়ে চারমাস চট্টগ্রাম অবরোধ করে রাখলেও কোনও ফল হয় না। কিন্তু কিছুকাল পরে হোসেন শাহ বিজয়ী হন। হোসেন শাহ এরপর ওলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে সন্দীপ থেকে পর্তুগিজদের হটিয়ে দেন। কিন্তু হোসেন শাহ পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে চট্টগ্রামের আশেপাশের জমিতে বসতি করান। প্রধানত চক্রশাল নামে জায়গাতেই তাদের বসতি ছিল এবং নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে পর্তুগিজদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এরাই আরাকান জলদস্যুদের সঙ্গে মিলে ও আরাকান রাজের মদতে পূর্ব বাংলার উপকূলে দস্যুতা করত।

মোগলরা আফগান কাররানিদের পরাজিত করে বাংলা দখল করে চট্টগ্রামের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করে। জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে চট্টগ্রাম মোগল বাংলার পূর্ব সরকার। শিহাবুদ্দিন তালিশ লিখছেন যে চট্টগ্রাম মোগল হিসেবের খাতায় লেখা ছিল অস্থায়ী জায়গা বলে। যখন কাউকে মাহিনা না দেওয়ার হয়, তখন তাকে চট্টগ্রামের খাজনা জায়গির দেওয়া হয়। পাদরি মানরিক লিখেছেন যে স্থলপথে ডিয়াঙ্গা হয়ে চট্টগ্রাম যাওয়া যায় এবং জলপথে ঢাকা থেকে সন্দীপ হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছোনো যায়। মোগলরা জাহাঙ্গিরের সময়ে জলপথে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খান যখন চট্টগ্রাম দখল করেন তখন দুপথেই আক্রমণ চালানো হয়েছিল।

শায়েস্তা খানের ১৬৬৬ সালের আক্রমণের পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত আরাকানের দখলে ছিল চট্টগ্রাম। পাদরি মানরিক বলেছেন যে সাধারণত আরাকান রাজার দ্বিতীয় ছেলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হত। উনি চট্টগ্রামের দুর্গের মধ্যেই থাকতেন যার ফলে অনেক বিদেশির কাছে উনিই ছিলেন চট্টগ্রামের রাজা। সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিজের নামে মুদ্রা বের করতেন বলে ও কখনও রাজা উপাধি নিয়েছিলেন বলে এই ধারণা হয়েছিল। এমনকী আরাকানি শিলালেখতে (যেমন ১৫৪০-৪১ সালের) শাসনকর্তাকে রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুরো এলাকার সুরক্ষার জন্য ছিলেন *করমকারি*, যাকে কেউ কেউ বলেছেন জাহাজের সৈন্যাধ্যক্ষ আবার কেউ কেউ বলেছেন স্থলসৈন্যের কর্তা। এ ছাড়াও আরাকানি সূত্র থেকে নিম্নস্তরের কিছু আমলার কথা জানা যায়। গ্রামের মোড়ল বা গ্রামের খাজনা সংগ্রহের ভার ছিল *রোয়াজার* উপর। এ ছাড়াও *খোয়াজা, কর্বরি* ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামে মুসলমানদের আসার পরই দুর্গ তৈরি হয়েছিল। আরাকানিরা সম্ভবত আর একটা দুর্গ তৈরি করেছিল যার উল্লেখ পাওয়া যায় পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের

লেখায়। তাদের মতে ১৬১২ সালের আগে এই দুর্গ তৈরি হয়েছিল। শিহাবুদ্দিন তালিশ এই দুর্গের বর্ণনা দিয়েছেন। কর্ণফুলী নদীর পাড়ের পাহাড়গুলির মধ্যে এই দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। এর অনেকগুলি বুরুজ ছিল। এই দুর্গের সামনে আট গজ চওড়া একটা পরিখা ছিল। পূব দিকে এই পরিখার সঙ্গে লাগানো ছিল কর্ণফুলী নদী। উত্তর দিকে ছিল বড় একটা পুকুর। পুকুরের পিছনে সারা উত্তর দিক জুড়ে ও পশ্চিম দিকের কিছু অংশ নিয়ে ছিল পাহাড়। দুর্গের মধ্যে ছিল দুটি ঝরনা যার জল বর্ষাকালে কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে পড়ত। ওই সময় জল বেড়ে যাওয়ায় নৌকো করে যাওয়া যেত। এই জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হত যাতে সব সময়েই জল পাওয়া যায়। দুর্গের উঁচু চূড়ায় ছিল পির বদর সাহেবের সমাধি। শিহাবুদ্দিন তালিশ বলছেন যে চট্টগ্রাম দুর্গের বিপরীত দিকে কর্ণফুলী নদীর অপর পারে ছিল আর একটি দুর্গ। এটাও খুব শক্ত ও উঁচু দুর্গ।

মোগল-আরাকানি সংঘর্ষে চট্টগ্রামের উত্তর দিক সীমান্ত পর্যন্ত জনশূন্য হয়ে পড়ে। আরাকানিরা প্রধানত নির্ভর করত পর্তুগিজদের উপর যারা সারাজীবন দস্যুতা করে কাটিয়েছে। পর্তুগিজ ঐতিহাসিকরা বলছেন যে রাজ্যের সব বন্দরগুলির সুরক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল পর্তুগিজদের উপর। ১৫৯৮ সালের একটা বিদেশি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে আড়াই হাজার পর্তুগিজ ও তাদের বংশধররা চট্টগ্রাম ও আরাকানে আছে। ১৬০৭ সালে যখন পিরাদ দ্য লাভাল চট্টগ্রামে এসেছিলেন তখন তিনি বহু পর্তুগিজকে স্বাধীনভাবে শহরে ও উপকূল এলাকায় থাকতে দেখেছিলেন। বার্নিয়ার লিখেছেন যে আরাকান রাজা বহু পর্তুগিজ, খ্রিস্টান দাসদাসী ও মিশ্র পর্তুগিজ অধিবাসীদের চট্টগ্রামে থাকতে দিয়েছেন ও জমিও দিয়েছেন। নিকোলাই মানুচ্চি ওই একই কথার পুনরুক্তি করেছেন। শিহাবুদ্দিন তালিশ বলছেন বহু ফিরিঙ্গি চট্টগ্রামের মুখে বসবাস করতেন। এরা সকলেই আরাকান রাজার অধীন যিনি পর্তুগিজ জলদস্যুদের উৎসাহ দেন এবং তাদের লুঠের মালের অংশ নেন। ১৭১৩ সালে পাদরি বারবিয়ার বলেছেন যে চট্টগ্রামের খ্রিস্টানদের তিনটি বসতি আছে। একটা দিয়াং-এ, দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজারের আশেপাশে ও তৃতীয়টি জাবালকালতা, যেটিকে চট্টগ্রামের মধ্যে জামালখাল দিহি বলে ধরা হয়।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের একটা দুর্গ ছিল। উনি পাহাড়তলির কাছে একটা ধ্বংসস্তূপকে ওই দুর্গ বলে শনাক্ত করেছেন। স্থানীয় প্রবাদ আছে যে পর্তুগিজরা ওই দুর্গে তাদের লুঠের ধনসামগ্রী রাখত। ঐতিহাসিক ক্যাম্পস বলেছেন যে ১৫৯০ সালের আগেই পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে একটা দুর্গ করেছিল। কিন্তু পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই জানা যায় যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের দুর্গ তৈরি করার আর্জি নাকচ করে দেন। আরও জানা যায় যে চট্টগ্রামের পর্তুগিজরা তাদের রাজার কাছে দুর্গ তৈরি করার প্রার্থনা জানালে, তিনি কোনও মত দেননি। ১৬০৭ সালে পিরাদ দ্য লাভাল পরিষ্কার লিখছেন যে পর্তুগিজদের কোনও দুর্গ নেই। পাদরি মানরিকও পর্তুগিজ দুর্গের কোনও উল্লেখ করেননি। লিনসখোটেন লিখছেন যে পর্তুগিজদের কোনও দুর্গও নেই, সরকারও নেই।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দুয়ার্ত বারবোসা বাংলার বর্ণনা দিয়েছেন যদিও মনে হয় উনি বাংলায় আসেননি। উনি বন্দর-শহরের যে বাণিজ্যর কথা বলেছেন সেটা সপ্তগ্রামের নয়। কারণ ততদিনে সপ্তগ্রামের গৌরব প্রায় অস্তমিত। বারবোসা অবশ্য চট্টগ্রাম বলেননি। বলেছেন *বেঙ্গলা,* যেটি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। তবে লেখাটি অন্যদের কাছ থেকে শোনা হলেও, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উনি বলেছেন যে মুসলমানরা যে বন্দরে থাকে, সেখানে সব জিনিসের প্রচুর বাণিজ্য হয়। বন্দরটি সমুদ্রের মুখে এবং এর উত্তরে মুসলমানদের একটা বড় শহর আছে, যাকে ওরা বলে বেঙ্গলা। এর রাজা স্বাধীন। এখানকার অধিবাসীদের রং সাদা এবং এখানে বহু বিদেশি থাকে বিভিন্ন দেশের। যেমন আরব, পারসিক, ভারতীয়। এদের মধ্যে সবাই প্রায় বড় বণিক এবং তারা মক্কার ধরনের বড় জাহাজ রাখে। চিন দেশের জাহাজ 'জাঙ্ক'ও এদের আছে। এই শহরে প্রচুর তুলোর চাষ হয়, আখ, লম্বা গোলমরিচ ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন ধরনের কাপড় বোনা হয়। এখানকার মুসলমান বণিক হিন্দুদের ছোট ছেলে কিনে নেয়। বড়লোক মুসলমানরা সাদা তাঁতের কাপড় পড়ে যার উপরে রেশমের রুমাল থাকে। তাদের কোমরে থাকে মণিমুক্তোখচিত ছোরা। এদের নিজেদের বাড়িতেই পুকুর আছে যেখানে তারা স্নান করে।

১৫৯৯ সালে পাদরি ফার্নানদেজ ও পাদরি সোসা চট্টগ্রামে যান ও ওখান থেকে পর্তুগিজদের প্রধান এলাকা দিয়াঙ্গাতে আসেন। এখানে ওঁরা একটা থানা দেখেছেন চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য। কিন্তু ওখানে তখন কোনও গির্জা ছিল না। আরাকান রাজা ওদের গির্জা বানানোর অধিকার দেন। দিয়াঙ্গা, কারাঞ্জা ও চট্টগ্রামে ওঁরা ধর্মপ্রচার শুরু করেন। চট্টগ্রামে তখন মাত্র পনেরো জন পর্তুগিজ ও কয়েকজন মিশ্র লোক ছিল, যাদের মধ্যে বিবাহিত লোক খুব কম। ওঁরা ওঁদের ধর্মের কাজ শুরু করে দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উপকূল বাংলার জমিদাররা পর্তুগিজদের উপর অত্যাচার শুরু করলে ওরা চট্টগ্রামে চলে আসেন। পাদরি তখন চট্টগ্রামের এক মাইল দূরে থাকছিলেন। আরাকান রাজাও ওখানে মগদের খ্রিস্টান করা বারণ করে আদেশ দিয়েছেন। ১৬০২ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই পাদরিরা বাংলায় ৬২,৬০৬ জনকে খ্রিস্টান করেছেন। ১৬০২ সালের পর দুইজন ডোমিনিকান পাদরি দিয়াঙ্গা পৌঁছলে ওখানকার অধিবাসীরা একটা গির্জা ও থাকার বাড়ি তৈরি করে দেয়। কিন্তু এরপরই আরাকান ও পর্তুগিজদের মধ্যে গোলমাল হলে আরাকান রাজা পাদরিদের দিয়াঙ্গা ও চট্টগ্রামে জেলে পাঠান। ওঁদের চট্টগ্রামের বাড়িও নষ্ট করে দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও, আরাকান রাজা পাদরিদের পায়ে শিকল বেঁধে চট্টগ্রামে আটক রাখেন।

১৭১৩ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি পাদরি লেনেস চট্টগ্রামে আসেন। এসে দেখেন এখানকার লোকেরা হাতে অস্ত্র নিয়ে একটা জামা ও একটা প্যান্টালুন পরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। এই সৈন্যদের পরে ওদের সেনাপতি ও আমলারা আসে। ওই সময়ে বারবিয়ারের বক্তব্যর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। উনি বলছেন যে চট্টগ্রামের খ্রিস্টানরা তিনটি বসতিতে বিভক্ত। প্রত্যেকটিরই একজন কাপ্তান, একজন পাদরি ও একটা গির্জা আছে। সাধারণভাবে ওরা পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে।

কিন্তু স্থানীয় লোকেরা নিজেদের ভাষায় কথা বলে। এরা অধিকাংশই দাস। পাদরি ওই ভাষা শিখেছিলেন এদের খ্রিস্টান করার জন্য। এরপরে ওখানকার খ্রিস্টান উৎসব কী রকম হত তার বর্ণনা দিয়েছেন।

ফরাসিদের চট্টগ্রামে কোনও কুঠি ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও ফরাসি জাহাজ পেগু যাতায়াতের পথে ওখানে থামত। ১৭৩৬ সালে ওই রকম একটা জাহাজ চট্টগ্রামে এলে হাজি আমেদের আদেশে জাহাজ আটক করা হয়। বহু টাকা খরচ করে জাহাজ ও লোকজনকে দুপ্লেক্স ছাড়িয়ে আনেন। কিন্তু ওখানে কুঠি করার পরিকল্পনা করেন কারণ আর্মেনিয়ান ও ইংরেজরা ভাল ব্যবসা করছে প্রধানত কাপড়ের। ১৭৩৭ সালে দুপ্লেক্স এই পরিকল্পনা পরিতাগ করেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসিরা আলিবর্দির কাছ থেকে অনুমতি পায় কুঠি তৈরি করার। পলাশির যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সালে ইংরেজরা চট্টগ্রামের ফৌজদারের কাছে অনুমতি চায়, কিন্তু নবাবের অনুমতি না পেলে সে দিতে রাজি হয় না। ইংরেজরা চট্টগ্রাম ইজারা নিতে চাইলে নবাব মিরজাফর রাজি হলেন না। এমনকী উনি কোম্পানিকে চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার অধিকারও দিতে রাজি হননি। মিরকাশিমের সঙ্গে যে গোপন চুক্তি হয়েছিল ১৭৬০ সালে, সেখানে বলা ছিল যে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজদের দেওয়া হবে। মিরকাশিম নবাব হলে ১৭৬০ সাল থেকে এই চুক্তি কার্যকর হয় যার ফলে চট্টগ্রাম নবাবি শাসনযন্ত্র থেকে পৃথক হয়ে যায়।

মধ্যযুগ থেকেই চট্টগ্রাম *বারো আউলিয়ার মুল্লুক* বলে বিখ্যাত ছিল যার মানে বোঝায় বারো আউলিয়ার বাসস্থান। চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ মুকিম চট্টগ্রামে সুফিদের মধ্যে চিস্তি সুফিদের যে প্রভাব ছিল বলেছেন। আরও কয়েকটি লেখায় এই ধরনের সুফিদের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে কবি মুহম্মদ খানই প্রথম বারো আউলিয়ার কথা বলেছেন। প্রবাদ আছে যে এদের মধ্যে অনেক সাধুই চট্টগ্রামে এসেছিলেন সমুদ্র পথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এদের মধ্যে বলা হয় যে শাহি সুলতান মাহিশ্বর মাছের পিঠে চড়ে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক আবদুল করিম এর সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য দিয়েছেন। আর একজন ঐতিহাসিক ধরেছেন যে মাহিশ্বর-এর পরম্পরা থেকে বোঝা যায় যে হিন্দু দেবতা এর উৎস। এই সব সন্তদের মধ্যে পির বদর বিখ্যাত। এর কথা বিভিন্ন মধ্যযুগীয় লেখায় আছে। শিহাবুদ্দিন তালিশ চট্টগ্রাম দুর্গের মধ্যে এঁর সমাধির কথা বলেছেন যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রধানত সমুদ্রযাত্রার পরম্পরার সঙ্গে ইনি জড়িত বলে সব ঐতিহাসিকই মত প্রকাশ করেছেন। এরা ছাড়াও আরও অনেক সাধুসন্ত চট্টগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ধরনের সাধুসন্তদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধদের মধ্যে সমতলের বৌদ্ধ ও পাহাড় এলাকার বৌদ্ধদের ভাগ ছিল। পাহাড় এলাকায় মগ বৌদ্ধ ও চাকমাদের বিভাজন দেখা যায়।

পরিশিষ্ট

মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে শহরের উত্থান ও তার ফলাফল নিয়ে প্রচুর বিতর্ক ও লেখালেখি হয়েছে যার মধ্যে কেউ কেউ সমগ্র এশিয়ার শহরগুলিকে এক ধরনের শহর বলে অভিহিত করেছেন। হেনরি পিরেন ও মরিস ডব শহরের উত্থানের সঙ্গে দূরপাল্লার বাণিজ্য ও ইউরোপীয় ফিউডাল প্রথার বিলোপ জড়িত বলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে ডব ও পল সুইজির সঙ্গে বিখ্যাত বিতর্কে শহরের অবস্থান ফিউডাল প্রথার বাইরে ছিল কিনা এ নিয়ে স্থির কোনও মীমাংসা করেননি। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের চিঠির উপর ভিত্তি করে কার্ল মার্কস বলেছিলেন যে ভারতীয় শহরগুলি প্রধানত সামরিক ছাউনি। এর ফলে কেউ কেউ মনে করেছেন যে ভারতীয় শহরগুলির উপর গবেষণা বেশ কিছুকাল পিছিয়ে গিয়েছিল। ম্যাক্স ওয়েবার অবশ্য এ ধারণার কিছুটা বদল করে বলেছেন যে ভারতীয় শহরগুলি প্রধানত রাজকীয় শাসন মর্যাদার কেন্দ্র বা বাজারের থেকে গড়ে উঠেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এঁদের সময়ে ভারতীয় শহর সম্পর্কে জ্ঞান অনেক সীমিত ছিল। ফলে ওঁদের ধারণাও যে অস্পষ্ট থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে মধ্যযুগের ভারতে নানা কারণে শহর গড়ে উঠেছে। এগুলির কতকগুলি শহর (বা এ ছাড়া অন্য আরও কতকগুলি) কিনা এ সম্পর্কে সমকালীন বিদেশি পরিব্রাজকদের মধ্যে নিশ্চিত কোনও ধারণা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর এক ফরাসি বণিক জনবসতিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে পাঁচিল ঘেরা শহর, পাঁচিল ছাড়া শহর, ছোট গ্রাম, বড় গ্রাম, গ্রাম বাজার (যেটি বোধহয় *কসবার* কাছাকাছি) ও বাজার-শহর, যাকে বলা হচ্ছে বুর্গ। ছোট শহর ও বড় শহরের মধ্যেকার পার্থক্যও বিদেশি পরিব্রাজকরা লক্ষ করেছেন। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে, জনসংখ্যা না আয়তন বা অন্য কিছু, এই ভাগগুলি করেছেন সেটা তাঁরা বলেননি। এঁরা অনেকসময়ে নিজের দেশের বা ইউরোপের অন্যান্য শহরের সঙ্গে ভারতীয় শহরের তুলনা করছেন, সেটা আমরা দেখেছি। কিন্তু কেন করেছেন, সেটা খুব পরিষ্কার নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এঁরা নিজেদের দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতীয় শহরকে দেখেছেন এবং এই সব শহরের মধ্যে খুঁজেছেন গঠনের নিয়ম, ছন্দ ইত্যাদি—যে ধারণাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়দের ভারতীয় শহরের উপরে লেখায় দেখা যায়। কিন্তু এঁরা কেউই কেন শহর উঠছে বা পড়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি, বিশেষ কয়েকটি

ব্যতিক্রম ছাড়া। তবে প্রায় সকলেই খুঁজেছেন দূরপাল্লার বাণিজ্য যার থেকে পরবর্তীকালের ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও মুক্ত হননি। কেউ কেউ শহরের মধ্যে বা শহরগুলিতে শিল্প খুঁজেছেন। কিন্তু এগুলিই সর্বভারতীয় শহরের উত্থান-পতনের একমাত্র কারণ কিনা এটা প্রশ্ন করার সময় এসেছে।

আমরা আগে অধ্যাপক রামশরণ শর্মার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছি—এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ১৯৮৪ সালের ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাচীন ভারত শাখার সভাপতি দেখিয়েছেন যে দূরপাল্লার বাণিজ্য ছাড়াই একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় শহরগুলি পুনরুজ্জীবন লাভ করছে। সেক্ষেত্রে সুলতানি যুগ শুরু হবার অন্তত এক শতাব্দী আগে থেকেই যে শহরগুলির উত্থান শুরু হয়েছিল, সেটা পরিষ্কার। এই উত্থানের জন্য উনি দায়ি করেছেন আগেকার কয়েক শতাব্দী ধরে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন। এর মধ্যে দূরপাল্লার বাণিজ্য শুরু হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলেও, সেটা কতটা ছিল, এ সব প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি। সুতরাং তুর্কিরা এসে স্থানীয় যে বাধাগুলি ছিল সেগুলি দূর করে ও প্রধানত স্থলপথে দূরপাল্লার বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে সাহায্য করে, বিশেষত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে। এগুলির ফলে যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতীয় শহরের উত্থান ত্বরান্বিত হয়, সে সম্বন্ধে বোধহয় কারওর সন্দেহ নেই। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে নগরের উত্থান শুরু হলে, এসব প্রশ্ন নতুন করে দেখা প্রয়োজন যেটি এই বইয়ের সীমার বাইরে।

সাধারণত তুর্কিদের আসার ফলে শহরের আবার উত্থান শুরু হয়েছিল বলে আর একটা যুক্তিও দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয় যে তুর্কিরা আসার আগে ভারতভূখণ্ডে একছত্র কোনও সাম্রাজ্য ছিল না, যার ফলে শহরগুলির অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুক্তি মেনে নিলে চতুর্দশ শতকের শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শহরের অবক্ষয় হবার কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওই সময়ে বিভিন্ন দিকে নতুন শহর গড়ে উঠছে। দিল্লির সুলতানাত অর্ধেক হয়ে গেলেও শহরগুলি অর্ধেক হয়ে যায়নি। এর একটা কারণ হতে পারে যে ফিরোজ তুঘলকের সময়ে উন্নততর সেচ ব্যবস্থার ফলে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। জলের সঙ্গে শহরের ও চারপাশের কৃষিকার্যের কতটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল সেটা আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু সেচ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি বা তার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শহরের আয়তন বৃদ্ধি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন। বাংলায় আফগান শাসন চলে গিয়ে মোগল শাসন পরিপূর্ণভাবে বসার মাঝখানের সময়েতে যে শহরগুলি চলছিল, সেগুলি বাজার-শহর হলেও, ওইগুলি উত্থানের কারণ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। এগুলির পিছনে যে নতুন জনবসতির লক্ষণ দেখা যায়, চাল ও তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ও বাণিজ্যর উপরে যে এগুলি টিকে ছিল সেটাও বোঝা যায়। বিদেশি পরিব্রাজকরা অন্তত একথাই বলে গিয়েছেন।

কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে এ ধরনের শহরের উত্থানের যোগ ছিল কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ কেউ মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ভারতের কয়েকটি শহরের

অবস্থার অবনতি হচ্ছিল এটা বলেছেন। ওঁরা আরও দেখাচ্ছেন যে ওই সময়ে ইংরেজদের আগমনের ফলে বা তারা কর্তৃত্ব পাবার ফলে নতুন শহর গড়ে উঠছিল। অন্যদিকে কেউ কেউ ইংরেজদের কর্তৃত্ব পাওয়ার ফলে ও আদি ঔপনিবেশিক নীতি শুরু করার ফলে শহরগুলির পতন হচ্ছিল এটাই বলেছেন। যেমন আগ্রা, দিল্লি বা জৌনপুর ইত্যাদি শহরগুলির পতন হচ্ছিল যার কয়েকটার কথা আমরা এখানে বিদেশি পর্যটকদের লেখা থেকে দেখেছি। কিন্তু এই পতন সাময়িক কিনা, এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। সমকালীন উর্দু কবিতা *শহর আসব*-এর উপর নির্ভর করে উত্তর ভারতের বড় কয়েকটি শহরের অবক্ষয়ের কথা কেউ কেউ বলেছেন। পরলোকগত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিশ্র এই ধরনের কবিতার উপর নির্ভর না করতে চাইছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে ১৭৭২ সালে দিল্লি আবার জমজমাট হতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে দিল্লির অবক্ষয় হয়েছে। কিন্তু কতটা অবক্ষয় হয়েছিল এটা এখনও পরিষ্কার নয়।

আমরা এখানে শহরগুলির চেহারা কীরকম ছিল তার উপর জোর দিয়েছি যার থেকে শহরের কাজকর্মের ও লোকজনেরও একটা হিসেব পাওয়া যায়। হিসেব অবশ্য সম্পূর্ণ নয়—সব শহরের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু শহরের ভিতরের রাস্তা, বাড়ি, ধর্মীয় জায়গা, লোকবসতি, দোকান বাজার ইত্যাদি সবই এর মধ্যে আসে। তার থেকে দেখা যায় যে সব শহরের প্রধান কাজকর্ম এক ধরনের নয়। গর্ডন চাইল্ড শহর কাকে বলে বলতে গিয়ে কতকগুলি নির্দেশিকা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি-মধ্যযুগের শহরের কয়েকটা নির্দেশিকা দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে এখানে আলোচিত সবগুলি শহর পড়ে না। সুতরাং অন্য নির্দেশিকার প্রয়োজন আছে।

ভারতীয় শহরগুলি মধ্যযুগে প্রধানত নদীর উপর নির্ভরশীল হলেও বা নদীর ধারে হলেও, ব্যতিক্রম আছে। আমরা দেখেছি বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রার তীরে হলেও, নদীর উপর নির্ভরশীল নয়, বরঞ্চ পাহাড়ের উপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য নির্ভরশীল। জলের সমস্যা ওই শহর অন্যভাবে মিটিয়েছিল তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। অন্য শহরে খাল কেটে জল আনলেও বাংলার গৌড় শহর এ কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দুপাশে জল থাকার ফলে লম্বা ফালি দিয়ে শহর তৈরি করা হয়েছিল এবং দুপাশের জলের সংযোগ ছিল শহরের মধ্যেকার নালির মাধ্যমে। বাংলায় এ ধরনের শহর বিরল নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় সোনারগাঁতে যদিও মনে হয় গৌড়ে নালির সাহায্যে জলের যে রকম ব্যবহার করা হয়েছিল, সোনারগাঁতে সেরকম ভাবে করা হয়নি। বিজয়নগর, গৌড় বা সোনারগাঁ, আরও কয়েকটি শহরের মতো, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে, যার মুলে ছিল সামরিক ব্যর্থতা, তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে ওগুলি ক্রমশ পতনের দিকে চলছিল যেটি সামরিক কারণের ফলে বিলম্বিত হয়নি। সুতরাং রাজনৈতিক-সামরিক কারণের ফলে বা বিশেষ যুগের সন্ধিক্ষণে এগুলির উত্থান হলেও, এদের কাজকর্ম ও চেহারা আলাদা।

বড় বড় শহরগুলির মধ্যেকার চেহারাটা আমরা প্রায় একই ধরনের পাই। দুর্গ বা

রাজপ্রাসাদ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ও তার চারপাশে বসতি ও একটি ময়দান যেটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হত। গৌড়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমে ও সুরাটে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বিদেশি পরিব্রাজকরা প্রাসাদের সামনে পোলো খেলতে দেখেছেন। প্রাসাদের ভিতরের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেটি প্রধানত বিলাস বৈভবের, যেটি পরম্পরাগতভাবে চলেছিল ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উন্নতি করেছিল। নানা ধরনের ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, শিল্পকলায় তার অজস্র প্রমাণ সারা ভারতভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শহরের মধ্যে সাধারণ বা মধ্যবর্তী শ্রেণীর বাসস্থান বা কাজকর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা শহরের মধ্যে জাতপাতের বিভেদ বা সাম্প্রদায়িক বিভেদ খুঁজে পেলেও পাঁচশো বছরের ইতিহাসে দু একটি বিরল ঘটনা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। শহরের মধ্যেকার বাসস্থানের এলাকার মধ্যেও ওই ধরনের বিভাজন আমরা দেখি না। হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলমান ধর্মের সৌজন্যে ও প্রভাবে শহর গড়ে উঠেছিল বলে যারা দাবি করেছেন, তাঁরা ইতিহাসের স্বরূপ ধরার চেষ্টা করেননি। এঁরাই প্রধানত ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের লেখার অন্ধ অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন যা ভারতভূখণ্ডের মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রকৃত ধারার সঙ্গে মেলে না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অনিরুদ্ধ রায়, 'ফরাসি পর্যটকের চোখে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটের মুঘল শহর', *ইতিহাস অনুসন্ধান,* ১৯৯০, খণ্ড ৫, পৃ. ১৫৯-১৬৭, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

২. অনিরুদ্ধ রায়, 'গৌড় শহরের প্রথম পর্তুগিজ বর্ণনা : ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ', *ইতিহাস অনুসন্ধান,* ১৯৯৩, খণ্ড ৮, পৃ. ম ১০-২৫, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

৩. অনিরুদ্ধ রায়, 'সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলায় ফরাসি কোম্পানি ও দুটি কামান', *ইতিহাস অনুসন্ধান,* ১৯৯৬, খণ্ড ১১, পৃ. ২৪৭-২৫১, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

৪. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস—সুলতানী আমল,* ঢাকা, ১৯৮৭ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭)।

৫. আবদুস সামাদ, *গৌড়-পাণ্ডুয়ার বিতর্কিত স্তূপ-বিহার ও নগর-রাজধানীর অবস্থান : সমাধান,* মালদা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১।

৬. এ. কে. এম. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* ঢাকা, ১৯৮৪।

৭. কালিদাস দত্ত, *দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত,* দুই খণ্ড, বারুইপুর, ১৯৮৯।

৮. কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী* (মোহিত রায় সম্পাদিত), কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬ (প্রথম প্রকাশ ১৯১১)।

৯. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,* বসুমতি সংস্করণ, নবম সংস্করণ ১৩৮৬।

১০. গোলাম হোসেন সলিম, *বাংলার ইতিহাস* (আকরউদ্দীন অনূদিত), বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

১১. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল* (সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত), বিশ্বভারতী, ১৯৯৪।

১২. জিয়াউদ্দিন বারানি, *তারিখ-ই ফিরোজশাহি* (গোলাম সামদানি কোরায়শি অনূদিত), বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, ১৯৮২।

১৩. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *হুগলি জেলার পুরাকীর্তি,* কলকাতা, ১৯৯৩।

১৪. নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী,* কলকাতা, ১৯৭৮ (প্রথম প্রকাশ ১৩০৪)।

১৫. নিজামুদ্দিন আহমদ, *তবাকত-ই আকবরি,* দুই খণ্ড(আহমদ ফজলুর রহমান অনূদিত), বাংলা আকাদেমি, ঢাকা।

১৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব),* কলকাতা, (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) ১৯৯৩, (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯)।

১৭. প্রতিভারঞ্জন মৈত্র, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস,* মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯।

১৮. প্রতিভারঞ্জন মৈত্র (সম্পাদিত), *মুর্শিদাবাদ চর্চা,* বহরমপুর, ১৩৯০।

১৯. প্রদ্যোত ঘোষ, *মালদহ জেলার পুরাকীর্তি,* কলকাতা, ১৯৯৭।

২০. বিপ্রদাস, *মনসা-বিজয়* (সুকুমার সেন সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

২১. বৃন্দাবন দাস, *শ্রী চৈতন্যভাগবত,* নবদ্বীপ, ৪৯৭ গৌরাব্দ, পুনর্মুদ্রণ।

২২. ভারতচন্দ্র রায়, *অন্নদামঙ্গল,* বসুমতি সংস্করণ ১৯২৯।

২৩. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবাকত-ই-নাসিরি* (এ. কে. এম. জাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত), বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, ১৯৮৩।

২৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল,* (পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৯২।

২৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কন চণ্ডী* (শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪।

২৬. মুহম্মদ কাশিম ফিরিশতা, *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস,* (মুহাম্মদ শহিদুল্লা অনূদিত), বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, ১৯৭৭।

২৭. মোহিত রায়, *নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি,* কলকাতা, ১৯৭৫।

২৮. রীনা ভাদুড়ি, 'মধ্যযুগে বাংলায় নগর-বিন্যাসের ধারা—সুলতানি আমল', *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), পৃ. ৩১-৬০, কলকাতা, ১৯৯২।

২৯. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস,* দুই খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৩-৬৫ (প্রথম প্রকাশ ১৯১৪-১৯২২)।

৩০. সন্ধ্যাকর নন্দী, *রামচরিতম* (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯১০; পুনর্মুদ্রণ, (রাধাগোবিন্দ বসাকের ইংরেজি তরজমা সহ), কলকাতা, ১৯৬৯।

৩১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ),* কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৮।

৩২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব,* কলকাতা, ১৯৮৮।

৩৩. সুধীর কুমার মিত্র, *হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ,* কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬২)।

৩৪. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, *বন্দর কাশিমবাজার,* কলকাতা, ১৯৭৮।

৩৫. স্বরূপ চন্দ্র রায়, *সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস* (সৈকত আসগর সম্পাদিত), ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, (প্রথম প্রকাশ ১৮৯১)।

৩৬. হরিচরণ দাস, *অদ্বৈত মঙ্গল,* (রবীন্দ্রনাথ মাইতি সম্পাদিত), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭৩।

1. Afzal Ahmad, see K. S. Mathew.

2. Imtiaz Ahmad, 'Urban Centres in Medieval India: A Brief Survey' in V. K. Thakur (ed): *Towns in Pre-Modern India*, Patna, (1994), pp. 217-224.

3. Shamsuddin Ahmad, *Inscriptions of Bengal*, Rajshahi, 1960.

4. S. Maqbool Ahmad, *Arabic Classical Accounts of India and China*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1989.

5. M. Alam, 'The Growth of Hyderabad City', in *G. Yazdani Commemoration Volume*, Hyderabad, 1966.

6. M. Athar Ali, 'Capital of the Sultans: Delhi during the Thirteenth and

Fourteenth Centuries' in R. E. Frykenburg (ed): *Delhi Through the Ages*, Oxford University Press, 1993.

7. S. Abid Ali, *Memories of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1986 reprint.

8. S. Arasaratnam and Aniruddha Ray, *Masulipatnam and Cambay*, New Delhi, 1994.

9. Probodh Chandra Bagchi, 'Political Relation between Bengal and China in the Pathan period' in *Viswa-Bharati Annals*, 1945, Vol. I.

10. Rakhaldas Bandopadhyay, 'Saptagram or Satgaon' in *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1909, Vol. V, Pt. I, NS, No. 7, pp. 245 ff.

11. N. R. Banerjee, *The Iron Age in India*, Delhi, 1965.

12. Indu Banga (ed), *The City in Indian History*, New Delhi, 1991.

13. M. Baqir, *Lahore Past and Present*, Delhi, 1993 (reprint).

14. S.A. Bari, 'Hampi Revisited' in H. V. S. Murthy (ed): *Essays on Indian History and Culture*, New Delhi, 1990.

15. C. A. Bayly, *Rulers, Townsmen and Bazars*, Cambridge University Press, 1988 (reprint).

16. W. E. Begley and Z. A. Desai (ed), *The Shah Jahan Nama of Inayet Khan*, OUP, 1990.

17. Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, A. Constable (ed.), New Delhi, 1972 (reprint).

18. A. S. Beveridge (tr.), *Babur Nama*, New Delhi, 1979 (reprint), 2 Vols. in one.

19. H. Beveridge, *District of Bakerganj*, London, 1876.

20. H. Beveridge (tr. & ed.), *The Tuzuk-i Jahangiri*, New Delhi, 1978 (reprint).

21. N. K. Bhattasali, 'The English Factory at Dacca' in *Bengal Past and Present*, Vol. XXXIII, 1927.

22. N. K. Bhattasali, 'Some Facts about Old Dacca' in *Bengal Past and present*, Vol. LI, 1936.

23. N.K. Bhattasali, 'An Enquiry into the Origin of Old Dacca' in *JASB*, 1959, No. 3.

24. Stephen P. Blake, *Shah Jahanabad, the Sovereign City in Mughal India*, Cambridge University Press, 1993.

25. Vincent Le Blanc, *Les Voyages Fameux*, Paris, 1648.

26. H. Blochman, *Contribution to the Geography and History of Bengal*, Asiatic Society, Calcutta, 1968 (reprint from *JASB*, 1873-75).

27. Genevieve Bouchon & Luis Philipe Thomas, *Voyage*, Foundation Calouste Gulbenkien, Paris, 1988.

28. Charles J. Borges, *The Economics of the Goa Jesuits, 1542-1759*, New

Delhi, 1994.

29. Thomas Bowrey, *A Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal, 1669 to 1679,* R.C. Temple (ed), New Delhi, 1997 (reprint).

30. F.B. Bradley-Birt, *The Romance of an Eastern Capital,* Delhi, 1975 (reprint).

31. Percy Brown, *Indian Architecture* (Islamic Period), Bombay, 1995 (reprint).

32. J.J.A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal,* Janaki Prakashan, 1979 (reprint).

33. Abbe Carre, *The Travels of Abbe Carre in India and the Near East, 1672-1674,* C. Fawcett (ed.) 3 Vols., Asian Educational Service, 1990, (reprint).

34. M.M. Chakrabarty, 'Notes on Gaur and Other Old Places in Bengal' in *JASB,* 1909, Vol. 5, Pt. 5, pp. 199 ff.

35. Robert Challe, Journal d'un Voyage fait aux Indes Orientales, 1690, 2 Vols., Paris, 1938 (reprint).

36. B.D. Chattopadhyay, *Aspects of Rural Settlements and Rural Society in Early Medieval India,* Calcutta, 1990.

37. B.D. Chattopadhyay, 'Urban Centres in Early Bengal : Archaeological Perspectives in *Pratna-Samiksha,* 1993-94, Vol. 2-3, pp. 169-192.

38. B.D. Chattopadhyay, 'Urban Centres in Early Medieval India : A Theoretical Overview' in Vijay K. Thakur (ed): *Towns in Pre-Modern India*, Patna, 1994, pp. 127-146.

39. Ratnabali Chattopadhyay, 'The Perception of the City in Medieval Bengal' in *Proceedings of the Indian History Congress*, 53rd session, Warangle, 1992-93, pp. 187-193.

40. V.G. Childe, *What Happened in History,* Penguin, 1942.

41. Sushil Choudhury, 'The Rise and Decline of Hugli' in *Bengal Past and Presnt,* Vol. LXXXVI, Pt. I, Serial No 161, Jan.-June 1967, pp. 33-67.

42. M.S. Commissariat, *Mandelslo's Travels in Western India, 1638-1639,* AES, 1995 (reprint).

43. John Correia-Afonso, *Letters from the Mughal Court,* Bombay, 1980.

44. John Correia-Afonso (ed), *Inteprid Itinerant: Manuel Godinho and his Journey from India to Portugal in 1663,* OUP, 1990.

45. A. Cortesao (tr. & ed.), *The Suma Oriental of Thome Pires and the Book of F. Rodrigues.* 2 Vols., AES, 1990, (reprint).

46. D.G. Crawford, 'Satgaon or Triveni' in *Bengal Past and Present,* Vol. III, 1908, pp. 18-26.

47. H. Creighton, *Ruins of Gaur,* London, 1817.

48. Alexander Cunningham, *Archaeological Report: A Tour in Bihar and Bengal in 1879-80,* Calcutta, 1882.

49. M.L. Dames (tr. & ed.), *The Book of Duarte Barbosa,* 2 Vols. AES, 1989, (reprint).

50. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca, 1961.

51. A.H. Dani, *Dacca,* Dacca, 1962.

52. Ashin Dasgupta, *Indian Merchants and the Decline of Surat, c. 1700-1750,* Weisbaden, 1979.

53. G. Dellon, *A Voyage to the East Indies* (tr. by G. C.M.D.), London, 1898 (reprint).

54. Jean Deloche (ed), *Voyage en Inde du Comte de Modave, 1773-1776,* Ecole Francaise d'Extreme Orient, Paris, 1971.

55. Jean Deloche (ed), *Voyage en Inde, 1754-1762* (of Anquetil Duperron), Ecole Francaise d'Extreme Orient, 1997.

56. Z.A. Desai, see W.E. Begley.

57 Sambhu Chunder Dey, 'Hooghly Past and Present' in *Calcutta Review,* July 1892, Vol. 95, pp. 258-266.

58. Simon Digby, 'The Maritime Trade of India: Sultanate' in T. Roy Choudhury & I. Habib (ed), *The Cambridge Economic History of India,* Vol. I (1984), pp. 125-162.

59. Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism,* London, 1946.

60. H.C. Fanshaw, *Delhi Past and Present,* Voyage Books, 1991 (1st ed. 1902).

61. Abul Fazal, *Akbar Nama* (tr. by H. Beveridge), 3 Vols., Delhi, 1973, (reprint).

62. Abul Fazal, *Ain-i Akbari* (tr. by H. S. Jarett & ed. by Judunath Sarkar), 3 Vols., Delhi, 1978 (reprint).

63. V. Filliozat (ed), *The Vijayanagar Empire,* National Book Trust, 2nd ed., 1982

64. Klaus Fischer, 'Firuzabad on the Bhima and Its Environs' in *Islamic Culture,* Vol. XXXIX, No. 2.

65. Jose Nicolau da Fonseca, *Sketch of the City of Goa,* AES, 1994 (1st pub. Bombay, 1878).

66. William Foster, *Early Travels in India, 1583-1619,* New Delhi, 1985 (reprint). (Accounts of Ralph Fitch, John Mildenhall, William Hawkins, William Finch, N. Worthington, G. Coryat and Edward Terry)

67. William Foster (ed), *The Embassy of Sir Thomas Roe in India, 1615-1619,* New Delhi, 1996 (reprint).

68. John Freyer, *A New Account of India and Persia, 1672-1681* (W. Crooke ed.), 2 Vols, London, 1892.

69. John M. Fritz, 'Architectural Documentation of Vijayanagara: 1984-1987' in *South-Asian Archaeology,* 1987, Pt. 2, pp. 1085-1096.

70. *Gazetteer of Delhi District,* Delhi, 1992 (reprint).

71, Amalananda Ghosh, *The City in Early Historical India,* IIAS, Simla, 1973.

72. H.A.R. Gibb (tr. & ed.), *Ibn Batuta: Travels in Asia and Africa, 1325-1354,* New Delhi, 1986 (reprint).

73. B.G. Gokhale, *Surat in the Seventeenth Century,* Bombay, 1979.

74. Susan Golay, *India Within the Ganges*, New Delhi, 1953.

75. Stewart Gordon, 'Burhanpur: Entrepot and Hinterland, 1650-1750' in S. Subramaniam (ed), *Merchants, Markets and State in Early Modern India*, OUP, 1990.

76. Nicholas de Graaf, *Voyage aux Indies Orientales, 1639-1681* (tr. from the Dutch), Amsterdam, 1689.

77. J.S. Grewal, 'Historical Writing on Urbanisation in Medieval India' in Indu Banga (ed): *The City in Indian History*, New Delhi, 1991, pp. 69-80.

78. Edward Grey (ed), *The Travels of Pietro Della Valla in India*, AES, 2 Vols., 1991 (reprint).

79. I.P. Gupta, *Agra, the Imperial Capital*, Delhi, 1986.

80. Irfan Habib, 'Economic History of the Delhi Sultanate—An Essay in Interpretation' in *Indian Historical Review*, 1977, Vol. IV, No. 1, pp. 287-303.

81. Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire*, OUP, 1982.

82. Irfan Habib, 'The Economic and Social Setting : Akbar and Fatehpur Sikri' in *Marg*, 1991, pp. 79-82.

83. Irfan Habib, 'The Social Distribution of Landed Property in Pre-British India : A Historical Survey' in I. Habib (ed) : *Essays in Indian History*, New Delhi, 1995 (reprint).

84. G.R.G. Hambly, 'Towns and Cities : Mughal India' in T. Roychoudhury and I. Habib (ed): *The Cambridge Economic History of India*, Vol. I (1984), pp. 434-451.

85. Jean-Louis Harouel, *Histoire de l'Urbanisme*, Paris, 1981, 2nd ed.

86. Farhat Hasan, 'The Mutsaddi of Surat—evidence of Persian Records of the 17th Century' in *PIHC*, 53rd session, Warangle, 1992-93, pp. 276-280.

87. Javed Hasan, 'Mapping the Mughal City of Agra' in *PIHC*, 51st session, 1990, pp. 241-245.

88. S. Nurul Hasan, Address in Indian History Congress, 34th session, 1973.

89. S. Nurul Hasan, 'The Morphology of a Medieval Indian City : A Case Study of Shah Jahanabad' in Indu Banga (ed) : *The City in Indian History*, New Delhi, 1991, pp. 87-98.

90. G.R. Hearn, *The Seven Cities of Delhi*, New Delhi, 1991 (reprint).

91. William Hedges, *The Diary, 1681-1687* H. Yule (ed), 3 Vols. London, 1887.

92. R. Hilton (ed), *The Transition from Feudalism to Capitalism*, London, 1976.

93. J.E. Holwell, *Interesting Historical Events relating to the Province of Bengal*, London, 1768.

94. Rev. H. Hosten, 'Jesuit Letters from Bengal, Arakan and Burma (1599-1600), in *Bengal Past and Present*, 1925, Vol. 30, pp. 52-96.

95. Rev. H. Hosten, 'A Week at the Bandel Convent, Hugli' in *Bengal Past and Present*, Jan.-March 1915, Vol. X, pt. I, No. 1, pp. 26-120.

96. A.H. Hourani and S.M. Stern, *The Islamic City*, Oxford, 1970.

97. Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lang* (tr. & ed. by J.V.G. Mills), Cambridge, 1970.

98. A.B.M. Hussain (ed), *Gawr-Lakhnauti*, Asiatic Society, Dacca, 1997.

99. A.B.M. Hussain (ed), *Sonargaon-Panam*, Asiatic Society, Dacca, 1997.

100. Fatima Ahmad Inam, 'The Administration of the City of Delhi during the Sultanate' in *PIHC*, 48th session, Goa, 1987, pp. 179-186.

101. Abdul Karim, *Dacca, the Mughal Capital*, Asiatic Society, Dacca, 1964.

102. Abdul Karim, 'Date of Bakhtiyar Khalji's Conquest of Nadia' in *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)*, 1979-81, Vol. XXIV-VI, pp. 1-10.

103. Ali Muhammed Khan, *Mirat-i Ahmadi* (tr. by Lokhandwala), Baroda, 1965.

104. Dargah Quli Khan, *Muraqqa-e Dehli* (tr. C. Shekhar & S.M. Chenoy), Deep Pub., 1989.

105. V.G. Khobrekar (ed), *Tarikh-i Dilkhusa* (tr. from Persian), Bombay, 1972.

106. D.D. Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History*, Bombay, 1956.

107. D. Deva Kunjari, *Hampi*, Archaeological Survey of India, 1983.

108. E. M. Lapidus, *Muslim Cities in the Later Middle Ages*, Cambridge University Press, 1984 (1st pub. 1967).

109. Monsieur de La Haye, *Journal du Voyage des Grandes Indes*, Paris, 1698.

110. Syed Muhammed Latif, *Lahore*, Lahore, 1892.

111. Lespinay, *M(emoires de Bellanger de Lespinay*, 1670-1675 (H. Froidevaux ed), Vendome, 1895.

112. Sieur de L'Estra, *Relation ou Journal d'un Voyage nouvellement fait aux Indes Orientales*, Paris, 1677.

113. J.H.V. Linschoten, *The Voyage of J.H.V. Linschoten to the East Indies*, A.C.Burnell (ed), 2 Vols., AES, 1988, (reprint).

114. Maurice Lombard, *L'Islam dans sa premiere Grandeur*, Paris, 1971.

115. A.H. Longhurst, *Hampi Ruins*, AES, 1996 (reprint).

116. Sr. Luillier, *Voyage aux Grandes Indes*, Amsterdam, 1727 (1st ed., 1702).

117. T. V. Mahalingam, *Administrative and Social Life under Vijayanagar*, 2 Vols., Madras, 1962.

118. S.K. Maity, see R. Mukherjee.

119. R.H. Major (ed), *India in the Fifteenth Century*, Deep Pub., 1974 (reprint), (Narratives of Abd-er Razzak, Nicolo Conti, A. Nikitin and Hieronimo di Santo Stephano).

120. R.C. Majumdar (ed), *The History of Bengal*, Vol. 1, Dacca University, 1963.

121. F.S. Manrique, *The Travels of Fray Sebastian Manrique* (tr. & ed. by C. E. Luard), 2 Vols. , Oxford, 1877.

122. Niccolai Manucci, *Storia de Mogor* (tr, & ed. W. Irvine), 4 Vols. New Delhi, 1981 (reprint).

123. F. Martin; *M(emoires de Francois Martin*, A. Martineau (ed.), 3 Vols. Paris,

1931æ34.

124. Streynsham Master, *The Diaries, 1675-1680,* R. C. Temple (ed), 2 Vols. London, 1911.

125. K.S. Mathew & Afzal Ahmad, *Emergence of Cochin in Pre-industrial Era,* Pondicherry University, 1990.

126. R. N. Mehta, *Medieval Archaeology,* Delhi, 1979.

127. R. N. Mehta, 'Khambat (Cambay)' in *Journal of M. S. University of Baroda,* 1975, Vol. XXIV. No. 1, pp. 17-29.

128. R. N. Mehta, 'Champanir : an Experiment in Medieval Archaeology' in *Madhu,* Delhi, Vol. XX, pp. 119-128.

129. R. N. Mehta, 'Socio-Political Factors for Establishment of Ahmedabad' in *Journal of the Oriental Institute,* Baroda, 1985, Vol. 34, No. 3-4, pp. 193-199.

130. S. C. Mishra, 'Urban History of India : Possibilities and Perspectives' in Indu Banga (ed), *The City in Indian History,* New Delhi, 1991, pp. 1-8.

131. Pranab K. Mitra, *Port Towns in Medieval India, 1605-1707,* Calcutta, 1995.

132. K. M. Mohsin, *A Bengal District in Transition : Murshidabad 1765-1793,* Asiatic Society, Dacca, 1973.

133. J. S. Hoyland & S. N. Banerjee (ed), *Commentaries of Father Monserrate,* AES, 1992 (reprint).

134. Shireen Moosvi, 'Urban Population in Pre-colonial India' in D.N. Jha (ed): *Society and Ideology in Indis,* New Delhi, 1996, pp. 291-302.

135. W.H. Moreland, *Jahangir's India: the 'Remonostratie' of Francisco Pelsaert,* Delhi, 1972.

136. K.D. Morrison, 'Patterns of Urban Occupation: Surface Collections at Vijayanagar' in *South-Asian Archaeology,* 1987, Pt. 2, pp. 1111-1125.

137. A. Mukherjee, see R.C. Sharma.

138. B.N. Mukherjee, *Media of Exchange in Early Medieval North India,* Delhi, 1992.

139. R. Mukherjee & S. K. Maity (ed), *Corpus of Bengal Inscriptions,* Calcutta, 1967.

140. Lewis Mumford, *The City in History,* London, 1961.

141. Shaikh Rizqullah Mushtaqui, *Waqiat-e Mushtaqui* (tr. by I.H. Siddiqui), New Delhi, 1993.

142. R.N. Nandi, 'Growth of Rural Economy in Early Feudal India' in *PIHC,* 1984, 45th session.

143. H. K. Naqvi, *Urbanisation and Urban Centres under the Great Mughals,* IIAS, Simla, 1971.

144. H. K. Naqvi, *Agricultural, Industrial and Urban Dynamism under the Sultans of Delhi,* New Delhi, 1986.

145. Mirza Nathan, *Baharistan-i Ghayebi* (tr. by M. I. Borah), 3 Vols, Gauhati,

1936.

146. H. Neville, 'Mint Towns of Bengal' in *JASB*, 1921, NS, XVII, the Numismatic Supplement.

147. L.S.S. O'Malley & M.M. Chakrabarty, *Bengal District Gazetteers: Jessore*, Calcutta, 1911.

148. L.S.S. O'Malley & M.M. Chakrabarty, *Bengal District Gazetteers: Hooghly*, Calcutta, 1912.

149. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire*, New Delhi, 1984 (reprint from 1782 ed.).

150. J. Ovington, *A Voyage to Surat in the year 1689,* H.G. Rawlinson (ed), AES, 1994 (reprint).

151. D.R. Patil, *Mandu*, ASI, New Delhi, 1982.

152. M.N. Pearson, *The Portuguese in India,* Orient Longmans, 1990 (reprint).

153. John Pemble (ed), *Miss Fane in India,* London, 1989(reprint).

154. Henri Pirenne, *Les Villes et les Institutions Urbaines*, 2 Vols. Brussels, 1939.

155. Henri Pirenne, *Histoire Economique de l'Occident Medievale*, Brussels, 1951.

156. Marco Polo, *The Travels of Marco Polo* (tr. by Benedotto & Ricci), AES, 1994 (reprint).

157. Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720,* Princeton, 1985.

158. Purchas, *Voyages*, Vol. V (account of Frederick) Edinburg, 1885.

159. S.B. Qanungo, *A History of Chittagong*, Vol. 1, Chittagong, 1988.

160. K.V. Soundara Rajan, *Ahmadabad*, ASI, 1980.

161. N.V. Ramanayya, *Vijayanagara,* AES, 1990 (reprint), (1st ed. 1933).

162. R. Ramchandran, *Urbanization and Urban Systems in India*, OUP, 1992.

163. J. Ravenshaw, *Gaur: Its Ruins and Its Inscriptions,* London, 1878.

164. Aniruddha Ray, see. S. Arasaratnam.

165. Aniruddha Ray, 'The Growth of the City of Surat, 1610-1671' in *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)*, 1979-81, Vols. XXIV-VI, pp. 95-107.

166. Aniruddha Ray, 'Four Cities of the Deccan, 1776' in *Itihas* (Hyderabad), July-December 1984, Vol. XII, No. 2, pp. 21-42.

167. Aniruddha Ray, 'The City of Bengalla in the European Travel Accounts and Cartography' in H.V.S. Murthy (ed), *Eassays on Indian History and Culture*, New Delhi, 1990, pp. 123-134.

168. Aniruddha Ray, 'Urbanisation in Medieval Bengal, c. A.D. 1200 to c. A.D. 1600' in *PIHC*, 1992-93, Warangle session, pp. 135-180.

169. Aniruddha Ray, 'Cambay and Its Hinterland: Early 18th century' in Indu Banga (ed), *The City in Indian History*, Delhi, 1991, pp. 131-152.

170. Aniruddha Ray, 'Archaeological Reconnaissance at the City of Gaur: A Preliminary Report', *Pratna-Samiksha*, 1993-94, Vol. 2 & 3, pp. 245-263.
171. Aniruddha Ray, 'Urbanisation and Social Change in Bengal at the end of the 16th century in V. K. Thakur (ed), *Towns in Pre-Modern India*, Patna, (1994), pp. 188-216.
172. Haraprasad Ray, *Trade and Diplomacy in India-China Relations*, Delhi, 1973.
173. James Rennell, *Memoir of a Map of Hindustan*, Calcutta, 1976 (reprint).
174. S.A. Nadeem Rezavi, 'Bureacratic and Noble's Buildings in Fatehpur Sikri: A Survey', paper presented at the Indian History Congress, 53rd session, Warangle, 1992-93 (unpublished).
175. S.A. Nadeem Rezavi, 'Shah Jahan's Palace at Fathepur Sikri', paper presented at the Indian History Congress, 57th session, Chennai, 1996 (unpublished)
176. S.A. Nadeem Rezavi, 'Revisiting Fatehpur Sikri: An Interpretation of Certain Buildings' in Irfan Habib (ed), *Akbar and His India*, OUP, 1997, pp. 174-187.
177. S.A.A. Rizvi, *Fatehpur Sikri*, ASI, 1972.
178. Salimullah, *Tarikh-i Bangla* (tr. by F. Gladwin), Calcutta, 1778.
179. Saba Samiuddin, 'Revenue Administration in Bengal Suba' (M. Phil Dissertation), Aligarh Muslim University (unpublished).
180. Jadunath Sarkar (ed), *History of Bengal*, Vol. II, Dacca University, 1971, (1st pub. 1948).
181. Gautier Schouten, *Voiage aux Indes Orientales* (tr. into French), 2 Vols. Amsterdam, 1707.
182. Surendranath Sen, *Indian Travels of Thevenot and Carerri*, National Archives of India, New Delhi, 1949 (reprint).
183. R.C. Sharma & A. Mukherjee, 'A Contemporary Account of Lahore in Early Seventeenth Century' in *PIHC*, 53rd session, 1992-93, Warangle, pp. 205-210.
184. R.S. Sharma, *Indian Feudalism*, Calcutta, 1965.
185. R.S. Sharma, *Urban Decay in India*, New Delhi, 1987.
186. H.K. Sherwani, *History of the Qutb Shahi Dynasty*, New Delhi, 1974.
187. H.K. Sherwani, *The Bahamanis of the Deccan*, New Delhi, 1985.
188. Robert Sewell, *A Forgotten Empire*, National Book Trust, 2nd ed., 1970 (reprint).
189. O. P. Singh, *Surat and Its Trade*, Delhi University, 1975.
190. Surinder Singh, 'Darul Sultanate Lahore, the Socio-cultural Profile of an Urban Centre, 1550-1700' in *PIHC*, 54th session, Mysore, 1994, pp. 287-296.
191. D.C. Sircar, *Land System and Feudalism in Ancient India*, Calcutta University, 1966.
192. D.C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Motilal Banarasidas, 1971.

193. G. Sjoberg, *The Pre-industrial City, Past and Present*, Glencoe, 1960.

194. R.B. Smith, *The First Age*, Bethesda, 1969.

195. Faria Y Sousa, *The Portuguese Asia* (tr. by J. Stevens), 3 Vols., London, 1695.

196. Teotonio R. de Souza, *Medieval Goa*, New Delhi, 1979.

197. Burton Stein, 'Vijayanagara, c. 1350-1564' in T. Roychoudhury & I. Habib (ed), *The Cambridge Economic History of India,* Vol I, (1984), pp. 102-124.

198. S.M. Stern, see A.H. Hourani.

199. M.R. Tarafdar, *Hussain Shahi Bengal, 1494-1538 A.D.,* Asiatic Society, Dacca, 1965.

200. M.R. Tarafdar, 'Trade and Society in early Medieval Bengal' in *IHR,* 1977, Vol. IV, No 1, pp. 274-286.

201. Jean-Baptiste Tavernier, *Travels in India,* W. Croke (ed), 2 Vols, New Delhi, 1977 (reprint).

202. Vijay K. Thakur (ed), *Towns in Pre-Modern India*, Janaki Prakashan, Patna, 1994.

203. Luis Philipe Thomas, see Genevieve Bouchon.

204. Joseph Tieffenthaeler, *Geographie de L'Indoustan* (tr. from German), Berlin, 1784.

205. L. Varthema, *The Itinerary of Ludvico di Varthema* (tr. by J.W. Jones), AES, 1997 (reprint).

206. H.C. Verma, *Dynamics of Urban Life in Pre-Mughal India*, New Delhi, 1986.

207. Max Weber, *The City*, Free Press, N.Y., 1958.

208. J. Westland, *Report on the District of Jessore*, Calcutta, 1871.

209. J.T. Wheeler (ed), *Early Travels in India*, Deep Publications, 1974 (reprint).

210. M. Wheeler, *The Indus Civilization*, Cambridge, 1968 (reprint).

211. C.R.Wilson, 'Note on the Topography of the River in the Sixteenth Century from Hooghly to the Sea as Presented in Da Asia of J.D. Barros' in *JASB*, 1892, No. I.

212. Andre' Wink, *Al-Hind,* OUP, 1990.

213. James Wise, 'Notes on Sonargaon, Eastern Bengal' in *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1874, No. 1, pp, 82-96.

214. G. Yazdani, *Mandu : The City of Joy*, Oxford, 1929.

215. G. Yazdani, *The Antiquities of Bidar,* AES, 1992 (1st ed. 1917).